সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী (র)

সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস

(১ম খণ্ড)

[হিজরী ১ম শতাব্দির মুজাদ্দিদ হযরত ওমর ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীয (র) থেকে হিজরী ৮ম শতাব্দির মুজাদ্দিদ জালালুদ্দিন রূমী (র) পর্যন্ত ১১ জন মর্দে মু'মিন ও মর্দে মুজাহিদের সাধনা ও কর্মবহুল জীবন]

আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী (র)

অনূদিত

تاریخ دعوت و عزیمت اول (21)

از سید ابوالحسن علی ندویؒ

مترجم: ابوسعید محمد عمر علی

ناشر: محمد برادرس 38، بنگلہ بازار، ڈھاکہ 1100.

মুহাম্মদ ব্রাদার্স

৩৮, বাংলা বাজার, ঢাকা

সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস (১ম খণ্ড)
মূল ঃ সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.
অনুবাদ ঃ আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী রহ.

প্রকাশকাল
জানুয়ারী, ২০১৫ ঈসায়ী
মাঘ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ; রবিউস সানী ১৪৩৬ হিজরী

প্রকাশনায় মুহাম্মদ আবদুর রউফ
মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ৩৮, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০
সেলঃ 01822-806163; 01776-438110

মুদ্রণে ঃ মেসার্স তাওয়াক্কুল প্রেস
৬৬/১, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ
সালসাবিল

ISBN: 984-622-001-4

মূল্য ঃ ৪০০.০০ (চারশত) টাকা মাত্র।

Shangrami Shadhakder Itihas: (History of the Soviours of Islamic Sprit) written by Allama Sayeed Abul Hasan Ali Nadvi (R) in Urdu and translated by A. S. M. Omr Ali (R) into Bengali and Published by Muhammad Abdur Rouf, Muhammad Brothers, 38, Bangla Bazar, Dhaka-1100. BANGLADESH. Cell Phone: 01776-438110

ইসলামের প্রচার ও প্রসারে যাঁরা চরম আত্মত্যাগের সম্মুখীন হয়েও বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি, এ পথের সকল প্রতিকূলতাকে যাঁরা হাসিমুখে মুকাবিলা করেছেন,

অত্যাচারী জালিমের খড়গ-কৃপাণ ও বদ্ধ কারাপ্রাচীর যাঁদের বিশ্বাসের ভিত্‌কে এক বিন্দুও টলাতে পারেনি,

বিলাসী ও আয়েশী জীবন যাপনের শত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যাঁরা নির্লোভ ও নির্মোহ জীবন যাপন করে মানুষের সামনে অনুপম আদর্শ স্থাপন করেছেন,

পর্ণ কুটিরে বাস করে এবং অনাড়ম্বর পরিবেশে থেকেও যাঁরা রাজা-বাদশাহ্‌র ঔদ্ধত্য ও দাম্ভিকতার সামনে নিজেদের শির সমুন্নত রেখেছেন, দুঃখী ও মজলুম মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের হতাশ অন্তরে আশা-ভরসার প্রদীপ জ্বালিয়েছেন,

তাদেরকে কাছে টেনেছেন,

আপন করেছেন,

রূহানিয়াতের প্রোজ্জ্বল আলোকধারায় যাঁরা পাপক্লিষ্ট ও পথভ্রষ্ট মানুষকে হিদায়াতের প্রশস্ত রাজপথে এনে দাঁড় করিয়েছেন, সেই সব জানা-অজানা মর্দে মু'মিন ও মর্দে মুজাহিদের পবিত্র রূহের উদ্দেশে—

— অনুবাদক

আমাদের কথা

ইসলাম একটি বিশ্বজনীন জীবন-দর্শন। অবস্থা, পারিপার্শ্বিকতা ও পরিবেশের প্রেক্ষাপটে উদ্ভূত যাবতীয় সমস্যার সুন্দর ও নিখুঁৎ সমাধান রয়েছে ইসলামে। জীবন প্রবাহের স্রোতধারায় ইসলামের অনুশাসনমালা এক কালজয়ী আদর্শরূপে স্বীকৃত। অভ্যুদয়ের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত বহু মনীষী ও আল্লাহ্ওয়ালা এর প্রচার ও সংরক্ষণে দিয়েছেন সীমাহীন কুরবানী। আমরা তাঁদের জীবনের কতটুকুই বা জানি?

আমরা সমাজের মূল স্রোতধারার সংস্কারক শক্তির কথা বেমালুম ভুলে যাই। যে সব মানব হিতৈষীবর্গ তাঁদের প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে সমাজের হিত সাধন করে গেছেন, কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজকে দান করেছেন এক সুষ্ঠু অবকাঠামো, মানবতার উত্তরণ ঘটিয়ে সৌহার্দ্যপূর্ণ ও পারস্পরিক সম্প্রীতির ডোরে আবদ্ধ করেছেন মানব সমাজকে– তাঁরা রয়েছেন ইতিহাসের পাতায় অনুল্লেখ্য। পক্ষান্তরে ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলো ভরে আছে রাজ-রাজড়াদের কাহিনীতে।

আজ মানুষ সচেতন হয়েছে অনেকটা। রাজ-দণ্ডমুণ্ডের অধিকারীরা আজ দিশেহারা। জ্ঞানরাজ্যে বিচরণকারীদের সংস্পর্শে এসে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে চায়। যুগধর্ম ও পরিবেশের এই জরুরী মুহূর্তে সংস্কারক ব্যক্তিত্বসমূহকে স্থায়ী আসনে সমাসীন করার জন্য যে সব মনীষী ও চিন্তাবিদ তাঁদের ক্ষুরধার লেখনী নিয়ে কলমী জিহাদের বিস্তীর্ণ ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছেন, উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'আলিম, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষক ও লেখক আল্লামা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী তাঁদের অন্যতম।

লাখনৌ-এর 'জামা'আতে দা'ওয়াত-ই-ইসলাহ ও তাবলীগ' যুগ-জিজ্ঞাসার প্রেক্ষাপটে সপ্তাহব্যাপী এক সেমিনারের আয়োজন করেছিল ১৩৭২ হিজরীর মুহাররম মাসে। এর আলোচ্য বিষয়ের শিরোনাম ছিল, "সংস্কার ও পুনর্জাগরণের ইতিহাস এবং উক্ত ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব।" জনাব আল্লামা নদভী উক্ত বিষয়ের ওপর নিবন্ধ পেশ করে এক নতুন ধারায় লেখনী পরিচালনার প্রেরণা লাভ করেন। এরপর আল্লাহ্র রহমত ও প্রাণান্তকর সাধনাকে সম্বল করে 'তারীখে দা'ওয়াত ও 'আযীমত' নামে সিরিজ পুস্তক প্রণয়নে হাত দেন এবং হযরত ওমর

ইবনে 'আবদুল 'আযীয (র) থেকে তিনি এর সিলসিলা আরম্ভ করেন। এ পর্যায়ে তিনি পাঁচটি গ্রন্থ রচনা করেন। মুসলিম জাহানের স্বনামধন্য 'আলিম, মর্দে মু'মিন ও মুজাদ্দিদবর্গের তেজোদ্দীপ্ত জীবনী তুলে ধরেছেন তিনি এ সব গ্রন্থে। মুসলিম জাহানে তাঁর এই সিরিজটি সর্বজনস্বীকৃত ও প্রশংসিত। বিশ্বের কয়েকটি ভাষায় এগুলোর তরজমা হয়েছে। বাংলাদেশী মুসলিম সমাজের উদ্দেশ্যে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক 'ইসলামী রেঁনেসার অগ্রপথিক' নামে উক্ত সিরিজের তিনটি খণ্ডের অনুবাদ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় ও বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। কিন্তু সুদীর্ঘ এক যুগ যাবত প্রকাশিত এ সব খণ্ডের আর কোন সংস্করণ মুদ্রিত না হওয়ায় আগ্রহী পাঠকের ঐকান্তিক অনুরোধে আল্লামা নদভী লিখিত পুস্তকাদির তরজমা ও প্রকাশের অনুমতি প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান "মজলিস নাশরিয়াত-ই-ইসলাম"-এর সংগে আমরা যোগাযোগ করি। "মজলিস নাশরিয়াত-ই-ইসলাম" কর্তৃপক্ষ আমাদের আগ্রহে সাড়া দিয়ে শর্তসাপেক্ষে এ সিরিজটি এবং হযরতের অন্যান্য পুস্তকাদি প্রকাশের অনুমতি দেন। এক্ষণে সেই আগ্রহী পাঠকের স্বার্থ আমরা এই দূরূহ কাজে হাত দিয়েছি তাদের প্রয়োজন পূরণে এ প্রয়াস সফল হলে আমাদের শ্রম সার্থক মনে করব। আল্লাহপাক আমাদের এ প্রয়াস কবুল করুন এবং সেই কিয়ামতের কঠিন দিনে নাজাতের ওসিলা বানিয়ে দিন– এটাই আমাদের মুনাজাত।

– প্রকাশক

অনুবাদকের আরয
(প্রথম সংস্করণ)

আল-হ়াম্‌দু লিল্লাহ্! অবশেষে তাঁরই অপার রহমতে মুসলিম বিশ্বের প্রখ্যাত 'আলিম, লেখক ও চিন্তাবিদ এবং রূহানী মার্গের অন্যতম জ্যোতিষ্ক হযরত মাওয়ানা সায়্যিদ আবু'ল-হাসান 'আলী নদভী (র.) রচিত "তারীখে দা'ওয়াত ওয়া 'আযীমাত" সিরিজের ১ম খণ্ডের তরজমা প্রকাশিত হল। এজন্য মহান আল্লাহ্ রাব্বু'ল-'আলামীনের দরবারে জানাই অসংখ্য শোকর ও সজুদ।

উর্দূভাষী পাঠকের নিকট 'তারীখে দা'ওয়াত ওয়া 'আযীমাত'-এর নতুন পরিচয়ের প্রয়োজন নেই। সর্বপ্রথম ভারতে প্রকাশিত হলেও ইতোমধ্যেই তা 'আরবী ও ইংরেজী সহ পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পাঠক মহলে সাড়া জাগিয়েছে। আমাদের জানা মতে এ পর্যন্ত কুয়েত ও বৈরূত থেকে 'আরবী ভাষায় দু'টি সংস্করণ, উর্দূ ভাষায় লখ্‌নৌ থেকে এ সিরিজের কোন কোন খণ্ডের দুই ও ততোধিক সংস্করণ এবং পাকিস্তানের করাচী থেকে একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। আলোচ্য সিরিজের তৃতীয় খণ্ডটি দীন অনুবাদক কর্তৃক বাংলা ভাষায় 'ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক' নামে অনুদিত হয়ে ১৯৮২ সালের ডিসেম্বরে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য, হযরত নদভী (র.)-র লিখিত 'যব ঈমান কি বাহার আঈ' ছিল ছিল প্রথম গ্রন্থ যা বর্তমানে অনুবাদক কর্তৃক অনূদিত হয়ে 'ঈমান যখন জাগলো' নামে সর্বপ্রথম বাঙলা ভাষায় আত্মপ্রকাশ করে।

১৯৭৯ সালে এ সিরিজের তৃতীয় খণ্ডটি আমার হাতে এলেও ১৯৮০-এর শেষাংশের পূর্বে এর তরজমার কাজে হাত দেওয়া সম্ভব হয়নি। তারপর ১৯৮১ সালের মে মাসে তরজমা শেষ হলেও তা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হতে ৮২-র ডিসেম্বর এসে যায়। প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই আগ্রহী পাঠক সমাজ পুস্তকটি দু'হাতে লুফে নেন এবং সেই সঙ্গে এর পূর্ববর্তী দু'টি খণ্ডের তরজমা প্রকাশের প্রবল তাকীদ আসতে থাকে। কিন্তু বহু চেষ্টা সত্ত্বেও খণ্ড দু'টি সংগ্রহে ব্যর্থ হওয়ায় স্বভাবতই এর তরজমা কর্মে বিলম্ব ঘটে। অবশেষে আল্লাহ্‌র অশেষ মেহেরবানীতে বাংলাদেশের অন্যতম খ্যাতনামা পুস্তক ব্যবসায়ী টিরধব অর্ভণরভর্টধমভটফ-এর স্বত্বাধিকারী বন্ধুবর জনাব নাজমুল করিম সাহেবের সৌজন্যে উক্ত খণ্ড দু'টি

সংগ্রহে সমর্থ হই। এ জন্য তাঁর নিকট আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। এ কাজের জন্য মহান আল্লাহ্র দরবারে যদি অধমের কিছুমাত্র পুরস্কারও প্রাপ্য হয়ে থাকে জনাব করিমকেও আমি তাতে শরীক করতে চাই।

তরজমা কর্মে হাত দেবার পরও নানা কারণে এর গতি আশানুরূপ ছিল না। অতিরিক্ত খাটুনিজনিত ক্লান্তি এবং মাঝে মধ্যেই শারীরিক নানা অসুস্থতা তরজমার স্বাভাবিক গতিকে ব্যাহত করেছে। এরই মাঝে জেনারেল আকবর খান লিখিত 'সায়ফুল্লাহ্ খালিদ (রা)' ('খালিদ বিন ওয়ালীদ' নামে প্রকাশিত) অনুবাদ করতে হওয়ায় বর্তমান গ্রন্থের তরজমা আরো খানিকটা বিলম্বিত হয়ে পড়ে। অবশেষে অনেক দেরীতে হলেও মহান আল্লাহ্র ফযল ও করমে অনূদিত, সম্পাদিত ও মুদ্রিত হয়ে পাঠকের হাতে তা পৌঁছুতে যাচ্ছে দেখে গভীর তৃপ্তিতে মন আমার ভরে উঠছে। এক্ষণে যাঁদের কথা মনে রেখে আমি এর তরজমায় প্রবৃত্ত হয়েছিলাম, যে আগ্রহী পাঠক সমাজের প্রবল তাকীদ ব্যক্তিগত শত অসুবিধা সত্ত্বেও আমাকে নিরন্তর পরিশ্রমে উদ্বুদ্ধ করেছিল তাঁরা যদি এর থেকে কিছুমাত্রও উপকৃত হন তাহলে আমি আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করব। সেই সঙ্গে যে মহান আল্লাহ্র রেযামন্দী লাভের নিয়তে এ কাজে ব্রতী হয়েছি তাঁর দরবারে গোনাগারের এ প্রচেষ্টা সামান্যতম কবুলিয়াত লাভ করলেও বান্দা নিজেকে সরফরায মনে করবে। আর তাঁর সন্তুষ্টিই হোক আমাদের সকল কর্ম-প্রেরণার মূল উৎস।

অনুবাদ সম্পর্কে আমার কিছু বলার নেই। নিরন্তর কর্মব্যস্ততার মাঝে আমার পক্ষে যা কিছু করা সম্ভব ছিল আমি তা করেছি। বাকিটুকু করেছেন এর সম্পাদক খ্যাতনামা অনুবাদক ও লেখক অগ্রজপ্রতিম মওলানা আবদুল মতীন জালালাবাদী। প্রশংসার মত কিছু থাকলে সেটা তাঁরই, ব্যর্থতা আমার। এর কাফফারা ভবিষ্যতের জন্য তুলে রাখা ছাড়া উপায় কি!

নিতান্ত দুঃখজনক হলেও সত্য, ইসলামী সাহিত্যে আরবী ভাষার পরে যে ভাষার দান সর্বাধিক-সেই ফারসী ভাষার চর্চা মুসলিম প্রধান বাংলাদেশ থেকে যে এভাবে উঠে যাবে তা কয়েক যুগ আগেও বোধ হয় কেউ ভাবে নি। পৃথিবীর তাবৎ ভাষার মধ্যে ফারসী ভাষার শ্রুতি-মাধুর্য সকলেই স্বীকার করেন। এহেন সমৃদ্ধ ও মিষ্টি একটি ভাষা থেকে এ ভাবে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আমরা বোধ হয় খুব বেশি লাভবান হই নি, ভবিষ্যতেও লাভবান হবার তেমন সম্ভাবনা নেই। অবশ্য আমি নিজেও এর ব্যতিক্রম নই। গরজ বড় বালাই; তাই ভবিষ্যতে আধুনিক শিক্ষা লাভের স্বার্থে ইংরেজীর দরকার পড়বে বিধায় আমি আমার মাদরাসা জীবনে ইচ্ছে থাকলেও ফারসী ভাষা শিখতে পারিনি। ফলে বর্তমান গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে

মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (র)-এর 'দীওয়ান' ও 'মছনবী' থেকে উদ্ধৃত কবিতাংশ অনুবাদের ক্ষেত্রে আমাকে ভীষণ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। অবশেষে এদেশের অন্যতম খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ ও আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত হাম-বায়'আত পরম সম্মানিত মাওলানা সুলতান যওক সাহেব এই সমস্যা নিরসনে সাগ্রহে এগিয়ে আসেন এবং উদ্ধৃত কবিতাংশ উর্দূতে তরজমা করে দেন। তাঁর এ মহানুভবতা কোন দিন ভুলবার নয়। আল্লাহ্ পাক তাঁকে জাযায়ে খায়ের দিন, এই আমার একান্ত মুনাজাত।

এ বই প্রকাশের পেছনে অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের পরিচালক বন্ধুবর মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, সহকারী পরিচালক স্নেহভাজন মওলানা আবুল বাশার আখন্দ ও সহকারী পরিচালক বড় ভাই অধ্যাপক মওলানা মোশাররফ হোসাইনের অবদান সবচেয়ে বেশী। সে জন্য সাধারণ ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁদের সঙ্গে আমার সম্পর্কের অমর্যাদা করতে চাই না। স্নেহ-ভাজন মোহাম্মদ মোকসেদ প্রথম প্রুফ দেখে দিয়ে আমাকে ঋণী করেছেন। নির্ঘন্ট তৈরীতে স্নেহভাজন জিল্লুর রহমান, আবদুল হান্নান, আশকার আলী, মোমতাজ উদ্দীন, কন্যা মরিয়ম জামিলা ও জামিলা কুলছুম যে সহযোতিা দেখিয়েছে তজ্জন্য আমি তাঁদের নিকটও কৃতজ্ঞ। এতদ্ভিন্ন তরজমার কাজে দরকারী সহযোগিতা যুগিয়ে ও অনেক স্বার্থ কুরবানী দিয়ে জীবনসঙ্গিনী বেগম জেবুন্নেছা যেভাবে আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন সে জন্য আমি তাঁকেও আমার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রাখছি। আল্লাহ্ পাক সবাইকে তাঁদের স্ব-স্ব খিদমতের পুরস্কার দিন।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশনকে এ বই-এর প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য মুবারকবাদ জানাই।

৩০ শে শা'বান, বুধবার ১৪০৭ হি. আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

লেখকের আরয

১৩৭২ মুহাররম মাসে লাখনৌয়ে 'জামা'আতে দা'ওয়াত-ই ইসলাহ্ ও তাবলীগ'-এর পক্ষ থেকে বন্ধু-বান্ধবদের সম্মুখে দরকারী বিষয়াবলীর ওপর বক্তৃতা ও আলোচনার ইন্তেজাম করা হয়। শ্রোতাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়ানো এবং তাদের মানসিক প্রশিক্ষণের উপকরণ যোগান দেওয়াই ছিল এর উদ্দেশ্য। এসব বক্তৃতা, আলোচনা এবং নিবন্ধ পাঠের সিলসিলা সপ্তাহব্যাপী চলে। এই প্রশিক্ষণ সপ্তাহের দীর্ঘ ও ধারাবাহিক আলোচ্য বিষয়ের শিরোনাম ছিল, "সংস্কার ও পুনর্জাগরণের ইতিহাস এবং উক্ত ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব।" উল্লিখিত বিষয়ে আলোচনার ভার পড়ে অধম গ্রন্থকারের ওপর এবং প্রায় সপ্তাহকাল এই বিষয়ের উপর আমি আলোচনা করি। স্রেফ একটি সংক্ষিপ্ত স্মারক চিহ্ন, কিছু শিরোনাম ও কিছু ইশারা-ইঙ্গিত সামনে রেখে আলোচনা অব্যাহত থাকে। শ্রোতাগণ তাদের নিজস্ব পন্থায় এই আলোচনার সংক্ষিপ্তসার সংরক্ষণ করতেন।

পরবর্তীকালে প্রচারের নিয়তে যখন এর ওপর নজর দিলাম তখন অনুভব করলাম যে, এ কাজ একান্ত মনোযোগ ও পরিপূর্ণ তৃপ্তির সঙ্গে করা দরকার। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক বিষয় যার ওপর (আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান মুতাবিক) বিস্তারিত ও পরিপূর্ণ কোন আলোচনা হয়নি। এটাই ইসলামের ইতিহাস ও ইসলামী সাহিত্যের একটি বড় শূন্যতা যা সত্বর পূরণ হওয়া দরকার। এই শূন্যতা থাকার কারণে কোন কোন চিন্তাশীল মহলে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, ইসলাম ও মুসলিম ইতিহাসে সংস্কার, রেনেসাঁ তথা পুনর্জাগরণ ও বিপ্লবের ধারাবাহিক ও অবিচ্ছিন্ন কোন বিবরণী পাওয়া যায় না, বরং এতে বিরাট ও দীর্ঘ শূন্যতাই পরিদৃষ্ট হয় যা শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী বিস্তৃত। কয়েক শ' বছর পর কিছু কিছু ব্যক্তিত্বের উত্থান ঘটেছে যাঁরা প্রতিকূল অবস্থার সাথে লড়েছেন এবং এ কারণে চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে একটা উল্লেখযোগ্য মর্যাদারও অধিকারী হয়েছেন। অন্যথায় সাধারণভাবে মধ্যম শ্রেণীরই কিছু লোকের সন্ধান পাওয়া যায় যাঁরা চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে এবং জ্ঞানগত ও বাস্তব কর্মকাণ্ডে কোনরূপ নতুনত্ব কিংবা বিশেষত্বের অধিকারী ছিলেন না। স্রেফ জনা-কয়েক হাতে গোণা ব্যক্তিত্ব (যাঁদের

সংখ্যা ৭/৮ জনের বেশী হবে না) এই হিসাবের বাইরে।

বাহ্যত কথাটা খুবই মামুলী মনে হলেও এর ফলাফল কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী। এটা ইসলামের অভ্যন্তরীণ শক্তি ও যোগ্যতা সম্পর্কে এক ধরনের খারাপ ও হতাশাব্যঞ্জক ধারণা। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম প্রতিটি যুগে প্রয়োজনীয় লোক এবং ইসলামী পুনর্জাগরণে যথার্থ ভূমিকা গ্রহণ করার মত উদ্যোগী পুরুষ সৃষ্টি করেছে যার তুলনা অন্য কোন ধর্মে কিংবা অপর কোন জাতির মধ্যে মেলে না। আসলে এটা এক ধরনের হীনমন্যতাবোধ ও পরাজিত মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ, যার জ্ঞানগত কোন ভিত্তি নেই।

অবশ্য এর পেছনেও কারণ রয়েছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, মুসলিম ইতিহাসের বিস্তৃত ভাণ্ডারে এ সম্পর্কিত এমন সব গ্রন্থেরই সন্ধান মেলে যেগুলোকে ঘটনাবলীর তালিকা-সূচী বলাই শ্রেয় এবং যেগুলোর কেন্দ্রীয় চরিত্র হচ্ছেন শুধুমাত্র রাজা-বাদশাহ অথবা কতিপয় উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম ও মুসলমানদের ধারাবাহিক বুদ্ধিবৃত্তিক ও সংস্কারমূলক কর্ম-সাধনার এমন কোন ইতিহাস নেই যার ভেতর ঐসব ব্যক্তিত্বের বিপ্লবী কর্মকাণ্ড তথা তাঁদের পরিচালিত আন্দোলনের পরিচিতি রয়েছে। ঐসব ব্যক্তিত্ব যাঁরা মুসলিম ইতিহাসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছেন, ইসলামকে সময়োচিত হেফাজত ও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন, ভুল প্রবণতার সংস্কার এবং অশান্তি ও বিপর্যয়ের উৎখাত করেছেন এবং ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিক ও কার্যকর ভাণ্ডারে কোন না কোন উল্লেখযোগ্য অবদান বৃদ্ধি করেছেন। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের দা'ওয়াত ও সংস্কার আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় কোন শূন্যতা নেই, শূন্যতা রয়েছে শুধু ইসলামের ইতিহাস রচনায় ও বিন্যস্তকরণের ক্ষেত্রে। এই শূন্যতা পূরণ যুগের একটি দাবি এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও ইসলামী খিদমতও বটে। এই দাবি পূরণের দ্বারা কেবল দা'ওয়াত ও সংস্কার আন্দোলনের ইতিহাসই বিন্যস্ত হবে না বরং এ থেকে মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও জ্ঞানগত উত্থান-পতনের ইতিহাসও জন্ম নেবে। কিন্তু বিষয়টির ওপর যখন কলম ধরলাম তখনই বুঝতে পারলাম যে, এটি একটি কথিকা কিংবা নিবন্ধের বিষয় নয়; বরং একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বিরাট কলেবরের গ্রন্থের বিষয়। আর এজন্যে আবার আমাকে ইতিহাস অধ্যয়ন করতে হবে এবং একে একটি বিশেষ মাপে বিন্যস্ত অথবা একটি বিশেষ আঙ্গিকে ও কাঠামোয় ঢেলে সাজাতে হবে। এজন্য সাধারণভাবে ইতিহাস

পাঠই যথেষ্ট নয়; বরং বিভিন্ন ধর্মমত, নানা জ্ঞান ও বিষয় শাস্ত্রের ইতিহাস অধ্যয়নের প্রয়োজন। বাস্তব সত্য এই যে, এই বিষয়টি যেরূপ প্রশান্তি, নিরাপত্তা ও অবকাশের দাবি জানায় তা এই অশান্ত ও ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ জীবনে মেলা খুবই দুষ্কর। তবুও বিষয়টি জরুরী বিধায় এই উপলব্ধিটুকুই আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করেছে।

এই বিষয়টিও সম্মানিত পাঠকবর্গের স্মরণে রাখতে হবে যে, এই পুস্তকে আমরা 'তাজদীদ' নামক পরিভাষা নিয়ে কোন আলোচনা করছি না কিংবা সে সব ব্যক্তি নিরূপণ করাও আমাদের উদ্দেশ্য নয় যাঁরা মুজাদ্দিদ পদে আসীন হবার উপযুক্ত এবং যাঁদের একক সত্তা ধর্মীয় বিপ্লব সাধন করেছে এবং যাঁরা তাজদীদ-এর শর্তাদি পূরণ করেছেন। এখানে ইসলামের তেরশ বছরের ইতিহাসের 'ইসলাহ্' ও 'ইনকিলাব' তথা সংস্কার ও বিপ্লবায়ন প্রয়াসের ধারাবাহিকতা বর্ণনা এবং সে সব ব্যক্তিবর্গকে চিহ্নিত করা আমাদের উদ্দেশ্য, যাঁরা স্ব স্ব যুগে নিজ নিজ যোগ্যতা মুতাবিক দীন-এর পুনরুজ্জীবন ও পুনর্জাগরণ এবং ইসলাম ও মুসলমানদের হেফাজতের কাজে অংশ নিয়েছেন এবং যাঁদের সমবেত প্রচেষ্টা দ্বারা ইসলাম জীবিত ও সংরক্ষিত আকারে এই মুহূর্তে বিদ্যমান এবং মুসলমানরা একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায় (উম্মাহ্) হিসাবে পরিদৃশ্যমান। এই নিবন্ধে এমন কতিপয় ব্যক্তির আলোচনাও আসবে যাঁদেরকে স্বতন্ত্রভাবে যদিও মুজাদ্দিদ বলা যায় না, কিন্তু দীনের তাজদীদ ও পুনরুজ্জীবন এবং সংস্কার ও বিপ্লবের সংক্ষিপ্ত-সারের মধ্যে তাঁদের হিস্যা অবশ্যই রয়েছে। মুসলিম জাতি তাঁদের উপকার ভুলতে পারে না।

এই গ্রন্থ প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে ঃ

১. কোন দা'ওয়াত কিংবা কোন ব্যক্তিত্বের অবস্থা ও লক্ষ্য সম্পর্কে অবহিত হবার জন্য সাধারণত ঐ ব্যক্তির স্ব-রচিত গ্রন্থ, লিখিত নিবন্ধাদি এবং সংকলিত বাণীসমূহের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে সফল না হতে পারলে অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে কোন শূন্যতা দেখা গেলে তাঁর বন্ধু-বান্ধব, ছাত্র ও সমসাময়িকদের লিখিত গ্রন্থের বর্ণনাসমূহ থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে ভাষা ও যুগ নির্বিশেষে সকল মাধ্যম ব্যবহার করা হয়েছে। যেখানেই প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া গেছে, সেখান থেকেই তা গ্রহণ করা হয়েছে এবং হাওয়ালা দেওয়া হয়েছে।

২. ব্যক্তিত্বের জীবন-চরিত আলোচনার ক্ষেত্রে তাঁর পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সে

যুগের চিন্তা-ভাবনা, জ্ঞানের মাত্রা ও কর্মক্ষেত্রের প্রশস্ততাকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে করে ঐ সব ব্যক্তিত্বের সঠিক মর্যাদা ও সাফল্যের পরিমাপ সঠিকভাবে নিরূপিত হয় এবং সেই যুগ ও পরিবেশে তাঁদের সাফল্যের সম্ভাবনা কতটুকু ছিল তার পরিমাপ করে তাঁদেরকে ইতিহাসে যথাযথ মর্যাদা ও স্থান দেওয়া যায়। কোন ব্যক্তিত্বকে তাঁর পরিবেশ থেকে বের করে অন্য পরিবেশে নিয়ে এসে ভিন্ন যুগের পাল্লায় ও চাহিদায় মাপা, অতঃপর সেই মাপকাঠিতে তাঁর ত্রুটি-বিচ্যুতি তুলে ধরাকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে একটি সমালোচনামূলক কৃতিত্ব মনে করা হলেও জ্ঞানী ব্যক্তিরা এটাকে একটি বড় রকমের বেইনসাফী ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক বলেই মনে করেন। কারণ কোন মানুষকে তার যুগের প্রয়োজন ও চাহিদা এবং সে যুগের কর্মক্ষেত্রের সীমারেখার দিক দিয়েই কেবল সফল কিংবা অসফল বলা যেতে পারে। কেননা কোন ব্যক্তিত্বকেই, চাই তিনি ইসলামের ইতিহাস বা অন্য যে কোন ইতিহাসেরই অন্তর্ভুক্ত হোন, ভিন্ন যুগ ও পরিবেশের দৃষ্টিকোণ থেকে এবং ঐতিহাসিকের প্রবণতা ও ধ্যান-ধারণার মাপকাঠিতে ব্যর্থ প্রমাণ করাটাকে সত্যিকার বিচার বা ইনসাফ আখ্যা দেওয়া যায় না।

৩. কোন মুবাল্লিগ, গ্রন্থকার ও চিন্তাবিদের গ্রন্থ থেকে কতিপয় উদ্ধৃতি পেশ করাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়নি। কেননা এ থেকে তাঁর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, তাঁর জ্ঞানবত্তা ও মেধার পরীক্ষা সঠিকভাবে করা যায় না এবং পাঠক তাঁর সাহচর্যের স্বাদ ও সান্নিধ্য অনুভব করতে পারেন না। এই গ্রন্থে বিশিষ্ট মুবাল্লিগ, সংস্কারক, গ্রন্থকার এবং চিন্তাশীল ব্যক্তির লিখিত রচনা ও বক্তৃতামালার এত বিভিন্নমুখী ও বিস্তৃত উদ্ধৃতি পেশ করা হয়েছে যে, পাঠক অনুভব করবেন, তাঁর কিছু সময় উল্লিখিত ব্যক্তিত্বের সাহচর্যেই কাটল এবং তাঁদের সংগে আলাপ বিনিময়ের মওকা মিলল। এজন্য স্বয়ং গ্রন্থকার তাঁর জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ঐ সব মহান ব্যক্তির রচনা, ওয়া'জ-নসীহত এবং তাঁদের জ্ঞানগত ও চিন্তার প্রভাব বলয়ে ও পরিচয়ের পরিবেশে অতিবাহিত করেছেন এবং চেষ্টা করেছেন তাঁদের আলোচনা ও পরিচিতি পেশ করাকালে একটা নির্দিষ্ট সময় সেই পরিবেশে কাটাতে এবং সেই সব প্রভাব ও মানসিক অবস্থা দ্বারা প্রভাবান্বিত হতে, যদ্দারা উক্ত মহাত্মাদের সমসাময়িক ও একই সংগে উপবেশনকারী বন্ধু-বান্ধব ও ভক্ত-অনুরক্তরা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। এরই ফলে পাঠক বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে গ্রন্থকারের

আন্তরিক টান পরিষ্কার উপলব্ধি করতে পারবেন। এই বিষয়টি যদি কোন সমলোচকের দৃষ্টিতে সমালোচনাযোগ্য এবং গ্রন্থকারের দুর্বলতা বলে বিবেচিত হয় তাহলে এই দুর্বলতা স্বীকার করে নিতে গ্রন্থকারের কোন দ্বিধা নেই এবং এজন্য তিনি কোন কৈফিয়ত প্রদানেরও প্রয়োজন বোধ করেন না।

৪. ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের স্রেফ 'ইলমী' কামালিয়াত পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ এবং তাঁর রচিত গ্রন্থাদি থেকে উদ্ধৃতি পেশ করাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়নি বরং তাঁর জীবনের আধ্যাত্মিক দিক, আল্লাহ্‌র সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ও তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও উজ্জ্বলরূপে তুলে ধরা হয়েছে। কেননা এটা ইসলামী রেনেসাঁর প্রথম যুগের অগ্রপথিকদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য যে, নিজেদের 'ইলমী কামালিয়াত ও কর্মের মধ্যে নিবিষ্টতার সঙ্গে সঙ্গে 'ইবাদত-বন্দেগী ও আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের প্রতিও তাঁদের বিশেষ ঝোঁক থাকত। তাঁদের কামিয়াবী ও জনপ্রিয়তার পেছনে এরও একটা বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। এ সবের আলোচনা না করলে তাঁদের জীবনী আলোচনা অপূর্ণ থাকবে। উপরন্তু এই বিরাট গ্রন্থ এবং ইতিহাসের এরূপ বিস্তৃত ভাণ্ডার যাঁরা অধ্যয়ন করবেন তাঁদের এটা অধিকার এবং তাঁদের কষ্ট ও পরিশ্রমের এটা নীরব দাবি যে, তাঁরা এ ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক তথ্যাদিই কেবল আহরণ করবেন না; বরং রূহ ও হৃদয়ের শ্যামলিমা এবং আমলের স্বাদও উপভোগ করবেন।

৫. কোন ব্যক্তিত্বের পরিচয় দানের ক্ষেত্রে কেবল তাঁর ফযীলত ও কামালিয়াত বর্ণনাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়নি; বরং যখন লক্ষ্য করা গেছে যে, ন্যায়পরায়ণ ও সংযত সমসাময়িক ব্যক্তিবৃন্দ এবং প্রজ্ঞাবান পরবর্তী পুরুষগণ তাঁর রচিত গ্রন্থাদি ও চিন্তা-ভাবনার ওপর সমালোচনা করেছেন, তখন সে বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে। আর যদি তাঁর জওয়াব দেওয়া হয়ে থাকে এবং তাঁর পক্ষ থেকে প্রতিরোধ এসে থাকে তাহলে সেটিও পেশ করা হয়েছে, কিন্তু ইতিহাসকে সমালোচনামূলক প্রমাণ করার জন্য অনাবশ্যক সমালোচনার কোন অবকাশ রাখা হয়নি।

এটি এই সিরিজের প্রথম খণ্ড। প্রথমে ধারণা ছিল যে, খণ্ডটি শায়খুল ইসলাম ইমাম ইব্‌ন্ তায়মিয়া (র)-এর ওপর সম্পূর্ণ হবে। এই প্রেক্ষিতে প্রথম খণ্ডে হিজরী ১ম শতাব্দী থেকে হিজরী ৮ম শতাব্দী পর্যন্ত ইসলামী রেনেসাঁ ও সংস্কার আন্দোলনের ইতিহাসের রোয়েদাদ এসে যায়। কিন্তু ইব্‌ন তায়মিয়ার আলোচনা (তাঁর যুগের গুরুত্ব এবং তাঁর কর্মের বিস্তৃতির প্রেক্ষিতে) এত বেশী বিস্তৃত হয়ে

যায় যে, সেটাকেই এই গ্রন্থের স্থায়ী খণ্ডের রূপদান করতে হয় যা এই সিরিজের দ্বিতীয় খণ্ড হবে। গ্রন্থের তৃতীয় অংশটি (সম্ভবত চতুর্থ খণ্ডটিও) ভারতবর্ষের ইসলামী রেনেসাঁর ঐ সব অগ্রপথিকদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে যাঁরা গত শতাব্দীতে মুসলিম জাহানের সংস্কার ও রেনেসাঁ আন্দোলনের পতাকাবাহী এবং চিন্তা ও গবেষণার উৎস ছিলেন।

সবশেষে এ দীন গ্রন্থকার অসংকোচে স্বীকার করছে যে, এই গ্রন্থ রচনার জন্য যতটা সময়, যতখানি শান্ত ও নিরিবিলি পরিবেশ, বিস্তৃত ও গভীর অধ্যয়ন এবং বিস্তৃত ও সৃষ্টিশীল (متنوع) জ্ঞানের দরকার ছিল তা গ্রন্থকারের নেই। যা কিছু এই সময়ে এবং এরূপ অবস্থায় সম্ভব হয়েছে তা তাঁর বিব্রতকর অবস্থা, মানসিকতা ও জ্ঞানের দৈন্যের মুকাবিলায় কেবল আল্লাহর সাহায্য ও সমর্থনেই হয়েছে। আর সাহায্যকারী তো একমাত্র আল্লাহ্ই।

৪ঠা রবীউ'ল-আউয়াল
১৩৭৪ হি.

আবুল হাসান আলী নদভী
দাইরা-ই শাহ্ 'আলামুল্লাহ
রায়বেরেলী

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

"তারীখ-ই-দা'ওয়াত ও 'আযীমাত" (ইসলামী রেনেঁসার অগ্রপথিক), ১ম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করছি এবং তাঁর দরবারে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সুযোগ বেশ কয়েক বছর পর এল। এই বিলম্বের জন্য লিপিকরের অভাব, প্রকাশনার ক্ষেত্রে নানাবিধ প্রতিকূলতা এবং গ্রন্থকারের বর্ধিত ব্যস্ততাই প্রধানত দায়ী। অন্যথায় এই গ্রন্থটি ভারতীয় উপমহাদেশের জ্ঞানী-গুণী ও ধর্মীয় মহলে যেভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে, যেভাবে সুধী পণ্ডিতমণ্ডলী ও বিদগ্ধজনের ওপর এর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেছে এবং প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হবার পর যে দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়েছে তাতে স্বাভাবিক দাবি অনুযায়ী এতদিনে এর কয়েকটি সংস্করণ বেরিয়ে যেত। কিন্তু তা হয়নি। কেননা উর্দূ গ্রন্থ প্রকাশনার ক্ষেত্রে এখন যে সব অসুবিধা ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয় তা কোন গ্রন্থকারই কেবল উপলব্ধি করতে পারবেন। এ সব অসুবিধার কারণেই বর্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক বিলম্ব ঘটেছে। এ জন্য গ্রন্থকার আন্তরিকভাবে দুঃখিত এবং সুধী পাঠকবৃন্দের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

এ গ্রন্থে নিবন্ধ, বিষয়বস্তু ও শিরোনামের দিক দিয়ে তেমন কোন বৃদ্ধি ঘটেনি। তবে যা হয়েছে তা খুবই মূল্যবান ও উল্লেখযোগ্য এবং এতে গ্রন্থের মূল্য ও উপকারিতা অবশ্যই বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মধ্যে দু'টি বিষয় উল্লেখ করার মত। প্রথম বিষয়, "তাতারী ফিতনা ও ইসলামের নবতর পরীক্ষা" শিরোনামের অধীনে 'তাতারী হামলা ও এর কারণ' শীর্ষক একটি নিবন্ধ। এতে (গ্রন্থকারের জ্ঞান মুতাবিক) সে সময়কার মুসলিম বিশ্বের নৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক অবস্থা প্রথমবারের মত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে এবং জগতের এই বিভীষিকা ও উন্মত্ত সয়লাবের অন্তর্নিহিত ও অদৃশ্য কার্যকারণ কুরআন মজীদের পেশকৃত পথ-নির্দেশনার উজ্জ্বল আলোকে এবং খোদায়ী কানুনের

রূপকের সাহায্যে খেলাখুলিভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এটা ছিল একটি প্রাথমিক প্রয়াস এবং ঈমানী চিন্তা ও চেতনার একটি নমুনা যাকে আরও সম্মুখে সতর্কীকরণ ও অগ্রসর করানো যেত, যদিও তা বর্তমান অবস্থায়ও অন্তর্দৃষ্টি, শিক্ষা ও উপদেশ থেকে মুক্ত নয়।

দ্বিতীয়ত, গ্রন্থের উপক্রমণিকায় 'অপরাপর ধর্মের ইতিহাসে সংস্কারকের স্বল্পতা' শিরোনামে খৃস্টবাদ ও হিন্দু ধর্মের সংস্কার ও পুনর্জাগরণের ব্যাপারে কিছু নতুন তথ্য যোগ করা হয়েছে। এই দু'টি পরিবর্ধন ভিন্ন এই সংস্করণে কেবল ১ম সংস্করণের ভুলত্রুটিগুলোর ব্যাপক ও আংশিক সংশোধন করা হয়েছে।

মুনাজাত করি, আমার এই প্রচেষ্টা আল্লাহর দরবারে কবুল হোক এবং এই বিষয় বিন্যাসের পেছনে যে উদ্দেশ্য কাজ করেছে, যা আমি মুখবন্ধে উল্লেখ করেছি, তাও পূর্ণতা লাভ করুক।

৩রা সফর, ১৩৮৯
২১ এপ্রিল, ১৯৬৯ সোমবার

আবুল হাসান 'আলী নদভী
দাইরা-ই শাহ্ 'আলামুল্লাহ্
রায়বেরেলী

সূচী

ভূমিকা ঃ

রেনেসাঁ ও সংস্কার আন্দোলনের আবশ্যকতা এবং ইসলামের ইতিহাসে এর ধারাবাহিকতা ২৫ - ৩৯ পৃ.

জীবন গতিময় ও পরিবর্তনশীল ঃ মুসলিম উম্মাহ্র যুগটি ছিল সর্বাধিক পরিবর্তনশীলঃ ইসলামের স্থায়িত্ব ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য গায়বী ব্যবস্থাপনা ঃ ইসলামের জীবন সত্তার ওপর হামলা ঃ ধর্মের জন্য জীবিত ব্যক্তির প্রয়োজন ঃ ইতিহাসের লুপ্ত-প্রায় উৎস ঃ ইসলামের উত্তরাধিকার।

প্রথম অধ্যায় ঃ

হিজরীর প্রথম শতাব্দীর সংস্কার প্রয়াস এবং হযরত ওমর ইবন 'আবদুল 'আযীয (র) ৪০ - ৬২ পৃ

.উমায়্যা যুগে জাহিলী প্রবণতা ও প্রভাব ঃ উমায়্যা যুগের ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব এবং তাঁদের চারিত্রিক প্রভাব ঃ বিপ্লবী হুকুমতের প্রয়োজনীয়তা ঃ তাঁর বিপদরাজি ঃ হযরত ওমর ইব্ন 'আবদুল 'আযীয (র) খলীফা পদে অধিষ্ঠিত ঃ খিলাফত লাভের পরবর্তী জীবন ঃ বিপ্লবাত্মক সংস্কার ঃ আমল-আখলাকের প্রতি মনোনিবেশ ঃ 'ইল্‌ম ও সুন্নাহ পুনর্জীবনে তাঁর ভূমিকা ঃ কতিপয় পত্র ও ফরমান ঃ ইসলামের প্রচার ও প্রসারের দিকে মনোনিবেশ ঃ হযরত ওমর ইব্ন 'আবদুল 'আযীয (র)-এর সংস্কারের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ঃ তাঁর জীবনের মূল্যবান সম্পদ ঃ ওমর ইব্ন 'আবদুল 'আযীয (র)-এর ওফাত।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ

দ্বিতীয় শতাব্দীর সংস্কার প্রচেষ্টা এবং হযরত হাসান বসরী (র) ৬৩ -৭৮ পৃ.

মুসলিম উম্মাহ্র নৈতিক ও চারিত্রিক অবনতি এবং তাদের ঈমানী দুর্বলতা ঃ তাবি'ঈদের দা'ওয়াত ঃ হাসান বসরী (র)-এর ব্যক্তিত্ব এবং দা'ঈ হিসাবে তাঁর যোগ্যতা ঃ হাসান বসরী (র)-এর ওয়া'জ ঃ তাঁর সত্য-কথন ও নির্ভীকতা ঃ ইসলামী হুকুমতে নিফাক-চিহ্ন, মুনাফিকী ও মুনাফিকদের নিশানদিহী ঃ হাসান বসরী (র)-এর ওফাত এবং তাঁর জনপ্রিয়তা ঃ হুকুমতে বিপ্লব সাধনের প্রয়াস।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ

আব্বাসীয় খিলাফত এবং ধর্মীয় দা'ওয়াত ও আলোচনা ৭৯ - ৮২ পৃ.

'আব্বাসীয় খিলাফত ও তার প্রভাব ঃ বাগদাদে আল্লাহ্র দা'ঈ।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ

হাদীছ ও ফিক্'হ্ সংকলন ৮৩ - ৯৩ পৃ.

মুসলিম উম্মাহ্র দুটো তাৎক্ষণিক প্রয়োজন ঃ হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলন ঃ মুহাদ্দিছীনে কিরামের উন্নত মনোবল এবং কঠোর পরিশ্রম ঃ আসমাউ'র- রিজালশাস্ত্র ঃ মুহাদ্দিছীনে কিরামের সতর্কতা ও আমানতদারী ঃ স্মৃতি শক্তি ঃ দরস মজলিসে লোকের ভীড় ঃ ফিক্'হশাস্ত্র সংকলন ঃ ইমাম চতুষ্টয় ও তাঁদের বৈশিষ্ট্য ঃ ইমাম চতুষ্টয়ের শিষ্য-শাগরিদ ও খলীফাবৃন্দ ঃ ফিক'হ্ সংকলনের ফায়দা

পঞ্চম অধ্যায় ঃ

খাল্ক'-ই কুরআনের ফিতনা এবং ইমাম আহ্মদ ইব্ন হাম্বল (র) ৯৪ -১১২ পৃ.

ঐশী দর্শন এবং তাঁর সত্তা ও গুণাবলী সংক্রান্ত বাহাছ ঃ মু'তাযিলাদের উত্থান ঃ ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) : ফিতনা-ই-খাল্কে' কু'রআন ঃ বিপদ-আপদ ও পরীক্ষার মাঝে ইমাম আহমদ (র) : আহমদ (র)-এর মুখে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ ঃ তুলনাহীন ইচ্ছাশক্তি ও দৃঢ়তা ঃ ইমাম আহমদ (র)-এর গৌরবময় কৃতিত্ব ও অবদান এবং তার বিনিময়।

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ

মু'তাযিলা ফিতনা এবং ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী ও তাঁর অনুসারীবৃন্দ ১১৩ -১২৭ পৃ.

মু'তাযিলাবাদের পাণ্ডিত্যসুলভ ক্ষমতা এবং তাদের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ঃ সুন্নাহ্র মর্যাদা ও সম্ভ্রম রক্ষার জন্য একজন মহান ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন ঃ ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী (র)-এর তবলীগী প্রেরণা ও সত্য বিশ্লেষণ ঃ তাঁর মানসিক যোগ্যতা ও জ্ঞানের পরিপূর্ণতা ঃ আবুল হাসান আশ'আরীর পথ ও মত এবং তাঁর খেদমত ঃ রচিত গ্রন্থাদি ঃ 'ইবাদত ও তাক্'ওয়া ঃ ওফাত ঃ ইমাম আবূ মনসূর মাতুরিদী ঃ আশআরী অনুসারী 'উলামা এবং তাঁদের জ্ঞানগত প্রভাব।

সপ্তম অধ্যায় ঃ

'ইলমে কালামের অবনতি, দর্শন ও বাতেনী মতবাদের বিকাশ এবং একজন নতুন মুতাকাল্লিমের আবশ্যকতা ১২৮ -১৩৭ পৃ.

'ইলমে কালামের বিপথগমন ও অধঃপতন ঃ দর্শনের আরব অনুবাদক ও ভাষ্যকার ঃ জামা'আতে ইখওয়ানু'স-সাফা ও তাঁদের পুস্তিকাসমূহ ঃ মু'তাযিলা ও দার্শনিকদের মধ্যকার পার্থক্য ঃ বাতেনী মতবাদের ফেতনা ঃ জাহির ও বাতেনের বিভ্রম ঃ নবূওতে মুহাম্মাদীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঃ একজন নতুন ব্যক্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা।

অষ্টম অধ্যায় ঃ

ইমাম গাযালী (র) ৩৮ - ২০৩ পৃ.

শিক্ষা লাভ ও জ্ঞানের উচ্চমার্গে আরোহণ ঃ এগার বছরের চলমান জীবন এবং এর অভিজ্ঞতা ঃ জনসমাবেশের দিকে প্রত্যাবর্তন ঃ ইমাম (র)-এর সংস্কার ও ইসলামী পুনর্জাগরণমূলক কাজ ঃ তাহাফতুল ফালাসিফার প্রভাব ঃ বাতেনী মতবাদের ওপর হামলা ঃ জীবন ও সমাজের ইসলামী পর্যালোচনা ঃ 'ইহ্'য়া' উলূমুদ্দীন ঃ পর্যালোচনা ও হিসাব নিকাশ ঃ 'উলামা ও ধার্মিক ব্যক্তিবর্গ ঃ সুলতান ও শাসন কর্তৃত্বে সমাসীন ব্যক্তিবর্গ ঃ আত্মজিজ্ঞাসা ঃ ইহ্'য়াউ'ল-'উলূমুদ্দীন-এর সমালোচনা ঃ ইমাম গাযালী ও 'ইলমে কালাম ঃ অধ্যাপনার জন্য পুনরায় অনুরোধ এবং ইমাম গাযালী কর্তৃক অক্ষমতা জ্ঞাপন ঃ বাকী জীবন ও মৃত্যু ঃ ইমাম গাযালী (র)-এর দু'টি বৈশিষ্ট্য ঃ মুসলিম বিশ্বে ইমাম গাযালী (র)-এর প্রভাব ঃ সাধারণ দা'ওয়াত ও উপদেশ প্রদানের আবশ্যকতা এবং সাধারণ সংস্কার ও বাগদাদের দা'ঈ-র জ্ঞানগত যোগ্যতা ঃ বাগদাদের দু'জন দা'ঈ।

নবম অধ্যায় ঃ

হযরত শায়খ 'আবদুল কাদির জিলানী (র) – ২০৪-২৩১ পৃ.

শিক্ষা ও পরিপূর্ণতা ঃ ইসলাহ্ ও ইরশাদ ঃ তাঁর প্রতি জনগণের আকর্ষণ ঃ প্রশংসনীয় গুণাবলী ও চরিত্র ঃ মুর্দা দিল জীবিতকরণ ঃ শিক্ষাদান কার্যে কর্মব্যস্ততা ও অন্যান্য খিদমত ঃ দৃঢ়তা প্রদর্শন ও পর্যবেক্ষণ ঃ তাফবীদ এবং তওহীদ ঃ আল্লাহ্র সৃষ্ট জগতের প্রতি স্নেহ ঃ হযরত শায়খ-এর যুগ পরিবেশ ঃ ওয়া'জ ও খুতবা ঃ নির্ভেজাল তওহীদ এবং আল্লাহ ভিন্ন সকল শক্তির অস্তিত্বহীনতা ঃ পরাভূত ও পর্যুদস্ত দিলের সান্ত্বনা ঃ দুনিয়ার সত্যিকার মর্যাদা ও অবস্থান ঃ খলীফা ও সমসাময়িক শাসকদের সমালোচনা ঃ দীন (দীন ইসলাম)-এর জন্য অন্তর্জ্বালা ও উৎকণ্ঠা ঃ বায়'আত ও তরবিয়ত ঃ যুগের ওপর প্রভাব ঃ ওফাত।

দশম অধ্যায় ঃ

'আল্লামা ইবন জওযী (র) – ২৩২- ২৫৯ পৃ.

প্রাথমিক অবস্থা এবং 'ইল্ম হাসিল ঃ হাদীছ লিখবার ক্ষেত্রে গভীর আত্মনিবিষ্টতা ঃ অধ্যয়নের আগ্রহ ঃ গ্রন্থ প্রণয়ন ও গভীর পাণ্ডিত্য ঃ তাক'ওয়া ও 'ইবাদতের প্রতি আগ্রহঃ বাহ্যিক সৌন্দর্য ও গুণাবলী ঃ তাঁর উচ্চ আশা-আকাংখা ও ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী হবার প্রতি আগ্রহ ঃ ওয়া'জ মাহফিল ও তার প্রভাব ঃ তাঁর সমালোচনা ঃ সায়দু'ল-খাতিরঃ সাধারণ ঘটনা থেকে বিরাট ফলাফল ঃ জীবনের ঘটনাবলী এবং নফ্সের সংগে কথোপকথন ঃ প্রাচীন বুযুর্গদের (সলফ-ই-সালিহীন) জীবনী অধ্যয়নের আবশ্যকতা ঃ মুসলিম উম্মাহ্র নেককার ও সালিহ লোকদের জীবনচরিত ঃ ইতিহাসের গুরুত্ব ঃ এতিহাসিক রচনাবলী ঃ সম্বোধন, সম্ভাষণ ও বাগ্মিতা ঃ ওফাত।

একাদশ অধ্যায় ঃ

নূরুদ্দীন যংগী এবং সালাহুদ্দীন আয়্যুবী –২৬০-২৯৬ পৃ.

ক্রুসেড যুদ্ধ ঃ মুসলিম জাহানের ওপর নয়া দুর্যোগ ঃ আতাবেক 'ইমাদুদ্দীন যংগী ঃ আল-মালিকু'ল-'আদিল নূরুদ্দীন যংগী ঃ নুরুদ্দীন যংগীর প্রশংসনীয় গুণাবলী ঃ জিহাদের প্রতি আগ্রহ এবং তাঁর ঈমান ও ইয়াক'ীন ঃ সুলতান সালাহুদ্দীন আয়্যুবী ঃ জীবনের পট পরিবর্তন ঃ জিহাদের প্রতি অনুরাগ ঃ হিত্তীনের চূড়ান্ত যুদ্ধ ঃ সুলতানের ধর্মীয় আবেগ ও মর্যাদাবোধ ঃ বায়তু'ল-মুকাদ্দাস জয় ঃ ইসলামী চরিত্রের প্রদর্শনী ঃ ক্রুসেডারদের সয়লাবঃ সন্ধি এবং সুলতানের মিশনের পূর্ণতা সাধন ঃ ওফাত ঃ দরবেশ চরিত্রের সুলতান ঃ সর্বোত্তম চরিত্র-আখলাক ঃ পুরুষোচিত গুণাবলী ঃ 'ইল্ম ও ফযীলত ঃ ফাতিমী হুকুমতের অবসান ঃ সুলতান সালাহুদ্দীনের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব।

দ্বাদশ অধ্যায়

শায়খুল-ইসলাম 'ইয্যুদ্দীন ইব্ন 'আবদুস সালাম (র) —২৯৭-৩১৫ পৃ.

জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্ব ঃ সিরিয়ার বাদশাহ্‌র মুকাবিলায় নির্ভীকতা ও দৃঢ়তা প্রদর্শন ঃ শায়খ (র)-এর স্পষ্ট ভাষণ ও নির্ভীকতা প্রদর্শন ঃ ফিরিংগীদের সংগে জিহাদ ঃ জিহাদের ব্যয় নির্বাহের জন্য শায়খ (র)-এর ইন্তেজাম ঃ সালতানাতের আমীরদের নীলাম ঃ শায়খ 'ইযযুদ্দীন এবং মিসরের সুলতানকুল ঃ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ঃ আমরু বি'ল-মা'রূফ ওয়া নাহী 'আনি'ল-মুনকার সম্পর্কে শায়খ (র)-এর রচনাবলী ঃ ওফাত।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ঃ

তাতারী ফিতনা ঃ নবতর সঙ্কটের মুখে ইসলাম — ৩১৬-৩৫১ পৃ.

তাতারী হামলা ও তার পটভূমি ঃ তাতারী আক্রমণের আওতায় মুসলিম প্রাচ্য-ভূখণ্ডঃ বাগদাদ ধ্বংস ঃ তাতারীদের মধ্যে ইসলাম প্রচার।

চতুর্দশ অধ্যায় ঃ

মওলানা জালালুদ্দীন রূমী (র) — ৩৪৮-৪৩৭ পৃ.

'ইলমে কালাম ও বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্কট ঃ অন্তর-মানসের অধিকারী মুতাকাল্লিমের প্রয়োজন ঃ সংক্ষিপ্ত অবস্থা ঃ নাম ও পিতৃ পরিচয় ঃ মওলানার জন্ম ও প্রাথমিক শিক্ষা ঃ বল্‌খ থেকে পিতার হিজরত ঃ মওলানার কাউনিয়া উপস্থিতি ঃ মওলানার শিক্ষা সফর ও কর্মব্যস্ততাঃ অবস্থার বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ঃ মওলানার সংগে সাক্ষাৎ এবং বিরাট পরিবর্তন ঃ ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি ঃ শাম্‌স-এর অন্তর্ধান ঃ মওলানার অস্থিরতা এবং শাম্‌স-এর প্রত্যাবর্তন ঃ শাম্‌স-এর দ্বিতীয় অন্তর্ধান ঃ সিরিয়া সফর এবং সন্ধান লাভ ঃ শায়খ সালাহুদ্দীন যরকূব ঃ চিল্পী হুসামুদ্দীন ঃ মছনবী প্রণয়ন ঃ সাথী নির্বাচনের কারণ ঃ চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য ঃ রিয়াযত ও মুজাহাদাঃ সালাতের অবস্থা ঃ যুহ্‌দ ও অল্পে তুষ্টি ঃ বদান্যতা ও কুরবানী ঃ পরার্থপরতা ও অহংশূন্যতা ঃ হালাল উপার্জন ঃ দুনিয়াদারদের সংশ্রব বর্জন।

মছনবী ঃ তার জ্ঞানগত ও সংস্কারমূলক অবস্থান ও পয়গাম

বুদ্ধিবৃত্তি ও জাহির পরস্তীর সমালোচনা ঃ 'ইশ্‌ক-এর দা'ওয়াত ঃ অন্তর-রাজ্য ঃ মানবতার স্থান ঃ আমলের দা'ওয়াত ঃ 'আকাইদ ও 'ইলমে কালাম ঃ আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ঃ মছনবীর প্রভাব।

-০-

সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস

(প্রথম খণ্ড)

ভূমিকা

রেনেসাঁ ও সংস্কার আন্দোলনের আবশ্যকতা এবং ইসলামের ইতিহাসে এর ধারাবাহিকতা

জীবন গতিময় ও পরিবর্তনশীল

ইসলাম আল্লাহ্ তা'আলার শেষ পয়গাম এবং তা সামগ্রিকভাবে ও পরিপূর্ণরূপে দুনিয়ায় এসেছে। ইসলাম সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الاِسْلاَمَ دِيْنًا .

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের ওপর আমার নিয়ামত পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন হিসাবে মনোনীত করলাম।"

আল্লাহ্‌র দীন একদিকে যেমন পূর্ণাঙ্গ, অন্যদিকে এটাও বাস্তব সত্য যে, জীবন গতিময় ও পরিবর্তনশীল এবং এর যৌবন চিরনিত্য।

جاوداں پیہم رواں ، ہردم جواں ہے زندگی

"চিরন্তন, সদা ধাবমান, জীবন সর্বদাই যৌবন তরঙ্গে প্রবহমান।"

এই নিত্য প্রবহমান ও চিরযৌবনা জীবনের সঙ্গ দেবার এবং তাকে পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশেষ দীন পাঠিয়েছেন-- তার বুনিয়াদ যদিও "চিরন্তন 'আকীদা ও বাস্তব সত্যে"র ওপর, কিন্তু তথাপি তা জীবন রসে ভরপুর এবং গতিময়তা তার অস্থিমজ্জায় অনুপ্রবিষ্ট। তার ভেতর আল্লাহ্ তা'আলা এই যোগ্যতাও প্রদান করেছেন, যেন সে সকল অবস্থায় দুনিয়াকে পথ দেখাতে পারে এবং প্রতিটি মনযিলে পরিবর্তনশীল মানবতার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে। সে বিশেষ কোন যুগের এমন কোন নির্মাণ-শাস্ত্র নয় যা সেই যুগের স্মৃতিচিহ্নের ভেতর সংরক্ষিত---বরং তা এমন একটি জীবন্ত দীন যা সর্বজ্ঞ, সর্বোত্তম ও ন্যায়-বিচারক শিল্পীর শিল্প-নৈপুণ্যের সর্বোত্তম নমুনা।

ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ – الانعام : ١٢

"প্রবল পরাক্রমশালী জ্ঞানীর এটাই নির্ধারিত পরিমাপ।" – সূরা আন'আম ঃ ১২

صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِىْ اَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ – النمل : ٨٨

"সেই আল্লাহ্‌রই কারিগরি যিনি প্রতিটি বস্তুকে সুদৃঢ় করেছেন।"

– সূরা আন-নমল ঃ ৮৮

মুসলিম উম্মাহ্‌র যুগটি ছিল সর্বাধিক পরিবর্তনশীল

এই দীন যেহেতু শেষ ও বিশ্বজয়ী দীন এবং এই উম্মাহ্ যেহেতু শেষ ও বিশ্বজয়ী উম্মাহ্– সেজন্য এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মানুষও বিভিন্ন যুগের সঙ্গে এই উম্মাহ্‌র সম্পর্ক থাকবে এবং তাকে এমন সব দ্বন্দ্ব ও সমস্যা-সঙ্কটের মুকাবিলা করতে হবে যা বিশ্বের ইতিহাসে অপর কোন জাতিকে করতে হয়নি। এই উম্মাহকে যে যুগ দেওয়া হয়েছে– সে যুগ সর্বাধিক পরিবর্তনশীল ও বিপ্লবপূর্ণ এবং তার অবস্থার মাঝে যতখানি নিত্য নতুন সৃষ্টিশীলতা রয়েছে (تنوع) তা অতীতের কোন যুগেই দৃষ্টিগোচর হয় না।

ইসলামের স্থায়িত্ব ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য গায়বী ব্যবস্থাপনা

পরিবেশের প্রভাবের মুকাবিলা ও স্থান-কালের পরিবর্তন থেকে নিজেদের মুক্ত রাখার সুবিধার্থে আল্লাহ্ তা'আলা এই উম্মাহ্‌কে দু'টি বিশেষ দানে ভূষিত করেছেন। প্রথমত, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) এমন একটি পরিপূর্ণ ও জীবন্ত শিক্ষা দান করেছেন যা প্রতিটি দ্বন্দ্ব ও সঙ্কট এবং প্রতিটি পরিবর্তনকে অত্যন্ত সহজভাবে মুকাবিলা করতে পারে। তার ভেতর প্রতিটি যুগের সমস্যা সমাধানের পুরোপুরি যোগ্যতা বিদ্যমান। দ্বিতীয়ত, তিনি এও নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করেছেন যে, (এ যুগের ইতিহাস এর সাক্ষ্য দেয়) তিনি এই জীবন্ত ধর্মকে রক্ষা বা উজ্জীবিত করতে প্রতিটি যুগে এমন সব জীবন্ত ব্যক্তিত্ব দান করবেন যাঁরা ঐসব রেখে যাওয়া শিক্ষামালাকে জীবনের মাঝে স্থানান্তর করতে থাকবেন এবং ব্যক্তিগত অথবা সমষ্টিগতভাবে এই ধর্মকে জীবন্ত ও এই উম্মাহ্‌কে কর্মতৎপর রাখবেন। এই ধর্মে ব্যক্তি সৃষ্টি করার এই যে যোগ্যতা ও শক্তি– তা এর আগে অপর কোন ধর্মে পরিলক্ষিত হয়নি। এই উম্মাহ্ বিশ্ব-ইতিহাসে যেভাবে 'সন্তান-প্রসবিনী' প্রমাণিত হয়েছে, দুনিয়ার অন্য কোন উম্মাহ ও জাতিগোষ্ঠীর ভেতর তার নজীর মেলা ভার। এটা আকস্মিক কোন ব্যাপার নয়, বরং আল্লাহ্‌র একটি বিশেষ অবদান যে, যে যুগে যেরূপ যোগ্যতা ও শক্তিসম্পন্ন লোকের দরকার ছিল এবং যে বিষের জন্য যে বিষহরের প্রয়োজন ছিল তা এ উম্মাহ্‌কে দান করা হয়েছে।

ইসলামের জীবনসত্তার ওপর হামলা

শুরু থেকেই ইসলামের জীবনসত্তা ও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর এমন সব হামলা এসেছে যার ধকল সহ্য করা অন্য কোন মযহাবের পক্ষেই সম্ভব ছিল না।

পৃথিবীর অপরাপর ধর্ম, যে সব ধর্ম নিজ নিজ যুগে বিশ্ব জয় করেছিল– এর তুলনায় স্বল্পতর আঘাতও সহ্য করতে পারেনি এবং সে সব ধর্ম নিজের অস্তিত্বই আজ খুইয়ে বসেছে। কিন্তু ইসলাম তার সকল প্রতিপক্ষকেই পর্যুদস্ত করেছে এবং নিজ স্বরূপেই টিকে আছে। একদিকে বাতেনী ফেরকা ও তার শাখা-প্রশাখা ইসলামের মূল প্রাণসত্তা ও তার নেজামে 'আকীদার জন্য যেমন ছিল ভয়াবহ– তেমনি ভয়াবহ ছিল মুসলমানদের জড়ে-মূলে উৎখাত করবার জন্য ক্রুসেডারদের অভিযান ও তাতারীদের হামলা। দুনিয়ার অন্য কোন ধর্ম হলে এ পরিস্থিতিতে সে তার নিজস্ব সকল বৈশিষ্ট্যই খুইয়ে বসত এবং একটি কাহিনী হিসাবে ইতিহাসের পাতায় স্থান পেত। কিন্তু ইসলাম এসব অভ্যন্তরীণ ও বহিরাক্রমণ বরদাশত করেছে। সে কেবল তার নিজ অস্তিত্বই বজায় রাখেনি, বরং জীবনের ময়দানে নিত্য নতুন বিজয় লাভও করেছে। বিকৃতি ও মনগড়া ব্যাখ্যা, নতুন প্রথা-পদ্ধতির উদ্ভাবন, অনারবীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি, শিরকমূলক কর্মকাণ্ড ও প্রথা-পদ্ধতি, বস্তু-পূজা, আত্মপূজা, বিলাসপরায়ণতা, ইলহাদ ও ধর্মহীনতা, বুদ্ধিবৃত্তি পূজা প্রভৃতি ইসলামের ওপর বারবার হামলা করেছে, এমন কি কখনো কখনো মনে হয়েছে, আর বুঝি ইসলাম এইসব আক্রমণের মুখে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারল না, এই বুঝি সে আত্মসমর্পণ করে বসল! কিন্তু মুসলিম উম্মাহ্‌র সচেতন বিবেক ও আত্মমর্যাদাবোধ আত্মসমর্পণের ধারে কাছে না গিয়েও নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। ইসলামের প্রাণসত্তা কখনো বিলীন হয়ে যায়নি। প্রতিটি যুগেই এমন সব ব্যক্তির জন্ম হয়েছে যাঁরা সব রকমের বিকৃতি ও মনগড়া ব্যাখ্যার পর্দা উন্মোচন করেছেন এবং ইসলামের হাকীকত ও খালেস দীনকে উজ্জ্বলতর রূপে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁরা বিদ'আত ও অনারবীয় প্রভাব-প্রতিপত্তির বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছেন, রসূল করীম (সা)-এর সুন্নাহ্ তথা বাস্তব জীবনাদর্শের প্রতি সর্বাত্মক সমর্থন ঘোষণা করেছেন, বাতিল ও ভ্রান্ত 'আকীদা-বিশ্বাস সাহসিকতার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছেন, শিরকমূলক কর্মকাণ্ড ও আচার-প্রথার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য জিহাদ ঘোষণা করেছেন, বস্তুবাদ ও আত্মপূজার ওপর চরম আঘাত হেনেছেন, বিলাসপরায়ণতা ও স্বীয় যুগের 'মুতরাফীন' (مترفين)[১]-এর ভীষণ নিন্দাবাদ করেছেন, অত্যাচারী শাসকদের সামনে সত্যের কলেমাকে বুলন্দ করেছেন, বুদ্ধিবৃত্তির মায়াবী জাল ছিন্নভিন্ন করেছেন এবং ইসলামের ভেতর নতুন প্রাণশক্তি ও কর্মপ্রেরণা এবং নতুন ঈমান ও প্রাণস্পন্দন সৃষ্টি করেছেন। এ সমস্ত ব্যক্তি

১. গর্বিত ও উদ্ধত ধনী এবং প্রাচুর্যের অধিকারী বিত্ত-সম্পদের মালিকদের কুরআনের ভাষায় 'মুতরাফীন' বলা হয়। –অনুবাদক।

মেধা, জ্ঞান, চরিত্র ও আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়ে স্বীয় যুগের বিশিষ্টতম ব্যক্তি ছিলেন এবং শক্তিশালী ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। জাহিলিয়াত ও গোমরাহীর নিত্য নতুন অন্ধকারের জন্য তাঁদের নিকট কোন না কোন "শুভ্র সমুজ্জ্বল হাত" ছিল যদ্দ্বারা অন্ধকার অমানিশার ঘোর কালো পর্দা তাঁরা উন্মোচন করেছেন। ফলে সত্য প্রকাশ্য দিবালোকে উদ্ভাসিত হয়েছে। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলারই ইচ্ছা হ'ল এই দীনের হেফাজত করা এবং বিশ্ববাসীর পথ প্রদর্শনের সেই কাজ এই উম্মাহ্র মাধ্যমেই সম্পন্ন করা, যে কাজ তিনি অতীতে জীবন্ত নবুওয়াতের মাধ্যমে সম্পন্ন করতেন অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা অতীতে যে কাজ আম্বিয়ায়ে কিরামের দ্বারা নিতেন– এখন তা রসূল (সা)-এর প্রতিনিধিবর্গ এবং উম্মতের মুজাদ্দিদ ও সংস্কারকদের দ্বারাই নেবেন।

অন্যান্য ধর্মে মুজাদ্দিদ-এর স্বল্পতা

বিশ্বের অন্যান্য ধর্মে এমন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বের স্বল্পতা পরিলক্ষিত হয় যাঁরা ঐসব ধর্মে নতুন প্রাণস্পন্দন এবং তাঁর অনুসারীদের মধ্যে নতুন জীবন সৃষ্টি করতে পারেন। তাঁদের ইতিহাসে শত সহস্র বছরের এমনও শূন্যতা দৃষ্টিগোচর হয় যেখানে উক্ত ধর্মের এমন কোন সংস্কারকের আবির্ভাব হয়নি যিনি উক্ত ধর্মকে বিকৃতি ও বিদ'আতের (নবাবিষ্কৃত প্রথা-পদ্ধতির) বেড়াজাল থেকে মুক্ত করবেন, তার হাকীকত তথা বাস্তবতাকে প্রকাশ্যে তুলে ধরবেন, প্রকৃত দীন ও ঈমানী হাকীকতের দিকে পূর্ণ শক্তিতে দা'ওয়াত দেবেন, রসম ও রেওয়াজের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করবেন, বস্তুবাদ ও আত্মপূজার বিরুদ্ধে জিহাদ করবার জন্য কোমর বেঁধে ময়দানে অবতরণ করবেন এবং স্বীয় য়াকীন, সত্য-সুন্দর আধ্যাত্মিকতা ও সীমাহীন কুরবানী দ্বারা উক্ত ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে নতুন প্রাণস্পন্দন সৃষ্টি করবেন।

এর সর্বাপেক্ষা বড় উদাহরণ হ'ল খৃস্ট ধর্ম। খৃস্ট ধর্ম স্বীয় যুগের সূচনায় অর্থাৎ খৃস্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রথমার্ধেই এমন বিকৃতির শিকার হ'ল যার নজীর সে যুগের কোন ধর্মের ইতিহাসে মেলে না। খৃস্ট ধর্ম পরিষ্কার ও নির্ভেজাল একটি তওহীদী ধর্ম থেকে এমন একটি মুশরিক ও পৌত্তলিকতাবাদী ধর্মে রূপান্তরিত হয় যাকে বর্তমানে গ্রীক-দর্শন ও বৌদ্ধ চিন্তাধারার সংমিশ্রণ বলাই ভাল। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হ'ল, এসব কিছু হয়েছে খৃস্ট ধর্মের সর্বাপেক্ষা বড় অনুসারী ও প্রচারক সেন্ট পল (১০-৬৫ 'ঈসায়ী)-এর হাতে। আর প্রকৃতপক্ষে এ পরিবর্তন ছিল এক আত্মা থেকে অপর আত্মায়, এক কাঠামো থেকে অপর কাঠামোয়, এক বিধি-ব্যবস্থা

থেকে অপর বিধি-ব্যবস্থার দিকে এমন একটি উল্লম্ফনের সমার্থক যার ভেতর প্রথম কাঠামো থেকে স্রেফ নাম এবং কতক প্রথা-পদ্ধতির সমন্বিত রূপই অবশিষ্ট থেকে গিয়েছিল। একজন খৃস্টান মনীষী (Eruset De Bunsen) এই বিপ্লব ও পরিবর্তনের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন :

যে ধর্ম-বিশ্বাস ও বিধি-ব্যবস্থার বর্ণনা আমরা বাইবেলে পাই— তার দা'ওয়াত হযরত মসীহ ('আ) কখনোই তাঁর বাণী ও কর্মের দ্বারা দেননি। এই মুহূর্তে খৃস্টান, য়াহূদী ও মুসলমানদের মধ্যে যে মনোমালিন্য বিদ্যমান, এর যিম্মাদার হযরত 'ঈসা (আ) নন, বরং এজন্য খৃস্টান বেদীন পলই দায়ী। এসব কিছুই পবিত্র গ্রন্থের বিকৃতি ও কাঠামোগত পরিবর্তন-পরিবর্ধনের পন্থায় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং পবিত্র গ্রন্থের ভবিষ্যদ্বাণী ও উপমা-উৎপ্রেক্ষা দ্বারা পূর্ণ করারই ফল। পল ঈসানীয় (Essenio) ধর্মের প্রচারক স্টিফেন (Stephen)-এর অন্ধ আনুগত্য করতে গিয়ে হযরত মসীহ ('আ)-এর ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের অনেক রসম-রেওয়াজ জুড়ে দেন। আজ ইঞ্জিলে যে পরস্পরবিরোধী গল্প-কাহিনী ও বিবিধ ঘটনা পরিদৃষ্ট হয় এবং যা হযরত 'ঈসা (আ)-কে তাঁর প্রকৃত মর্যাদা থেকে অনেক খাটো করে দেখিয়ে থাকে— তা সবই উক্ত পল-এরই সৃষ্টি। হযরত মসীহ (আ) নন, বরং পল ও তার পরবর্তীতে আগত পাদরী ও ধর্মযাজকগণ সেই সব ধর্ম-বিশ্বাস ও বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন যাকে গোড়া খৃস্টান জগত অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে নিজেদের ধর্ম-বিশ্বাসের বুনিয়াদ হিসাবে অভিহিত করে আসছে।[১]

খৃস্ট ধর্ম দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী যাবত এবং অদ্যাবধিও পলের এই উত্তরাধিকারত্বকে বুকে উঠিয়ে রেখেছে এবং এই সময়পর্বে খৃস্টান জগতে এমন কোন ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেনি— যিনি খৃস্ট ধর্মকে বাইরের এই সব ধার করা ও অবাস্তব বিধি-বিধান থেকে মুক্ত করবেন এবং সেই বিন্দুর দিকে প্রত্যাবর্তনের প্রয়াস চালাবেন যেই বিন্দুর ওপর হযরত মসীহ ('আ) এবং তাঁর একনিষ্ঠ খলীফা ও ভক্ত অনুসারীরা অবস্থান নিয়েছিলেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে গেল, অথচ এমন কোন ব্যক্তির আগমন ঘটল না যিনি খৃস্ট ধর্মের সেই সব নতুন ও বর্ধিত অংশকে মূল অংশ থেকে পৃথক করতে পারেন। শেষাবধি খৃস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে জার্মানীতে মার্টিন লুথার (M. Luther)-এর জন্ম হল। তিনি কতক খুঁটিনাটি সমস্যার ক্ষেত্রে কিছুটা সীমিত ধরনের সংস্কার সাধন করেন। এটা এমন কিছু মূল্যবান ও ব্যাপক সংস্কার ছিল না কিংবা খৃস্ট ধর্মের ভুল গতি ও তার

---

1. Islam or true Christianity—— p. 128.

বিপথগামিতার বিরুদ্ধে কোন বিদ্রোহও ছিল না অর্থাৎ খৃস্ট ধর্মের প্রায় পনেরটি শতাব্দী বিপ্লবাত্মক বুনিয়াদী ও সকল ধর্ম-সংস্কারের আন্দোলন থেকে মুক্ত থাকল এবং এই সময়ে কোন সৎ প্রচেষ্টাই পুরোপুরি কার্যকর ও ফলপ্রসূ প্রমাণিত হল না। খৃস্টান মনীষিগণও এ কথা স্বীকার করেছেন যে, এই দীর্ঘ সময়ে খৃস্টান জগতে যেমন কোন ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হয়নি– তেমনি এমন কোন আন্দোলনেরও বিকাশ ঘটেনি যা খৃস্ট ধর্মের সংস্কার কিংবা পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে।

ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার নিবন্ধকার Mr. J. Bass Mullinger লিখেছেনঃ

> আমরা যদি এর কারণ অনুসন্ধান করি যে, ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে ধর্ম সংস্কার (Reformation)-এর প্রয়াসে কেন আংশিক সাফল্যও অর্জিত হয়নি– তাহলে কোনরূপ কষ্ট-কল্পনা ছাড়াই বলে দেওয়া যায় যে, এর সর্বাপেক্ষা বড় কারণ হ'ল, মধ্যযুগে মেধা অতীতের দৃষ্টান্তের গোলামী থেকে মুক্ত হতে পারেনি।[১]

অন্যত্র বলেন ঃ

> চার্চ-সংস্কারের কোন সামগ্রিক প্রস্তাব কার্যকর করার ক্ষেত্রে তাদের ধারাবাহিক প্রয়াসের ব্যর্থতা য়ূরোপীয় ইতিহাসের একটি বাস্তব ঘটনা।[২]

তিনি আরো একটু এগিয়ে গিয়ে বলেন ঃ

> ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে ধর্ম-সংস্কারের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রকমের প্রয়াস নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এর সবগুলোই কোনরূপ বাছবিচার ব্যতিরেকে গির্জার নিন্দা ও অভিশাপের শিকারে পরিণত হয়।[৩]

এরপর এমন কোন দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্ম হয়নি যিনি গির্জার কাল্পনিক ও মনগড়া মতবাদ ও ধ্যান-ধারণা এবং তাদের জোর-যবরদস্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারেন অথবা কমপক্ষে এতটুকু করতে পারেন, যতটুকু লুথার (তাঁর সীমিত কর্মক্ষেত্র ও দুর্বলতা সত্ত্বেও) করেছিলেন।

মোটকথা, এভাবে খৃস্ট ধর্ম তার মনোনীত পথ ধরেই ক্রমান্বয়ে চলতে থাকে, বরং সঠিকভাবে বলতে গেলে, সেই পথ ধরেই চলতে থাকে যা তার মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ফলে গির্জার প্রভাব হ্রাস পায় এবং পরবর্তীকালে তার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়। য়ূরোপে বস্তুবাদের রাজত্ব কায়েম হয় এবং তা ধর্মের স্থান দখল করে। পাশ্চাত্যের সকল ধর্মকেই বস্তুবাদ তার পশ্চাতে ঠেলে দেয়। খৃস্ট ধর্মে এমন কোন ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেনি, যিনি

1. Enc. Britannica, Ed. ix. vol. xx. P. 320. 2. G, 321 kO.Ç ;3. G, 321 kO.Ç

এই বস্তুবাদের ধ্বংসকর শক্তিকে রুখে ধর্মকে তার প্রকৃত স্থানে ফিরিয়ে আনতে পারেন অথবা খৃস্টানদের ভেতর স্বধর্মে আস্থা পুনর্বহাল করে তাদের মধ্যে সেই রূহানী ও আখলাকী তথা আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও চারিত্রিক শক্তি সৃষ্টি করতে সক্ষম হন, যা তাদেরকে বস্তুবাদের এই ভীষণ চপেটাঘাত এবং ঈমানী উৎসাহ-উদ্দীপনার সামনে দৃঢ়পদ রাখতে পারে, তাদেরকে এমন একটি জীবন অতিবাহিত করতে বাধ্য করতে পারে যা জ্ঞান, নৈতিক চরিত্র ও বিশুদ্ধ খৃস্টীয় 'আকীদার ওপর স্থিতিশীল এবং যেখানে নতুন যুগের প্রশ্নাদি ও আধুনিক কালের সমস্যা-সংকটের সমাধান তারই আলোকে সম্ভব। কিন্তু তা না হয়ে হল এই যে, খৃস্টান চিন্তাবিদ ও মনীষীবৃন্দ খৃস্ট ধর্মের ভবিষ্যত সম্পর্কে নিজেরাই হতাশ হয়ে পড়লেন এবং ধর্মহীন বস্তুবাদের মুকাবিলায় তাদের ভেতর হীনমন্যতা এসে ভর করল।

এই একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি ঘটে প্রাচ্যের বিভিন্ন ধর্মের বেলায়ও। হিন্দু ধর্মও তার আসল রাস্তা থেকে সরে যায়। সে তার অনাড়ম্বরতা ও সহজ-সারল্য এবং বিশ্ব-স্রষ্টার সঙ্গে সরাসরি রূহানী সম্পর্ক একেবারে খুইয়ে বসে। নৈতিক শক্তিও সে হারিয়ে ফেলে এবং অত্যধিক জটিলতা ও ঘোর-প্যাঁচের কারণে কেবল একটি সূক্ষ্ম ও অবাস্তব দর্শনে পরিণত হয়। ক্রমান্বয়ে তা নির্ভেজাল তওহীদ এবং পারস্পরিক সম্পর্ক ও লেন-দেনের ক্ষেত্রে সাম্য– এই দু'টো গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হাতছাড়া করে ফেলে। এ দু'টোই হচ্ছে সেই গুরুত্বপূর্ণ বুনিয়াদ যার ওপর যে ধর্ম কায়েম হবে তার শেকড় হবে মাটির গভীরে সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত এবং ডালপালা ও শাখা-প্রশাখা হবে উন্মুক্ত আকাশে বিস্তৃত।

উপনিষদের লেখকগণ বহু আয়াস স্বীকার করেছেন এই গণ্ডগোলের প্রতিবিধানে। অনন্তর তারা সেসব রসম-রেওয়াজ প্রত্যাখ্যান করেন যা হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সমাজকে পুরোপুরি ঢেকে ফেলেছিল এবং সে স্থলে এমন একটি দার্শনিকতামণ্ডিত ও চিন্তাপ্রসূত ব্যবস্থা পেশ করেন যা বহুত্বের মধ্যেও একত্বের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই নতুন চিত্র হিন্দু ধর্মের পণ্ডিত মহলে গৃহীত হয়। কেননা তাঁদের প্রবণতা তো প্রথম থেকেই ওয়াহ্‌দাতু'ল-ওজূদ 'হামাউস্ত'-এর দিকে ছিল। কিন্তু জনসাধারণ, যাদের চিন্তাশক্তি অত উচ্চমার্গের ছিল না এবং যারা কার্যকর পন্থা ও বাস্তব শিক্ষার অভিলাষী ছিল, তা কবুল করেনি। এভাবে হিন্দু ধর্ম ক্রমান্বয়ে তার শক্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি হারাতে থাকে এবং তাতে আস্থাহীনতা ও অনিশ্চয়তা দিন দিন বাড়তে থাকে। হিন্দু সমাজের এই অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে বুদ্ধের ব্যক্তিত্বে প্রতিবিধানের পথ খোঁজে। এটা খৃস্ট-পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর ঘটনা।

বুদ্ধ একটি নবতর চিন্তা, একটি নতুনতর ধর্ম [যদি এ ক্ষেত্রে 'ধর্ম' শব্দটির প্রয়োগ যথার্থ হয়] পেশ করেন যা ঘর-সংসার ত্যাগ, আত্মার শুচি-শুভ্রতা, প্রবৃত্তির মুকাবিলা তথা ষড় রিপু দমন, দয়া-দাক্ষিণ্য ও মহানুভবতা, সেবা-কর্ম ও প্রথা-পদ্ধতি, আচার-অভ্যাস এবং শ্রেণী-সংঘাত ও শ্রেণী বৈষম্য প্রত্যাখ্যান ও বিরোধিতার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ফলে এই ধর্ম [১] খুবই দ্রুততার সঙ্গে বিস্তার লাভ করে এবং এশিয়ার দক্ষিণ ও পূর্বাংশে এর একচ্ছত্র প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিন্তু কিছুকাল পরেই এই বিরাট ধর্মীয় আন্দোলনও স্বকীয়তা হারিয়ে বিকৃতির শিকারে পরিণত হয়। মূর্তিপূজা ও অন্যান্য রীতি-নীতি ও প্রথা-পদ্ধতি– যেগুলোর বিরুদ্ধে এই ধর্ম বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়েছিল– তারই প্রতি অনুগত হতে শুরু করে, এমন কি শেষ পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্মও শির্‌ক ও মূর্তিপূজার সেই ধর্মে পরিণত হয় যা তার পূর্ববর্তী হিন্দু ধর্ম থেকে বিভিন্ন প্রকার মূর্তি ও তার সংখ্যা ব্যতীত অপর কোন ক্ষেত্রে ভিন্নতর ও উত্তম ছিল না। এর নৈতিকতারও অবনতি ঘটে এবং চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রে জটিলতা আরও বৃদ্ধি পায়। নতুন নতুন ফেরকা ও ধর্মীয় গ্রুপের সৃষ্টি হয়। অধ্যাপক ঈশ্বর টোপা তাঁর "হিন্দুস্তানী তমদ্দুন" (ভারতীয় সংস্কৃতি) নামক গ্রন্থে বলেন ঃ

> বৌদ্ধ ধর্মের ছত্রছায়ায় এমন রাজত্ব কায়েম হয় যার ভেতর অবতারের ছড়াছড়ি এবং মূর্তি পূজার অবাধ কর্তৃত্ব বিদ্যমান। সংঘসমূহের পরিবেশ পরিবর্তিত হয়ে তার ভেতর ধর্মের নামে নিত্য নতুন প্রথা-পদ্ধতি ও নবাবিষ্কৃত বস্তু একের পর এক দৃষ্টিগোচর হতে থাকে।[২]

পণ্ডিত জওয়াহের লাল নেহরু তাঁর "Discovery of India" নামক গ্রন্থে বৌদ্ধ ধর্মের বিকৃতি ও ক্রমাবনতির বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

> ব্রাহ্মণ্যবাদ বুদ্ধকে অবতার বানিয়েছিল। বৌদ্ধ ধর্মও তাই করে। সংঘ খুবই সম্পদশালী হয়ে ওঠে এবং একটি বিশেষ দলের স্বার্থ সিদ্ধির আখড়ায় পরিণত হয়। সংঘের ভেতর নিয়ম-শৃঙ্খলার কোন বালাই ছিল না। উপাসনা পদ্ধতির ভেতর যাদু ও নানারূপ কল্পনার অনুপ্রবেশ ঘটে এবং সহস্র বছর এসব নিয়ম মাফিক চালু থাকার পর বৌদ্ধ ধর্মের অবনতি শুরু হয়। এই যুগে তার যে রোগজীর্ণ অবস্থা ছিল Mrs. Rhys Dayis তার উল্লেখ করেছেন এভাবে ঃ

---

১. বৌদ্ধ মতের উল্লেখ করতে গিয়ে 'ধর্ম' শব্দের ব্যবহারে আমার আপত্তির কারণ হ'ল এই যে, এতে স্রষ্টার অস্তিত্ব, প্রারম্ভ ও প্রত্যাবর্তন 'ল সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন 'আকীদা ও দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যায় না। অধিকাংশ লেখক ও ঐতিহাসিকেরও একই মত। ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার 'বুদ্ধ' নিবন্ধ দেখুন।

২. হিন্দুস্তানী তমদ্দুন (উর্দু), ঈশ্বর টোপাকৃত।

এইসব রোগক্লিষ্ট ধ্যান-ধারণার গভীর ছায়াতলে এসে গৌতমের (বুদ্ধের) নৈতিক শিক্ষা দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যায়। একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি জন্ম নেয় এবং তা ফলে-ফুলে সুশোভিত হয়ে ওঠে। একের স্থান দখল করে অন্য এবং প্রতিটি পদক্ষেপে নব-সৃষ্টির খেলা চলতে থাকে। আর এই প্রতারণাপূর্ণ নিত্য নব-সৃষ্টির দ্বারা অন্ধকার ঘনীভূত হয় এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তকের সাদা-সিধা ও উন্নত নৈতিক শিক্ষা মনগড়া চাকচিক্যপূর্ণ বাক্যজালের নিচে চাপা পড়ে যায়।[১]

সামগ্রিক দিক দিয়ে বৌদ্ধ ধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যবাদ– এই উভয়ের মধ্যেই ভেজালের সৃষ্টি হয় এবং উভয়ের ভেতর অধিকাংশ ইতর ও তুচ্ছ (مبتذل) প্রথা-পদ্ধতির অনুপ্রবেশ ঘটে। শেষ পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণই কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। বিস্তৃত বৌদ্ধ জগতে এবং তাঁদের সুদীর্ঘ শাসনামলে এমন কোন সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটেনি যিনি প্রকৃত বৌদ্ধ-মতের দিকে মানব জাতিকে আহ্বান জানাবেন এবং পূর্ণ শক্তিতে এই নবসৃষ্ট বিকৃত ধর্মের মুকাবিলা করে মূল ধর্মের অতীত যৌবন, সারল্য, অনাড়ম্বরতা ও শুচি-শুভ্রতা পুনরায় ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবেন।[২]

মোটকথা, বৌদ্ধমত শেষ পর্যন্ত প্রাচীন হিন্দু ধর্মের সাথেও প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারেনি, এমন কি খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে শঙ্করাচার্য[৩] বৌদ্ধ মতের বিরোধিতা এবং প্রাচীন হিন্দু ধর্মের প্রচার ও প্রসারব্যপদেশে পতাকা উত্তোলন করেন এবং শেষাবধি বৌদ্ধমতকে ভারতের মাটি থেকে উৎখাত করে ছাড়েন। বড় জোর বলা যেতে পারে যে, বৌদ্ধমত ভারতবর্ষের অনেক ধর্মের ভেতর একটি প্রাচীন ক্রমাবনতিশীল ও সীমিত ধর্মের মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকে। শঙ্করাচার্য তাঁর নিজস্ব মেধা, ধর্মীয় প্রেরণা ও কর্ম প্রচেষ্টা দ্বারা বৌদ্ধমতকে ভারতের চৌহদ্দী থেকে মোটামুটি বহিষ্কৃত করতে সক্ষম হন। অবশ্য তিনি প্রাচীন হিন্দু ধর্মকে তার আদি ও অকৃত্রিম রূপে ফিরিয়ে আনতে আদৌ সফলকাম হননি (সম্ভবত তিনি এ ধরনের কোন ইচ্ছাও পোষণ করেননি), সফলকাম হননি এতে তওহীদের 'আকীদা, মহান বিশ্ব-স্রষ্টার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন, আল্লাহ্ ও তাঁর বান্দাহ্‌র মধ্যবর্তী সকল মাধ্যমকে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন এবং সামাজিক ন্যায়-বিচার ও শ্রেণী-সাম্যের প্রাণস্পন্দন সৃষ্টি করতে। অনন্তর অদ্যাবধি এ দু'টি

১. তালাশ-ই-হিন্দ (Discovery of India), ২০১, ২০৩ পৃ.।
২. তালাশ-ই হিন্দ (Discovery of India), ২০১, ২০৩ পৃ.।
৩. শঙ্করাচার্য অষ্টম শতাব্দীর শেষ অর্ধের একজন ধর্ম-সংস্কারক। ৩২ বছর বয়সে তিনি মারা যান।

ভারতীয় ধর্ম নিজেদের পরিবর্তিত কাঠামোর ওপরেই টিকে আছে এবং পতন যুগের উত্তরাধিকার, প্রথা-পদ্ধতি ও আচার-আচরণ এবং মূর্তিগুলোকে নিজেদের বুকের সঙ্গে লাগিয়ে রেখেছে। Encyclopaedia of Religion and Ethics-এর নিবন্ধকার এলফিস্টন কলেজ, বোম্বাই-এর সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক V. S. Ghate– যিনি ভারতের প্রাচীন ধর্ম ও দর্শনের ওপর গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী– শংকরাচার্যের উল্লেখ করে লিখেছেন ঃ

> তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় ও মহৎ উদ্দেশ্য ছিল সেই ধর্ম ও দর্শনকে জীবিত করা, উপনিষদে যার শিক্ষা প্রদান করা হয়েছিল। তিনি কেবল ওয়াহ্‌দাতু'ল-ওজূদের 'আকীদাকে চালু করেন। তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল এই প্রমাণ করা যে, উপনিষদ ও শ্রীমদ্ভগবত-গীতার মধ্যে কোন বিধিবদ্ধ আইন-কানুন পেশ করা হয়নি, বরং পরিপূর্ণ ওয়াহ্‌দাতু'ল-ওজূদ-এর শিক্ষাই পেশ করা হয়েছে। শঙ্করাচার্য মূর্তিপূজার যেমন বিরোধিতা করেননি, তেমনি একে আক্রমণও করেননি। তাঁর নিকট মূর্তি একটি রূপক বা ইঙ্গিতে স্রষ্টার প্রকাশ। শঙ্করাচার্য আনুষ্ঠানিক (Ritualism) আচার-আচরণের নিন্দা করেন, কিন্তু সাধারণ্যে প্রিয় দেবদেবীর পূজা অর্চনার পক্ষে ওকালতিও করেন। তাঁর মতে লালন-পালন ও বিকাশের একটি বিশেষ পর্যায়ে মূর্তিপূজা আমাদের প্রকৃতির একটি অপরিহার্য অঙ্গ। যখন ধর্মীয় আত্মা (রূহ) পাকাপোক্ত ও সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয় তখন মূর্তিপূজার প্রয়োজন আর থাকে না। আর শুধু তখনই প্রতীক ও রূপক বা রহস্যপূর্ণ ইশারা-ইঙ্গিত (رموز) পরিত্যাগ করা উচিত যখন ধর্মীয় আত্মা পাকাপোক্ত ও সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয়। শঙ্করাচার্য প্রতীক হিসাবে সে সব লোকের জন্য মূর্তিপূজার অনুমতি দেন যারা এমন ব্রাহ্মণের মর্যাদায় উপনীত হতে পারেনি যিনি যাবতীয় দোষ-গুণের ঊর্ধ্বে।[১]

যা হোক, সে সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায় যা শংকরাচার্য থেকে দয়ানন্দ সরস্বতী ও গান্ধীজি পর্যন্ত চলেছে এবং যেগুলোর উদ্দেশ্য ছিল এই ধর্মকে সেই সঠিক ও বিশুদ্ধ বুনিয়াদের ওপর পুনরুজ্জীবিত করা যা নবীদের দা'ওয়াত, মানুষের সুস্থ প্রকৃতি ও পরিবর্তনশীল যুগ– সব কিছুর সঙ্গেই সামঞ্জস্যশীল হবে। উল্লিখিত দু'টো ধর্মই শেষ পর্যন্ত বস্তুবাদ ও ধর্মহীনতার সম্মুখে হাত-পা ছেড়ে দিয়ে একেবারে আত্মসমর্পণ করে বসে এবং জীবন থেকে নিজকে সরিয়ে নিয়ে উপাসনা গৃহ ও তীর্থকেন্দ্রে আশ্রয় নেয় এবং আচার-অনুষ্ঠান ও প্রথা-পদ্ধতি এবং বাহ্যিক রূপ-কাঠামোর মধ্যে বন্দী হয়ে পড়ে। ভারতবর্ষে এমন কোন শক্তিশালী

১. তালাশ-ই-হিন্দ (Discovery of India) ॥২০১, ২০৩ পৃ.।

দা'ওয়াত নেই যার ধ্বনি ও ঘোষণা হবে এই, "পুনরায় ধর্মের পথে ফিরে এস"-এর বিপরীতে, বরং ঐ সব আন্দোলন খুবই সক্রিয় ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে যার ধ্বনি ও মূলনীতি হ'ল, "নিজেদের পুরনো সভ্যতাকে বাঁচিয়ে তোল এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন ও ঐতিহাসিক ভাষা সংস্কৃতকে পুনরায় চালু কর"।

ধর্মের জন্য জীবিত ব্যক্তির প্রয়োজন

প্রকৃতপক্ষে কোন ধর্মই সে পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে না, নিজের বৈশিষ্ট্য বেশি দিন ধরে রাখতে পারে না, পরিবর্তনশীল জীবনের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না মাঝে মাঝে তার মধ্যে এমন সব ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে যাঁরা নিজেদের অসাধারণ বিশ্বাস, আধ্যাত্মিকতা, নিঃস্বার্থপরতা, ত্যাগ ও উন্নত মানের মেধা ও আত্মিক যোগ্যতা দ্বারা তার অসাড় দেহে নবতর জীবনের সৃষ্টি করবেন, তার অনুসারীদের মাঝে নতুন আস্থা ও অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করবেন। জীবনের চাহিদা নিত্য নতুন এবং বস্তবাদের বৃক্ষ বসন্তের সবুজ সমারোহে পল্লবিত। প্রবৃত্তি পূজার আন্দোলন ও প্রবৃত্তি পূজাভিত্তিক ধর্মের জন্য বস্তুতপক্ষে কোন রেনেসাঁর প্রয়োজন নেই। কেননা এর প্রেরণা ও উৎসাহদাতা বস্তুসমূহ পদে পদে বিদ্যমান। কবির ভাষায় ঃ

اگر چه پیر هے مؤمن جوان هیں لات ومنات

"যদিও ঈমানদার বৃদ্ধ– লাত ও মানাত কিন্তু যুবক।"

অতএব, যতক্ষণ পর্যন্ত ধর্ম একটি নতুন জীবন ও নতুন শক্তির সঙ্গে ময়দানে অবতরণ না করবে এবং মাঝে মাঝে এর সংস্কার না হতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত জীবন্ত বস্তুবাদের মুকাবিলায় তার বেঁচে থাকাটা প্রায় অসম্ভব।

প্রতিটি নতুন ফিত্না ও বিপদের জন্য নতুন ব্যক্তিত্ব ও শক্তি

এই বাস্তবতাকে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, ইসলামের এই দীর্ঘ ও ঘটনাবহুল ইতিহাসে স্বল্প থেকে স্বল্পতম সময় পর্বও এমন পাওয়া যায় না– যেখানে ইসলামের প্রকৃত দা'ওয়াতের কাজ একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে, ইসলামের প্রকৃত সত্য (হাকীকত) একেবারে অন্তরালে হারিয়ে গেছে, মুসলিম জাতির বিবেক একেবারে অনুভূতিশূন্য হয়ে পড়েছে কিংবা সমগ্র মুসলিম জাহান অন্ধকারে ছেয়ে গেছে। এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা যে, যখনই ইসলামের সামনে কোন নতুন ফিত্না এসেছে, ইসলামকে বিকৃত ও কদাকার করার চেষ্টা করা হয়েছে কিংবা বস্তুবাদের কোন শক্ত হামলা এসেছে– তখনই এমন কোন শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব

অবশ্যই ময়দানে এসে গেছেন, যিনি পূর্ণ শক্তিতে সেই ফিত্‌নার মুকাবিলা করেছেন এবং তাকে ময়দান থেকে ঝেটিয়ে বিদায় করেছেন। বহু দা'ওয়াত ও বিপ্লবী আন্দোলন এমনও আছে যেগুলো স্বীয় যুগে খুবই শক্তিশালী ছিল, কিন্তু আজ তার অস্তিত্ব কেবল কিতাবের পাতায় রয়েছে, এমন কি তার হাকীকত অনুধাবন করাও আজ মুশকিল। কাদরিয়া, জাহমিয়া, মু'তাযিলা মতবাদ, খাল্‌ক'-ই কু'রআন, ওয়াহ'দাতু'ল-ওয়াজুদ ও আকবরের দীন-ই-ইলাহীর হাকীকত ও বিস্তারিত তথ্যাদি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল লোকের সংখ্যা আজ কতই বা হবে, অথচ স্ব স্ব যুগে এসব মতবাদ বিরাট গুরুত্বপূর্ণ 'আকীদা ও ধর্ম হিসাবে খ্যাত ছিল। এগুলোর ভেতর কতকগুলোর পৃষ্ঠপোষক তো বিরাট বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর এবং বিরাট মেধাসম্পন্ন, প্রতিভাধর ও সুযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইসলামের হাকীকত সে সব 'আকীদা ও ধর্মের ওপর বিজয়ী হয় এবং কিছুদিন পর সে সব জীবন্ত আন্দোলন ও সরকারী ধর্ম শুধু জ্ঞানগর্ভ আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয় এবং কেবল 'ইল্‌ম-ই-কালাম ও আকাইদশাস্ত্রের ইতিহাস গ্রন্থের পাতায় আশ্রয় নেয়। দীনের হেফাজতে এই চেষ্টা-সাধনা, রেনেসাঁ ও বিপ্লবী প্রয়াস এবং দা'ওয়াত ও সংস্কার-সংশোধনের এই ধারাবাহিকতা ততটাই প্রাচীন যতটা প্রাচীন ইসলামের ইতিহাস এবং ততটাই সূত্র– পরম্পরা যতটা সূত্র–পরম্পরা মুসলিম জীবন।

ইতিহাসের লুপ্তপ্রায় উৎস

এই গুরু দায়িত্ব কেবল ঐতিহাসিকের ওপর অর্পিত নয়, বরং এর যিম্মাদার সেই সব লোকও যাঁরা ইতিহাসের পারিভাষিক ও সরকারী মর্যাদা ভিন্ন আর কোন মর্যাদা মেনে নিতে প্রস্তুত নন এবং তারা এমন কোন পুস্তককেও নির্ভরযোগ্য মনে করেন না, যা কোন কুতবখানায় ইতিহাসের আলমারীতে স্থান পায়নি কিংবা ইতিহাসশাস্ত্রের আওতায় লিপিবদ্ধ হয়নি, অথচ এ ধরনেরই বহু গ্রন্থ নিজের মধ্যে ইতিহাসের বহু মূল্যবান সম্পদ ও গুরুত্বপূর্ণ উৎস ধরে রেখেছে। এগুলো সেই সব সাহিত্য ও ধর্মীয় গ্রন্থ যার ভেতর মুসলিম উম্মাহ্‌র স্বনামখ্যাত দাঈ ও সংস্কারকগণ নিজেদের অন্তরে অনুভূতি ও মন-মানসের পর্দা উন্মোচন করেছেন এবং নিজেদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী ও অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন। এগুলো সেই সব গ্রন্থ যার মধ্যে সংস্কারকদের শাগরিদ ও মুরীদবর্গ আপন আপন উস্তাদ ও শায়খগণের নসীহত, বাণীসমষ্টি ও হাকীকত ও মা'রিফত লিপিবদ্ধ করেছেন এবং তাঁদের প্রভাবমণ্ডিত ও বরকতপূর্ণ মজলিসের রোয়েদাদ পেশ করেছেন। এসব

চিঠিপত্র ও ওয়াজ-নসীহতের সংকলন দ্বারা ঐ সমস্ত ব্যক্তির ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা ও আবেগ-অনুভূতির সঠিক পরিমাপ করা যায়। ঐ সব গ্রন্থে সামাজিক খতিয়ানের ওপর সমালোচনা এবং বিদ'আত ও গর্হিত কাজ-কর্ম রদ ও বাতিলের বিবরণী রয়েছে। আমাদের অধ্যয়ন যদি নির্ধারিত সীমা থেকে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে ঐসব গুরুত্বপূর্ণ ও লুপ্ত ঐতিহাসিক উৎস পর্যন্ত প্রসারিত হয় এবং কোন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সমালোচক ও সাহসী বিজ্ঞ দার্শনিক পণ্ডিত এই বিষয়ের ওপর কায়মনে কাজ করেন তাহলে একটি সুসমন্বিত, সুসংবদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ রেনেসাঁ আন্দোলনের ইতিহাস অনায়াসে উদ্ধার করা যাবে। তখন আমাদের পরিষ্কার দৃষ্টিগোচর হবে যে, ইসলামী রেনেসাঁ ও পুনর্জাগরণের অস্তিত্ব এই মুসলিম উম্মার প্রতিটি যুগে এবং প্রতিটি পর্যায়ে বিদ্যমান ছিল। আল্লাহ্‌র এই অবদান থেকে তারা কখনো মাহরূম বা বঞ্চিত থাকেনি।

ইসলামের উত্তরাধিকার

এই উত্তরাধিকার (মীরাছ) যা আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে (এবং আমরা যার উত্তরাধিকারী) সেই অর্থে উত্তরাধিকার নয় যে অর্থে পাশ্চাত্যের লোকেরা বুঝেছে। এটা এজন্য যে, ইসলাম একটি জীবন্ত ও চিরন্তন জীবনবিধান (দীন)। আমরা উত্তরাধিকার বলতে সেই দৌলত ও মূল্যবান সম্পদ বুঝে থাকি যা আমাদের পূর্বপুরুষ থেকে বংশ ও সূত্রপরম্পরায় আমাদের দিকে হস্তান্তরিত হয়ে চলে এসেছে। আর তা হ'ল বদ্ধমূল জ্ঞান, সংরক্ষিত ও সুদৃঢ় 'আকীদা, শক্তিশালী ঈমান, সুন্নত (আদর্শ), উন্নত ও মহান চরিত্র, ফিক'হ ও শরীয়ত এবং শানদার ইসলামী সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ। এই উত্তরাধিকারে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিরই পরিপূর্ণ অংশ রয়েছে, যিনি ইসলামের কোন একটি যুগে মিনহাজু'ন-নবুওয়াতের ওপর খিলাফত কায়েম করেছেন, জাহিলিয়াত ও বস্তুবাদের মুকাবিলা করেছেন, আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান জানিয়েছেন, ইসলামের যে বৈশিষ্ট্যসমূহ মিটে গিয়েছিল সেগুলোকে উজ্জ্বল ও প্রোজ্জ্বল করেছেন, উম্মাহ্‌র মধ্যে ঈমানী রূহ সৃষ্টি করেছেন। এই অবিনশ্বর সম্পদে এমন প্রত্যেক লোকেরই অংশ রয়েছে যিনি এই দীনের ওপর তার উৎস ও টীকা ব্যাখ্যার ওপর নির্ভরযোগ্যতার দিকটি নতুনভাবে ঢেলে সাজিয়েছেন, নবোদ্ভূত ও নতুনভাবে অবতীর্ণ দর্শনকে বাতিল করে ইসলামের প্রকৃত চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটিয়েছেন এবং এই উম্মাহ্‌কে কোন না কোন নবতর ফিতনার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবার হাত থেকে বিরত রেখেছেন। যিনি এই উম্মতের জন্য তার ধর্ম (দীন) এবং ধর্মের মূল উৎসসমূহের হেফাজত করেছেন, হাদীছ ও

ফিক'হশাস্ত্র নতুন করে সম্পাদনের দায়িত্ব আনজাম দিয়েছেন, ইজতিহাদের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেছেন, উম্মাহ্‌কে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অফুরন্ত ভাণ্ডার এবং জীবন ও সামাজিকতার সুশৃঙ্খল বিধান দান করেছেন, সমাজে হিসাব-নিকাশ ও খতিয়ানের ফরয আদায় করেছেন, এর থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন ও অবহেলাকে পরিষ্কারভাবে সমালোচনা করেছেন– সঠিক, বিশুদ্ধ ও প্রকৃত ইসলামের দিকে খোলাখুলি ও প্রকাশ্য দা'ওয়াত দিয়েছেন, যিনি সন্দেহ ও সংশয়ের যুগে এবং অস্বস্তিকর ও বিব্রত 'আকীদার যমানায় জ্ঞানগত যুক্তি ও প্রমাণ-পদ্ধতি অবলম্বন করত মস্তিষ্ককে তৃপ্ত করতে কোশেশ করেছেন এবং একটি নতুন 'ইলম-ই-কালাম (কালামশাস্ত্র)-এর ভিত্তি স্থাপন করেছেন, যিনি দা'ওয়াত ও যি'ক্‌র-আয'কার, ভীতি প্রদর্শন ও সুসংবাদ প্রদানের ক্ষেত্রে আম্বিয়া-ই-কিরাম ('আ)-এর প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং ঈমানের চাপাপড়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে উত্তাপ ও গতিশীলতা দান করেছেন, যিনি বস্তু-পূজার চঞ্চল ও বেগবান গতিধারার সামনে খাড়া হয়ে তার গতিবেগকে কমিয়ে দিয়েছেন এবং আল্লাহ্‌র মাখলূককে সেই ধারায় ভেসে যাবার কিংবা চাপা পড়ার হাত থেকে মাহ্‌ফুজ রেখেছেন, যিনি এই উম্মতের রাজনৈতিক শক্তির হিফাজত করেছেন এবং তাঁকে উপর্যুপরি বহিরাক্রমণ সইবার শক্তি দান করেছেন, যিনি বিজ্ঞ ও পাণ্ডিত্যসুলভ দা'ওয়াত ও স্বীয় মুহব্বতের জালে আবদ্ধ হয়ে সেই শত্রুকেও শিকার করেছেন, যার তলোয়ারের শক্তি ও খঞ্জরের অগ্রভাগ অবনমিত ও পর্যুদস্ত হয়নি, যিনি স্বীয় শক্তিশালী ঈমান ও রূহ'নী কূওয়তের দ্বারা এমন দুশমনকেও ইসলামের আওতায় টেনে এনেছেন এবং মুহাম্মদ (সা)-এর গোলামীতে নিয়োজিত করে তার জীবনকে ধন্য করেছেন যে তার শক্তিশালী সাহিত্য ও হৃদয়স্পর্শী অলঙ্কারপূর্ণ কাব্য-প্রতিভা দ্বারা অন্যের মস্তিষ্ককে আবিষ্ট ও বন্দী করতে সক্ষম হয়েছিল এবং যে ইসলামের জ্ঞানপূর্ণ ও বিজ্ঞ আলাপচারিতা ও ধর্মীয় দর্শন দ্বারা তৃপ্ত হবার ছিল না। এটি একটি ধারাবাহিক কার্যক্রম এবং এতে প্রতিটি ব্যক্তিত্বের একটি বিশেষ হিস্যা ও মরতবা রয়েছে। ইতিহাস আসলে আমানতের দায়িত্ব পালন এবং প্রকৃত সত্যকে স্বীকার করারই নাম। এর মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিই ইসলামের কোন না কোন সীমান্তের মুহাফিজ (রক্ষক) ছিলেন। যদি তাঁরা ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁদের সাধনা ও কোশেশ অব্যাহত না রাখতেন যাকে আমরা ইতিহাসের দূরবীন দ্বারা দেখার প্রয়াস পাচ্ছি তাহলে আমাদের কাছে ঐ সব বিরাট সংকলন-ভাণ্ডার পৌঁছুতে পারত না– যার ভেতর আমাদের জন্য ইজ্জত, শিক্ষা ও দেশের প্রচুর উপকরণ ও সরঞ্জাম মওজুদ রয়েছে এবং যার কারণে আমরা বিশ্বের তাবৎ জাতিগোষ্ঠীর সামনে সগর্বে

মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারি। এই পথ ও এই চিহ্নিত রেখা অবলম্বনে (যা গ্রন্থকারের নিকট ন্যায় ও সুবিচারসম্মত পথ) সামনের পৃষ্ঠাগুলোতে সেসব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের চিত্র পেশ করার কোশেশ করা হবে যাঁরা ইসলামের রেনেসাঁ এবং সংস্কার ও সংশোধনের ক্ষেত্রে কোন-না-কোন উল্লেখযোগ্য খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন।

وبيد الله التوفيق

প্রথম অধ্যায়

হিজরীর প্রথম শতাব্দীর সংস্কার প্রয়াস এবং হযরত ওমর ইবনে 'আবদুল আযীয (র)

উমায়্যা যুগে জাহিলী প্রবণতা ও প্রভাব

খিলাফতে রাশেদার অবসান এবং বনী উমায়্যাদের রাজত্ব সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন ও সুসংহতকরণ (যা ইসলামী শাসনের পরিবর্তে 'আরবীয় শাসন বলাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত) রেনেসাঁ ও বিপ্লবের তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করে দেয়। প্রাচীন জাহিলী প্রবণতা— যা আঁ-হযরত (সা)-এর সাহচর্য ও প্রশিক্ষণ এবং খিলাফতে রাশেদার প্রভাবে চুপসে গিয়েছিল, অর্ধ ও নামমাত্র প্রশিক্ষিত মুসলমান এবং নতুন 'আরবীয় বংশধরদের মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। হুকুমতের মেরুদণ্ড কুরআন ও সুন্নাহ্র স্থান আরবীয় রাজনীতি ও 'রাষ্ট্রীয় সুবিধাবাদ' দখল করে নেয়। পারস্পরিক গর্ব ও অহমিকা এবং 'আরবীয় আভিজাত্য ও স্বাজাত্যবোধের কলঙ্ক, যা ইসলাম দূরে নিক্ষেপ করেছিল এবং যা আরবের মরুভূমিতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল, পুনরায় লোকালয়ে ফিরে আসে। গোত্রীয় অহমিকা, খান্দানী পক্ষপাতিত্ব, আত্মীয় তোষণ তথা স্বজন-প্রীতি— যা খিলাফতে রাশেদার আমলে ভীষণ দূষণীয় ও অন্যায় কর্ম বলে গণ্য হত— পুনরায় প্রশংসনীয় গুণে পরিণত হয়। 'আমল ও আখলাকের সক্রিয় শক্তিসমূহ (পুরস্কার ও সওয়াবের পরিবর্তে) জাহিলী নাম–ধাম, প্রশংসা ও স্তুতি এবং শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্যের রূপ নেয়।[১] বায়তুল-

---

১. এই পর্যায়ে জাহিলী যুগের খ্যাতি ও সম্মান ল্যাভের প্রতিযোগিতামূলক মনোবৃত্তি পুনরায় সজাগ ও জীবন্ত হয়ে ওঠে। এই মানসিকতার পরিমাপ নিম্নোক্ত চিত্তাকর্ষক ঘটনা থেকে হতে পারে, যা আবুল ফারাজ ইস্পাহানী তাঁর "আগানী" নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। উমায়্যা যুগের হাওশাব ও 'ইকরিমা নামক দু'জন আরব সর্দারের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবত প্রতিযোগিতা চলে আসছিল— কার ঘরে অধিক খাবার তৈরি হয় এবং মেহমান বেশি আসে— এই নিয়ে। এই ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় হাওশাবের পাল্লা ভারী হ'ত। বেশ কিছুকাল পর 'ইকরিমা তার প্রতিপক্ষকে পরাজিত ও হেয় করবার জন্য একটি কৌশল অবলম্বন করে। সে এক শ' ঝুড়ি আটা খরিদ করে নিজ গোত্রের মধ্যে বণ্টন করে দেয়। নির্দেশ ছিল, পানি সহযোগে এই আটাকে আঠালো ময়দায় পরিণত করতে হবে এবং উক্ত ময়দা দিয়ে একটি বিরাট গর্ত ভর্তি করে ওপর থেকে ঘাস দিয়ে তা ঢেকে দিতে হবে। অতঃপর হাওশাবের ঘোড়া যাতে করে এই গর্তে পড়ে— সে ব্যবস্থা সম্পন্ন করা হয়। শেষ পর্যন্ত হাওশাবের ঘোড়া ময়দার গর্তে গিয়ে পড়ে এবং সারা দেহে ময়দা লেগে গিয়ে এক কিম্ভূতকিমাকার রূপ ধারণ করে। অতঃপর চতুর্দিকে রটে যায় যে, 'ইকরিমার এখানে এত বিরাট পরিমাণ আটা প্রস্তুত হয় যে, তাতে একটি আস্ত ঘোড়া নিক্ষিপ্ত হয়েছে। লোকজন কৌতূহলী হয়ে 'ইকরিমার বাড়িতে জমায়েত হয়ে দেখতে পায় যে, ঘোড়ার মাথা ও গর্দান কেবল বাইরে এবং বাকী সারা শরীর ময়দার মধ্যে ডুবে রয়েছে। রশি ও বলির সাহায্যে খুব কষ্ট করে ঘোড়াটিকে টেনে তোলা হয়। সাধারণভাবে এই ঘটনা খুবই খ্যাতি লাভ করে। এর ওপর কবিরা কাব্য-গাথাও তৈরি করে। এভাবে 'ইকরিমা তার প্রতিপক্ষের ওপর জয় লাভ করে এবং স্বীয় প্রাধান্যের স্বীকৃতি আদায় করে ছাড়ে। —(য়ান্নাতু'ছ'-হু'লিছ', ১ম খণ্ড, ১৩৯-৪০ পৃ)।

মাল (যা মুসলমানদের প্রতিটি পয়সা পাই পাই করে জমা করে গঠিত) খলীফার ব্যক্তিগত মালিকানা ও খান্দানী জায়গীরদারীতে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। পেশাদার কবি, চাটুকার সভাষদ, সম্ভ্রমখোর ও মোসাহেবদের একটি শ্রেণী সৃষ্টি হয়ে যায় যাদের ওপর মুসলমানদের ধন-সম্পদ বেদেরেগ ব্যয়িত হতে থাকে। এদের অনাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতাকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা হ'তে থাকে।[১] গান শোনবার আগ্রহ এবং সঙ্গীতের প্রতি গভীর আত্মমগ্নতা সীমা ছাড়িয়ে যায়।[২] হুকুমতের ভুল পদক্ষেপ ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং হুকুমতের সদস্যদের ধর্মহীন জীবনধারা গোটা ইসলামী সমাজকে কলুষিত করতে থাকে এবং প্রাচুর্যের অধিকারী বিত্তবানদের (মুতরাফীন) একটি শ্রেণীর সৃষ্টি হয় যাদের আচার-আচরণ (আখলাক)-এর সাথে প্রাচীন বুর্জোয়াদের আচার-আচরণের অদ্ভুত মিল ছিল। দেখে শুনে মনে হচ্ছিল যেন আহত জাহিলিয়াত স্বীয় বিজয়ী প্রতিপক্ষের নিকট থেকে প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে দৃঢ় সংকল্প হয়েছে এবং চল্লিশ বছরের প্রতিশোধ যেন সে এক বছরেই নিতে চায়।

উমায়্যা যুগের ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ও তাঁদের চারিত্রিক প্রভাব

বনী উমায়্যার এ বস্তুগত ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি সত্ত্বেও সে যুগ পর্যন্ত ধর্মের মর্যাদা ও তার চারিত্রিক প্রভাব কিছুটা অন্তত মুসলিম জীবনে বাকি ছিল। ধর্মের এই মর্যাদা ও চারিত্রিক প্রভাব সেই সব ব্যক্তির বদৌলতে ছিল যাঁরা ধর্মীয় ও জ্ঞানগত অবস্থানের কারণে উন্নত স্থান অধিকার করেছিলেন এবং নিজেদের লিল্লাহিয়াত, ইখলাস, বিশুদ্ধচিত্ততা, 'ইল্ম ও ধর্মীয় বোধশক্তিতে মশহূর ছিলেন। হুকুমত ও ক্ষমতার মসনদের বাইরেও এসব মনীষীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার আসন বিস্তৃত ছিল। এঁদেরই প্রভাবে মুসলমানরা অনেক খারাবী ও গোমরাহী থেকে নিরাপদ ছিল এবং বস্তুবাদের সয়লাবে একেবারে ভেসে যাবার হাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পেরেছিল। এই সব ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের মধ্যে

---

১. উমায়্যা যুগের মশহূর খৃস্টান কবি আখতাল (মৃত্যু ৯৫ হি.) খলীফা 'আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের মজলিসে এমন শান-শওকতের সঙ্গে আগমন করত যে, তার গলায় থাকত স্বর্ণ-নির্মিত ক্রস এবং শ্মশ্রু থেকে শরাবের ফোঁটা টপকে পড়ত। তাকে বাধা দেবার সাহস কারো ছিল না। —(আগানী, ৭ম খণ্ড, ১৭৮ পৃ.);

২. এর অনুমান আপনি এই ঘটনা থেকেও করতে পারবেন যে, একবার ইরাকের প্রখ্যাত গায়ক হুনায়ন তার স্ব-পেশার লোকদের দ্বারা আহূত হয়ে মদীনা মুনাওয়ারায় এসেছিল। একটি ঘরে তার গানের জলসা বসে এবং তাতে শ্রোতাদের এত ভীড় হয় যে, ঘরটির ছাদ ধসে যায় এবং চাপা পড়ে স্বয়ং হুনায়নেরও মৃত্যু ঘটে। —আগানী, ২য় খণ্ড।

সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ও জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন হযরত 'আলী ইবনু'ল-হুসায়ন (রা)। তিনি 'ইবাদত ও তাক'ওয়া, যুহ্দ ও পরহেযগারীর ক্ষেত্রে ছিলেন অতুলনীয়। মুসলমানদের সাথে তাঁর কি ধরনের সম্পর্ক ছিল তা নিম্নের একটি ঘটনা থেকেই আঁচ করা যাবে।

একবার যুবরাজ (পরবর্তীকালে উমায়্যা খলীফা) হিশাম ইবনে 'আবদুল মালিক কা'বা শরীফ তাওয়াফের জন্য আগমন করেন। প্রচণ্ড ভীড়ের কারণে তিনি হজরে আসওয়াদ (পবিত্র প্রস্তরখণ্ড) পর্যন্ত পৌঁছুতে ব্যর্থ হন এবং ভীড়ের চাপ হ্রাস না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকেন যাতে তা চুম্বন করতে সক্ষম হন। এরই মধ্যে হযরত 'আলী ইবনু'ল-হুসায়ন (রা) আগমন করেন। তিনি বেশ সহজভাবেই তাওয়াফ ও হজরে আসওয়াদ চুম্বন শেষ করেন। তিনি যেদিক দিয়েই যাচ্ছিলেন— লোকজন শ্রদ্ধাবশত তাঁর পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াচ্ছিল। হিশাম অপরিচিতের ভান করে জিজ্ঞাসা করেন : লোকটি কে? উমায়্যা যুগের মশহূর কবি ফারাযদাক অবলীলায় কবিতার মাধ্যমে তাঁর সেই অনীহামূলক প্রশ্নের জবাব দেন এবং ইবনু'ল-হুসায়নের যথাযোগ্য পরিচিতি প্রদান করেন।[১]

এভাবেই আহ্‌লে বায়ত-এর অন্যান্য বুযুর্গ হযরত হাসান আল-মুছান্না, তৎপুত্র হযরত 'আবদুল্লাহ্ আল-মাহ্দ এবং তাবি'ঈগণের মধ্যে বুযুর্গ শ্রেষ্ঠ হযরত সালেম ইব্‌নে 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ওমর (রা), হযরত সা'ঈদ ইবনু'ল-মুসায়্যিব, হযরত ওরওয়া ইবনু'য-যুবায়র (রা)[২] প্রমুখ মুসলমানের ধর্মীয় আদর্শের বাস্তব নমুনাস্বরূপ ছিলেন। তাঁরা নিজেদের সত্তা সম্বন্ধে আত্মসচেতনতা, হুকূমতের সঙ্গে সম্পর্কহীনতা, সত্য কথন, নির্ভীকতা, জ্ঞানমগ্নতা ও স্বার্থলেশহীনভাবে দীনের খেদমত দ্বারা নিজেদের চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের ছবি জনমনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। হুকুমতের ব্যাপক প্রভাবের মুকাবিলায় এই চারিত্রিক প্রভাব যদিও যথেষ্ট ছিল না, কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তা একেবারে মূল্যহীন ও নিষ্ফলও ছিল না। এর দ্বারা মুসলমানদের জীবনে মোটামুটিভাবে সংযম, মিতাচার, ভারসাম্য ও ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জাগরূক ছিল এবং কখনো কখনো তাদের পার্থিব মগ্নতার মধ্যেও সংস্কারের আবেগ মাথাচাড়া দিয়ে উঠত।

---

১. এই কবিতাংশটি আরবী সাহিত্যে আজও স্মরণীয় হয়ে আছে যার প্রথম লাইনটি হচ্ছে هذا الذى تعرف البطحاء وطاته والبيت يعرفه والحل والحرم । সমালোচকদের ধারণা পরবর্তীকালে কবিতাটিতে আরও পরিবর্ধন করা হয়েছে।

২. বিস্তারিত অবস্থা ও অনুবাদের জন্য দ্র. যাহাবীর তাযকিরাতু'ল-হুফ্‌ফাজ, ইব্‌নে জওযীর সাফওয়াতু'স-সাফওয়া ও তারীখ ইব্‌ন খাল্লিকান।

বিপ্লবী হুকুমতের প্রয়োজনীয়তা : তার বিপদরাজি

ক্রমে ক্রমে রাজনৈতিক বিপ্লবের প্রভাবসমূহ বিস্তৃত ও গভীরতর হতে থাকে। ঐসব ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রেও, যাঁরা ইসলামের আসল গুণাবলী ও নৈতিক চরিত্রের মুহাফিজ ও ইসলামের প্রথম তথা স্বর্ণযুগের স্মৃতিচহ্নস্বরূপ ছিলেন, দারুণ ঘাটতি পরিলক্ষিত হতে থাকে। তখন হুকুমতের প্রভাবাধীন এলাকাও বিস্তৃত ও সুদৃঢ় হয়ে গিয়েছিল। এমতাবস্থায় নৈতিক, চারিত্রিক ও দীনী ইনকিলাব সংগঠন ও পরিচালনা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ছিল।

উমায়্যা হুকুমত এমন একটি শক্ত ফৌজী বুনিয়াদের ওপর কায়েম ছিল যে, সেটাকে সহজে হেলানো ছিল প্রায় অসম্ভব। সে সময় কোন অভ্যন্তরীণ বা বহিঃশক্তি এমন ছিল না যা তাকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত করতে পারে। নিকট অতীতের দু'টি বড় রকমের চেষ্টা- সাধনা- একটি সায়্যিদুনা হযরত হুসায়ন (রা)-এর ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও বীরত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, অপরটি হযরত 'আবদল্লাহ্ ইবনু'য-যুবায়র (রা)-এর সাহসিকতাপূর্ণ, সুশৃঙ্খল ও সুসংগঠিত মুকাবিলা ইতোমধ্যেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে গিয়েছিল এবং শীঘ্রই আর কোন সামরিক বিপ্লবের আশঙ্কা ছিল না। ব্যক্তিনির্ভর ও মৌরুসী হুকুমত সংস্কার-সংশোধন ও পরিবর্তনের সকল দ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছিল। এমনও মনে হচ্ছিল যে, শতাব্দীকালের জন্য মুসলমানদের ভাগ্য বুঝি মোহরাংকিত হয়ে গেছে! সে সময় ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হওয়ার এবং অবস্থা বদলে দেবার জন্য একটি মু'জিযারই প্রয়োজন ছিল এবং সেই মু'জিযার আত্মপ্রকাশও ঘটেছিল।

হযরত ওমর ইব্ন 'আবদুল 'আযীয (র) খলীফা পদে অধিষ্ঠিত

হযরত সায়্যিদুনা ওমর ইব্ন 'আবদুল 'আযীয (র) ছিলেন উমায়্যা বংশের প্রতিষ্ঠাতা মারওয়ান-এর পৌত্র এবং তাঁর মা (উম্মে 'আসিম) ছিলেন হযরত ফারূক-ই-আ'জম (রা)-এর পৌত্রী। ফারূকী ও উমায়্যা বংশের এই সংযোগ[১]

১. বর্ণিত আছে, হযরত ওমর (রা) ঘোষণা দিয়েছিলেন যেন দুধে পানি মেশানো না হয়। একদা রাত্রিবেলা টহল দেবার সময় হযরত ওমর (রা) শুনতে পান, জনৈক মহিলা তার মেয়েকে সম্বোধন করে বলছে, বেটী! ভোর হয়ে যাচ্ছে, দুধে পানি মিশিয়ে দাও। মেয়েটি তখন জবাব দিচ্ছে, মা! আপনি জানেন না, আমীরু'ল-মু'মিনীন দুধে পানি মেশাতে নিষেধ করেছেন? মহিলা বলল, এই সময় আমীরু'ল-মু'মিনীন কোথায়? তিনি কি করে জানবেন? বালিকা জওয়াব দেয়, আমীরু'ল-মু'মিনীন না জানলেও আল্লাহ তো দেখছেন। হযরত ওমর (রা) ঘরটা চিনে নিয়ে ফিরে এসে পুত্র 'আসিমকে বলেন, তুমি এই বালিকাকে বিয়ের পয়গাম পাঠাও। আমি আশা করছি, এর পেটে এমন সন্তানের জন্ম হবে, যে গোটা আরবের ওপর হুকুমত করবে। 'আসিম মেয়েটিকে বিয়ে করেন। ওমর ইব্ন 'আবদুল 'আযীয (র) এঁদেরই দৌহিত্র (সীরতে ওমর ইব্ন 'আবদুল 'আযীয, ১৭-১৮ পৃ.)।

স্থাপিত হয়েছিল সম্ভবত এজন্য যে, উমায়্যা বংশে এমন একজন খলীফা-ই-রাশেদ-এর জন্ম হোক যিনি অবস্থার বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আনতে পারবেন।

ওমর ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীয (র) ৬১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তৎকালীন খলীফা সুলায়মান ইব্‌ন 'আবদুল মালিক-এর চাচাতো ভাই ছিলেন এবং তাঁর পূর্ববর্তী খলীফা ওয়ালীদ ইব্‌ন 'আবদুল মালিক ও সুলায়মান-এর যমানায় মদীনা মুনাওয়ারার শাসনকর্তা (গভর্নর) ছিলেন। তাঁর যৌবন ও গভর্নর থাকাকালীন জীবনের সঙ্গে পরবর্তী জীবনের কোনই মিল নেই। যৌবনে তিনি ছিলেন গভীর রুচিসম্পন্ন আমীরানা মেযাজের ধোপদুরস্ত এক সৌখিন যুবক। তিনি যে রাস্তা অতিক্রম করতেন অনেকক্ষণ পর্যন্ত তা সুগন্ধে মোহিত থাকত। পরিবেশই বলে দিত যে, এ পথ দিয়ে ওমর গেছেন। তাঁর চাল-চলন ছিল মশহূর এবং যুবকদের জন্য ঈর্ষণীয়। শান্ত-স্বভাব, সত্যপ্রিয় (হক পছন্দীয়) এবং প্রকৃতিগতভাবে নেক মেযাজ হওয়া ছাড়া তিনি এমন কোন গুণের অধিকারী ছিলেন না– যদ্দারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি ভবিষ্যতে ইসলামের কোন গুরুত্বপূর্ণ খেদমত আনজাম দিতে যাচ্ছেন।

কিন্তু তাঁর জীবনের আপাদমস্তকই ছিল যেন ইসলামের জন্য একটি মু'জিযা! তিনি যেভাবে খিলাফতের আসনে সমাসীন হন সেটাও আল্লাহ্‌রই কুদরতের একটি নিশানী ছিল। মৌরুসী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় তাঁর খিলাফত লাভের কোনই সুযোগ ছিল না। যদি সকল অবস্থা স্বাভাবিক গতিতে চলতে থাকত তাহলে বড়জোর তিনি কোন একটি অঞ্চলের শাসনকর্তা হতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ! সুলায়মান ইব্‌ন 'আবদুল মালিক অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর ছেলেরা ছিল ছোট্ট শিশু। তিনি তাদেরকে লম্বা লম্বা ঝলমলে শাহী পোশাক পরতে দেন এবং কটি দেশে হাতিয়ারও বেঁধে দেন যাতে করে তাদেরকে একটু বড়সড় দেখায়। এতদসত্ত্বেও তারা তাঁর চোখে পড়বার মত হয়নি। তখন তিনি অত্যন্ত আফসোসের সঙ্গে তাদের থেকে দৃষ্টি ফেরান এবং বলেন : সেই ব্যক্তিই সৌভাগ্যবান যার সন্তান-সন্ততি বড় হয়ে গেছে। রাজা' ইবন হায়াত– যিনি এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন, হযরত ওমর ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীয (র)-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করার ব্যাপারে খলীফাকে পরামর্শ দেন এবং খলীফা তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করেন! রাজা'র এই কৃতিত্বপূর্ণ অবদান ছিল (যা একটি ধর্মীয় ইনকিলাব সৃষ্টির মাধ্যম হয়েছিল) বড় বড় মুজাহাদা ও শত শত বর্ষব্যাপী 'ইবাদত-বন্দেগীর চাইতেও অধিক মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ।

খিলাফত লাভের পরবর্তী জীবন

ওমর ইব্‌ন 'আবদুল আযীয (র) হুকুমতের লাগাম হাতে নেওয়ার সাথে সাথে এতটুকু দেরী না করে সেই সব আমলাকে প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন যারা ছিল শক্ত রকমের জালেম এবং যাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র কোন ভয় ছিল না। সিংহাসনে আরোহণকালে তাঁর সামনে শাহী জাঁক-জমক ও আড়ম্বরপূর্ণ যে সব মূল্যবান উপকরণ উপঢৌকন হিসাবে পেশ করা হয়েছিল, তিনি অবিলম্বে সেগুলো বায়তুল মালে পাঠিয়ে দেন। সেই মুহূর্ত থেকেই তাঁর আচার-আচরণ ও জীবনধারা একদম পাল্টে যায়। মনে হচ্ছিল, তিনি খলীফা সুলায়মানের স্থলাভিষিক্ত নন, বরং আমীরু'ল-মু'মিনীন হযরত ওমর ইবনু'ল-খাত্তাব (রা)-এর স্থলাভিষিক্ত। গভীর পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে তিনি রাজপ্রাসাদের দাসী-বাঁদীদের তাদের নিজ নিজ খান্দান ও শহরগুলোতে পাঠিয়ে দেন। তিনি স্বীয় মজলিসকে যা ইরানের শাহানশাহ ও রোম সম্রাটের দরবারের রূপ নিয়েছিল, খিলাফতে রাশেদার নমুনা মাফিক সাদাসিধা ও সুন্নাহ্ মুতাবিক ঢেলে সাজান। তিনি তাঁর জায়গীরসমূহ মুসলমানদের ফিরিয়ে দেন, এমন কি স্ত্রীর গহনাপত্রও বায়তুলমালে জমা দিয়ে দেন। তিনি এরূপ যুহ্‌দসুলভ জীবন ইখ্‌তিয়ার করেন যার নজীর বাদশাহদের মধ্যে তো দূরের কথা, ফকীর-দরবেশদের মধ্যেও মেলা ভার। তিনি তাঁর পোশাক-আশাকের সংখ্যা এমনভাবে কমিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাঁর একটি মাত্র কুর্তা ছিল এবং সেটি শুকানোর অপেক্ষায় থাকায় জুম'আর জামা'আতে শরীক হতে তাঁর কখনো কখনো বিলম্ব হত। বনূ উমায়্যা, যারা গোটা মুসলিম সাম্রাজ্যকে নিজেদের জায়গীর এবং বায়তুল-মালকে নিজেদের পৈতৃক সম্পত্তি বলে মনে করত, এখন তা থেকে শুধু মাপা-জোখা অংশ পেতে থাকে। তাঁর নিজের ঘরের অবস্থাও ছিল এই যে, একবার তিনি তাঁর শিশু-সন্তানদের সঙ্গে মিলিত হতে গিয়ে দেখতে পান, যে বাচ্চাই তাঁর সঙ্গে কথা বলছে– সেই তার মুখের ওপর হাত চাপা দিচ্ছে। কারণ জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন যে, আজ তারা সবাই কেবল ডাল ও পেঁয়াজ খেয়েছে। তিনি অশ্রু ভারাক্রান্ত চোখে বলেন, "তোমরা কি চাও যে, তোমরা রকমারি খানা খাও আর তোমাদের পিতা জাহান্নামে যাক।" এ কথা শোনার পর তারাও কেঁদে ফেলে।[১] এটা সেই সময়কার কথা যখন তিনি ছিলেন তৎকালীন বিশ্বের সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর। তাঁর ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সম্পত্তির পরিমাণ এই দাঁড়িয়েছিল যে, হজ্জ করবার প্রবল আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তা সমাধা করবার মত প্রয়োজনীয় ব্যয়-নির্বাহের সঙ্গতি তাঁর ছিল না। খাস

১. সীরাতে ওমর ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীয (র), মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুল হাকামকৃত, ৫৫ পৃ.।

নওকরকে (যে ছিল তাঁর আন্তরিক বন্ধু) জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমার নিকট কিছু আছে কি? সে বলল ঃ দশ-বার দীনারের মত আছে। তিনি বললেন ঃ এতে কিভাবে হজ্জ সমাধা হতে পারে? অতঃপর উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অর্থ-সম্পদের একটি বিরাট পরিমাণ তাঁর হাতে এসে পৌঁছে। তখন খাদেম খলীফাকে মুবারকবাদ জানিয়ে বলে, হজ্জের সামান তো এসে গেছে। খলীফা বললেন, "আমরা এই বিত্ত-সম্পদ থেকে বহুদিন পর্যন্ত উপকার লাভ করেছি। এখন এটা সাধারণ মুসলমানদের হক।" এই বলে তিনি ঐ সম্পদ বায়তুল-মালে জমা দিয়ে দেন।

খলীফা ওমর ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীযের দৈনিক খোরাকি খরচ দুই দিরহামের বেশি ছিল না। সতর্কতার অবস্থা এমন ছিল যে, যদি সরকারী বাতি জ্বলত এবং সে অবস্থায় কেউ তাঁকে তাঁর ব্যক্তিগত কুশলাদি জিজ্ঞাসা করতে থাকত অথবা কোন ব্যক্তিগত কথাবার্তা ও আলাপ-আলোচনা শুরু হয়ে যেত, তিনি তৎক্ষণাৎ বাতি নিভিয়ে দিতেন এবং আলোর জন্য ব্যক্তিগত বাতি চেয়ে আনতেন।

গোসলের সময় বায়তুল-মালের বাবুর্চিখানার গরম পানি ব্যবহার করা থেকে তিনি বিরত থাকতেন, এমন কি বায়তুল-মালের মেশ্‌ক-এর ঘ্রাণ নেওয়াও তিনি পছন্দ করতেন না।[১]

তাঁর সতর্কতা কেবল তাঁর নিজের ব্যক্তিসত্তা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তিনি তাঁর হুকুমতের আমলাদেরকেও সব ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বনের শিক্ষা দিতেন। মদীনার শাসনকর্তা আবূ বকর ইব্‌ন হয্‌ম সুলায়মান ইব্‌ন 'আবদুল মালিকের কাছে দরখাস্ত পাঠিয়েছিল যেন পূর্ব নিয়ম মাফিক তাকে সরকারী মোমবাতি ও বাতি সরবরাহ করা হয়। সুলায়মানের ইনতিকালের পর এই চিঠি হযরত ওমর ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীয (র)-এর হাতে পড়ে। তিনি উত্তরে লিখেন, "আবূ বকর! আমার স্মরণ আছে যে, এই পদে অধিষ্ঠিত হবার পূর্বে শীতের অন্ধকার রাত্রেও তুমি মোমবাতি এবং অন্য কোন বাতি ছাড়াই পথে বের হতে। তোমার সেই অবস্থা আজকের এই অবস্থা থেকে উত্তম ছিল। আমার ধারণায় তোমার ঘরের মোমবাতি ও বাতি দ্বারাই তোমার কাজ চালানো উচিত।"[২] এ ধরনেরই একটি দরখাস্তের ওপর যেখানে সরকারী কাজে কাগজ চেয়ে পাঠানো হয়েছিল, তিনি লিখেছিলেন ঃ

১. সীরতে ওমর ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীয-৪৪ পৃ.।
২. ঐ, ৬৪ পৃ.; ৩. ঐ, ৬৪ পৃ.।

কলম চিকন করে এবং ছোট ছোট করে লিখ। একই পৃষ্ঠায় অনেক জরুরী বিষয় লিখে দাও। মুসলমানদের এমন লম্বা-চওড়া কথার প্রয়োজন নেই, যার কারণে অযথা বায়তুল-মালের ওপর বোঝা ভারী হয়।[১]

বিপ্লবাত্মক সংস্কার

হযরত ওমর ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীয (র) তাঁর যুহদ-এর যিন্দেগী এবং তাকওয়া, সতর্কতা ও সংযমের দ্বারা হুকুমতের প্রাণসত্তাই বদলে দেন। তাঁর প্রথম ও মৌলিক বিপ্লব ছিল এই যে, তিনি হুকুমতের দৃষ্টিকোণই পাল্টে দেন। সে সময় হুকুমত কেবল ট্যাক্স ও রাজস্ব আদায় এবং তা ব্যয় করার একটি ব্যবস্থাপক সংস্থায় পরিণত হয়েছিল। সাধারণ মানুষের 'আকীদা-আখলাক ও তাদের গোমরাহী ও হিদায়াতের ব্যাপারে রাষ্ট্রের কোন মাথা ব্যথা ছিল না। কিন্তু ওমরের গোটা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা নিম্নলেখ প্রখ্যাত ঐতিহাসিক উক্তিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে থাকে :

> মুহাম্মদ (সা)-কে দুনিয়ার হাদী (পথ-প্রদর্শক) হিসাবে পাঠানো হয়েছিল, তহশীলদার হিসেবে নয়।[২]

অর্থাৎ হুকুমতের মেযাজ ও দৃষ্টিকোণই তিনি বদলে দেন এবং তাকে পার্থিব হুকুমতের পরিবর্তে "খিলাফাত 'আলা মিনহাজু'ন-নুবুওয়াত" বানিয়ে দেন। তাঁর গোটা খিলাফত আমলটাই ছিল সেই একটি বাক্যের বাস্তব ব্যাখ্যা। তিনি রাষ্ট্রীয় কল্যাণ ও স্বার্থের মুকাবিলায় সব সময় দীন, তার মূলনীতি ও আখলাককেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং পার্থিব লাভালাভের মুকাবিলায় হুকুমতের আর্থিক ক্ষতিকে কখনো তিনি গ্রাহ্যের মধ্যে আনেননি। তাঁর খিলাফত যুগে ইসলামী হুকুমতের অমুসলিম বাসিন্দারা (যিম্মী) বিরাট সংখ্যায় ইসলাম গ্রহণ করে, যার ফলে জিযয়ার অর্থ– যা রাষ্ট্রীয় আমদানির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ও উৎস ছিল, দিন দিন হ্রাস পেতে থাকে এবং হুকুমতের আর্থিক ভারসাম্যের ওপর এর একটি বিরাট প্রভাব পড়ে। সাম্রাজ্যের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এই বিপদের প্রতি খলীফার মনোযোগ আকর্ষণ করলে তিনি জওয়াবে বলেন ঃ এটা তো আঁ-হযরত (সা)-এর নবী হিসাবে প্রেরিত হবার লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। একবার অন্য একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তাকে তিনি লিখে পাঠান ঃ আমি খুব খুশি হব যদি সকল অমুসলিম মুসলিম হয়ে যায় এবং (জিযয়া খাতের আমদানি বন্ধ হয়ে যাবার কারণে) আমার ও তোমার দু'জনকেই হাল চালিয়ে নিজেদের পেট ভরাতে হয়।[৩]

১. মানাকিব ওমর ইব্‌ন আবদুল আযীয, ৬৪ পৃ.
২. সীরাতে ওমর ইব্‌ন আবদুল আযীয, ৬৪ পৃ.
৩. কিতাবুল খারাজ, ইমাম আবূ ইউসুফকৃত, ৭৫ পৃ.

য়ামানে রাজস্বের একটি নির্দিষ্ট হার নির্ধারিত ছিল– চাই কি ফসল ভাল হোক কিংবা খারাপ। সেখানকার শাসনকর্তা বিষয়টি খলীফাকে অবহিত করলে তিনি বলেন ঃ ফসল মাফিক অর্থ আদায় হওয়া উচিত। এর ফলে যদি সমগ্র য়ামান এলাকা থেকে এক মুষ্টি শস্য কিংবা একদানা খোরাকও না আসে– তবু আপত্তির কিছু নেই।[১] তিনি চুঙ্গি (নগর-শুল্ক) থেকে গোটা রাষ্ট্রকে অব্যাহতি দেন এবং আমলাদের লেখেন :

এটি অপবিত্র জিনিস। এ সম্পর্কে কুরআন মজীদে ইরশাদ রয়েছে ঃ

وَلَا تَبْخَسُوْا النَّاسَ اَشْيَائَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ -(هود ٨٥)

লোকদেরকে তাদের জিনিস কম দিও না এবং যমীনের বুকে অশান্তি ও ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়িও না। – সূরা হূদ ৮৫

লোকেরা এর নাম বদল করে একে জায়েয বানিয়ে নিয়েছে।[২]

কতিপয় শর'ঈ বিধানসম্মত ট্যাক্স ভিন্ন সব ধরনের নাজায়েয রাজস্ব, এমন কি বিশ প্রকারের ট্যাক্স– যা সাবেক শাসক ও আমলারা উদ্ভাবন করেছিল, একেবারে চিরতরে মাফ করে দেন।[৩] তিনি স্থল ও সমুদ্র পথ খুলে দেবার নির্দেশ দেন এবং সকল ধরনের বাণিজ্যিক বাধ্যবাধকতা ও কঠোর বিধি-নিষেধ রহিত করেন।[৪]

তিনি গোটা সাম্রাজ্য জুড়ে এমন সব সংস্কার সাধন করেন যার ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। তিনি সমগ্র রাষ্ট্রে একই ধরনের মাপ নির্ধারণ করেন।[৫] প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও রাষ্ট্রের আমলাদের পক্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন[৬] এবং বেগার শ্রমকে আইনত নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।[৭] রাষ্ট্রীয় ভূ-সম্পত্তির একটি নির্দিষ্ট অংশকে আমীর-উমারা, শাহী খান্দানের লোক ও শাসনকর্তারা নিজেদের শিকার ক্ষেত্র অথবা চারণভূমিতে পরিণত করে পতিত রেখে দিয়েছিল। তিনি নির্দেশ দেন যে, সে সবই জনসাধারণের মালিকানাধীন সম্পত্তি।[৮] জনসাধারণের তোহফা (উপহার-উপঢৌকন) গ্রহণ করাকে আমলাদের জন্য তিনি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে দেন এবং বলেন, এটা যদি কোন সময় তোহফাও হয়ে থাকে তবু এখন তা ঘুষ ছাড়া কিছু নয়।[৯] তিনি শাসনকর্তাদের প্রতি নির্দেশ পাঠান তারা যেন জনসাধারণকে তাদের সাথে সাক্ষাত করার এবং অভাব-অভিযোগ পেশ করার পূর্ণ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন। হজ্জের সময়

১. সীরতে ওমর ইব্ন 'আবদুল 'আযীয–১২৬ পৃ.।
২. সীরতে ওমর ইব্ন 'আবদুল 'আযীয ৯৯ পৃ.।
৩. ঐ; ৪. ঐ, ৯৮ পৃ.; ৫. ঐ, ৯৯ পৃ.; ৬. ঐ।
৭. ঐ, ১০০ পৃ.; ৮. ঐ ৯৭ পৃ; ৯. ঐ, ১৬২ পৃ.;

ঘোষণা দেওয়া হ'ত ঃ কারো ওপর জুলুম করা হয়েছে– এমন কোন তথ্য কেউ প্রদান করলে এবং এ ব্যাপারে কোন সৎ পরামর্শ দিলে তাকে এক শ' থেকে তিন শ' দীনার পর্যন্ত পুরস্কার দেওয়া হবে।[১]

আমল-আখলাকের প্রতি মনোনিবেশ

সে সময় পর্যন্ত খলীফা কেবল শাসকই ছিলেন, জনসাধারণের আমল-আখলাকের প্রতি মনঃসংযোগের যেমন ফুরসৎ তাঁর ছিল না– তেমনি এর কোন যোগ্যতাও তাঁর ছিল না, এমন কি তখন মনেই করা হ'ত না যে, খলীফা জনসাধারণকে ধর্মীয় পরামর্শ দান করবেন, তাদের আখলাক ও আচার-আচরণ দেখাশোনা করবেন এবং তাদেরকে ওয়া'জ-নসীহত করবেন। এ কাজ কেবল 'উলামায়ে কিরাম ও মুহাদ্দিছীন করবেন বলেই মনে করা হত। ওমর ইব্ন 'আবদুল 'আযীয (র) এই জাতীয় ধারণার অবসান ঘটান এবং নিজেকে প্রকৃত ও বাস্তব অর্থে খলীফা হিসাবে প্রমাণিত করেন। তিনি খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করতেই হুকুমতের আমলা ও ফৌজী অফিসারদের কাছে যে সমস্ত দীর্ঘ চিঠি ও ফরমান পাঠান তা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত হবার তুলনায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ছিল ধর্মীয়, নৈতিক ও চারিত্রিক বিষয় সম্পর্কিত। সে সব পত্রের মধ্যে হুকুমতের প্রাণসত্তার চাইতে পরামর্শ ও নসীহতের রূপই বেশি থাকত। কোন কোন পত্রে তিনি সাবেক ইসলামী যিন্দেগী (নবুওয়ত ও খিলাফতে রাশেদার যুগ) ও সে যুগের সমাজ চিত্র অংকন করেছেন এবং ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও রাষ্ট্রীয় পদ্ধতির বিশ্লেষণ করেছেন।[২] উক্ত পত্রসমূহে তিনি ফৌজী অফিসারদেরকে সময়মত সালাত কায়েম করতে, তা ঠিক মত কায়েম হচ্ছে কিনা তার বন্দোবস্ত করতে এবং জ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে তৎপর হতে তাকীদ করেছেন।[৩] আমলাদেরকে তিনি তাক'ওয়া ও শরীয়তের আনুগত্যের ওসিয়্যত করতেন,[৪] নিজ নিজ এলাকায়ই ইসলামের দা'ওয়াত ও তাবলীগের ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন এবং একেই রাসূল (সা)-এর রিসালাত ও ইসলামের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বলে উল্লেখ করতেন।[৫] জনসাধারণকে সৎকার্যের আদেশ দান এবং অসৎ কার্য থেকে বিরত রাখার জন্যও তিনি আমলাদেরকে তাকীদ দিতেন। এই অপরিহার্য দায়িত্ব পালনে অসতর্কতা দেখালে কি ক্ষতি হবে এবং এর কি নিদারুণ মূল্য দিতে হবে[৬] তা তিনি সকলকে বুঝিয়ে বলতেন। সাম্রাজ্যের আমলাদেরকে সাজা ও শিক্ষা

১. সীরতে ওমর ইব্ন 'আবদুল 'আযীয - ১৪১ পৃ.।
২ সীরতে ওমর ইব্ন 'আবদুল 'আযীয (ইব্ন 'আবদুল হ'াকামকৃত) ৬৯।
৩. ঐ ৭৯ পৃ.; ৪ ঐ. ৯২ পৃ. ৫. ঐ, ১৩৭ পৃ.; ৬. ঐ ১৬৭ পৃ.।

প্রদানের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখতেও সতর্কতা অবলম্বনের ব্যাপারে তিনি তাকীদ করতেন এবং ইসলামের শাস্তি বিধানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রদান করতেন।[১] অতঃপর তিনি সাম্রাজ্যের সাধারণ নাগরিকদের খারাপ ও অন্যায় কাজকর্ম এবং অসৎ চরিত্র সংশোধনের প্রতি মনোনিবেশ করেন। নারীদের উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ, মাতম ও তাদের জানাযায় যোগদান নিষিদ্ধ করেন এবং পর্দার ব্যাপারে তাকীদ দেন।[২] তিনি গোত্রীয় পক্ষপাতিত্বের প্রতি নিন্দাবাদ জ্ঞাপন করেন এবং এর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন।[৩] নাবীয ব্যবহারের ক্ষেত্রে দারুণ প্রবণতা দেখা দিয়েছিল এবং এর মাধ্যমে জনসাধারণ শরাব পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল যার ফলে সমাজে বিভিন্ন ধরনের নৈতিকতাবিরোধী ও চরিত্র বিধ্বংসী কার্যকলাপ শুরু হয়ে গয়েছিল। তিনি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দেন ও সাবধান বাণী উচ্চারণ করেন।[৪]

'ইল্ম ও সুন্নাহ্ পুনর্জীবনে তাঁর ভূমিকা

তিনি দীনী 'ইল্ম সংরক্ষণ, সংকলন ও সুন্নাহ্র পুনর্জীবনের দিকে মনোনিবেশ করেন। তিনি হাদীছ সংকলনের প্রতি আবূ বকর ইবন হয্‌ম নামক একজন প্রখ্যাত 'আলিমের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তাঁকে লেখেন ঃ

انظر ما كان حديث رسول الله صـ فاكتبه فانى خفت دروس العلم وذهاب العلماء

আঁ-হযরত (সা)-এর যে কোন হাদীছ পাওয়া মাত্রই তা লিপিবদ্ধ করুন। কেননা আমি 'আলিমদের বিদায় এবং 'ইল্ম-এর অন্তর্ধানের আশঙ্কা করছি।

তিনি হাদীছ ভাণ্ডার সংগ্রহের প্রতি, বিশেষ করে 'উমরাহ্ বিনতে 'আবদুর রহমান আনসারিয়া ও কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর-এর মনোযোগ আকর্ষণ করেন এবং তাঁদেরকে তা লিপিবদ্ধ করতে বলেন। তিনি এই প্রয়োজনীয় বিষয়টির প্রতি সাম্রাজ্যের সকল আমলা ও খ্যাতনামা 'উলামায়ে কিরামেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং স্থায়ী নির্দেশ জারী করেন ঃ

انظروا الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه

রসূল (সা)-এর হাদীছ তন্ন তন্ন করে খোঁজ ও সংগ্রহ করো।[৫]

এই সঙ্গে তিনি 'উলামায়ে কিরাম-এর ভাতা[৬] নির্ধারণ করে দেন যাতে তাঁরা একাগ্রতা ও গভীর অভিনিবেশ সহকারে 'ইল্ম-এর প্রচার ও শিক্ষা দানে ব্রতী হতে পারেন।

---

১. সীরতে ওমর ইব্ন 'আবদুল 'আযীয, ৭০ পৃ.২. ঐ ১০৭ পৃ.; ৩. ঐ, ১০২ পৃ.; ৪ ঐ, ১০পৃ.;
৫. তারীখ-ই-ইস্পাহান (আবু ন'ঈম); ৬. সীরতে ওমর ইব্ন 'আবদুল 'আযীয, ১৬৭ পৃ.।

তিনি নিজেও একজন বড় 'আলিম ছিলেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবেও ফরয ও সুন্নতের বিশ্লেষণের দিকে মনোনিবেশ করেন। খিলাফত লাভের প্রাথমিক দিনগুলোতে তিনি নিম্নলিখিত নির্দেশটি জারী করেন ঃ

> ইসলামের এমন কিছু বিধি-বিধান ও আইন-কানুন রয়েছে যেগুলোর ওপর আমল করলে ঈমান পূর্ণাঙ্গ হয়। যে এগুলোর ওপর আমল করবে না তার ঈমান অপূর্ণ থেকে যাবে। যদি কিছুদিন বেঁচে থাকি তাহলে আমি সে শিক্ষাই দেব এবং তোমাদেরকে তার ওপর পরিচালিতও করব। যদি এর পূর্বেই আমার বিদায় মুহূর্ত এসে যায় তা হলেও আপত্তির কিছু নেই। কেননা আমি তোমাদের ভেতর বেঁচে থাকতেও খুব একটা আগ্রহী নই।[১]

কতিপয় পত্র ও ফরমান

সায়্যিদুনা ওমর ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীয (র)-এর মধ্যে যে আন্তরিকতা, ইসলামী মানসিকতা ও প্রাণ-চাঞ্চল্য বিদ্যমান ছিল (এবং যা শেষাবধি তাঁর প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায়ও উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হয়) তার সঠিক পরিমাপ তাঁর ঐ সমস্ত চিঠি-পত্র ও সরকারী ফরমান থেকেই করা যায় যা তিনি সময় সময় সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা ও পদাধিকারী ব্যক্তিদের কাছে পাঠিয়েছিলেন। ঐগুলো থেকে বোঝা যায় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে কী খালিস ও নির্ভেজাল মন-মস্তিষ্ক ও মানসিকতার অধিকারী করেছিলেন। তাঁর ওপর জাহেলিয়াত ও বনী উমায়্যার রাজন্যবর্গের চরিত্র ও ধ্যান-ধারণার কোন প্রভাবই পড়েনি।

একবার তিনি অবগত হলেন যে, কোন কোন গোত্রীয় সর্দার ও উমায়্যা যুগের কিছু কিছু নব্য ধনিক জাহেলিয়া যুগে প্রচলিত পারস্পরিক মিত্রতা বন্ধনে অঙ্গীকারাবদ্ধ হবার রীতি পুনরুজ্জীবিত করছে[২] এবং যুদ্ধ ও মুকাবিলার ক্ষেত্রে "يا بنى فلان ! يا لمضر!" (অর্থাৎ হে অমুক গোত্র অথবা হে মুদার গোত্র! তোমরা তোমাদের মিত্রদের সাহায্যে এগিয়ে এস) ইত্যকার জাহিলী যুগের সম্বোধনমূলক ধ্বনি উচ্চারণ করতে শুরু করেছে। এ ছিল ইসলামের সম্পর্ক, ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার বিপক্ষে একটি জাহিলী ব্যবস্থাপনা ও জাহিল প্রথার পুনরুজ্জীবন। এতে ছিল বহু ফেতনার পূর্বাভাষ। সাবেক শাসকবৃন্দ সম্ভবত রাষ্ট্রীয় সুবিধা

১. সহীহ বুখারী, কিতাবুল ঈমান অধ্যায়।
২. জাহিলী যুগে এক গোত্র অপর গোত্রের এবং এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির মিত্রে পরিণত হ'ত। অতঃপর সে বিভিন্নভাবে তার প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করত এবং ন্যায়-অন্যায় ও সত্যাসত্যে সবক্ষেত্রে তার সহায়তা করত।

হাসিলের কুমতলবে একে প্রশ্রয় দিত। কিন্তু ওমর ইব্ন 'আবদুল 'আযীয এর বিপদের দিকটি ভালভাবে উপলব্ধি করেন এবং এর প্রতিবিধানের ব্যাপারে স্থায়ী নির্দেশ জারী করেন। রাষ্ট্রের একজন বড় পদাধিকারী ব্যক্তি দাহাক ইব্ন 'আবদুর রহমানকে তিনি লিখেন ঃ

হা'ম্দ ও সালাত বাদ! তুমি অবগত হও যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা এই ইসলাম, যাকে তিনি নিজের জন্য ও স্বীয় বিশিষ্ট বান্দাগণের জন্য মনোনীত করেছেন– ভিন্ন অন্য কোন দীন (ধর্ম)-কে কবুল করেন না। আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামকে স্বীয় গ্রন্থ দ্বারা সম্মান দান করেছেন এবং এর মাধ্যমে ইসলাম ও গায়র-ইসলামের মধ্যে পার্থক্য রেখা টেনে দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

قَدْ جَائَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتَابٌ مُّبِيْنٌ - يَهْدِىْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهِ وَيَهْدِيْهِمْ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ
-(المائدة : ١٦-١٥)

আল্লাহ্র নিকট থেকে তোমাদের নিকট এসেছে এক জ্যোতি ও সুস্পষ্ট কিতাব। যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করতে চায়– এর দ্বারা তিনি তাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং নিজ অনুমতিক্রমে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান এবং ওদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন।

– আল-মায়িদা, ১৫-১ আয়াত

তিনি আরও ইরশাদ করেন ঃ

وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ط وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا -(اسراء : ١٠٥

আমি সত্যসহই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং তা সত্যসহই অবতীর্ণ হয়েছে। আমি তো তোমাকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি।

– সূরা ইসরা, ১০৫ আয়াত

আল্লাহ্ তা'আলা আঁ-হযরত (সা)-কে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর ওপর স্বীয় গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন। সেই সময় (ওহে আরববাসী! তোমরা জান যে,) পথভ্রষ্টতা, মূর্খতা, পেরেশানি ও ভীষণ মানসিক অস্থিরতার মধ্যে মানবতা হাবুডুবু খাচ্ছিল। ফেতনা-ফাসাদ তোমাদের মধ্যে জেঁকে বসেছিল। লোকেরা তোমাদের দাবিয়ে রেখেছিল এবং সাধারণের নিকট দীনের যতটুক অবশিষ্ট ছিল তা থেকেও তোমরা মাহ্রূম ছিলে। এক কথায় বলতে গেলে, এমন কোন গোমরাহী ছিল না যার মধ্যে তোমরা লিপ্ত ছিলে না। তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকত তারা মূর্খতা ও গোমরাহীর মধ্যেই বেঁচে থাকত; আর তোমাদের

মধ্যে যারা মারা যেত তাদের ঠিকানা হত জাহান্নাম। অবশেষে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে মূর্তিপূজা, যুদ্ধ-বিগ্রহ, পারস্পরিক ঘৃণা-বিদ্বেষ প্রভৃতি মন্দ কাজ থেকে রক্ষা করলেন। তোমাদের মধ্যে যারা অস্বীকারকারী তারা অস্বীকার করল। এদিকে আল্লাহ্‌র পয়গম্বর আল্লাহ্‌র কিতাব এবং ইসলামের দা'ওয়াত দিতে থাকলেন। অতঃপর তোমাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক লোকই তাঁর ওপর ঈমান আনল। অবশ্য এমন কিছু দুর্বল লোকও ঈমান আনল যারা সব সময় ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকত এই ভয়ে যে, লোকেরা তাদেরকে ছোঁ মেরে না নিয়ে যায়! আল্লাহ্ তাদেরকে আশ্রয় দিলেন, তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা দান করলেন এবং তাদেরকে সেই সব লোকও দান করলেন যাদের ইসলাম গ্রহণ তাঁর মর্জিতে ছিল। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তাঁর সেই ওয়াদা পূর্ণ করলেন যাকে স্বল্প সংখ্যক মুসলমান ব্যতিরেকে সাধারণ লোকেরা অসম্ভব মনে করেছিল। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

هُوَ الَّذِیْ اَرْسَلَ رَسُوْلَه بِالْهُدٰی وَدِیْنِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَه عَلَی الدِّیْنِ کُلِّه وَلَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُوْنَ .

তিনিই (আল্লাহ্)– তাঁর রসূলকে হিদায়াত ও সত্য-সুন্দর জীবন-ব্যবস্থাসহ পাঠিয়েছেন তাকে অন্য সকল বাতিল জীবন-ব্যবস্থার ওপর বিজয়ী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, যদিও তা মুশরিকদের নিকট অপছন্দনীয় হয়।

– সূরা সাফ, ৯ আয়াত

কতক আয়াতে আল্লাহ্ পাক স্বয়ং মুসলমানদের সঙ্গে ওয়াদা করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে :

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مِنْکُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْاَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَیُمَکِّنَنَّ لَهُمْ دِیْنَهُمُ الَّذِی ارْتَضٰی لَهُمْ وَلَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ط یَعْبُدُوْنَنِیْ لَایُشْرِکُوْنَ بِیْ شَیْئًا ط –(نور : ٥٥)

তোমাদের ভেতর যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে খিলাফত দান করবেনই যেমন তিনি খিলাফত দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য সুদৃঢ় করবেন তাদের দীনকে যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার 'ইবাদত করবে, আমার কোন শরীক করবে না।

– সূরা নূর, ৫৫ আয়াত

যা-হোক আল্লাহ্ পাক তাঁর নবী ও মুসলমানদের সঙ্গে কৃত ওয়াদা পূরণ করে দেখিয়েছেন। ওহে ইসলামের অনুসারীবৃন্দ! মনে রেখ যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের যা কিছু দিয়েছেন– তা এই ইসলামের মাধ্যমেই দিয়েছেন যার বদৌলতে তোমরা শত্রুর ওপর বিজয়ী হয়েছ এবং যার কারণে তোমরা কিয়ামতের দিনে সাক্ষ্যদাতা হবে। তোমাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে এ ছাড়া কোন গতি নেই, নেই কোন দলীল-প্রমাণ, নেই কোন বাঁচার পথ, নেই আত্মরক্ষার কোন মাধ্যম; আর এ ছাড়া তোমাদের কোন শক্তিও নেই।

আমি তোমাদেরকে এই কুরআন এবং এর ওপর আমল না করার অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করে দিচ্ছি। এর ওপর আমল না করার পরিণতিতে উম্মার মধ্যে যে রক্তপাত, গৃহযুদ্ধ ও বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তা তো তোমাদের চোখের সামনেই রয়েছে। অতএব, যে কাজ থেকে আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাক। আল্লাহ্র সাবধান বাণী অপেক্ষা অধিক ভীতিপ্রদ আর কিছু নেই। যে জিনিস আমাকে তোমাদের কাছে পত্র লিখতে বাধ্য করেছে তা এই যে, গ্রাম এলাকার অধিবাসীদের সম্পর্কে ও সেই সব লোক সম্পর্কে– যারা নতুন নতুন শাসনকর্তা ও পদাধিকারী হয়েছেন– আমি খোঁজ-খবর নিয়েছি। গ্রাম্য লোকেরা নিরক্ষর ও জাহেল ধরনের লোক। আল্লাহ্র বিধি-বিধান সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই। আল্লাহ্র ব্যাপারে তারা ভীষণ ধোঁকায় নিপতিত। তাদের সঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলার যে ব্যাপার-স্যাপার রয়েছে তা তারা ভুলে গেছে। তারা আল্লাহ্ তা'আলার সে সব নে'মতের নাশোকরী ও অসম্মান করেছে যে পর্যন্ত পৌঁছবার কোন যোগ্যতাই তাদের ছিল না। আমাকে বলা হয়েছে যে, তাদের মধ্যে কিছু লোক যুদ্ধে মুদার গোত্র ও য়ামানবাসীদের সাহায্য ও আশ্রয় কামনা করে থাকে। তাদের ধারণা এই যে, অন্যদের মুকাবিলায় ওরাই তাদের একমাত্র সাহায্য ও সহায়তাদানকারী বন্ধু। আল্লাহ্র জন্যই সকল তাসবীহ্ ও হাম্দ! এটা অত্যন্ত জঘন্য ধরনের অকৃতজ্ঞতা ও নে'মতের কুফরী। ধ্বংস ও লাঞ্ছনা-গঞ্জনার দিকে কত দূর এগিয়ে গেছে তারা! তারা দেখছে না কী অনুপম শান্তি ও নিরাপত্তা থেকে তারা নিজেদেরকে বঞ্চিত করেছে এবং এক দল দুর্ভাগ্যের সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে ফেলেছে! এখন আমি ভালভাবে বুঝতে পেরেছি যে, যারা হতভাগা তারা নিজেদের ইচ্ছা-অভিলাষের কারণেই হতভাগা হয়ে থাকে। আর জাহান্নাম অযথা সৃষ্টি করা হয়নি। ঐ সব লোক কি আল্লাহ্র কালাম পাকে এ কথা শোনেনি ঃ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوْا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

"মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। অতএব, তোমাদের ভাইদের পরস্পরের মধ্যে সন্ধি ও সমঝোতা স্থাপন কর এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর; এটা করলে তোমরা আল্লাহ্‌র করুণা লাভ করবে।"

আমাকে বলা হয়েছে যে, কিছু লোক জাহেলিয়া যুগের পারস্পরিক মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ হবার দিকে ঝুঁকে পড়েছে, অথচ আঁ-হযরত (সা) শর্তহীনভাবে কাউকে সাহায্য-সহযোগিতা ও সমর্থন প্রদানে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, لا حلف في الاسلام (ইসলামে কোন অন্যায় মিত্রতা ও যূথবন্দী নেই)। জাহিলী যুগে প্রত্যেক প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মিত্র অপর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মিত্রের নিকট এই আশা-ভরসা রাখত যে, সে পারস্পরিক মিত্রতা চুক্তির হক আদায় করবে এবং তা পূরণ করবে– চাই কি তা জুলুমসর্বস্ব হোক, অন্যায় হোক অথবা তাতে আল্লাহ ও রাসূল (সা)-এর অবমাননাই হোক। আমি সেই সব লোককে ভীতি প্রদর্শন করছি যারা আমার এই আহ্বান শুনবে এবং যাদের নিকট এই পত্র পৌঁছুবে। তারা ইসলাম ভিন্ন অন্য কোন আশ্রয় যেন না নেয় এবং আল্লাহ, তাঁর রাসূল (সা) ও মুমিনদের পরিত্যাগ করে অপর কাউকে যেন বন্ধু হিসাবে গ্রহণ না করে। এই বিষয়ে আমি পরিষ্কার ভাষায় খোলাখুলিভাবে এবং বার বার সতর্ক ও সাবধান বাণী উচ্চারণ করছি এবং আমি এ সব লোকের ওপর এমন এক সত্তাকে সাক্ষী মানছি যাঁর কুদরত ও হিসাবের খাতায় সকল প্রাণী অন্তর্ভুক্ত এবং যিনি প্রত্যেক মানুষের জীবন-শিরার চাইতেও নিকটবর্তী।[১]

তিনি তাঁর এক ফৌজী অফিসারকে যুদ্ধে রওয়ানা হবার সময় যে হেদায়াতনামা লিখে দিয়েছিলেন তা থেকেই পরিমাপ করা যায় তাঁর মানসিকতা হুবহু কুরআনের ছাঁচে কিভাবে গড়ে উঠেছিল এবং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাধারা দুনিয়াদার বাদশাহ ও রাজনৈতিক শাসকদের থেকে কি পরিমাণ ভিন্নতর ছিল।

মনসূর ইবনে গালিবের কাছে প্রেরিত একটি ফরমানে তিনি লিখেছেন ঃ

আল্লাহ্‌র বান্দাহ্ আমীরু'ল-মু'মিনীন ওমর (র)-এর এই হিদায়াতনামা মনসূর ইবনে গালিবের নামে যখন আমীরু'ল-মু'মিনীন তাকে দারুল হারব-এর অধিবাসী এবং যাদের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হওয়া গেছে– এমন দেশের অধিবাসীদের মধ্যে যারাই মুকাবিলায় আসবে– যুদ্ধ করার জন্য পাঠিয়েছেন। আমীরু'ল-মু'মিনীন তাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনি সর্বাবস্থায় তাক্ওয়া ইখতিয়ার

১. সীরতে ওমর ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীয (ইব্‌ন 'আবদুল হাকাম), ১০৪-৭ পৃ., আবুল 'ইরফান নদভী অনূদিত।

করবেন। কেননা আল্লাহ্‌র তাক'ওয়াই সর্বোত্তম সামগ্রী এবং প্রকৃত শক্তি। আমীরু'ল-মু'মিনীন তাকে হুকুম দিয়েছেন যে, তিনি নিজ সাথীদের ব্যাপারে দুশমন অপেক্ষা আল্লাহ্‌র অবাধ্যতাকেই বেশি ভয় করবেন। কেননা গুনাহ্ শত্রুর অপকৌশল ও অপপ্রয়াসের চেয়েও মানুষের জন্য অধিকতর ভয়াবহ ও বিপজ্জনক। আমরা শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করি এবং তাদের গুনাহ্‌র কারণেই আমরা তাদের ওপর বিজয়ী হই। যদি এ কথা সত্যি না হয় তাহলে প্রকৃতপক্ষে তাদের সঙ্গে মুকাবিলা করার শক্তি আমাদের নেই। কেননা আমাদের সংখ্যা তাদের সংখ্যার সমান নয়, আমাদের সামানও তাদের সামানের সমকক্ষ নয়। অতএব, আমরা ও তারা যদি পাপের ক্ষেত্রে সমান সমান হয়ে যাই, তাহলে সংখ্যা ও শক্তির দিক দিয়ে তারা আমাদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হবে। মনে রেখ, আমরা যদি তাদের ওপর হক (ন্যায় ও সত্য)-এর জন্য জয়ী হতে না পারি তাহলে কেবল নিজেদের শক্তির সাহায্যে তাদের ওপর কখনো জয়ী হতে পারব না। কারো শত্রুতাকে নিজের গুনাহ্ অপেক্ষা বেশি ভয় করার দরকার নেই। নিজের গুনাহ্‌রাজি সম্পর্কেই চিন্তা করবে। মনে রেখ, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তোমাদের ওপর এমন কিছু মুহাফিজ নিযুক্ত করা হয়েছে যারা ঘরে-বাইরে ও দেশে-বিদেশে তোমাদের কার্যকলাপের ওপর লক্ষ্য রাখেন। অতএব, তাঁদেরকে লজ্জা কর এবং স্বীয় সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর। আল্লাহ্‌র নাফরমানী করে তাদেরকে কষ্ট দিও না– এমন অবস্থায় যখন তোমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় বেরিয়েছ। মনে ক'র না যে, তোমাদের দুশমন তোমাদের তুলনায় অকেজো ও নিষ্কর্মা– তাই যদিও তোমরা গুনাহগার তবু তারা তোমাদের ওপর জয়ী হতে পারবে না। কেননা এমন বহু জাতিগোষ্ঠী রয়েছে যাদের ওপর তাদের গুনাহ্‌র কারণে তাদের থেকেও নিকৃষ্টতর লোকদের চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। অতএব, আল্লাহ্‌র নিকট নিজেদের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা কর যেমন তোমরা নিজেদের শত্রুর বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা করে থাক। আমিও নিজের জন্য এবং তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য কামনা করে থাকি। আমীরু'ল- মু'মিনীন মনসুর ইবনে গালিবকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, সফরে নিজের সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে কোমল ব্যবহার করবে এবং তাদের এমন দূর পথ অতিক্রম করতে বাধ্য করবে না– যা তাদের কষ্টের মাঝে নিক্ষেপ করবে এবং সফরে এমন কোন মনযিলে ছাউনি ফেলতে ইতস্তত করবে না যেখানে তাদের আরাম মিলবে। শত্রুর মুখোমুখি হবে এমন অবস্থায় যে, সফরের ক্লান্তি তোমার সাথীদের শক্তিকে যেন খর্ব করে না দেয়। তোমরা

এমন দুশমনের নিকট যাচ্ছ যারা রয়েছে নিজেদের ঘর-বাড়িতে এবং তাদের সামান ও সওয়ারী বিশ্রামরত। অতএব, তোমরা যদি সফরে নিজেদের সঙ্গে এবং নিজ সওয়ারীর সঙ্গে কোমল ব্যবহার না কর তাহলে তোমাদের শত্রু তোমাদের কাবু করে ফেলতে পারে। আমীরু'ল-মু'মিনীন তাকে হুকুম দিচ্ছেন যে, প্রতি জুম'আয় একদিন এক রাত সফর করবে না, বরং বিশ্রাম নেবে এবং নিজেকে আরাম দেবে। পশুগুলোকেও বিশ্রামের সুযোগ দেবে। নিজেদের সাজ-সামান ও অস্ত্রশস্ত্রগুলোর প্রয়োজনীয় মেরামতের কাজও সেরে নেবে। আমীরু'ল- মু'মিনীন তাকে আরও নির্দেশ দিচ্ছেন যে, যাদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপিত হয়েছে– নিজেদের অবস্থান তাদের থেকে পৃথক রাখবে। নিভৃত নিরাপদ বস্তীগুলোতে তোমরা সঙ্গী-সাথীদের কেউ যেন না যায়। তাদের রাজার মজলিসেও যেন কেউ না যায়। হ্যাঁ, কেবল সেই ব্যক্তিই যেতে পারেন যাঁর স্বীয় আমানত ও দীনদারীর ওপর পূর্ণ আস্থা রয়েছে। ঐ সব বস্তিবাসীর ওপর জুলুম করবে না, তাদেরকে কষ্ট ও যন্ত্রণা দেবে না। হ্যাঁ, শরীয়তের কোন দাবি বা অনিবার্য হক থাকলে অন্য কথা। কেননা তাদের হক ও যিম্মাদারী পূরণ করার ব্যাপারে তুমি ততটুকু দায়ী, যতটুকু দায়ী ঐসব লোক শরীয়তের অধিকার (হক) ও অনিবার্য হক আদায়ের ব্যাপারে। অতএব, যতক্ষণ পর্যন্ত ঐসব লোক নিজেদের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে সুদৃঢ় থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরাও তাদের অধিকার আদায় করে যাবে। সন্ধি ও সমঝোতাকামী লোকের ওপর জুলুম করে যুদ্ধরত দেশের ওপর জয়ী হবার চেষ্টা ক'র না। আল্লাহ্র কসম! তোমাদের তাদের ধন-দৌলত থেকে একটা নির্দিষ্ট অংশ[১] প্রথমেই দেওয়া হয়ে গেছে। অধিক দেওয়ার আর সুযোগ নেই, নেই এর প্রয়োজনও। আমরা তোমাদের সাজ-সামান প্রদানের ক্ষেত্রে কোনরূপ কার্পণ্য করিনি এবং তোমাদের শক্তি-সামর্থ্যে দুর্বলতাও থাকতে দেইনি। তোমাদের জন্য আবশ্যকীয় সাজ-সামান বেশ ভালভাবেই সংগৃহীত হয়েছে। তোমাকে একটি বাছাইকৃত সেনাবাহিনী দেওয়া হয়েছে এবং কাফির ও মুশরিক রাষ্ট্রের প্রতি তোমাদের ব্যস্ত রেখে সমঝোতাকামী রাষ্ট্রের দিক থেকে তোমাদের দৃষ্টি সরিয়ে রাখা হয়েছে। একজন মুজাহিদের জন্য আমি যতটা ব্যবস্থা করতে পারতাম তার থেকে উত্তম ব্যবস্থা তোমাদের জন্য করে দিয়েছি। আমরা তোমাদের শক্তি যোগান দিতে কোন সুযোগই হাতছাড়া করিনি। এবার আল্লাহ্র ওপর ভরসা; তিনিই সর্বশক্তির আধার।

১. জিযয়া, খারাজ ইত্যাদি।

আমীরু'ল-মু'মিনীনের নির্দেশ এই যে, আরব ও অনারবের মধ্যে সেই সব লোকই তাঁর গোয়েন্দা হবার যোগ্য যাদের ইখলাস ও সততার ওপর তিনি আস্থাশীল। কেননা যারা অসৎ ও মিথ্যাবাদী– তাদের প্রদত্ত তথ্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না, যদিও তার কোন কোন কথা সঠিকও হয়। প্রতারক ও ধোঁকাবাজ আসলে তোমাদের জন্য নয়[১], বরং তোমাদের শত্রুপক্ষের গুপ্তচর হিসাবেই কাজ করে থাকে।

একটি সাধারণ চিঠিতে সাম্রাজ্যের কর্মচারীদের লিখছেন :

আম্মা বা'দ! নিশ্চয় এই যিম্মাদারী– যা আল্লাহ্ তা'আলা আমার ওপর সোপর্দ করেছেন– খাবার, পোষাক-পরিচ্ছদ, সওয়ার, বিয়ে–শাদী, ধন-সম্পদ আহরণ প্রভৃতি কাজে নিয়োজিত করতে পারি না। কেননা আল্লাহ তা'আলা আমাকে এই সব বস্তু পূর্বেই এত বেশি পরিমাণে দিয়েছিলেন যা অন্যরা সাধারণত কষ্টেই আহরণ করে। আমি এই যিম্মাদারী খুব-ভয়-ভীতির সঙ্গে কবুল করেছি। এই বাপারে আমার অনুভূতি খুবই সজাগ যে, এ এক বিরাট যিম্মাদারী। এ সম্পর্কে যে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে তাও খুব শক্ত। বিভিন্ন পক্ষ ও দাবিদার কেয়ামতের দিন যখন জমায়েত হবে, তখন তাদের ব্যাপারে আমাকে বড় শক্ত রকমের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

হ্যাঁ, আল্লাহ্ তা'আলা যদি আমাকে ক্ষমা করেন, আমার অন্যায়-বিপ্লব মার্জনা করেন এবং আমার প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন, তাহলে ভিন্ন কথা। আমি তোমাদের ওপর হুকুমতের যে কাজ সোপর্দ করেছি, তোমাদের যে ক্ষমতা ও ইখতিয়ার প্রদান করেছি এবং সেই সাথে খোদাভীতির হিদায়াত প্রদান করছি, নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন, আল্লাহ্র নির্দেশাবলীর আনুগত্য এবং তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বেঁচে থাকার জন্যই আমি তোমাদের তাকীদ করছি। যে সব বিষয় তাঁর ইচ্ছার পরিপন্থী সেগুলোর দিকে লক্ষ্য করার আদৌ কোন প্রয়োজন নেই। তোমাদের দৃষ্টি যেন নিজের ওপর এবং নিজ আমলের ওপর নিবদ্ধ থাকে এবং সে সব বিষয়ের ওপর নিবদ্ধ থাকে, যা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের সান্নিধ্যে নিয়ে পৌছায়। যে আচরণ তোমরা নিজেদের ও জন-সাধারণের মধ্যে করছ তা তোমাদের সামনেই রয়েছে। তোমরা ভালভাবেই জান যে, আল্লাহ্র শাস্তি থেকে নাজাত প্রাপ্তি এগুলোর ওপরই নির্ভর করছে। সেই প্রতিশ্রুত দিনের জন্য তোমরা সেই বস্তুই প্রস্তুত রাখ যা আল্লাহ্র সমীপে

---

১. সীরতে ওমর ইব্ন 'আবদুল 'আযীয–৮৪-৮৭ পৃ.; মওলভী আবুল 'ইরফান নদভী

তোমাদের কাজে আসবে। বিভিন্ন ঘটনার ভেতর তোমরা নিশ্চয়ই এমন শিক্ষাপ্রদ বিষয় লক্ষ্য করে থাকবে যা আমাদের ওয়া'জ-নসীহতের চাইতেও অধিক প্রভাবমণ্ডিত। —ওয়াস্‌সালাম।[১]

ইসলামের প্রচার ও প্রসারের দিকে মনোনিবেশ

হযরত ওমর ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীয কেবল মুসলমানদের ইসলাহ (সংস্কার) এবং রাষ্ট্রে ইসলামী শরীয়ত কার্যকর করাকেই যথেষ্ট মনে করেননি, অমুসলিমদের মধ্যে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ওপরও তিনি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন এবং তিনি তাঁর সত্তা, সততা, নিষ্ঠা ও আমল দ্বারা ইসলামের সঠিক প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সফলকাম হন। বালাযুরী তাঁর 'ফুতুহুল বুলদান' নামক গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

> (হযরত) ওমর ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীয ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গের নিকট সাতটি পত্র লিখেন এবং তাঁদেরকে ইসলামের দা'ওয়াত দেন। তিনি তাঁদেরকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দেন যে, যদি তাঁরা এই আহ্বানে সাড়া দেন তাহলে তাঁদের নিজ নিজ সাম্রাজ্যের ক্ষমতায় বহাল রাখা হবে এবং তাঁদের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য তাই হবে যা একজন মুসলমানের হয়ে থাকে। হযরত ওমর ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীযের চরিত্র ও কার্যকলাপের সুখ্যাতি পূর্বেই সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল। তাই তাঁরা ইসলাম কবুল করেন এবং আরবদের ন্যায় নিজেদের নামও রাখেন।[২]

ইসমা'ঈল ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবি'ল-মুজাহিরকে—যিনি বনী মাখযূমের আযাদকৃত গোলাম ছিলেন, পশ্চিম আফ্রিকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। তিনি সেখানে স্বীয় কার্যকলাপ ও আচার-আচরণের উত্তম প্রকাশ ঘটান এবং বার্বারদের ইসলামের দা'ওয়াত দেন। হযরত ওমর ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীযও সেখানকার লোকদের কাছে একটি পত্র পাঠান এবং তাদের ইসলামের দা'ওয়াত দেন। এই পত্র ইসমা'ঈল প্রকাশ্যে জনসমাবেশে পাঠ করে শোনান। শেষ পর্যন্ত সেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩] স্বীয় খিলাফত লাভের পর তিনি মাউরাউন্নাহর-এর সুলতানদের ইসলামের দা'ওয়াতসম্বলিত পত্র লেখেন। খুরাসানের যেসব লোক ইসলাম কবুল করেছিল, জনকল্যাণার্থে সরাঈখানা নির্মাণ করেছিল তিনি তাদেরকে পুরস্কৃত করেন এবং তাদের ভাতা নির্ধারিত করেন।[৪]

---

১. সীরতে ওমর ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীয– ৯২-৯৩ পৃ.; তরজমায় আবুল্ 'ইরফান সাহেব নদভ।
২. ফুতূহুল-বুলদান, ৪৪৬-৪৭ পৃ.; ৩. ফুতূহুল বুলদান, ৩৩৯ পৃ.; ৪. ঐ, ৪৩২ পৃ.।

হযরত ওমর ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীয (র)-এর সংস্কারের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া

হযরত ওমর ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীয (র)-এর অর্থনৈতিক সংস্কার, পরিকল্পনা ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনাপ্রসূত শর'ঈ ও নৈতিক বাধা-নিষেধের ফলে রাষ্ট্রের আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি এবং নাগরিকদের অসুবিধার সম্মুখীন হবার পরিবর্তে দেশের সর্বত্র সুখ-শান্তি ও প্রাচুর্য ছড়িয়ে পড়ে। অবস্থা এমন হয় যে, যাকাত নেবার মত লোক তখন খুঁজে পাওয়া যেত না। ইয়াহইয়া ইব্‌ন সা'ঈদ বলেন ঃ

> আমাকে ওমর ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীয (র) আফ্রিকায় যাকাত আদায়ের দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। আমি যাকাত আদায় করে এমন লোকের সন্ধান করলাম যাদের মধ্যে (যাকাতের) এই অর্থ বিতরণ করতে পারি। কিন্তু এমন একজন লোকেরও সাক্ষাত পেলাম না যাকে যাকাত দেওয়া যেতে পারে। হযরত ওমর ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীয (র) সবাইকে ধনী বানিয়ে দিয়েছিলেন। শেষ অবধি আমি কিছু গোলাম ক্রয় করে আযাদ করি।[১]

অপর একজন কুরায়শী বলেন ঃ

> ওমর ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীয (র)-এর সংক্ষিপ্ত খিলাফত আমলে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, লোকে বিরাট বিরাট অংকের যাকাতের অর্থ নিয়ে আসত, কিন্তু যারা এ অর্থ পাবার হকদার তাদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যেত না। ফলে বাধ্য হয়ে এ অর্থ ফিরিয়ে দেওয়া হ'ত। মোট কথা, ওমরের যুগে সকল মুসলমান ধনী হয়ে গিয়েছিল। যাকাত নেবার মত কোন লোকই আর অবশিষ্ট ছিল না।[২]

এই প্রকাশ্য ও বাহ্যিক বরকত ছাড়াও (যা বিশুদ্ধ ইসলামী হুকুমতের দ্বিতীয় পর্যায়ের সুফল) একটি বড় বিপ্লব সংঘটিত হয়। আর তা ছিল এই যে, জনসাধারণের মন-মানসিকতা বদলাতে থাকে এবং জাতির মেযাজ ও রুচিতে পরিবর্তন দেখা দেয়। তাঁরই সমসাময়িক একজন বলেন ঃ

> আমরা যখন ওয়ালীদের যামানায় একত্র হতাম তখন ইমারত, তার নির্মাণ-পদ্ধতি ও কাঠামো সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করতাম– এজন্য যে, ওয়ালীদের রুচি ও স্বাদ এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ফলে গোটা রাজ্যে এরই প্রভাব পড়েছিল। সুলায়মান খানাপিনা ও নারী প্রসঙ্গে খুবই আগ্রহী ছিলেন। তার যুগের মজলিস এসব বিষয় নিয়েই সরগরম থাকত। কিন্তু ওমর ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীয (র)-এর যমানায় নফল 'ইবাদত-বন্দেগী, আনুগত্যমূলক

১. সীরতে ওমর ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীয, ১৬৯ পৃ.।

বিষয়াদি এবং যি'ক্‌র-আয'কার পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ও মজলিসী বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। যেখানে চারজন লোক একত্র হ'ত সেখানে একে অপরকে জিজ্ঞাসা করত, রাতে সাধারণত তোমার কি পড়ার অভ্যাস, তুমি কতখানি কুরআন মুখস্থ করেছ, তুমি কুরআন কবে খতম করেছিল, তুমি মাসে কতটি রোযা রাখ ইত্যাদি।[১]

তাঁর জীবনের মূল্যবান সম্পদ

ওমর ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীয (র)-এর জীবনের মূল্যবান সম্পদ এবং তাঁর সমস্ত তৎপরতা ও চেষ্টা-সাধনার প্রাণসত্তা ও ক্রিয়াশীল শক্তি ছিল তাঁর সুদৃঢ় ঈমান, পারলৌকিক জীবনের প্রতি গভীর বিশ্বাস ও জান্নাতের প্রতি ঐকান্তিক আগ্রহ। তিনি যা কিছু করেছেন আল্লাহ্‌র ভয় এবং তাঁর সন্তুষ্টি কামনায়ই করেছেন। এটিই ছিল তাঁর সেই শক্তি যা তাঁর সময়ের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী শাসককেও বিশ্ব-ভূখণ্ডের সর্বাপেক্ষা বিরাট সাম্রাজ্যের প্রেরণা, আকর্ষণ ও উপকরণের মুকাবিলায় দৃঢ়পদ রাখত। কেউ যদি তাঁর এই কর্ম-পদ্ধতির সমালোচনা করত এবং লোভ-লালসা ও পৃথিবীর স্বাদ ভোগের প্রতি তাঁকে উৎসাহিত করত তাহলে তিনি তাকে নিম্নলেখ আয়াতটি পড়ে শোনাতেন ঃ

إِنِّىْ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ -(الانعام ١٥)

আমি যদি আমার প্রতিপালকের নাফরমানী করি, তাহলে আমি ভয় করি যে, মহাদিনের শাস্তি আমার ওপর আপতিত হবে। (৬ ঃ ১৫)

একবার তিনি তাঁর এক খাদেমকে একটি কথা বলেছিলেন এবং এটাই ছিল তাঁর সঠিক পরিচয়। তিনি বলেছিলেন ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে উচ্চাভিলাষী স্বভাব দান করেছেন। যে মর্যাদাই আমি লাভ করেছি তার থেকেও উচ্চতর মর্যাদার আশা করেছি। এখন আমি সেই স্থানে পৌঁছে গেছি যার পর আর কোন পার্থিব মর্যাদা নেই। এখন আমি শুধু জান্নাতের অভিলাষী।[২]

তাঁর রোদন ও আল্লাহ্‌ভীতির অবস্থা ছিল এই যে, এক ব্যক্তিকে তিনি নসীহত করার আবেদন জানালে সে বলেছিল, "আল্লাহ্ যদি তোমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ

---

১. তারীখ-ই-তাবারী, ৯৬ হি.-এর ঘটনাবলী
২. সীরতে ওমর ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীয--৬১ পৃ.।

করেন এবং গোটা দুনিয়া যদি জান্নাতে চলে যায় তাহলে তোমার কি লাভ? আর যদি গোটা দুনিয়া জাহান্নামে চলে যায় এবং আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে জান্নাত নসীব করেন তাহলে তোমাদের কি ক্ষতি?" এতদশ্রবণে তিনি এত রোদন করলেন যে, তাঁর সামনে যে অঙ্গার-ধানিকা রাখা ছিল তা নিভে যায়।[১] ইয়াযীদ ইবন হাওশাব বলেন ঃ মনে হ'ত যে, জান্নাত ও জাহান্নাম কেবল ওমর ইব্ন 'আবদুল 'আযীয (র) ও হাসান বসরী (র)-এর জন্যই পয়দা করা হয়েছে।[২]

ওমর ইব্ন 'আবদুল 'আযীয (র)-এর ওফাত

আল্লাহ্র যদি মঞ্জুর হ'ত এবং ওমর ইব্ন 'আবদুল 'আযীয (র) আরও কিছুকাল খিলাফত চালাবার সুযোগ পেতেন তাহলে গোটা ইসলামী বিশ্বে এক সুদূরপ্রসারী ও স্থায়ী বিপ্লব সাধিত হ'ত এবং মুসলমানদের ইতিহাস আজ অন্যভাবে লেখা হ'ত। কিন্তু বনী উমায়্যা– যাদেরকে এই ব্যক্তিটির জন্য খিলাফতের ক্ষেত্রে তাদের বংশগত স্বার্থে এক বিরাট কুরবানী দিতে হচ্ছিল, এমন কি যারা নিজেদের মজলিসী আলোচনায় হযরত ওমর (র)-এর পরিবারে আত্মীয়তা করার কারণে ছিল মর্মাহত, বেশি দিন পর্যন্ত এই বিপ্লবী মুজাহিদকে বরদাশ্ত করতে পারেনি। তারা খুব সত্বর তাঁর হাত থেকে নিস্তার লাভ করে মুসলমানদের আল্লাহপ্রদত্ত এই নে'মত থেকে মাহরূম করে দেয়। সায়্যিদুনা ওমর ইব্ন 'আবদুল 'আযীয (র) মোটের ওপর দু'বছর পাঁচ মাস খিলাফতের আসনে সমাসীন থেকে হিজরী ১০১ সনে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন।[৩] এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ আছে যে, তাঁর খান্দান তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেছিল।

---

১. সীরতে ওমর ইব্ন 'আবদুল 'আযীয, ১০৮–৯ পৃ.।
২. সিফাতু'স-সাফওয়া–ইবন জওযী, তৃতীয় খণ্ড, ১৫৬ পৃ.।
৩. ইব্ন সা'দ, ইব্ন আছীর, ইবনে জওযী।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় শতাব্দীর সংস্কার প্রচেষ্টা
ও
হ্যরত হাসান বসরী (র)

মুসলিম উম্মাহ্র নৈতিক ও চারিত্রিক অবনতি এবং তাদের ঈমানী দুর্বলতা

হযরত ওমর ইব্ন 'আবদুল 'আযীয (র)-এর ওফাতের পর হুকুমতের ধারা সেভাবেই বইতে থাকে যেভাবে এর পূর্বে বইছিল। জাহেলিয়াত কঠিনভাবে তার পাঞ্জাকে মযবুত করেছিল। তাঁর স্থলাভিষিক্তগণ তাঁর খিলাফতকালীন অপছন্দনীয় বিরতিটুকুর ক্ষতি পূরণ করতে চেষ্টার কোন ত্রুটি করেনি। তারা হুকুমতকে সেই নীতির ওপরই নিয়ে আসেন যে নীতির ওপর তা সুলায়মানের যমানা পর্যন্ত ছিল। অবস্থা এই দাঁড়িয়েছিল যে, ব্যক্তিগত ও মৌরুসী হুকুমতের ধারাবাহিকতা এবং সম্পদ ও সাফল্যের প্রাচুর্যের ফলে মুসলিম সমাজে 'মুনাফিকীর বীজ এবং প্রাচীন যুগের বিত্তশালী ধনিক শ্রেণীর (مترفين سابقين) অতীত দিনের সেই রিপু তাড়িত বিলাসী আচার-আচরণ' পুনরায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছিল। সমাজের মধ্যে বিলাসিতার সাধারণ প্রবণতা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। ঈমান ও সৎ কর্মময় জীবন, যা ছিল এই উম্মাহ্র মূল্যবান পুঁজি, সকল শক্তির গোপন রহস্য ও নবুওয়তের রেখে যাওয়া একটি মূল্যবান উত্তরাধিকার, ক্রমেই বিপন্ন হয়ে পড়ছিল। এই উম্মত নৈতিক ও চারিত্রিক দিক দিয়ে দেউলিয়া ও আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়ে ফোখলায় পরিণত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। মনমরা ও বিমর্ষ ভাব, ঈমানের কমযোরী এবং আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিস্পৃহ ও উদাসীন মানসিকতা শক্তভাবে ডানা বিস্তার করছিল। হুকুমত এই মূল্যবান সম্পদের হেফাজত ও লালন-পালন থেকে কেবল গাফিল ও সম্পর্কহীনই ছিল না, স্বীয় ব্যক্তিগত চরিত্র ও কার্যকলাপ দ্বারা এই নৈতিক ও চারিত্রিক অবনতির সহায়ক ও আহ্বায়কেও পরিণত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) এই উম্মতের মধ্যে ঈমান ও আল্লাহ্র নৈকট্য ও দাসত্বের যে সম্পর্ক সৃষ্টি করেছিলেন (যা কেবল একজন নবীই করতে পারেন) তা অধঃপতনের দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল। এটা ছিল এমন একটি ঘাটতি যা রাষ্ট্রীয় ভূ-খণ্ডের বিস্তৃতি এবং বিরাট থেকে বিরাটতর বিজয় দ্বারাও পূরণ করা যায় না। যা একবার অপসৃত হলে (বিগত জাতি ও সম্প্রদায়-

সমূহের ইতিহাস তার সাক্ষী) অনেক দুঃখ-কষ্ট ও সাধ্য-সাধনার পরই তা ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়।

যদি এই মূল্যবান পুঁজির হেফাজত না করা হ'ত, কালের প্রভাব ও নৈতিক, চারিত্রিক ও রাজনৈতিক উপসর্গসমূহকে স্বাধীনভাবে তার কাজ চালিয়ে যাবার স্বাধীনতা দেওয়া হ'ত তাহলে এই উম্মাহ্ও বিগত উম্মাহ্গুলোর ন্যায় একটি প্রবৃত্তিপূজক, আখিরাতবিস্মৃত ও বস্তুপূজারী জাতিতে পরিণত হ'ত। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর শেষ দিনগুলোতে এই বিপদ সম্পর্কেই সর্বাধিক আতংকিত ছিলেন। ওফাতের কয়েকদিন পূর্বে তিনি তাঁর এক খুতবায় পরিষ্কার ভাষায় বলেছিলেন :

ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى عليكم ان تبسط الدنيا كما بسطت من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم .

আমি তোমাদের দারিদ্র্যের ব্যাপারে ভীত ও শংকিত নই, বরং শংকিত এই ব্যাপারে যে, তোমাদের জন্য পার্থিব প্রাচুর্যের বিস্তৃতি ঘটবে যেরূপ তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের বেলায় ঘটেছিল। ফলে তোমরা দুনিয়া প্রাপ্তির ক্ষেত্রে একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা শুরু করবে। পরিণতিতে তাই তোমাদের ধ্বংস করবে যেরূপ ধ্বংস করেছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের।

তাবি'ঈদের ঈমানী দা'ওয়াত

নবী করীম (সা) তাঁর ভাষায় যে বিপদাশঙ্কার কথা ব্যক্ত করেছিলেন তা সত্বরই প্রতিভাত হয়। কিন্তু এই বিপদের মুকাবিলা করবার জন্য আল্লাহ্র এমন কিছু একনিষ্ঠ ও উৎসর্গিত বান্দা ময়দানে অবতরণ করেন যাঁরা তাঁদের ঈমানী কুওয়তের প্রখরতা, যথাযথ প্রশিক্ষণ, ওয়া'জ-নসীহত এবং দা'ওয়াত ও তালকীন দ্বারা লক্ষ লক্ষ মানুষকে বস্তুবাদের ভয়ঙ্কর তুফানে খড়কুটোর ন্যায় ভেসে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেন এবং ঐ প্লাবনের গতিকেও শ্লথ করে দেন। তাঁরা উম্মতের ঈমানী ও রূহানী ধারাবাহিকতা বহাল রাখেন, যা বংশগত ও রাজনৈতিক ধারাবাহিকতার চেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল। এই ফিতনা মুকাবিলা করবার জন্য শ্রদ্ধেয় ও মহান তাবি'ঈদের একটি নেতৃস্থানীয় জামা'আত সদাই প্রস্তুত ছিল যাঁদের মধ্যে সা'ঈদ ইবন জুবায়র (র), মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র), শা'বী (র) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হাসান বসরী (র)

কিন্তু এই বিপদের কট্টর প্রতিপক্ষ, প্রতিদ্বন্দ্বী ও ঈমানী দা'ওয়াতের প্রকৃত পতাকাবাহী ছিলেন হযরত হাসান বসরী (র) যিনি ২১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁর পিতা য়াসার ছিলেন মশহূর সাহাবী হযরত যায়দ ইব্ন হারিছা (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম এবং তিনি নিজে উম্মু'ল-মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা (র)-এর ঘরে প্রতিপালিত হয়ে ছিলেন।

হাসান বসরী (র)-এর ব্যক্তিত্ব ও দা'ঈ হিসাবে তাঁর যোগ্যতা

হযরত হাসান বসরী (র)-এর মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা সেই সব যোগ্যতারই সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন যা সেই যুগের বিশেষ অবস্থায় দীন ও ধর্মের মর্যাদা বৃদ্ধি এবং দীনী-দা'ওয়াতকে কার্যকর করার জন্য খুবই দরকারী ছিল। তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে সামগ্রিকতা, হৃদয়গ্রাহিতা ও পরিপূর্ণতার সমাবেশ ঘটেছিল। তিনি দীনের ক্ষেত্রে পূর্ণ পাণ্ডিত্য ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন, ছিলেন উন্নত মার্গের ও উচ্চস্তরের মুফাসসির ও নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিছ। তাঁকে বাদ দিয়ে সে যুগে ইজতিহাদ বা সংস্কার কার্য আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব হ'ত না। সাহাবায়ে কিরাম (র)-এর উল্লেখযোগ্য যমানা তিনি পেয়েছিলেন এবং সে যমানাকে খুব ভালভাবেই অধ্যয়ন করেছিলেন। মুসলমানদের জীবনে ও ইসলামী সমাজে যে সব পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছিল তিনি সে সবের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। তিনি তাঁর যুগের সমাজ ও সমাজের প্রতিটি শ্রেণীর জীবন-যিন্দেগী সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত ছিলেন। সমাজের বৈশিষ্ট্যাবলী ও তার রোগব্যাধি সম্পর্কেও একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের ন্যায় তিনি ওয়াকিফহাল ছিলেন। তিনি বাগ্মী, বাকপটু ও মিষ্টভাষী ছিলেন। যখন কথা বলতেন তখন তাঁর মুখ থেকে যেন ফুল ঝরে পড়ত। যখন তিনি আখিরাতের বর্ণনা দিতেন কিংবা সাহাবায়ে কিরাম (র)-এর যুগের ছবি অংকন করতেন তখন চোখ দিয়ে তাঁর অশ্রুর নহর বইত। হাজ্জাজ ইবন ইউসুফের ন্যায় ভাষা ও বাকচাতুর্যে দক্ষ এমন একজন ব্যক্তি সে যুগে আর জন্মাননি। লোকেরা হাসান বসরী ও হাজ্জাজ ইবন ইউসুফকে বাকপটুতার দিক দিয়ে সমপর্যায়ের মনে করত। 'আরবী অভিধান ও ব্যাকরণশাস্ত্রের বিখ্যাত ইমাম আবূ 'আম্র ইব্ন আল-'আলা বলেন, "আমি হাসান বসরী ও হাজ্জাজ ইবন ইউসুফের চাইতে বাকপটু অন্য কোন লোক দেখিনি এবং হাসান হাজ্জাজের চাইতেও বেশি বাকপটু ছিলেন।"[১] জ্ঞানের বিস্তৃতির ক্ষেত্রে তাঁর যে অবস্থা ছিল সে সম্পর্কে রবী' ইবন আনাস বলেন, "আমি দশ বছর যাবৎ হাসান বসরীর নিকট আসা-যাওয়া করেছি এবং প্রতিদিনই তাঁর কাছ থেকে এমন কিছু কথা শুনেছি, যা ইতোপূর্বে আর কখনো শুনিনি।"[২]

১. ঐ, ৭ম খণ্ড, ৪৪ পৃ.; ২. দাইরাতু'ল-মা'আরিফ, বুস্তানীকৃত, ৭ম খণ্ড; ৪৪ পৃ.।

জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর যে ব্যাপকতা ছিল সে সম্পর্কে জনৈক বিজ্ঞজনের অভিমত লক্ষ্য করুন ঃ

كان من دراری النجوم علما وتقوى وزهدا وورا عا وعفة ورقة وفقها ومعرفة يجمع مجلسه ضروبا من الناس هذا ياخذ عنه الحديث، وهذا يلقن منه التاويل وهذا يسمع منه الحلال والحرام، وهذا يحكى له الفتيا وهذا يتعلم الحكم والقضا وهذا يسمع الوعظ وهو فى جميع ذلك كالبحر العجاج تدفقا وكالسراج الوهاج تالفا ولا تنس مواقفه ومشاهده فى الامر بالمعروف والنهى عن المنكر عند الامراء واشباه الامراء بالكلام الفصل واللفظ الجزل .

তিনি (হাসান বসরী) স্বীয় 'ইল্‌ম ও তাক্‌ওয়া, যুহ্‌দ ও পরহেযগারী, পরমুখাপেক্ষীহীনতা ও উন্নত মনোবল, সৌন্দর্য ও পবিত্রতা, অনুধাবন শক্তি ও মা'রিফতের দিক দিয়ে একটি উজ্জ্বল জোতিষ্ক ছিলেন। তাঁর মজলিসে বিভিন্ন কিসিমের লোক জমায়েত হ'ত এবং তাঁর উপদেশ থেকে সকলেই উপকৃত হ'ত। একই মজলিসে কেউ তাঁর কাছ থেকে হাদীছের জ্ঞান হাসিল করছেন, কেউ তাফসীরশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করছেন, কেউ 'ইল্‌মে ফিক্‌'হের দর্‌স গ্রহণ করছেন, কেউ ফতওয়া জিজ্ঞাসা করছেন এবং বিচার-আচারের নিয়ম-কানূন শিখছেন, কেউ ওয়া'জ শুনছেন। তিনি ছিলেন যেন এক লোনা সমুদ্র যাকে উত্তাল তরঙ্গ সর্বদা আন্দোলিত করছে। তিনি ছিলেন এক উজ্জ্বল প্রদীপ, যা মজলিসকে আলোকিত করছে। 'আমরু বি'ল-মা'রূফ ওয়া নাহী 'আনি'ল-মুনকার' তথা সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধের ক্ষেত্রে তাঁর কার্যধারা, বাকপটুতা ও শাসকমণ্ডলী ও আমীর-উমারা সমীপে তাঁর মর্যাদাপূর্ণ ভাষায় সত্য প্রকাশের ঘটনাবলী ভুলবার মত নয়।[১]

তিনি শুধু বাগ্মিতা ও কামালিয়াতের অধিকারীই ছিলেন না, হৃদয়বান ও সাহিব-ই-হালও ছিলেন। তিনি যা বলতেন তা তাঁর অন্তরের গভীরতম প্রদেশ থেকেই নির্গত হ'ত। ফলে তা অন্যের দিলের ওপর গভীর প্রভাব ফেলত। যে সময় তিনি বক্তৃতা করতেন তখন শ্রোতার পা থেকে মাথা পর্যন্ত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হ'ত। এরই ফলে বসরা থেকে কুফা পর্যন্ত বড় বড় 'আলিম ও শিক্ষক থাকা সত্ত্বেও তাঁর দরস কক্ষ চুম্বকের ন্যায় মানুষকে আকর্ষণ করত। তাঁর ওয়া'জ ও বর্ণনাসমূহের বড় বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, সেগুলোর সঙ্গে 'কালামে নবুওয়ত'-এর গভীর মিল ছিল।

---

১. আবু হায়্যান তাওহীদী এটি ছাবিত ইবন কুরা থেকে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম গাযালী 'ইহ্‌য়াউ'ল-'উলূম' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

> সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, হাসান বসরীর বাচনভঙ্গি আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স- সালামের বাচন-ভঙ্গির সাথে অত্যন্ত সামঞ্জস্যশীল ছিল। এরূপ সামঞ্জস্য অন্য কোন ওয়ায়েজের বেলায় দেখা যায়নি। ঠিক একইভাবে তাঁর জীবন-যাপন পদ্ধতিও সাহাবায়ে কিরামের জীবন-যাপন পদ্ধতির সাথে ছিল সাদৃশ্যপূর্ণ।[১]

তাঁর এসব বৈশিষ্ট্য ও ব্যাপকতার প্রভাব এমনই ছিল যে, লোকেরা তাঁর ব্যক্তিত্ব দ্বারা ছিল অভিভূত এবং তাঁকে উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের মধ্যে গণ্য করা হ'ত। তৃতীয় শতাব্দীর একজন অমুসলিম দার্শনিক (ছাবিত ইবন কুরাহ্)-এর উক্তি হচ্ছে, উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার যে কয়জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের ওপর অন্যান্য্য উম্মার ঈর্ষা করা উচিত, তাঁদের মধ্যে হাসান বসরী (র) অন্যতম। মক্কা-মু'আজ্জমা সব সময়ই ইসলামী বিশ্বের কেন্দ্র হিসাবে পরিগণিত হয়ে আসছে। সেখানে সকল শাস্ত্রের জ্ঞানী ব্যক্তিদের সমাগম ঘটে, কিন্তু মক্কার অধিবাসীরাও হাসান বসরীর জ্ঞানবত্তা দৃষ্টে ও তাঁর বক্তৃতা শ্রবণে বিস্ময়াভিভূত হয়ে বলেছে ঃ আমরা তাঁর মত কোন লোক আর দেখিনি।[২]

হাসান বসরী (র)-এর ওয়া'জ

হাসান বসরী (র)-এর ওয়া'জ ছিল সাহাবীদের ওয়া'জের ন্যায় সহজ সরল ও আকর্ষণীয়। তাতে দুনিয়ার অনিত্যতা, যিন্দেগীর অবিশ্বস্ততা, আখিরাতের গুরুত্ব, ঈমান ও 'আমলের তালকীন, তাক'ওয়া ও খোদাভীতির তা'লীম এবং নফসের ফেরেববাজির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থাকত। যে যুগে মানুষের ওপর বস্তুবাদ ও গাফিলতির শক্ত হামলা চলছিল এবং জনসাধারণ, এমন কি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিও ধন-দৌলত, সুখ-সম্ভোগ ও ভোগ-বিলাসিতার বন্যায় খড়কুটোর মত ভেসে যাচ্ছিল, সে যুগে এরূপ ওয়া'জ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দরকারও ছিল। যেহেতু তিনি সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর যুগ নিজ চোখে দেখেছিলেন, তাঁদের সাহচর্যের ফয়েয লাভে ধন্য হয়েছিলেন, এরপর উমায়্যা হুকুমতের যৌবন দেখছিলেন, তাই তাঁর ওয়া'জে অধিকাংশ সময় বিরাট জোশ ও দরদের সঙ্গে সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর ঈমানী অবস্থা এবং তাঁদের আমল ও আখলাকের বৈশিষ্ট্যগুলির বর্ণনা পাওয়া যেত। যখন তিনি তাঁর দেখা দু'টো যুগের তুলনা করতেন এবং সেই মহান

১. ইহ্‌য়া-ই-'উলুমুদ্দীন—১ম খণ্ড, ১৬৮ পৃ.
২. আল-হাসান বসরী, ইব্‌ন জওযীকৃত, ৬৯-৭০ পৃ.

বিপ্লবের আলোচনা করতেন যা দেখতে দেখতে তাঁদের ঈমান ও আমল, আখলাক ও 'আদতের মধ্যে ফুটে উঠেছিল, তখন তাঁর দরদী জোশ খুব বেড়ে যেত এবং তাঁর বর্ণনা অব্যর্থ তীরে পরিণত হ'ত। তাঁর ওয়া'জসমূহ শুধু হৃদয়গ্রাহী ও চিত্তাকর্ষক ছিল না, বরং তা ছিল সে যুগের বাকপটুতা, অলঙ্কারিক ভাষা ও উন্নতমানের সাহিত্যেরও নমুনা। একবার তিনি সে যুগের অধিবাসীদের অবস্থার পর্যালোচনা ও সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর আদর্শ চরিত্রের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন :

هيهات هيهات اهلك الناس الامانى قول بلاعمل ، ومعرفة بغير صبر، وايمان بلايقين، مالى ارى رجالاً ولا ارى عقولا واسمع حسيسًا، ولا ارى انيسًا، دخل القوم والله ثم خرجوا، وعرفوا ثم انكروا وحرموا ثم استحلوا، انما دين احدكم لعقة على لسانه اذا سئل أمؤمن انت بيوم الحساب؟ قال نعم! كذب ومالك يوم الدين، ان من اخلاق المؤمنين قوة فى دين وايماناً فى يقين وعلماً فى حلم وحلم بعلم وكيسًا فى رفق وتحملا فى فاقة وقصداً فى غنى وشفقة فى نفقة ورحمة لمجهود، وعطاءا فى الحقوق، وانصافا فى استقامة لا يحيف على من يبغض ولا يأثم فى مساعدة من يحب ولا يمز ولا يغمز ولا يلمز ولا يلغو ولا يلهو ولا يلعب، ولا يمشي بالنميمة ولا يتبع ما ليس له ولا يجحد الحق الذى عليه، ويتجاوز فى العذر ولا يشمت بالفجيعة ان حلت بغيره ولا يسر بالمعصية اذا نزلت بسواه، المؤمن فى الصلوة خاشع والى الركوع مسارع قوله شفاء وصبره تقى، وسكوته فكرة ونظرته عبرة يخالط العلماء ليعلم ويسكت بينهم ليسلم ويتكلم ليغنم ان احسن استبشر وان اساء استغفر، وان عتب استعتب، وان سفه عليه حلم، وان ظلم صبر وان جير عليه عدل ولا يتعوذ بغير الله ولا يستعين الا بالله قور فى الملاء، شكور فى الخلاء، قانع بالرزق، حامد على الرخاء، صابر على البلاء ان جلس مع الغافلين كتب من الذاكرين وان جلس مع الذاكرين كتب من المستغفرين، هكذا كان اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم، الاول فالاول حتى لحقوا بالله عز وجل وهكذا كان المسلمون من سلفكم الصالح وانما غيربكم لما غيرتم "اِنَّ اللّٰهَ لَايُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ وَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْءً فَلَا مَرَدَّ لَه وَمَا لَهُمْ مِنْ دُوْنِه مِنْ وَّالٍ .

হায় আফসোস! আশা-ভরসা ও কল্পনাবিলাসী পরিকল্পনা মানুষকে ধ্বংস ও বরবাদ করে দিয়েছে। মুখে কথার ফুলঝুরি আছে, কিন্তু কাজের কোন উদ্যোগ নেই। 'ইল্ম ও মা'রিফত আছে, কিন্তু (তার দাবি পূরণ করবার জন্য) ধৈর্য নেই। ঈমান আছে, কিন্তু য়াকীন নেই। মানুষের অবয়ব চোখে পড়ে, কিন্তু তাতে ঘিলু নেই। দর্শনার্থীদের ভিড় আছে, হৈ-হট্টগোলও আছে, কিন্তু এমন

একজন আল্লাহ্‌র বান্দা চোখে পড়ে না, যার অন্তর আছে, মন যার প্রতি আকৃষ্ট হয়। লোকজন আসে, অতঃপর চলে যায়। তারা সব কিছু জেনেছে, অতঃপর তা বেমালুম ভুলে গেছে। প্রথমে তারা একটি বস্তুকে হারাম করেছে, অতঃপর তাকেই আবার হালাল করে নিয়েছে। তোমাদের ধর্ম কি? মুখের একটি মিষ্টি শব্দোচ্চারণ। যদি প্রশ্ন করা হয়, "হিসাব-নিকাশের দিনে তুমি বিশ্বাসী?" জওয়াব পাওয়া যায়, "হাঁ!" প্রতিফল দিবসের মালিকের কসম! সে মিথ্যা বলেছে। মু'মিনের চরিত্র ও শান এই যে, সে কর্মফল দিবসে বিশ্বাস করবে এবং ঈমান ও ইয়াকীনের অধিকারী হবে। তার 'ইল্‌ম-এর সাথে হি'ল্‌ম (ধৈর্য) এবং হি'ল্‌ম-এর সাথে 'ইল্‌ম থাকবে। সে বুদ্ধিমান হবে, কিন্তু হবে নম্র প্রকৃতির এবং উত্তম ভূষণ ও সংযম তার দারিদ্র্য ও অভাব-অনটনকে ঢেকে দেবে। ধনী হয়ে গেলেও মধ্যম পন্থা সে কখনো পরিত্যাগ করবে না। ব্যয়ের ক্ষেত্রে সে মিতাচারী, বিপর্যস্ত মানুষের ক্ষেত্রে দয়ালু ও দানশীল, অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে প্রসারিত হস্ত ও উন্মুক্ত মন এবং ন্যায় ও সুবিচারের ক্ষেত্রে হবে জোর তৎপর ও অনড়। কারো প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি হলেও তার প্রতিকূলে বাড়াবাড়ি করে না। ভালবাসার ক্ষেত্রেও কারো সাথে শরীয়তের সীমারেখা অতিক্রম করে না। কারো ছিদ্রান্বেষণ করে না, কাউকে তিরস্কার কিংবা ভর্ৎসনা করে না। অর্থহীন বিষয়ের সঙ্গে যেমন তার সম্পর্ক থাকে না, তেমনি ক্রীড়াকৌতুক ও হাসি-তামাশার সঙ্গেও সে কোন সম্বন্ধ রাখে না। সে চোগলখুরী করে না, যে বিষয়ে তার অধিকার নেই, তার পেছনে ধাবিত হয় না, যা তার ওপরে ওয়াজিব– সে ব্যাপারে অস্বীকৃতি জানায় না এবং ওযরখাহীর বেলায় সীমা অতিক্রম করে না। সে অপরের দুঃখ-কষ্টে উৎফুল্ল হয় না এবং অপরের অন্যায়কেও সমর্থন করে না। তার সালাতে ভয়-ভক্তিমিশ্রিত বিনয় থাকে। সে 'আলিম সমাজের সাহচর্য অবলম্বন করে। 'ইল্‌ম-এর খাতিরে সে চুপ থাকে, শুধু গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকা এবং সওয়াব ও ফায়দা হাসিলের জন্য কথা বলে। পুণ্য লাভ ঘটলে সে খুশি ও আনন্দে উদ্বেলিত হয়, আর ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলে আল্লাহ্‌র দরবারে তওবা-ইস্তিগফার (অনুশোচনার সঙ্গে ক্ষমা প্রার্থনা) করে। কারো তরফ থেকে দিলে চোট পেলে ক্ষমার মধ্যেই তার উপশম খোঁজে। কেউ তার সঙ্গে মূর্খজনোচিত আচরণ করলে সে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও বুদ্ধিমত্তার আশ্রয় গ্রহণ করে। জুলুম করলে সে সবর করে, কেউ তার অধিকারের ক্ষেত্রে বেইনসাফী করলে সে ইনসাফের দণ্ড হস্তচ্যুত হতে দেয় না। আল্লাহ ভিন্ন কারো আশ্রয় ভিক্ষা করতে সে রাযী হয়

না এবং অন্য কারোর নিকট সে সাহায্যপ্রার্থীও হয় না। জনসমাবেশে সে মর্যাদাবান এবং নির্জনে শোকর-গুযার। আল্লাহ্প্রদত্ত রিযক˙ লাভে সে তৃপ্ত, সুখ-শান্তি ও আরাম-আয়েশের মধ্যে কৃতজ্ঞ, সংকট ও পরীক্ষার মুহূর্তে ধৈর্যশীল, গাফিলদের মধ্যে যি˙করকারী এবং যি˙করকারীদের মধ্যে ইস্তিগফারে লিপ্ত। এসবই ছিল আসহাব-ই-রাসূল (সা)-এর শান। নিজ দর্জা ও মর্তবা মাফিক যতদিন তাঁরা দুনিয়াতে ছিলেন এইরূপ শান-শওকতের সাথেই ছিলেন এবং যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন– এইরূপ শান-শওকতের সাথেই বিদায় নিয়েছেন। মুসলমনেরা! তোমাদের পূর্বপুরুষগণের এটাই ছিল নমুনা। যখন তোমরা আল্লাহ্র সঙ্গে তাঁর কায়-কারবার বদলে দিলে তখন আল্লাহ পাকও তোমাদের সঙ্গে তাঁর কায়-কারবার বদলে দিলেন।

"আল্লাহ্ পাক কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করে। আর কোন সম্প্রদায়ের সম্পর্কে যদি আল্লাহ্ অশুভ কিছু ইচ্ছা করেন তবে তা রদ করবার কেউ নেই এবং তিনি ছাড়া ওদের কোন অভিভাবক নেই।"

অপর এক ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরাম (রা)-কে স্মরণ করতে যেয়ে এবং সূরা আল-ফুরক˙ান-এর সেই আয়াতসমূহের তাফসীর বর্ণনা করতে গিয়ে, যেখানে মু'মিনদের গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি বলেন ঃ

ان المؤمنين لما جائتهم هذه الدعوة من اللّه صدقوا بها وافضى يقينها الى قلوبهم وابدانهم وابصارهم، كنت واللّه اذا رائيتهم رائيت قوما كانهم رأى عين، واللّه ما كانوا باهل جدل ولا باطل ولكنهم جاءهم امر عن اللّه فصدقوا به فنعتهم اللّه فى القران احسن نعت قال "وَعِبَادُ الرَّحْمنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلى الاَرْضِ هَوْنًا" – والهون فى كلام العرب اللين والسكينة والوقار "وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلاَمًا" حلماء لا يجهلون وان جهل عليهم حلموا يصاحبون عباد اللّه نهارهم بما يسمعون ثم ذكر ليلهم خير ليل فقال "وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا" ينتصبون للّه على اقدامهم ويفترشون وجوههم سجداً لربهم تجرى دموعهم على خدودهم فرقا من ربهم لامر ماسهروا ليلهم ولامر ما خشعوا نهارهم قال "اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ – اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا"– وكل شئ يصيب ابن ادم ثم يزول عنه فليس بغرام، انما الغرام اللازم له، ما دامت السموت والارض – صدق القوم واللّه الذى لا اله الا هو فعملوا وانتم تتمنون، فاياكم وهذه الامانى رحمكم اللّه فان اللّه لم يعط عبدا بامنيته شيئا فى الدنيا والاخرة .

১. আল-হাসান বসরী––ইব্ন জওযীকৃত, ৬৯-০ পৃ.

(প্রথম যুগের) মু'মিনদের কানে যখনই আল্লাহ্‌র এই আহ্বান গিয়ে পৌঁছুল তখনই তাঁরা এর সত্যতার স্বীকৃতি জানালেন এবং এই ডাকে সাড়া দিলেন। তাঁদের অন্তর-মানস, তাঁদের দেহ ও চক্ষু আল্লাহ্‌র 'আজমত তথা শ্রেষ্ঠত্ব ও বিরাটত্ব এবং আল্লাহ্‌র পরাক্রমের সামনে ঝুঁকে পড়ল। আল্লাহ্‌র কসম! আমি যখন তাঁদের দেখতাম– তখন পরিষ্কার মনে হ'ত যে, দীনের হাকীকত ও অদৃশ্য জগতের বিষয়াদি সব যেন তাঁদের চোখে দেখা। অন্যায় তর্ক-বিতর্ক ও অনর্থক কথাবার্তার সঙ্গে তাঁদের কোনরূপ সম্পর্ক ছিল না। তাঁদের নিকটে তো আল্লাহ্‌র তরফ থেকে কেবল একটি জিনিসই পৌঁছেছিল এবং তাঁরা তা মেনে নিয়েছিলেন। আল্লাহ্ পাক কুরআন মজীদে তাঁদের সর্বোত্তম চরিত্র চিত্রণ করেছেন এবং প্রশংসা-গীতি গেয়েছেন। আল্লাহ্‌পাক বলেন ঃ

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا .

"আর 'রাহ্'মানের' বান্দাহ তারাই যারা যমীনের বুকে বিনম্রভাবে চলাফেরা করে।" 'আয়াতে "هونا" শব্দটি এসেছে। هون শব্দের অর্থ 'আরবী ভাষায়– নম্রতা, কোমলতা, শান্তি, তৃপ্তি ও মর্যাদা। অতঃপর আল্লাহ্‌পাক বলেন ঃ

وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلَامًا .

"আর জাহেল লোকেরা যখন তাদেরকে সম্বোধন করে তখন তারা বলে, শান্তি, শান্তি!" অর্থাৎ তাঁরা সংযমী ও ধৈর্যশীল, তাঁরা মূর্খতার কাজ থেকে দূরে সরে থাকে। আর কেউ যদি তাঁদের সাথে মূর্খতার আচরণও করে তবু তাঁদের ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও মর্যাদায় কোন ফারাক আসে না। এসব লোক আল্লাহ্‌র বান্দাদের সঙ্গে কাজের কথা শোনবার জন্য গোটা দিন কাটিয়ে দিত আর রাত কাটাত আল্লাহর 'ইবাদত-বন্দেগী তে। স্বয়ং আল্লাহ্ পাক এঁদের প্রশংসা করে বলছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا .

"আর সে সব লোক স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে সিজদাবনত ও দণ্ডায়মান অবস্থায় রাত্রি অতিবাহিত করে।" আসলেই এসব লোক স্বীয় পদযুগলের ওপর দাঁড়িয়ে যায়, মুখমণ্ডল মাটির ওপর স্থাপন করে এবং সিজদায় পতিত হয়। তাঁদের গণ্ডদেশে অশ্রুর ধারা প্রবাহিত হয়। আল্লাহ্‌র ভয় তাঁদের আঁখি-যুগলকে অশ্রুভারাক্রান্ত করে রাখে। নিশ্চয় তাঁদের সামনে এমন কিছু ছিল যার জন্য তাঁরা বিনিদ্র রাত্রি যাপন করতেন। এমন কিছু ছিল যার কারণে তাঁরা দিনের বেলা ভয়-ভীতির মাঝে কাটাতেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ - اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا .

"আর সেই সব লোক যারা বলে ঃ হে আমাদের রব! আমাদের থেকে জাহান্নামের আযাব দূরীভূত করা; নিশ্চয় তাঁর আযাব বিরাট জরিমানাস্বরূপ এবং জানের জন্য্য বিপদ।" আয়াতের মধ্যে غرام শব্দ এসেছে। যে বিপদ-মুসীবত মানুষের সামনে এসে দেখা দেয়– আবার চলেও যায় তাকে আরবের লোকেরা غرام বলে না। غرام হচ্ছে এমন দুঃসহ বিপদ যা কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের মাথার ওপর ঝুলে থাকে। সেই আল্লাহ্র কসম! যিনি ভিন্ন আর কোন ইলাহ নেই, এই আল্লাহ্র বান্দারা (স্বীয় উক্তি ও ধর্মে) সত্যবাদিতা ও দৃঢ়তার প্রমাণ দিয়েছেন। তাঁরা যা মুখে বলেছেন তার ওপর আমল করেছেন। কিন্তু আফসোস! তোমরা কেবল কামনা-বাসনার মায়া-মরীচিকার পেছনে দৌড়াচ্ছ। লোক সকল! তোমরা ফাঁপা আশা থেকে বিরত হও! তা এইজন্য যে, আল্লাহ্ কখনো কোন বান্দাকে কেবল তার আশা করার কারণে দুনিয়া ও আখিরাতের কোন বস্তু দান করেন না।[১]

তিনি এই বক্তৃতার শেষে বললেন (এবং অধিকাংশ ওয়া'জের পর বলতেন) ঃ এই ওয়া'জ ও নসীহতের ভেতরে তো কোন জিনিসের কমতি নেই, তবে দিলের মধ্যেও প্রাণের স্পন্দন থাকতে হবে।

তাঁর সত্যকথন ও নির্ভীকতা

হযরত হাসান বসরী (র) কেবল কামালিয়াত, বাগ্মিতা, ভাষার অলঙ্কার, গভীর জ্ঞান, পাণ্ডিত্য ও বক্তৃতায়ই নয়, বরং সত্য কথনে, নির্ভীকতায়, নৈতিক সাহসে ও বীরত্বেও আপন যুগে বিশিষ্ট ছিলেন। তিনি তৎকালীন খলীফা ইয়াযীদ ইবন 'আবদুল মালিক-এর প্রকাশ্যে ও খোলাখুলিভাবে সমালোচনা করেন। একবার তিনি দরস প্রদানকালে এক ব্যক্তি কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হন, "এই যমানার 'ফিতনা' (ইয়াযীদ ইবনু'ল-মুহাল্লাব ও ইবনু'ল-আশ'আছ-এর উপদ্রব) সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?" তিনি বললেন, "তাদের সঙ্গে থেকো না, তাদেরকে সহযোগিতা ক'র না।" একজন সিরীয় তখন বলল, "আর আমীরু'ল-মুমিনীন-এর সঙ্গে?" এতদশ্রবণে তিনি ভীষণ ক্রোধান্বিত হন এবং হস্ত উত্তোলন করে বললেন, "হাঁ, আমীরু'ল-মু'মিনীন-এর সঙ্গেও নয়; হাঁ, আমীরু'ল-মু'মিনীন-এর সঙ্গেও নয়।"[২] হাজ্জাজের তলোয়ার ও নৃশংসতার কাহিনী সবার জানা। কিন্তু হাসান বসরী (র) তাঁর যুগেও সত্য প্রকাশে বিরত হননি।

১. কি'য়ামুল্লায়ল, ১২ পৃ. মুহাদ্দিছ ইব্ন নসর মুরূযী, –ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল-এর ছাত্র।
২. তাবাকাত ইব্ন সা'দ, ৭ম খণ্ড–১১৮-১৯।

ইসলামী হুকুমতে নিফাক'-এর চিহ্ন ও মুনাফিক

ইসলামের রাজনৈতিক ও বস্তুগত প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা লাভের পর মুসলিম রাষ্ট্রে এমন একটি শ্রেণীর উদ্ভব হয়, যারা ইসলাম কবুল করেছিল বটে, কিন্তু তাদের আচার-আচরণ তথা আমল-আখলাক, পারস্পরিক লেনদেনের ক্ষেত্র ও তাদের মন-মগজ পুরোপুরি ইসলাম দ্বারা প্রভাবিত হয়নি। তাদের ভেতর হাকীকী ঈমান এবং ادخلوا فى السلم كافة (ইসলামে তোমরা পরিপূর্ণরূপে প্রবেশ কর)–এর প্রতিফলন ঘটেনি। খোদ মুসলমানদের নতুন বংশধরদের মধ্যেও (যাদের পুরোপুরি ইসলামী তরবিয়ত হয়নি) এমন লোক ছিল যারা জাহেলী প্রভাব থেকে মুক্ত ও পবিত্র হতে পারেনি এবং ইসলামের সঙ্গে তাদের গভীর সম্পর্কও সৃষ্টি হয়নি। তাদের জীবনে আহকামে ইলাহী তথা ঐশী বিধান ও নির্দেশাবলীর বাস্তবায়ন ঘটেনি এবং আনুগত্য স্বীকারের স্বভাব-প্রকৃতিও সৃষ্টি হয়নি, অথচ এদেরই একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে জড়িত ও সম্পর্কিত হয়ে পড়েছিল।

আমীর-উমারা ও ধনিক শ্রেণীর ভেতরও এমন লোক ছিল যাদের মধ্যে প্রাচীন মুনাফিকদের আমল-আখলাক ও তাদের মেযাজ-মস্তিষ্কের প্রভাব পরিলক্ষিত হত। সত্যি কথা বলতে গেলে, রাজদরবারে, হুকুমতে, নেতৃস্থানীয় জায়গাগুলোতে, ফৌজে, হাটে-বাজারে এরাই প্রাধান্য লাভ করেছিল এবং এদের জীবন যাপন পদ্ধতি সামাজিক ফ্যাশন হিসাবেও পরিগণিত হতে শুরু করেছিল।

কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিমত এই যে, নিফাকে'র চিহ্ন একটি বিশেষ সময়ের ব্যাপার এবং এটি এমন একটি রোগ যা রিসালাতের যুগে মদীনা তায়্যিবার একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে সৃষ্টি হয়েছিল। ইসলামের সুস্পষ্ট বিজয় এবং কুফরী শক্তির পরাজয়ের পর তা খতম হয়ে যায়। দুই বিপরীত শক্তির পরস্পর দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের পর কেবল ইসলামই অবশিষ্ট থাকে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই এমন কোন গ্রুপের জন্ম নেবার সুযোগ বাকি থাকেনি, যা ঐ দুই শক্তির মাঝখানে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকবে। কাজে কাজেই শেষ পর্যন্ত বাকি থাকে শুধু প্রকাশ্য কুফর অথবা প্রকাশ্য ইসলাম। তাফসীর ও তারীখ গ্রন্থগুলোতে এ মতের সমর্থন মেলে।

মূলত ঐ সমস্ত ব্যক্তি একটি বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে গিয়েছিলেন। আর তা হ'ল 'নিফাক'' (কপটতা) মানবীয় ফিতরতের একটি দুর্বলতা ও ব্যাধি যা মানবীয় প্রকৃতির মতই সাধারণ ও পুরাতন। এই রোগ সৃষ্টি হবার জন্য এটা একেবারেই জরুরী নয় যে, ইসলাম ও কুফর– এই দুই শক্তি সব সময় বহাল থাকবে এবং তাদের মধ্যে মুকাবিলাও অব্যাহত থাকবে, বরং নির্ভেজাল ও খালিস ইসলামের

বিজয় ও প্রাধান্যকালেও এমন একটি দল সৃষ্টি হয়ে যায় যারা যে কোন কারণেই হোক, ইসলামকে হযম করতে পারে না এবং তা তাদের মন-মগজে আসন গাড়তে পারে না। কিন্তু তাদের মধ্যে এতখানি নৈতিক সাহসও জন্মায় না যে, তারা এর অস্বীকৃতি এবং এর সাথে তাদের সম্পর্কহীনতার কথা প্রকাশ করবে অথবা ব্যক্তিস্বার্থও তাদেরকে এ অনুমতি দেয় না যে, তারা ঐ সব কল্যাণ ও উপকারিতা থেকে সরে দাঁড়াবে যা ইসলামের সঙ্গে সম্পর্কের কারণে মুসলিম রাষ্ট্রে অথবা মুসলিম সমাজে তারা লাভ করছে। ফলে তারা সারাটা জীবন এই দ্বিমুখী ও দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থার মধ্যেই কাটায়। তাদের প্রবৃত্তিগত অবস্থা, তাদের আমল-আখলাক, তাদের নৈতিক ও চারিত্রিক দুর্বলতা, তাদের সুযোগ-সন্ধানী মানসিকতা, সুখ-সম্ভোগ ও সৌন্দর্য উপভোগের আবেগ-অনুভূতি, পার্থিব মগ্নতা, পরলোক বিস্মৃতি, ক্ষমতাসীনদের সামনে অবনত মেযাজ এবং গরীব, অসহায় ও দুর্বলের প্রতি অত্যাচার প্রথম যুগের মুনাফিকদের আচার-ব্যবহারের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

নিফাক ও মুনাফিকদের নিশানদিহি

হযরত হসান বসরী (র)-এর এটি একটি বিরাট ধর্মীয় প্রতিভার পরিচায়ক ছিল যে, তিনি এই সত্য বেশ ভালভাবেই অনুধাবন করেছিলেন যে, নিফাক স্থিতিশীল এবং এখনো বিদ্যমান। মুনাফিকরা কেবল ধর্মীয় ক্ষেত্রে নয়, বরং জীবনের সকল ক্ষেত্রেই প্রভাব বিস্তার করে আছে এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেও তাদের অধিকার কায়েম করে রেখেছে। তাদেরই কারণে শহরগুলো জমজমাট ও কোলাহলমুখর হয়ে আছে। কেউ কেউ তাঁকে বলেছিল ঃ এ যুগেও কি 'নিফাক'-এর অস্তিত্ব আছে? তিনি বলেছিলেন ঃ لوخرجوا من ازقة البصرة لاستوحشتم فيها – "মুনাফিকরা যদি বসরার গলি-ঘুপচি থেকে বেরিয়ে যায় তাহলে শহরে তোমাদের মন টেকানো মুশকিল হয়ে পড়বে।"[১] অর্থাৎ শহরের অধিবাসীদের ভেতর তাদের সংখ্যাই বেশি, ইসলামের সাথে যাদের নাম মাত্র সম্পর্ক এবং যারা তাদের আমল ও আখলাকের দিক দিয়ে ইসলামী চরিত্র দ্বারা ভূষিত ও সজ্জিত নয়। তিনি অন্য একবার বলেছিলেন :

ياسبحان الله مالقيت هذه الامة منافق قهرها واستاثر عليها

আল্লাহ্র কি শান দেখুন! এই উম্মতের মধ্যেও এমন সব মুনাফিক প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছে যারা ধ্বংসাত্মক রকমের স্বার্থপর।[২]

১. সি ফাতু'ন-নিফাক ওয়ায যম্মু'ল-মুনাফিকীন, মুহাদ্দিছ আবূ বকর ফারয়াবীকৃত, ৬৮ পৃ.।
২. ঐ, ৫৭ পৃ.।

শেষ যুগের 'আলিমগণের মধ্যে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (র)-ও এই মতের অনুসারী যে, 'নিফাক' সকল যুগেই বিদ্যমান আছে এবং মুনাফিকদের অস্তিত্ব বিশেষ কোন যুগের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। তাঁর মতে নিফাক' দু'ধরনের ঃ 'আকীদাগত নিফাক' এবং আমলী ও আখলাকী নিফাক'। রিসালত যুগ অতিক্রান্ত হওয়ায় অর্থাৎ ওয়াহী বন্ধ হয়ে যাওয়ায় 'আকীদাগত নিফাকে'র অকাট্য জ্ঞান আমাদের নেই; তবে আমলী ও আখলাকী নিফাক' সর্বত্রই প্রচুর দৃষ্টিগোচর হয়। তিনি তাঁর যুগ সম্পর্কে বলেন যে, এই মুহূর্তে নিফাকে'র আধিক্য বর্তমান।

হাসান বসরী (র)-এর দা'ওয়াত ও সংস্কারের শক্তি ও প্রভাবের মধ্যে এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, তিনি জীবনের এক-একটি দিক পাকড়াও করেছেন এবং সমাজের আসল রোগ কোথায়, সে দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। তাঁর যুগেও বহু ওয়া'ইজ ও দা'ঈ ছিলেন, কিন্তু তৎকালীন সমাজ কারো দা'ওয়াত বা ধর্মোপদেশকে সেভাবে গ্রহণ করেনি, যেভাবে হযরত হাসান বসরী (র)-এর দাওয়াতকে গ্রহণ করেছিল এবং তা এজন্য যে, তাঁর বক্তৃতামালা ও দর্‌স থেকে সেই যুগের বিগড়ে যাওয়া সমাজের ওপর সরাসরি চপেটাঘাত পড়ত; তিনি নিফাকে'র প্রকৃত স্বরূপ বর্ণনা করতেন। নিফাক' এমন একটি রোগ যা সেই সমাজে বিস্তার লাভ করেছিল। তিনি মুনাফিক'দের চরিত্র ও অভ্যাসসমূহ বর্ণনা করতেন এবং সে ধরনের অভ্যাস ও চরিত্র অনেক লোকের মধ্যেই পাওয়া যেত যারা হুকুমত, ফৌজ ও ব্যবসা-বাণিজ্যে অগ্রগামী ছিল এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রেই যাদের অস্তিত্ব অনুভব করা যেত। তিনি আখিরাত বিস্মৃতি ও পার্থিব কামনা-বাসনা তথা জাগতিক লোভ-লালসার প্রাবল্যের নিন্দা করতেন। সে যুগের অনেক লোকই এই সংক্রামক ব্যাধির শিকার ছিল। তিনি মৃত্যু ও (মৃত্যু-পরবর্তী) পারলৌকিক জীবনের ছবি আঁকতেন এবং অত্যন্ত সুন্দরভাবে শ্রোতার চোখের সামনে তা তুলে ধরতেন। গাফিল, বিত্তশালী ও প্রাচুর্যের অধিকারী লোকদের এমন একটি শ্রেণীর সে সময় জন্ম হয়েছিল যারা এ সব ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল।

মোট কথা, তাঁর দা'ওয়াত, তাঁর ওয়া'জ-নসীহত, তাঁর সংস্কারমূলক দর্‌স সে যুগের মন-মানসিকতা ও অন্যান্য উদ্দেশ্যের সঙ্গে এতই সংঘর্ষমুখর ছিল যে, সে যুগের সমাজের পক্ষে তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা কিংবা সম্পর্কচ্যুত হয়ে থাকা মুশকিল হয়ে পড়েছিল। তাই অধিক হারে লোক তাঁর বক্তৃতামালা শুনত এবং তাদের পাপক্লিষ্ট মনে চোট লাগত। ফলে বিগত জীবনের অন্যায় কৃতকর্ম ও পাপ থেকে তারা তওবা করত এবং নতুন জীবন ইখতিয়ার করত। তিনি তাঁর

বক্তৃতামালা ও মজলিস থেকে দীন ও ঈমানের দিকে লোকদেরকে আহ্বান জানাতেন এবং স্বীয় সাহচর্য ও আমল দ্বারা তাদের আত্মাকেও প্রশিক্ষণ দিতেন। ষাট বছরের দীর্ঘ মুদ্দত তিনি এই দাওয়াত ও সংস্কার কর্মেই কাটিয়ে দেন। কত লোক যে তাঁর কারণে ঈমানের মিষ্টতা ও ইসলামের অপরূপ সত্য লাভ করেছে তা কেউ পরিমাপ করতে পারবে না।

'আওয়াম ইব্‌ন হাওশাব বলেন ঃ হাসান (র) ষাট বছর পর্যন্ত স্বীয় কওমের ভেতর সেই কাজটি করেছেন যা আম্বিয়া-ই-কিরাম (খতমে নবুওতের পূর্বে) নিজ উম্মতের মধ্যে করতেন।[১]

হাসান বসরী (র)-এর ওফাত ও তাঁর জনপ্রিয়তা

তাঁর নিষ্ঠা, ধর্মীয় নিবিষ্টতা, 'ইলমী ও রূহানী তথা জ্ঞানগত ও আধ্যাত্মিক কামালিয়াতের এরূপ আছর ছিল যে, সারা বসরা ছিল তাঁর ভক্ত ও অনুরক্ত। ১১০ হিজরীতে যখন তাঁর ইনতিকাল হয় তখন গোটা শহর[২] তাঁর জানাযায় অনুগমন করে। বসরার ইতিহাসে এটিই ছিল প্রথম ঘটনা যে, গোটা জনবসতি কবরস্থানে চলে যাবার কারণে শহরের জামে মসজিদে সেদিন 'আসরের জামা'আত হতে পারেনি।[৩]

হাসান বসরী (র)-এর রূহানী ও 'ইল্‌মী স্থলাভিষিক্তগণ এবং নিজ নিজ যমানার দা'ঈরা আল্লাহ্‌র দিকে দা'ওয়াত, পারলৌকিক জীবনের দিকে আহ্বান এবং ঈমান ও আমলের দিকে দা'ওয়াত প্রদানের সিলসিলা জারী রাখেন। এর মাঝখানে তাঁরা কোনরূপ শূন্যতা সৃষ্টি হতে দেননি। হাসান বসরী (র)-এর ওফাতের ২২ বছর পর উমায়্যা খিলাফতের অবসান ঘটে এবং 'আব্বাসীয় খিলাফতের সূচনা হয়। দামিশকের পরিবর্তে বাগদাদ রাজধানীতে রূপান্তরিত হয় এবং পরিণত হয় গোটা প্রাচ্যের মনোযোগ কেন্দ্রে।

হুকুমতে বিপ্লব সাধনের প্রয়াস

এ সব সংস্কারমূলক প্রয়াস ও প্রচেষ্টা এবং দা'ওয়াত ও যিক্‌র-আযকারের ধারাবাহিকতার সঙ্গে এই প্রয়াসও অব্যাহত থাকে যে, খিলাফতকে তার সঠিক ও বিশুদ্ধ মারকাযের ওপর প্রতিষ্ঠিত করা হোক এবং সেসব ইজারাদারী খতম করে

১. দাইরাতুল-মা'আরিফ—বুস্তানীকৃত, ৭ম খণ্ড, ৪৪ পৃ.।
২. বসরা ছিল সে সময় ইরাকের বৃহত্তম শহর ও খিলাফতের রাজধানী। দামিশকের পর মুসলিম সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় স্তরের শহর হিসাবে গণ্য হ'ত।
৩. ইব্‌ন খাল্লিকান (হাসান বসরী)।

দেওয়া হোক যা উমায়্যা ও তাদের পর 'আব্বাসীয়রা কায়েম করে রেখেছে। দুর্ভাগ্যবশত খিলাফত গোত্রীয় ও বংশীয় ভিত্তির ওপর এমনভাবে কায়েম হয়ে গিয়েছিল যে, তার বিরুদ্ধে কোন কার্যকর আন্দোলন গড়ে তোলা ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব ছিল না যতক্ষণ না তার সাথে বংশীয় আভিজাত্য ও উচ্চ খান্দানের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। এজন্যই আমরা দেখতে পাই যে, যে সব লোক উমায়্যা ও 'আব্বাসীয় খিলাফতের বিরুদ্ধে জিহাদী পতাকা উত্তোলন করেছিলেন তাঁদের সম্পর্ক ছিল আহলে-বায়তের সঙ্গে। কেননা তাঁদেরই সাফল্য লাভের সম্ভাবনা ছিল বেশি। তাঁরা মুসলিম উম্মার ধর্মীয় প্রবণতার প্রতিনিধি-স্থানীয়ও ছিলেন এবং তাঁদের প্রতি মুসলমানদের ধর্মীয় মহল ও সংস্কারপ্রিয় জামা'আতের সহানুভূতি ও সমর্থনও ছিল।

কারবালার ঘটনার পরও নবী-বংশের বিভিন্ন লোক বিপ্লব সংঘটনের প্রয়াস চালান। সায়্যিদুনা হুসায়ন (তাঁর ও তাঁর পিতার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক)-এর পর তাঁর পৌত্র যায়দ ইবন 'আলী আল-হুসায়ন (র) হিশাম ইবন 'আবদুল মালিকের মুকাবিলায় জিহাদী পতাকা উত্তোলন করেন এবং ১২২ হিজরীতে শূলবিদ্ধ হয়ে শহীদ হন। ইমাম আবূ হানীফা (র) তাঁকে দশ হাযার দিরহাম পাঠান এবং তাঁর খিদমতে হাযির না হতে পারার কারণে ওযরখাহী পেশ করেন। তাঁর পর ইমাম হাসান (রা) বংশের হযরত মুহাম্মদ যু'ন্নাফসু'য-যাকিয়্যা (ইবনে 'আব্দুল্লাহ্ আল-মাহ্দ ইবনু'ল-হাসান আল-মুছান্না ইবন সায়্যিদুনা হাসান ইবনে 'আলী) মদীনা তায়্যিবাতে এবং তাঁর পরামর্শে তাঁর ভাই ইবরাহীম ইবন 'আবদুল্লাহ্ কূফাতে খলীফা মনসূরের বিরুদ্ধে জিহাদী পতাকা উত্তোলন করেন। ইমাম আবূ হানীফা[১] এবং ইমাম মালিক (র)[২] তাঁদের সমর্থক ও সহযোগী ছিলেন। ইমাম আবু হানীফা (র) প্রকাশ্যে ও খোলাখুলিভাবে তাঁকে সমর্থন দেন এবং কিছু অর্থও তাঁর খিদমতে প্রেরণ করেন। তিনি মনসূরের ফৌজী অফিসার হাসান ইবন কাহ্তাবাকে ইবরাহীমের মুকাবিলায় নিরস্ত রাখেন এবং খলীফার নিকট সুপারিশ করে তাঁর ক্ষমা লাভের সুযোগ করে দেন।[৩] প্রথম জন ১৪৫ হিজরীতে কূফায় শহীদ হন।

১. মানাকি 'বে আবূ হানীফা, বাযারীকৃত, ১ম খণ্ড, ৫৫ পৃ.।
২. ইমাম মালিক মাদীনাবাসীদেরকে মুহাম্মদ যু'ন্নাফসু'য-যাকিয়ার বন্ধুত্ব ও আনুগত্যের ফতওয়া দিয়েছিলেন, যদিও তিনি নিজে মনসূরের বায়'আত করেছিলেন। –তারীখু'ল-কামিল, ৫ম খণ্ড, ২১৪ পৃ.।
৩. ঐতিহাসিকদের ধারণা, ইমাম আবূ হানীফার বিরুদ্ধে মনসূর যে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তার কারণ বিচারপতির পদ গ্রহণে তাঁর অস্বীকৃতি নয়, বরং মুহাম্মদ ও ইবরাহীমের প্রতি তাঁর সমর্থন। কেননা এ বিষয়টি মনসূরের অজ্ঞাত ছিল না। এই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে দ্র. "ইমাম আবু হানীফা কী সিয়াসী যিন্দেগী"– সায়্যিদ মানাজির আহসান গিলানীকৃত ("ইমাম আবূ হানীফা" নামে বইটি ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে)।

বনী উমায়্যা ও বনূ 'আব্বাসের হুকুমতের ব্যাপক ব্যবস্থাপনার কারণে এসব প্রয়াস ব্যর্থ হলেও তাঁরা মুসলিম উম্মাহ্‌র ভেতর ভ্রান্ত কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, সাধনা ও সত্যকে সরবে ঘোষণা করবার একটি নজীর কায়েম করে যান। যদিও কার্যত তাঁরা সফল হতে পারেননি, কিন্তু তাঁদের প্রয়াসের এই মানসিক প্রভাব, কুরবানী এবং সংগ্রাম ও সাধনার এই ধারাবাহিকতার মূল্য মোটেই কম নয়। ইসলামী ইতিহাসের 'ইযযত-আবরূ ঐ সব পুরুষ-সিংহের বদৌলতেই কায়েম রয়েছে– যাঁরা অন্যায় ও ভ্রান্ত কর্তৃত্বের কাছে এবং বস্তুগত প্রেরণা ও আকর্ষণের সামনে আত্মসমর্পণ করেননি এবং যাঁরা সঠিক উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যের জন্য দেহের শেষ রক্ত বিন্দু পর্যন্ত দান করেছেন।

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوْا اللّٰهَ عَلَيْهِ .

"মু'মিনদের ভেতর কেউ কেউ আল্লাহ্‌র সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার পূরণ করেছে" (সূরা আহযব, ২৩ আয়াত)।

তৃতীয় অধ্যায়

'আব্বাসীয় খিলাফত এবং ধর্মীয় দা'ওয়াত ও আলোচনা

'আব্বাসীয় খিলাফত ও তার প্রভাব

'আব্বাসীয় খিলাফত উমায়্যা খিলাফতের পুরোপুরি স্থলাভিষিক্ত ছিল। সেই দুনিয়াদারীর রূহ, সেই ব্যক্তিতান্ত্রিক ও মৌরুসী সাম্রাজ্যের রীতিনীতি ও আইন-কানুন, বায়তুল মালের সেই বল্গাহীন অপব্যবহার, সেই আরাম-আয়েশ ও বিলাসিতাপ্রবণতা; সর্বক্ষেত্রে ছিল এই দুই খিলাফতের মধ্যে অদ্ভুত মিল। পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, উমায়্যাদের সাম্রাজ্যে ও তাদের কালের সমাজে আরবীয় রূহ কার্যকর ছিল; কিন্তু 'আব্বাসীয় সাম্রাজ্যে অনারব রূহ তথা অনারব জাতিগোষ্ঠী ও সভ্যতার রোগ-ব্যাধি ও দোষ-ত্রুটিগুলো সমাজে ঢুকে পড়েছিল। 'আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের আয়তন এতটা বেড়ে যায় যে, খলীফা হারূনুর রশীদ একবার এক খণ্ড মেঘ দেখে অত্যন্ত তৃপ্তির সঙ্গে বলেছিলেন ঃ

امطری حیث شئت فسیأتی خراجك .

অর্থাৎ "তোমার যেখানে ইচ্ছা গিয়ে বারি বর্ষণ কর, কারণ তোমার উৎপাদিত ফসলের রাজস্ব শেষাবধি আমার কাছেই আসবে।"

ইব্‌ন খালদূনের পরিমাপ মুতাবিক 'আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের বার্ষিক আমদানী ছিল খলীফা হারূনুর-রশীদের যমানায় সাত হাজার পাঁচ শ' কিনতার (সাত কোটি দেড় লক্ষ দীনার অর্থাৎ একত্রিশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ রুপিয়া)-এর অধিক[১]– যা সে যুগের হিসাবে একটি বিরাট অংকের অর্থ। খলীফা মামুনের যমানায় এ ক্ষেত্রে আরো সমৃদ্ধি ঘটে। বিরাট অংকের আমদানি রাজস্বের অধিকারী এবং তৎকালীন দুনিয়ার সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্যের রাজধানী হবার কারণে সারা দুনিয়ার আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের উপকরণ, গোটা দুনিয়ার জ্ঞানী-গুণী, শিল্পী-গায়ক, দাসদাসী, পারিষদ-মোসাহেব, কবি-সাহিত্যিক, সৎ ও অসৎ তথা সর্বশ্রেণীর মানুষের ঢল চতুর্দিক থেকে এসে নেমেছিল বাগদাদে। সম্পদের প্রাচুর্য ও অনারব লোকজনের অবাধ প্রবেশের ফলে সাংস্কৃতিক ভ্রষ্টতা তথা সাংস্কৃতিক বাড়াবাড়ি দারু'স-সালাম বা মুসলিম কেন্দ্রে শুরু হয়ে গিয়েছিল।[২] সম্পদের ছড়াছড়ি, অর্থের মূল্যহীনতা

১. মুকাদ্দিমা ইবন খালদূন, ১৫১ পৃ.।
২. বিস্তারিত জানতে দ্র. কিতাবুল-হায়ওয়ান (জাহিজ), ৩য় খণ্ড, ৯১ পৃ.; ৫ম খণ্ড, ১১৫ পৃ.।

এবং সে যুগের তমদ্দুন ও বিলাসিতার পরিমাপ করবার জন্য ইতিহাসে মামূনের বিবাহের বর্ণনা পড়ে দেখাই যথেষ্ট হবে। ঐতিহাসিক লিখেন ঃ

মামূন শাহী খান্দান, সাম্রাজ্যের সদস্যবর্গ, সমস্ত ফৌজ, রাষ্ট্রীয় কর্মচারী ও খাদেমকুলসহ উযীরে আজম হাসান ইবন সহল (যাঁর কন্যার সঙ্গে মামূনের বিয়ে হচ্ছিল)-এর মেহমান হন এবং একাধারে উনিশ দিন পর্যন্ত এই বিরাট বরযাত্রীদলকে এমন উন্নতমানের বদান্যতার সাথে মেহমানদারী করা হয় যে, দেশের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর মানুষটিও কয়েকদিনের জন্য আমীরানা জীবন যাপন করার সুযোগ পায়। হাশিমী খান্দান, ফৌজের অফিসারবৃন্দ ও সাম্রাজ্যের সকল পদাধিকারী ব্যক্তিবৃন্দের ওপর মিশ্ক ও আম্বরের হাযার হাযার গুলি ছিটান হয়। গুলিগুলো ছিল কাগজে লেপ্টানো এবং তাতে নগদ অর্থ, দাসদাসী, ভূ-সম্পত্তি, খেলাত, ঘোড়া, জায়গীর প্রভৃতির উপহারের পরিমাণ লিপিবদ্ধ ছিল। খোলাখুলি নির্দেশ ছিল যে, যার হিস্যায় যে গুলি পড়বে তাতে যা লেখা রয়েছে তা সেই মুহূর্তেই ভাণ্ডার-তত্ত্বাবধায়ক তাকে দিয়ে দেবে। সাধারণ লোকজনের ওপরও মিশক 'আম্বরের গুলি এবং দিরহাম ও দীনার ছিটানো হয়। মামূনের জন্য স্বর্ণ-সূত্রের তৈরী একটি দামী ও সুদৃশ্য ফরাশ বিছানো হয়; তাতে মুক্তা ও য়াকূত খচিত ছিল। মামূন যখন তার ওপর উপবেশন করেন তখন দামী ও মূল্যবান মোতি তাঁর পদদ্বয়ের ওপর ছিটানো হয় যা যরীন-ফরাশের ওপর বিক্ষিপ্ত হয়ে এক চিত্তাকর্ষক দৃশ্যের অবতারণা করে।[১]

বাগদাদে আল্লাহ্র দা'ঈ

কিন্তু বাগদাদে এই আরাম-আয়েশ ও ভোগবিলাসিতার মাঝেও এমন কিছু মহান ব্যক্তির অস্তিত্ব ছিল যাঁরা আল্লাহ্র দিকে আহ্বানে, তাযকিয়ায়ে নফস ও 'ইলমে দীনের প্রচার-প্রসারে এবং শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা দানের মধ্যে সার্বক্ষণিক নিমগ্ন ছিলেন। তাঁরা শহরের হাঙ্গামা এবং জীবনের সকল চিত্তাকর্ষক ও মনোমুগ্ধকর বিষয়াবলী থেকে নিজেদেরকে আলাদা করে নিয়েছিলেন এবং এই উম্মতের রূহ ও আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্কের পুঁজি এবং ইসলামী জীবন যিন্দেগীর উৎসের (কুরআন ও হাদীছ-এর) হেফাজতে ব্যস্ত ছিলেন। হুকুমত কোনমতেই তাঁদের চিনতে পারেনি এবং দুনিয়ার কোন আকর্ষণই তাঁদেরকে নিজ কাজ থেকে হটাতে পারেনি। বস্তুবাদের এই উত্তাল সমুদ্রে তাঁরা ছিলেন এমন মানবীয়

১. আল-মা'মূন, মাওলানা শিবলী নু'মানীকৃত, ১৫৭ পৃ.- ইবন খালদূন, আবুল-ফিদা, ইব্নু'ল-আছীর, ইবন খাল্লিকান-এর উদ্ধৃতিসহ।

ীপমালা যেখানে ডুবন্ত ব্যক্তি এসে আশ্রয় নিত। তাঁরা বাগদাদে বস্তুবাদী ও ভাগ-বিলাসপূর্ণ জীবনের পাশাপাশি একটি খালেস ঈমানী ও রূহানী জীবনও গয়েম করে রেখেছিলেন। তাঁরা তাঁদের শক্তি ও বিস্তৃতির ক্ষেত্রে বস্তুবাদী ও াজনৈতিক জীবনধারীদের পেছনে ছিলেন না। খলীফা, আমীর-উমারা ও ওযীরদের নিয়ন্ত্রণ সাধারণ মানুষের দেহের ওপর চললেও তাদের মন-মস্তিষ্কের ওপর চলত ঐ মহান ব্যক্তিদের শাসন। আর যখন ঐ দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দিত তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মহান ব্যক্তিদের প্রাধান্য প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হ'ত। তৎকালীন খলীফা হারূনুর-রশীদ শাহী জাঁকজমক ও জৌলুসের সঙ্গে রুক্কা ামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। সেই সময় সেখানে হাদীছশাস্ত্রের মশহূর ইমাম ার্দে সালিহ হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারক (র)-এর আগমন ঘটে। শহরের গোটা অধিবাসী তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে বেরিয়ে পড়ে। ফলে খলীফা নিঃসঙ্গ হয়ে াড়েন। লোকের ভীড় এত প্রচণ্ড ছিল যে, ধাক্কাধাক্কিতে অনেকেরই পা থেকে জুতা ছিটকে যায়। খলীফা হারূনের একজন দাসী খলীফার বালাখানা থেকে দৃশ্যটি দেখছিল। সে এর কারণ কি তা জানতে চায়। লোকেরা বলে যে, খুরাসানের একজন 'আলিম এসেছেন; তাঁর নাম 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারক। সে বলে, "এটাই বাদশাহী, হারূনেরটা নয়। কেননা তাঁর বাদশাহী পুলিশ ও পাইক-পেয়াদা ছাড়া মোটেই জমে না।"

এই ছিল বাগদাদে ঈমানী ও 'ইলমী যিন্দেগীর অবস্থা। সেখানে যেমন আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাস ও ধন-দৌলতের ধুম পড়েছিল, তেমনি তা ইল্‌ম-আমল, তাকওয়া-পরহেযগারী এবং দা'ওয়াত ও ইসলাহেরও সর্ববৃহৎ মারকাযে (কেন্দ্র) পরিণত হয়েছিল। তাবাকাত ও অন্যান্য গ্রন্থ দৃষ্টে তো এটাই মনে হয় যে, বাগদাদে তখন 'আলিম ও সালিহ বান্দা ছাড়া আর কেউ বসবাস করত না এবং وقال الله وقال الرسول ভিন্ন আর কোন আওয়াযই তখন উঠত না। এই ধর্মীয় রওনক এবং দীন ও ইসলাহের এই সমৃদ্ধি ঐসব মুজাহিদ বান্দার শ্বাস-প্রশ্বাসের কারণেই ছিল যাঁরা এই কর্মটিকে জীবনের লক্ষ্য হিসাবে ধরে নিয়েছিলেন। এই সিলসিলায় সুফিয়ান ছওরী, ফুযায়ল ইবন 'আয়ায, জুনায়দ বাগদাদী, মা'রূফ কারখী, বাশার হাফী প্রমুখের নাম সর্বাধিক খ্যাত ও আলোকোজ্জ্বল। ঐসব হযরতের আমল-আখলাক, সত্যিকার খোদাভীতি, নিঃস্বার্থ যুহ্‌দ ও যিন্দেগী, পার্থিব জগত থেকে মুখাপেক্ষীহীনতা, ত্যাগ ও উৎসর্গ এবং নিঃস্বার্থ খিদমতে খাল্‌ক ও ঈমানী অবস্থা মুসলিম জনপদের ওপরও প্রভাব ফেলত। তাঁদের ব্যক্তিসত্তা দ্বারা ইসলামী সম্ভ্রম কায়েম ছিল। এর ফল হয়েছিল

এই যে, তাঁদের উপদেশ ও বক্তৃতা শ্রবণে এবং তাঁদের আমল ও আখলাক দৃষ্টে বিপুল সংখ্যক য়াহূদী, 'ঈসায়ী (খৃস্টান), অগ্নি-পূজারী ও সাবিঈ ইসলামে দীক্ষিত হয়।[১]

১. তারীখ-ই-বাগদাদ (খতীব বাগদাদী), হিলয়্যাতুল-আওলিয়া (আবু ন'ঈম) ও তারীখ-ই ইব্‌ন খাল্লিকান।

চতুর্থ অধ্যায়

হাদীছ ও ফিক্‌হ্ সংকলন

মুসলিম উম্মাহ্‌র দুটো তাৎক্ষণিক প্রয়োজন

মুসলিম উম্মার রূহ্, তার চরিত্র ও আখলাকের হেফাজতের সঙ্গে (যার সিলসিলা বরাবর অব্যাহত ছিল) উম্মার সামাজিক জীবন ও সামাজিক রীতিনীতি, পারস্পরিক লেনদেন ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রনীতির হেফাজতেরও প্রয়োজন ছিল। এ ক্ষেত্রে নিশ্চয়তার প্রয়োজন ছিল যে, তা ভবিষ্যতেও ইসলামের মূলনীতি ও আইন-কানুন মুতাবিক হবে। যে সময় এশিয়া, আফ্রিকা ও য়ূরোপের একটি অংশ (স্পেন) ইসলামের তত্ত্বাবধান ও অভিভাবকত্বে ছিল, মুসলিম সাম্রাজ্য তৎকালীন বিশ্বে সর্ববৃহৎ ও সর্বাধিক আয়তনবিশিষ্ট ছিল যা বিশ্বের সুসংস্কৃত ও সভ্যতম রাষ্ট্রসমূহের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল। ফলে নিত্য-নতুন অবস্থা ও পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছিল মুসলমানেরা। ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, শাসিতদের নিকট থেকে জিযয়া ও রাজস্ব আদায়সহ নব-বিজিত রাষ্ট্রগুলোর নিত্য নতুন সমস্যাদি ক্রমেই সামনে এসে দেখা দিচ্ছিল। প্রাচীন অভ্যাস ও প্রচলিত রীতিনীতি, সিদ্ধান্ত গ্রহণসহ আরো অনেক নতুন বিষয় ইসলামী হুকুম-আহকামের ভিত্তিতে ফয়সালার অপেক্ষায় ছিল। এ সবের কোনটিরই আবশ্যকতা এড়িয়ে যাবার মত ছিল না কিংবা একটু নজর বুলিয়ে এগুলোকে পাশ কাটিয়ে যাবার মতও ছিল না। হুকুমত বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনের প্রার্থী ছিল। হুকুমতের ব্যবস্থাপনা-মেশিনারী থামিয়ে রাখা যায় না। যদি ইসলামী আইন-কানুন বা বিধি-বিধান প্রণয়ন ও বিন্যাসের ক্ষেত্রে বিলম্ব ঘটত তাহলে রোমক কিংবা পারসিক আইন দিয়ে কাজ চালাতে হ'ত। ফলে অবস্থা তাই হ'ত যা এই সময়কার নামে মাত্র ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর ক্ষেত্রে হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে 'উলামায়ে কিরামের সামান্যতম গাফিলতি, সুন্নাহ্‌র রক্ষকদের মেধাগত আলস্য ও আরামপ্রিয়তা এই উম্মাহ্‌কে হাযারো বছরের জন্য ইসলামী সমাজ ও তার সামাজিক আইন-কানুনের বরকত থেকে মাহরূম করে দিত।

یک لحظه غافل بودم صد ساله راهم دور شد ۔

সে সময় দু'টো বিষয়ের দিকে তাৎক্ষণিক মনোযোগ দেবার প্রয়োজন ছিল। একটি হ'ল, হাদীছ ও সুন্নাহর মূল্যবান পুঁজি সংকলন ও সংরক্ষণ করা,

বিভিন্নভাবে যা মুহাদ্দিছীন-ই-কিরামের বক্ষে এবং লিখিতভাবেও নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল।[১] এটি নতুন সমস্যাবলী খুঁজে বের করার একটি বড় মাধ্যম এবং ইসলামী ফিক্'হশাস্ত্রের একটি বিরাট উৎস। এটি উম্মার ইসলামী মেযাজে এবং তার যিন্দেগীর ইসলামী ছাঁচের হেফাজতেরও মাধ্যম। হাদীছ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সর্বাধিক বিস্তৃত, নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ চরিতমালা (سيرت)। এটি নবী যুগের তেইশটি বছরের এক ধরনের রোয-নামচা যা অপর কোন নবীর উম্মতের ভাগ্যে জোটেনি। এটি বিনষ্ট হয়ে যাওয়া জ্ঞান ও ধর্মের ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ছাড়া কিছু নয়। এতদ্ভিন্ন এর মধ্যে নিহিত রয়েছে উম্মতের নৈতিক ও চারিত্রিক সংস্কার, মিতাচার, বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিকতা, যুহ্দ ও তাক'ওয়া এবং পরিবর্তন ও বিপ্লবে উৎসাহদানকারী বিরাট শক্তি। এরই প্রভাবে প্রতিটি যুগে ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিকগণ জন্ম নিতে থাকবেন এবং প্রতিটি যুগের মুসলিম সোসাইটির শর'ঈ ও আখলাকী হিসাব-নিকাশ হতে থাকবে। এরই মাধ্যমে প্রতিটি যুগ ও প্রতিটি স্তরের বিদ'আতের মুকাবিলা করা হবে।

দ্বিতীয় বিষয়টি হ'ল, ফিক্'হের একত্রীকরণ ও সম্পাদন এবং মসলা-মাসাইল তথা শর'ঈ সমস্যাসমূহ খুঁজে বের করা ও ইজতিহাদ করা। কুরআন হাদীছে জীবনের প্রতিটি শাখা ও প্রতিটি বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় মূলনীতি ও আদর্শ বিদ্যমান। এসব থাকতে অন্য কোথাও যাবার প্রয়োজন নেই। জীবন পরিবর্তনশীল। মানুষের অবস্থা ও তার আবশ্যকীয় বিষয়াদি সীমাহীন বৈচিত্র্যে ভরা। উল্লিখিত মূলনীতি ও আদর্শের আলোকে জীবনের প্রতিটি নতুন অবস্থা ও পরিস্থিতির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ইজতিহাদ ও ইসতিম্বাতের আবশ্যক ছিল।

হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলন

ইসলামের আবির্ভাবের ক্ষেত্র হিসাবে সেই দেশ ও সেই জাতিগোষ্ঠীকে নির্বাচন করা হয় যারা তাদের সত্য কথন, আমানতদারী ও স্মৃতিশক্তির জন্য সারা বিশ্বে বিখ্যাত ছিল। সাহাবায়ে কিরাম (রা) যা কিছু দেখেছেন, যা কিছু শুনেছেন,

১. হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলনের কাজ তাবি'ঈদের যুগ থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। এই সিলসিলায় হযরত ওমর ইব্ন 'আবদুল 'আযীয (র)-এর মনোযোগ ও আগ্রহের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। দ্বিতীয় শতাব্দীতেই হাদীছের বিভিন্ন সংকলন তৈরি হয়ে গিয়েছিল যার মধ্যে ইব্ন শিহাব যুহরী (জন্ম ১২৪ হি.), ইব্ন জুরায়জ মক্কী (জন্ম ১৫০ হি.), ইব্ন ইসহাক (জন্ম ১৫১ হি.), সা'ঈদ ইব্ন 'আরূবা মাদানী (জন্ম ১৫৬ হি.), মা'মার য়ামানী (জন্ম ১৫৩ হি.), রবী' ইব্ন সবীহ (জন্ম ১৬০ হি.) প্রমুখের সংকলন বিশেষরূপে খ্যাত। একে অধিকতর 'ইল্মী ও উন্নতমানের আঙ্গিক ও কাঠামোয় আঞ্জাম দেওয়ার দরকার ছিল।

তা হৃদয়ে গেঁথে নিয়েছেন এবং এতটুকু কম-বেশি না করে তা পরবর্তী বংশধরদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। অপরাপর কওম ও জাতিগোষ্ঠী স্ব স্ব পয়গম্বরদের মূর্তি নির্মাণ করেছে এবং তাঁদের ছবি অংকন করেছে। ইসলামে মূর্তি নির্মাণ ও প্রাণীর ছবি অংকন হারাম। কিন্তু সাহাবায়ে কিরাম (রা) আঁ-হযরত (সা)-এর আকৃতি-প্রকৃতি (শামাইল) ও আচার-অভ্যাসের এমন সব জীবন্ত চিত্র তাঁদের বর্ণনায় ধরে রেখেছেন যার বর্তমানে কোন ছবি অংকনের আবশ্যক হয় না। তাঁদের বর্ণিত এই ছবি সকল প্রকার খারাপ ও অকল্যাণ থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

মুহাদ্দিছীনে কিরামের উন্নত মনোবল ও কঠোর পরিশ্রম

অতঃপর সেই সব বর্ণনার হেফাজত ও বর্ণনার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা উন্নত মনোবলের অধিকারী, প্রাণবন্ত, বিদ্যোৎসাহী এমন শত শত বিদ্যার্থী যুগিয়ে দিয়েছেন যাঁরা স্মৃতিশক্তি ও মেধার ক্ষেত্রে ছিলেন নজীরবিহীন। তাঁরা অনারব দেশগুলো থেকে দলে দলে ধেয়ে এসেছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের দিলে হাদীছের এমনি 'ইশ্‌ক পয়দা করে দিয়েছিলেন যে, সে কারণে নিশ্চিন্তে আরামের সঙ্গে দু'দণ্ড স্থির হয়ে বসে থাকাটাও তাঁদের জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সকল জায়গা থেকে 'ইল্‌ম হাসিল করা এবং স্বীয় বক্ষ ও লেখনীতে তা রক্ষণাবেক্ষণ করার মধ্যেই তাঁরা মগ্ন ছিলেন। বিজ্ঞানের ইতিহাসে ও পূর্ববর্তী নবীদের উম্মতের ভেতর এই 'ইশ্‌ক ও নিবিষ্টতার এবং এই সতর্কতা ও আমানতদারীর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। হাদীছ সংগ্রহ করা এবং প্রতিটি রিওয়ায়াত তাঁর বর্ণনাকারী (রাবী) থেকে শোনবার জন্য তাঁরা ইসলামী বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, ইমাম বুখারী চৌদ্দ বছর বয়সে এতদুদ্দেশ্যে ভ্রমণ শুরু করেন। বুখারা থেকে মিসর পর্যন্ত সকল রাষ্ট্র তিনি চিরুণীর ন্যায় আঁচড়ে ফেলেন। আবূ হাতিম রাযী বলেন, "আমি তিন হাযার ফারসাখের (নয় হাযার মাইল) বেশি দুরত্ব পদব্রজে অতিক্রম করি। এরপর আমি মাইলের হিসাব গণনা করা ছেড়ে দিই।" স্পেনের মুহাদ্দিছ ইব্‌ন হায়ওয়ান স্পেন, ইরাক, হিজায ও য়ামানের শায়খগণের থেকে হাদীছ গ্রহণ করেন। মোট কথা, তিনি তুঞ্জা থেকে সুয়েজ পর্যন্ত গোটা আফ্রিকা মহাদেশ, অতঃপর লোহিত সাগর পাড়ি দেন। মুহাদ্দিছীনে কিরামের সফরনামা তিনটি মহাদেশ– এশিয়া, আফ্রিকা, য়ূরোপ (স্পেন)-কে কেন্দ্র করে আবর্তিত।[১] সেই সময়কার সভ্য, সংস্কৃত ও

১. এসব উদাহরণ "উলামায়ে সলফ" (মওলনা হাবীবুর রহমান খান শেরওয়ানী মরহূম) থেকে গৃহীত। বিস্তারিত জানতে চাইলে দ্র. গ্রন্থের "সফর" শিরনামের নিবন্ধ।

পরিচিত বিশ্বের দূর-প্রতীচ্য (স্পেন) থেকে নিয়ে দূর-প্রাচ্য (খুরাসান) পর্যন্ত সফর করা এবং শহরে শহরে টহল দিয়ে বেড়ানো তাঁদের জন্য একটি মামুলী ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

আসমাউ'র-রিজাল শাস্ত্র

ঐ সব আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দা কেবল হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলন করাকেই যথেষ্ট মনে করেননি, এর মধ্যবর্তী মাধ্যমগুলোও গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁরা ঐ সমস্ত 'রাবী'র নাম-ধাম, জীবনেতিহাস, আমল- আখলাক ও আচার-অভ্যাসকেও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করেন যাঁদের মাধ্যমে এসব বর্ণনা তাঁদের কাছে পৌঁছেছে। এভাবে যে সব মহান ব্যক্তিদের সম্পর্কে ورفعنا لك ذكرك -এর ওয়াদা ও খোশখবর ছিল– তাঁদের বদৌলতে লাখো বান্দার জীবন দিবালোকে এসে যায়। আর উল্লিখিত ধারায় হাদীছ ও তার রিওয়ায়াতসমূহের সংকলন ও সম্পাদনের ফলে স্বাভাবিকভাবেই একটি নতুন 'ইল্‌ম "আসমউ'র-রিজাল" তথা রিজালশাস্ত্রের উদ্ভব ঘটে। জ্ঞানের এই শাখা মুহাদ্দিছীনে কিরামের বুলন্দ হিম্মত, জ্ঞানের ক্ষেত্রে নিবিষ্টচিত্ততা, বিশ্লেষণী শক্তি ও যিম্মাদারীর অনুভূতির আলোকোজ্জ্বল উদাহরণ, এই উম্মার এটি একটি গৌরবজনক কৃতিত্ব। ড. স্প্রেঙ্গার তাঁর الاصابة فى احوال الصحابة। (হাফিজ ইবন হ'জার)-এর ইংরেজী সংস্করণের ভূমিকায়[1] যথার্থই বলেছেন ঃ

> আজ পর্যন্ত দুনিয়ায় এমন কোন জাতিগোষ্ঠী দেখা যায়নি, এমন কি বর্তমানেও নেই যারা মুসলমানদের মত "আসমাউ'র-রিজাল"-এর ন্যায় একটি বিরাট মর্যাদাসম্পন্ন শাস্ত্রের আবিষ্কার করেছেন যার বদৌলতে আজ আমরা পাঁচ লক্ষ লোকের অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারছি।[2]

মুহাদ্দিছীনে কিরামের সতর্কতা ও আমানতদারী

মুহাদ্দিছগণ কেবল হাদীছ বর্ণনাকারী লোকদের (রাবীগণের) জীবন-বৃত্তান্ত একত্র ও সংরক্ষিতই করেননি, তাঁদের আচার-আচরণ (আখলাক), শক্তি ও দুর্বলতা, সাধুতা ও তাক'ওয়া এবং 'ইলম ও স্মৃতিশক্তি সম্পর্কেও তাঁদের সমসাময়িকদের বর্ণনা, বিবৃতি ও সর্বপ্রকার তথ্যাদি একত্র করে দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে কারো ব্যাপারে কোনরূপ আনুকূল্য কিংবা দয়া প্রদর্শন করা হয়নি, চাই কি

---

১. কলিকাতায় মুদ্রিত–১৮৫৩-৬৪ ঈসায়ী।
২. খুতবাত-ই-মাদ্রাজ, মাওলনা সায়্যিদ সুলায়মান নদভী।

তাঁরা তাঁদের যুগের শাসকই হোন অথবা সমসাময়িক কালের বড় যাহিদই হোন।

তাঁরা রাবীগণের যাচাই-বাছাই ও বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এতখানি সততা ও নির্ভীকতার সঙ্গে কাজ করেছেন যে, সে সব ঘটনা আজ ইসলামের গৌরবময় ঘটনা হিসাবে বিবেচিত। রাবীগণের মধ্যে বড় বড় খলীফা ও আমীর-উমারাও ছিলেন যাঁদের ক্ষমতার দাপট ছিল অপ্রতিহত। কিন্তু মুহাদ্দিছীন-ই-কিরাম এতটুকু ভীত না হয়ে সবারই বাহ্যিক দিকগুলো প্রকাশ্য দিবালোকে এনেছেন এবং গোপন ও প্রচ্ছন্ন দিকগুলোর নেকাব উন্মোচন করেছেন। তাঁরা তাঁদেরকে সে দর্জাই দিয়েছেন, যা প্রকৃতপক্ষে তাদের প্রাপ্য। ইমাম ওকী' ছিলেন একজন বড় মুহাদ্দিছ, কিন্তু তাঁর পিতা ছিলেন একজন সরকারী খাজাঞ্চী। ফলে তিনি যখন স্বয়ং তাঁর পিতা থেকে কোন হাদীছ রিওয়ায়েত করতেন তখন তার সমর্থনে অপর কাউকে অবশ্যই তাঁর সঙ্গে মিলিয়ে নিতেন অর্থাৎ এককভাবে তাঁর পিতার রিওয়ায়েতকে তিনি নির্ভরযোগ্য মনে করতেন না। এরূপ সতর্কতা ও সত্য-প্রীতির দৃষ্টান্ত সত্যি বিরল।[১]

ইমাম মু'আয ইব্‌ন মু'আয এমন একজন উঁচুদরের মুহাদ্দিছ ও বুযুর্গ ছিলেন যে, এক ব্যক্তি তাঁকে দশ হাযার দীনার– যার মূল্য আজ দশ হাযার গিনিরও অধিক– কেবল এ কথার বিনিময়ে পেশ করতে চান যে, 'আদল তথা ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে অমুক ব্যক্তি নির্ভরযোগ্য কিংবা নির্ভরযোগ্য নয়– সে সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলবেন না অর্থাৎ তিনি এ ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকবেন। তিনি আশরফীর সেই থলি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন ঃ আমি কোন সত্যকে লুকাতে পারি না।[২] ইতিহাস কি এর চেয়ে অধিক সতর্কতা, সততা ও সাধুতার কোন দৃষ্টান্ত পেশ করতে পারবে?[৩]

স্মৃতিশক্তি ও ধীশক্তি

মুহাদ্দিছীন-ই-কিরামের এই জামা'আত ছিল ইরান ও তুর্কিস্তানের সর্বোত্তম মেধা সম্পদ (دماغی جوهر)। তাঁরা বংশগতভাবে খুবই সুস্থ, সবল, পরিশ্রমী, উন্নত মনোবলসম্পন্ন, জ্ঞানতাপস ও প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। স্মৃতিশক্তির ওপর আস্থা ও স্মৃতিশক্তির ব্যাপক চর্চার ফলে (গোটা মানবীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ন্যায় যা লালন-পালন ও অনুশীলনী দ্বারা অস্বাভাবিক রকম

১. তাহযীবু'ত-তাহযীব, ১১শ খণ্ড, ১৩০ পৃ।
২. ঐ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪৩১ পৃ.।
৩. খুতবাতে মাদ্রাজ, ৫৯-৬০ পৃ.।

শক্তিশালী হয়ে যায়) তা এমন আশ্চর্যজনক নমুনা পেশ করত যা দুর্বল ও কমযো স্মৃতির এই নির্ভেজাল কিতাবী যুগে কতক সময় বুদ্ধির অগম্য বলে মনে হয়। কি ইতিহাস এ ধরনের ঘটনাবলীর ক্রমিক ও ধারাবাহিক সাক্ষ্য প্রদান করে, অভিজ্ঞত এর অনুকূলে রায় দেয় এবং এর সম্ভাবনার সত্যতা স্বীকার করে। এসবের 'ইল্ তাওযীহ' তথা জ্ঞানগত বর্ণনানুক্রমিক তালিকা পেশ করা কঠিন কিছু নয়। ব্যাপ চর্চা, অনুশীলন ও বিষয়বস্তুর সঙ্গে প্রেম ও আকর্ষণ এমন শক্তি সৃষ্টি করে এব মেধা স্থানান্তরের এমন সব নমুনা প্রকাশিত হতে থাকে যা এর সঙ্গে সম্পর্কহী ব্যক্তিবর্গের কাছে বিস্ময়কর ঠেকবে বৈকি!

ইমাম বুখারী যখন বাগদাদ আগমন করেন তখন বাগদাদের 'আলিমকু তাঁকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত উপায় উদ্ভাবন করেন : তারা এক শ হাদীছের সনদ ও মতন (মূল বর্ণনা) উল্টে-পাল্টে দেন, এক হাদীছের সনদ অপ হাদীছের মতনের সঙ্গে ও এক হাদীছের মতন অপর হাদীছের সনদের সঙ্গে জুড়ে দেন এবং তাঁকে (বুখারীকে) প্রশ্ন করবার জন্য দশ-দশটি হাদীছ একএকজ লোকের হাওয়ালা করেন। ইমাম বুখারী মজলিসে আগমন করলে এক একজ ব্যক্তি দশ-দশটি করে হাদীছ শোনান এবং এসব হাদীছ সম্পর্কে তাঁর মতাম জানতে চান। তিনি এগুলো শুনতেন এবং বলতেন, "আমি এসব হাদীছ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নই।" যাঁরা জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন তাঁরা এই রহস্য উপলব্ধি করে এবং অজ্ঞ লোকেরা তাঁর এই অজ্ঞতাদৃষ্টে মুচকি হাসে। যখন সকলেই নিজ নিজ অংশের হাদীছ শুনিয়ে শেষ করলেন তখন ইমাম বুখারী পালাক্রমে এক-একজনের প্রতি মনঃসংযোগ করেন এবং বলেন, "আপনি যে দশটি হাদীছ আমাকে শুনিয়েছিলেন তার মতন এই এবং তার সনদ এই।" তিনি সকলের পেশকৃত হাদীছই সহীহ করে দেন এবং যে সনদের যে মতন এবং যে মতনের যে সনদ তা সঠিকভাবে বর্ণনা করেন। লোকে তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টি, উপস্থিত বুদ্ধি ও অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি দৃষ্টে থ হয়ে যায়।[১]

দর্স-এর মজলিসে লোকের ভীড়

উপরিউক্ত কারণেই জনগণের মধ্যে মুহাদ্দিছীন-ই-কিরামের দর্স ও রিওয়ায়াতের মজলিসে শরীক হবার উদগ্র আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। এসব মজলিসে উপস্থিতির সংখ্যা হাযারের কোঠা অতিক্রম করত এবং বাদশাহদের দরবার থেকেও সে সব মজলিসে অধিক নীরবতা ও শৃঙ্খলাপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করত।

১. ফতহুল্ বারী--মুকদ্দিমা, পৃ. ৪৯২।

ইমাম 'আসিম ইব্ন আলী হাদীছের শ্রুতলিপি প্রদানের উদ্দেশ্যে বাগদাদের বাইরে নাখলিস্তানে (খর্জুর বৃক্ষপূর্ণ স্থান) একটি উচ্চ চবুতরার ওপর উপবেশন করতেন। খলীফা মু'তাসিম বিল্লাহ একবার তাঁর এক বিশ্বস্ত লোককে উক্ত মজলিসে শরীক লোকজনের পরিমাণ নির্ধারণ করবার জন্য পাঠান। সেখানে তখন প্রায় এক লক্ষ চব্বিশ হাযারের মত শ্রোতা ছিল। আহমদ ইব্ন জা'ফর বর্ণনা করেন যে, যখন আবূ মুসলিম বাগদাদে আসেন তখন রুহবা গাসসান নামীয় স্থানে তিনি হাদীছের শ্রুতলিপি দেন। সাত ব্যক্তি দাঁড়িয়ে একে অপরকে শায়খ (র)-এর রিওয়ায়াত পৌঁছাতে থাকে এবং অন্যরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা লিখতে থাকে। দোয়াত গুণে বোঝা গেল, লেখকদের সংখ্যা প্রায় চল্লিশ হাযার। যারা লিখছিল না, শুধু শ্রোতা ছিল, তারা এই গণনার বাইরে। সে যুগের শায়খ ফারয়াবী বাগদাদে হাদীছের শ্রুতলিপি প্রদান করেন। তিনশ' ব্যক্তি এই শ্রুতলিপি সাধারণ লেখক ও শ্রোতা পর্যন্ত পৌঁছে দেবার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিল। উপস্থিতির সংখ্যা ছিল তিরিশ হাযারের মত। ফারয়াবীর নিকট দশ হাযার লোক শিক্ষা গ্রহণ করতে আসত এবং তারা সকলেই দোয়াত কলম নিয়ে বসত।[১] ফ্রেবারি বর্ণনা করেন যে, ইমাম বুখারীর জামি' সহীহ তাঁর নিকট থেকেই নব্বই হাযার লোক শুনেছে।[২]

সিহাহ সিত্তা

এই উৎসাহ-উদ্দীপনা, এই মগ্নতা, এই প্রতিযোগিতা ও উদ্বেলিত প্রেরণা হিকমতশূন্য ছিল না। এর ফল এই দাঁড়ায় যে, হাদীছের এমন একটি নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য পুঁজি জমা হয়ে যায় যা এই উম্মতের একটি বিরাট বড় সম্পদ, ইসলাহ ও তাজদীদ তথা সংশোধন ও সংস্কারের একটি বিরাট শক্তিশালী মাধ্যম। এই পুঁজির ভেতরে ইমাম বুখারীর সহীহ বুখারী ও ইমাম মুসলিমের সহীহ মুসলিম (যেগুলোকে অধিকাংশ সময় 'স'হ'হি'ায়ন বা দু'টি বিশুদ্ধ গ্রন্থ নামে স্মরণ করা হয়) আর যে সমস্ত হাদীছ উক্ত দু'জন ইমাম রিওয়ায়াত করেছেন সেগুলোকে বলা হয় "মুত্তাফাকু'ন 'আলায়হি" (এই হাদীছগুলো সর্বোত্তম মর্যাদাসম্পন্ন) সর্বাধিক বিশিষ্ট ও উন্নতমানের।[৩] এ দু'টির পর ইমাম মালিকের মুওয়াত্তা', ইমাম

১. 'উলামায়ে সল্ফ, তাযকিরাতু'ল-হুফফাজ ও তা'রীখ-ই-ইব্ন খাল্লিকানের বরাতে।

২. ফতহুল বারীর মুকাদ্দিমা, ৪৯২ পৃ.।

৩. শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র) হু'জ্জাতুল্লাহি'ল-বালিগা'য় বুখারী ও মুসলিম সম্পর্কে বলেনঃ اما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على ان جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع وانهما متواتران الى مصنفيهما وانه كل من يهون امرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين. মুহাদ্দিছীন কিরাম এ ব্যাপারে একমত যে, উক্ত (পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন।)

তিরমিযীর জামি', ইমাম আবূ দাউদ সিজিস্তানীর সুনানে আবী দাউদ, ইমাম নাসাঈ ও ইমাম ইব্ন মাজার সংকলনগুলো নিজস্ব অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যের কারণে সবিশেষ মর্যাদার অধিকারী। পরবর্তীকালের সংশোধনমূলক প্রয়াস ও কর্মকাণ্ডের মধ্যে মুহাদ্দিছীন-ই-কিরামের ঐসব প্রাথমিক মেহনতের বিরাট বড় হিস্যা রয়েছে। আজও কোন চিন্তাশীল ও শক্তিশালী সংস্কার আন্দোলন ও ধর্মীয় ইনকিলাব প্রচেষ্টা এই কার্যকর সম্পদ-ভাণ্ডারের দিকদর্শন ছাড়া পরিচালিত হতে পারে না এবং তা ফলপ্রসূও হতে পারে না।

ফিক্'হ্শাস্ত্র সংকলন

ফিক্'হ্শাস্ত্রের সংকলন, মসলা-মাসায়েলের সমাধান তথা ফতওয়ার বিন্যাস ইসলামের একটি বাস্তব প্রয়োজনীয় বিষয় ছিল। ইসলাম জাযীরাতু'ল-'আরব (আরব উপদ্বীপ) থেকে বহির্গত হয়ে শাম, ইরাক, মিসর, ইরান ও অন্যান্য বিস্তৃত ও উর্বর ভূ-খণ্ডে পৌঁছে গিয়েছিল। ফলে সামাজিকতা, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা সব কিছুই বিস্তৃত ও জটিল আকার ধারণ করে। ঐসব নিত্য নতুন অবস্থা ও সমস্যার ক্ষেত্রে ইসলামের মূলনীতির প্রয়োগ ও পথ প্রদর্শনের জন্য উন্নত প্রতিভা, যে কোন ব্যাপার উপলব্ধি করবার মত ক্ষমতা, সূক্ষ্মদর্শিতা, জীবন ও সমাজ সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান, মানবীয় প্রবৃত্তি ও তার দুর্বলতা সম্পর্কে অবহিতি, কওমের অন্তর্গত বিভিন্ন শ্রেণী এবং জীবনের বিভিন্ন বিভাগ ও শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে জ্ঞান, ইসলাম পূর্বকালের ইতিহাস ও রিওয়ায়াত এবং শরীয়তের রূহ' সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা, নবী যুগ ও সাহাবায়ে কিরামের যমানার অবস্থাদি সম্পর্কে পূর্ণ অবহিতি এবং ইসলামের মূল জ্ঞানভাণ্ডার (কুরআন, হাদীছ, অভিধান ও ব্যাকরণের নিয়মাবলী)-এর ওপর পূর্ণ দখল থাকার প্রয়োজন অবশ্যই ছিল।

ইমাম চতুষ্টয় ও তাঁদের বৈশিষ্ট্য

এটি আল্লাহ্র একটি বিরাট দান (ফযল) এবং এই উম্মতের জন্য এক বিরাট সৌভাগ্যের ব্যাপার ছিল যে, এই বিরাট ও মহান কাজের জন্য এমন সব লোক ময়দানে অবতরণ করেন যাঁরা মেধা ও প্রতিভা, সাধুতা, ইখলাস ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইতিহাসের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য। এঁদের মধ্যে আবার চার ব্যক্তি— ইমাম

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর) দু'টি কিতাবে যতগুলো মুত্তাসিল, মরফু' রিওয়ায়াত আছে তা নিশ্চিতরূপেই সহীহ এবং উক্ত দু'টি কিতাবের নিসবত স্বীয় গ্রন্থকারদের ধারাবাহিকতা দ্বারা প্রমাণিত এবং যে ব্যক্তি এই দু'টি কিতাবকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করে সে বিদ'আতী এবং মু'মিন দলভুক্ত নয়।

আবূ হানীফা (মৃত্যু ১৫০ হি.), ইমাম মালিক (মৃ. ১৬৯ হি.), ইমাম শাফি'ঈ (মৃ. ২০৪ হি.) ও ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (মৃ ২৪১ হি.) ফিক্‌'হশাস্ত্রের চারটি চিন্তামূলক স্কুলের ইমাম ছিলেন। এদের ফিক্‌'হ এই মুহূর্ত পর্যন্ত মুসলিম জাহানে গৃহীত ও প্রচলিত। আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্ক, আল্লাহ্‌র জন্যই সব কিছু– এই মানসিকতা, আইনের উপলব্ধি, জ্ঞানের মধ্যে মগ্নতা, নিবিষ্টচিত্ততা ও খিদমত তথা সেবার প্রেরণায় ছিল এঁদের হৃদয় ভরপুর। এই মনীষিগণ তাঁদের গোটা জীবন ও সমস্ত যোগ্যতা এই মহান উদ্দেশ্য ও এই গুরুত্বপূর্ণ খিদমতের জন্য ওয়াক্‌'ফ করে দিয়েছিলেন। তাঁরা পার্থিব মর্যাদা, জাঁকজমক, স্বাদ-আহ্লাদ, আরাম-আয়েশ ও সুখ-শান্তির সঙ্গে কোনরূপ সম্পর্ক রাখেননি। ইমাম আবূ হানীফা (র)-কে দু'বার বিচারপতির পদ গ্রহণের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। তিনি তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান, এমন কি (এই অস্বীকৃতির ফলে) জেলখানায় তাঁর ইনতিকাল হয়। ইমাম মালিক (র) একটি মসলা[১] প্রকাশ করার দায়ে বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত হন। ইমাম শাফি'ঈ (র) জীবনের একটি বড় অংশ দুঃখ-কষ্ট ও সংকটের মাঝে অতিবাহিত করেন এবং নিজের স্বাস্থ্য কুরবান করে দেন। ইমাম আহমদ তৎকালীন হুকুমতের ভ্রান্ত প্রবণতা এবং সরকারী মত ও পথের মুকাবিলা করেন এবং স্বীয় মত ও পথ তথা আহলে সুন্নাহ্‌র তরীকার ওপর পাহাড়ের ন্যায় অটল থাকেন। এঁদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে ও বিষয়ে একাকী এত বেশি কাজ করেছেন এবং মসলা-মাসায়েল ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এমন বিরাট ভাণ্ডার সৃষ্টি করে গেছেন যা বড় বড় সুসংগঠিত জামা'আত ও শিক্ষা সংস্থার পক্ষেও সহজসাধ্য নয়। ইমাম আবূ হানীফা (র) তিরাশি হাযার মসলা নিজ মুখে বর্ণনা করেন যেগুলোর ভেতর আটত্রিশ হাযার 'ইবাদতের সাথে এবং পঁয়তাল্লিশ হাযার পারস্পরিক লেনদেনের সাথে সম্পর্কিত।[২]

শামসু'ল-আইম্মা কারদারী লিখেছেন : ইমাম আবূ হানীফা (র) যে পরিমাণ মসলা সংকলন করেছিলেন তার সংখ্যা হবে ছয় লাখ।[৩] 'আল-মুদাওওয়ানা' নামক ইমাম মালিক (র)-এর ফতওয়ার সংকলনগ্রন্থে ছত্রিশ হাযার মসলা ছিল। ইমাম

---

১. মসলা এই ছিল যে, যবরদস্তিমূলকভাবে বা মজবুর অব'ায় প্রদত্ত তালাক নির্ভরযোগ্য নয়। এই মসলার রাজনৈতিক দিক ছিল এই যে, খলীফাদের জন্য যেই বায়'আত নেওয়া হ'ত তাতে বলা হ'ত ঃ যদি বায়'আত ভাঙা হয় তাহলে বিবি তালাক হয়ে যাবে। যদি মজবুর অব'ায় প্রদত্ত তালাক কোন মূল্য বহন না করে– তাহলে বায়'আতের হলফনামারও কোন গুরুত্ব থাকে না, থাকে না কোন শক্তি ও প্রভাব। এরই ভিত্তিতে হুকুমত ইমাম মালিক (র)-এর ফতওয়ায় অ'ির হয়ে ওঠে এবং তাঁর প্রতি রূঢ় আচরণ করে।

২. ফজরু'ল-ইসলাম (মক্কীর মানাকি'বে আবী হ'ানীফার হাওয়ালাসহ, পৃ. ৯৬), ২য় খণ্ড, ১৮৮পৃ.।

৩. সীরাতু'ন-নু'মান (মাওলানা শিবলীকৃত), "ক'ালাইদ 'উকূ'দু'ল 'ইক'য়ান" গ্রন্থের বরাতে।

শাফি'ঈ (র)-এর 'কিতাবু'ল-উম্ম' সাতটি বিরাট খণ্ডে বিভক্ত ছিল। আবূ বকর খাল্লাল (মৃ. ৩১১ হি.) ইমাম আহ'মদ (র)-এর মসলা-মাসাইল চল্লিশ খণ্ডে সংকলিত করেন।১

ইমাম চতুষ্টয়ের শিষ্য-শাগরিদ ও খলীফাবৃন্দ

অতঃপর ইমাম চতুষ্টয় এমন বিশিষ্ট সব শিষ্য-শাগরিদ লাভ করেন যাঁরা এই ভাণ্ডার আরও সমৃদ্ধ করেন এবং সেগুলো বিন্যাস ও বিন্যস্তকরণের কাজ অব্যাহত রাখেন। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর শাগরিদগণের মধ্যে ইমাম আবূ য়ূসুফ (র)-এর মত আইন বিষয়ক প্রতিভা দৃষ্টিগোচর হয়– যিনি হারূনুর-রশীদের বিশাল সাম্রাজ্যের কাযীউ'ল-কুযাত (প্রধান বিচারপতি)-এর দায়িত্ব লাভ করেন এবং ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার মূলনীতির ওপর 'কিতাবু'ল-খারাজ'-এর মত জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ রচনা করেন। এভাবেই তাঁর শাগরিদ মধ্যে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর ন্যায় ফকীহ ও গ্রন্থ প্রণেতা এবং ইমাম যুফার (রা)-এর ন্যায় সুক্ষদর্শী তার্কিকও ছিলেন, যাঁরা হানাফী ফিক্'হকে সমৃদ্ধ ও গৌরবোজ্জ্বল আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইমাম মালিক (র) 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন ওয়াহ্ব, 'আবদুর রহমান ইব্নু'ল-কাসিম, আশহাব ইব্ন 'আবদুল আযীয, 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আবদুল হিকাম, ইয়াহয়া ইব্ন ইয়াহয়া আল-লায়ছীর ন্যায় বিশ্বস্ত শাগরিদ ও বিখ্যাত 'আলিম লাভ করেন, যাঁদের প্রচেষ্টায় মিসর ও উত্তর আফ্রিকায় মালিকী ফিক্'হ বিস্তার লাভ করে। ইমাম শাফি'ঈ (র) বুওয়ায়তী, মুযানী ও রবী'র ন্যায় পরিশ্রমী ও প্রতিভাবান শাগরিদ লাভ করেন যাঁরা শাফি'ঈ ফিক্'হ প্রণয়ন ও বিন্যস্ত করেন। ইমাম আহমদ (র)-এর ফিক্'হ ইব্ন কু'দামার ন্যায় গ্রন্থকার ও মুহাক্কিক 'আলিম লাভ করে যিনি "আল-মুগ'নী"র মত 'আজীমুশ্বান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন যা ইসলামী ফিক্'হের বিস্তৃত ভাণ্ডারে বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে।

ফিক্'হ সংকলনের ফায়দা

ইসলামের প্রাথমিক শতাব্দীগুলোতে ফিক্'হশাস্ত্রের এই সব ইমাম ও মুজতাহিদ 'আলিম-'উলামার আবির্ভাব এই ধর্মের জীবনীশক্তি এবং উম্মতের কৃতিত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড ও যোগ্যতারই দলীল। তাঁদের প্রচেষ্টা ও মেধা দ্বারা মুসলিম উম্মার কর্মমুখর ও পারস্পরিক লেনদেন সম্পর্কিত জীবনে একটি শৃঙ্খলা ও ঐক্যের

১. এই গ্রন্থের নাম আল-জামি'উল-'উলূম লি ইমাম আহ'মদ। আবূ বকর খাল্লালের সম্পর্কে জানতে শায'ারাতু'য'-য'াহাব ফী আখবার মিনা'য'-য'াহাব দ্র. ২য় খণ্ড, ৩৬১ পৃ.।

সৃষ্টি হয় এবং মানসিক বিক্ষিপ্ততা, সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যস্ত অবস্থার হাত থেকে এই উম্মাহ্ রক্ষা পায়। তাঁরা ফিক্‌'হ্শাস্ত্রের এমন মযবুত বুনিয়াদ কায়েম করেন এবং এমন মূলনীতি প্রণয়ন ও বিন্যস্ত করেন যেগুলোর মধ্যে পরবর্তীতে আগত মসলা-মাসাইল ও অসুবিধাদির সমাধান এবং সাধারণ ভারসাম্যপূর্ণ জীবনকে নিয়মিত ও শর'ঈ নেতৃত্বের নির্দেশনায় পরিচালনা করার পথ-নির্দেশ রয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

খাল্‌ক -ই-কুরআনের ফিতনা এবং ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র)

ঐশী-দর্শন, তাঁর সত্তা ও গুণাবলী সংক্রান্ত বাহাছ

দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমেই গ্রীক দর্শনের সঙ্গে মুসলমানদের পরিচয় ঘটে। এই দর্শন কেবল কতিপয় অনুমান ও কষ্ট-কল্পনার একটা জগা-খিচুড়ি ও শব্দসমষ্টির একটি মোহনীয় ইন্দ্রজাল ছাড়া কিছুই ছিল না। না ছিল এর কোন হাকীকত ও আসলীয়ত, আর না ছিল এর কোন বাস্তব ও মৌলিক ভিত্তি। এমনি একটি দর্শনের পক্ষে একটি অসীম সত্তার বাস্তবতা ও গুণাবলীর বর্ণনা দেওয়া কি সম্ভব? আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব এবং তাঁর সত্তা ও গুণাবলীর বিষয়টি কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মিশ্রণ ও যোগফল এবং কোন জ্ঞানগর্ভ সূক্ষ্ম আলোচনা ও কষ্ট-কল্পনার বিষয় নয়। এ ব্যাপারে মানুষের জ্ঞানের মাধ্যম কেবল আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালামের দেয়া তথ্য তথা আল্লাহ্‌র প্রেরিত ওয়াহী অর্থাৎ ওয়াহী দ্বারাই কেবল আল্লাহ্‌র সঠিক পরিচয় এবং তাঁর সিফাত বা গুণাবলীর হাকীকত জানা যেতে পারে। মুসলমানদের নিকট কুরআন ও হাদীছ আকারে সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত জ্ঞান বর্তমান ছিল এবং তাদের এই অলাভজনক পেশার (ঐশী সংক্রান্ত বাহাছ-মুবাহাছার) আদৌ কোন প্রয়োজন ছিল না। সাহাবায়ে কিরাম, তাবি'ঈন, আইম্মায়ে দীন ও মুহাদ্দিছকুল এই পথ ও মতের ওপরই কায়েম ছিলেন এবং মুসলমানদের সমগ্র মনোযোগ ইসলামের দা'ওয়াত ও জিহাদ, কর্মজীবনের সমস্যাদির সমাধান, উপকারী ও কল্যাণকর জ্ঞানের উদ্ভাবন ও সংকলনকার্যে ব্যস্ত ছিল। যখন গ্রীক ও সুরিয়ানী গ্রন্থের তরজমা হ'ল এবং প্রাচীন ধর্ম ও রাষ্ট্রগুলোর জ্ঞানী-গুণী ও মুতাকাল্লিমদের সঙ্গে মুসলমানদের মেলামেশা শুরু হ'ল তখন মুসলিম উম্মার সেই অংশটি– যারা খুব তাড়াতাড়ি প্রভাবিত হবার মত, যাদের মেধা ও ধীশক্তির মধ্যে গভীরতা ও পরিপক্কতার স্থলে ছিল ভাসা-ভাসা জ্ঞান ও নতুনত্বের প্রতি আকর্ষণ– তারা উক্ত চিন্তাধারা, আলোচনা ও বিতর্ক পন্থা দ্বারা প্রভাবিত হয়। এর পরিণামে আল্লাহ তা'আলার যাত ও সিফাত তথা তাঁর সত্তা ও গুণাবলী, সেগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক, আল্লাহ্‌র কালাম, আল্লাহ্‌র দর্শন, ন্যায়বিচারের সমস্যা, তকদীর ও বাধ্যতামূলক ও ইচ্ছাধীন বিষয়াবলী সম্পর্কে এমন সব বিতর্ক ও মসলা-মাসাইলের

সৃষ্টি হয় যা না ধর্মের দিক দিয়ে জরুরী ছিল, আর না পার্থিব ও জাগতিক দিক দিয়েই উপকারী, বরং তা ছিল উম্মার ঐক্য ও সংহতি এবং মুসলমানদের কর্মশক্তির পক্ষে চরম ক্ষতিকর।

মু'তাযিলাদের উত্থান

ধর্মীয় দার্শনিকদের এই দলের নেতৃত্ব করছিলেন মু'তাযিলারা, যাঁরা তাঁদের যুগের 'প্রগতিশীল' জ্ঞানী ও আবেগোদ্দীপক মুতাকাল্লিম ছিলেন। তাঁরা জ্ঞানগত আলোচনা-সমালোচনাকে কুফ্‌র ও ঈমানের মানদণ্ডে পরিণত করেন এবং নিজেদের সমগ্র প্রতিভা ও মেধাকে ঐসব বাহাছ-মুবাহাছার মধ্যেই নিয়োজিত করেন। তাঁদের প্রতিপক্ষ ছিলেন মুহাদ্দিছ ও ফকীহগণ, যাঁরা এসব মসলার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বুযুর্গ ও মনীষীদের মতের সমর্থক ছিলেন। তাঁরা মুতাকাল্লিমদের বিতর্কমূলক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়াবলীকে চরম ক্ষতিকর এবং তাদের টীকা-টিপ্পনীকে ভুল ও ভ্রান্ত মনে করতেন। খলীফা হারূনুর-রশীদের খিলাফত আমল পর্যন্ত মু'তাযিলাদের উত্থান ঘটেনি। খলীফা মা'মূনের যুগে, যিনি গ্রীক দর্শন ও বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন এবং বিশেষ রকমের প্রশিক্ষণ ও অবস্থার কারণে যাঁর মস্তিষ্কগত কাঠামোর সাথে মু'তাযিলাদের বেশ মিল ছিল– মু'তাযিলাদের উত্থান ঘটে। কাযী ইব্‌ন আবী দাউদের বদৌলতেও যিনি 'আব্বাসীয় সালতানাতের কাযীউ'ল-কুযাত (প্রধান বিচারপতি) ছিলেন এবং মু'তাযিলা মতবাদ ও চিন্তাধারার একজন উৎসাহী দা'ঈ ও মুবাল্লিগ ছিলেন– মু'তাযিলা মতবাদ হুকুমতের পৃষ্ঠপোষকতা ও আনুকূল্য লাভ করে। মা'মূনের মধ্যে স্বয়ং দা'ওয়াতী রূহ', একজন দা'ঈর আবেগ-উদ্দীপনা ও তবলীগী জযবা বর্তমান ছিল। তাঁর ভেতর প্রতিভাবান ও ধীশক্তিসম্পন্ন যুবকের তাড়াহুড়ো স্বভাব[১] এবং স্বৈরাচারী একনায়কের জিদ– দু'টোরই সমাবেশ ঘটেছিল। তাঁর দরবার ও মেযাজ-মর্জির ওপর মু'তাযিলা মতবাদ আসন গেড়ে বসেছিল।

খাল্‌ক'-ই-কুরআনের 'আকীদা[২] সে সময় মু'তাযিলাদের পরিচিতি এবং কুফ্‌র ও ঈমানের মাপকাঠিতে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। মুহাদ্দিছীন কিরাম এই মসলার

১. একবার তিনি হযরত 'আলী (রা)-এর ফযীলতের প্রকাশ্য ঘোষণা দেন যার জন্য বেশ উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। একবার তিনি মুত'আ বিয়ে জায়েয বলে এলান করেন। এরপর কাযীউ'ল-কুযাত ইয়াহয়া ইব্‌ন আকছাম তাঁকে জ্ঞানগর্ভ আলোচনার মাধ্যমে বুঝিয়ে দিলে তিনি একে হারাম ঘোষণা করেন।

২. খাল্‌ক'-ই-কুরআন সংক্রান্ত আলোচনা ও বিতর্ক একটি বিশেষ জ্ঞানগর্ভ দার্শনিক আলোচনা যার মস্তিষ্কজাত প্রভাবে (যেমন কতক মু'তাযিলাবাদী ঐতিহাসিক স্বীকার করেছেন) (পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

ক্ষেত্রে মু'তাযিলাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিপক্ষ ছিলেন এবং তাঁদের পক্ষ থেকে ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) এই মসলা-সংক্রান্ত যাবতীয় ঝুঁকি বুক পেতে নিয়েছিলেন।

ইমাম আহ্মদ ইবন হাম্বল (র)

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র) ১৬৪ হিজরীর রবী'উ'ল-আওয়াল মাসে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নির্ভেজাল আরব বংশোদ্ভূত এবং শায়বানী গোত্রের লোক ছিলেন। ধৈর্য, মনোবল, সাহস, দৃঢ়তা ও অটুট সংকল্প ছিল এই গোত্রের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য।[১] তাঁর দাদা হাম্বল ইব্ন হেলাল বসরা থেকে খুরাসানে স্থানান্তরিত হন। উমায়্যা হুকুমতে তিনি সারাখ্স এলাকার শাসনকর্তাও ছিলেন। কিন্তু 'আব্বাসীয়রা যখন আহলে বায়ত ও বনী হাশিম-এর নামে খুরাসানে তাদের দা'ওয়াতের বিস্তার ঘটায় তখন তিনি এই দা'ওয়াতের প্রতি সহানুভূতিশীল হন। ইমাম আহমদের মাতা যখন মার্ভ থেকে বাগদাদ আগমন করেন তখন তিনি মাতৃগর্ভে ছিলেন। জন্মের পূর্বেই পিতা ইনতিকাল করেন। মাতা তাঁকে অত্যন্ত সাহসিকতা ও মনোবলের সঙ্গে লালন-পালন করেন। জীবিকা নির্বাহের জন্য নামকা-ওয়াস্তে সামান্য স্থাবর সম্পত্তি ছিল। এসব অবস্থা তাঁর ভেতর ধৈর্য, সহনশীলতা, অটুট মনোবল ও আত্মবিশ্বাসের ন্যায় অমূল্য গুণাবলীর সৃষ্টি করে। তিনি শৈশবেই কুরআন মজীদ হেফ্জ করেন এবং ভাষা শিক্ষা করেন। অতঃপর একটি দফতরে কাজ নেন। লেখা ও রচনার অনুশীলনীই ছিল এর মুখ্য উদ্দেশ্য। মৌলিকত্ব ও যোগ্যতার 'আলামত শৈশব থেকেই তাঁর মধ্যে পরিস্ফুট ছিল। তাঁর চাচা বাগদাদের সংবাদলিপিকার ছিলেন। খলীফার অবর্তমানে তিনিই চিঠি-পত্রাদি লিখতেন এবং সংবাদাদি প্রেরণ করতেন। একবার তিনি একটি লিখিত লিপি তাঁর অল্প বয়সী ভাতিজার হাতে সোপর্দ করেন এবং নির্দিষ্ট এক ব্যক্তিকে তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য বলেন। তিনি (ইমাম আহমদ) এই ধারণায় যে, এর ভেতর সম্ভবত

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর) কুরআন মজীদের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা এবং তাঁর শব্দগত ও অর্থগত দিক দিয়ে আল্লাহ্র কালাম হবার 'আকীদা দুর্বল হয়ে যায়। মুহাদ্দিছীন কিরাম মু'তাযিলাদের সে সব ব্যাখ্যাকে গলদ এবং উম্মতের জন্য ক্ষতিকর মনে করতেন। এজন্য ইমাম আহমদ এর প্রকাশ্য বিরোধিতা করেন। মু'তাযিলারা প্রগতিশীল চিন্তার অধিকারী এবং স্বাধীন মতামতের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন-কারী হিসাবে মশহুর ছিলেন। কিন্তু তাঁরা এ ব্যাপারে ভীষণ বাড়াবাড়ি, ধর্মীয় ক্ষেত্রে জোর-যবরদস্তি ও শক্তি প্রয়োগ করেন এবং নিজেদের অপরিণামদর্শিতা দ্বারা গোটা মুসলিম বিশ্বকে যুদ্ধক্ষেত্রে ও পরীক্ষা কেন্দ্রে পরিণত করেন। তাঁরা এই মসলার ব্যাপারে বিরোধীদের সঙ্গে সেই ব্যবহার করেন যা মধ্যযুগে গির্জার পাদরীকুল মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের সঙ্গে করেছিলেন। শেষাবধি এই শক্তি প্রয়োগ এবং তৎকালীন হুকুমতের পৃষ্ঠপোষকতাই মু'তাযিলা মতবাদ ও চিন্তাধারা খোদ মু'তাযিলাদের অধঃপতনের কারণ হয়।

১. সিদ্দিকী খিলাফতের প্রখ্যাত সিপাহসালার মুছান্না ইব্ন হারিছা (রা)-র সম্পর্ক এই গোত্রের সঙ্গেই ছিল।

বাগদাদবাসী সম্পর্কে অভিযোগ ও গোয়েন্দা রিপোর্ট রয়েছে, লিপিটি দজলা (টাইগ্রীস) নদীতে নিক্ষেপ করেন। যখন তিনি দফতরে চিঠি- পত্রাদি লেখার অনুশীলন করতেন তখন বহু মহিলা, যাদের স্বামী খলীফা হারূনুর রশীদের সঙ্গে ফৌজে বাইরে গিয়েছিল, তাঁকে দিয়ে চিঠি-পত্র পড়িয়ে নিত এবং জওয়াবও লিখিয়ে নিত। তিনি তাদের চিঠিপত্র লিখে দিতেন, কিন্তু যে সব চিঠির বিষয়বস্তুকে তিনি শরীয়তের কিংবা শালীনতার পরিপন্থী মনে করতেন– তা লিখতেন না। তাঁর তাক'ওয়া ও পবিত্রতা, যোগ্যতা ও মৌলকত্বের চিহ্ন দৃষ্টে সে যুগের একজন জ্ঞানী ব্যক্তি (হায়ছাম ইবন জামীল) বলেছিলেন যে, যদি এই যুবক বেঁচে থাকে তাহলে যুগের অধিবাসীদের জন্য স্বয়ং একটি দলীল হবে।[১]

ধর্মীয় 'ইল্‌ম-এর ভেতর তিনি হাদীছের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেন। সর্বাগ্রে কাযী আবূ য়ূসুফ (র) থেকে হাদীছ লিপিবদ্ধ করেন।[২] অতঃপর চার বছর পর্যন্ত বাগদাদে হাদীছের ইমাম হায়ছাম ইব্‌ন বশীর ইব্‌ন আবূ হাযিম আল-উস্তার নিকট (মৃত্যু ১৮২ হি.[৩]) শিক্ষা গ্রহণ করেন। এই সময় হাদীছের মশহূর ইমাম 'আবদুর রহমান ইব্‌ন মাহদী, আবূ বক্‌র ইব্‌ন 'আয়্যাশ (র) প্রমুখ থেকেও তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন। স্বীয় লক্ষ্যে তিনি কতখানি দৃঢ় ও তৎপর ছিলেন তা তাঁর মৌখিক উক্তি থেকেই পরিমাপ করা যায়। একদা তিনি বলেছিলেন ঃ আমি কোন কোনদিন হাদীছ শুনবার জন্য এত ভোরে শয্যা ত্যাগ করতাম যে, আমার মা আমার কাপড়ের প্রান্ত ধরে বলতেন ঃ কিছুটা অপেক্ষা কর, অন্তত আযান হয়ে যাক এবং চারদিক কিছুটা ফর্সা হয়ে উঠুক।

বাগদাদে শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি বসরা, হিজায, য়ামান, শাম ও জযীরা সফর করেন এবং এর প্রতিটি স্থান থেকেই হাদীছের সবক গ্রহণ করেন।

১৮৭ হি. তে হিজাযে ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর সঙ্গে তাঁর মোলাকাত হয়। এরপর বাগদাদে দ্বিতীয়বার মোলাকাত হয় যখন তিনি তাঁর উসূল (মূল নীতি) ও ফিক্'হসহ অনেক কিছুই সংকলন ও সম্পাদন করে ফেলেছিলেন। ইমাম আহমদ (র) তখন বেশ পাকাপোক্ত হয়ে উঠেছিলেন। ইমাম শাফি'ঈ (র) হাদীছের সুস্থতা ও অসুস্থতার ব্যাপারে অধিকাংশ সময় তাঁর ওপর নির্ভর করতেন এবং বলতেন ঃ মুহাদ্দিছীনের নিকটে যে হাদীছটি বিশুদ্ধ ও সঠিক মনে হয় আমাকে সেটি বলে দেবেন, আমি তাই ইখতিয়ার করব।

---

১. তারীখ-ই-হাফিজ যাহাবী (তরজমা-ইমাম আহমদ আহমদ ইব্‌ন হাম্বল)।
২. মানাকিব লি ইব্‌ন আল-জাওযী, ২৩ পৃ.।
৩. ঐ, ২৩ পৃ.।

তিনি জরীর ইব্‌ন 'আবদুল হামীদ-এর নিকট থেকে হাদীছ শুনবার জন্য 'রে' (বর্তমান ইরানে) যাবার নিয়ত করেন। কিন্তু ব্যয় সংকুলানের মত অর্থ না থাকায় যেতে পারেননি। তিনি বলতেন, "আমার নিকট যদি ৯০টি দিরহামও থাকত তা হলেও আমি চলে যেতাম।" হাদীছ অনুসন্ধানের ব্যাপারে তাঁর উচ্চ মনোবলের পরিচয় এ থেকেও পাওয়া যাবে যে, ১৯৮ হি.-তে তিনি হজ্জের উদ্দেশ্যে হিজায গমন করেন। সেখানে কিছুদিন অবস্থান করার পর 'আবদুর রাযযাক ইব্‌ন হুমামের নিকট হাদীছ শুনবার জন্য য়ামানের সান'আ নামক স্থানে গমনের নিয়ত করেন এবং সহপাঠী ইয়াহয়া ইব্‌ন মা'ঈন-এর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করলে তিনিও ঐ একই সংকল্প নেন। উভয়ে মক্কা গমন করেন। তাঁরা তাওয়াফে কদূম করছিলেন। এমন সময় হঠাৎ 'আবদুর রাযযাক ইব্‌ন হুমাম তাঁদের দৃষ্টিপথে পতিত হন। ইব্‌ন মা'ঈন তাঁকে চিনতেন। তিনি সালাম পেশ করেন এবং ইমাম আহমদকে তাঁর সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি তাঁর জন্য দু'আ' করেন এবং বলেন, "আমি তাঁর খুব ত'রীফ শুনেছি।" ইয়াহ্য়া ইব্‌ন মা'ঈন বলেন, "আমরা আগামীকাল আপনার খিদমতে হাযির হব এবং আপনার থেকে হাদীছ শুনব।" ইয়াহয়া চলে যাবার পর ইমাম আহমদ স্বীয় বন্ধুকে বলেন, "তুমি শায়খের সঙ্গে কেন ওয়াদাবদ্ধ হলে?" ইব্‌ন মা'ঈন বলেন, "হাদীছ শোনার এই সুযোগ পাওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় কর। কেননা তিনি তোমাকে গমনে এক মাসের দীর্ঘ সফর ও প্রত্যাবর্তনে আরো এক মাসের দীর্ঘ সফর এবং সেই সাথে বিরাট অংকের অর্থ ব্যয়ের হাত থেকে বাঁচালেন এবং শায়খকে এখানেই পৌঁছিয়ে দিলেন।" ইমাম আহমদ উত্তরে বলেন, "আল্লাহ্‌র নিকট আমি লজ্জাবোধ করছি এই ভেবে যে, হাদীছের জন্য সফরের নিয়ত করলাম, আবার তা ভেঙেও ফেললাম। আমরা নিশ্চয় য়ামান যাব এবং সেখানে গিয়েই হাদীছ শুনব।" অনন্তর তিনি হজ্জ উদ্‌যাপনের পর সান'আ গমন করেন এবং যুহরী ও ইবনু'ল-মুসায়্যিবের রিওয়ায়াতসমূহ (যা তিনি ইতোপূর্বে শোনেন নি) সেখানেই শ্রবণ করেন।[১]

উন্নত মনোবল, কঠোর পরিশ্রম, দীর্ঘ সফরের কষ্ট-সহিষ্ণুতা এবং অতুলনীয় স্মৃতিশক্তির ফলে তাঁর দশ লক্ষ হাদীছ মুখস্থ ছিল। বিস্তৃত জ্ঞান ও প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর ফিক্‌হশাস্ত্র সম্পর্কিত জ্ঞান, মসলা ও তার সমাধান খুঁজে বের করবার পদ্ধতি ও অন্যান্য মেধা দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তিনি বলতেন ঃ ما رائيت عيناى مثله (আমার চোখ তাঁর মত আর

---

১. ইব্‌ন কাছীর ও ইব্‌ন জাওযী।

াউকে দেখেনি)। তিনি তাঁর (ইমাম শাফি'ঈর) কাছ থেকে ইজতিহাদের উসূল থা মূলনীতি আয়ত্ত করেন এবং এ ব্যাপারে যোগ্যতা ও পরিপক্বতা অর্জন রেন। শেষাবধি তিনি এই উম্মতের নামকরা সেই সব মুজতাহিদের মধ্যে রিগণিত হন যাঁদের ফিক্‌'হ্ আজও মুসলিম বিশ্বে জীবিত ও প্রচলিত। ইমাম ফি'ঈ (র)-ও তাঁর গুণের বড় কদর করতেন এবং স্বীকৃতি দিতেন। বাগদাদ থকে যাবার সময় তিনি বলেছিলেন ঃ

خرجت من بغداد وما خلفت بها اتقى وافقه من ابن حنبل .

অর্থাৎ "আমি এই অবস্থায় বাগদাদ পরিত্যাগ করছি যে, এখানে আহমদ ইব্‌ন হাম্বল অপেক্ষা অধিক মুত্তাকী ও ফকীহ্ আর কেউ নেই।"

চল্লিশ বছর বয়সে সম্ভবত ২০৪ হিজরীতে তিনি হাদীছের দর্‌স প্রদান রতে শুরু করেন। এটিও তাঁর সুন্নতের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের পরিচায়ক ছিল যে, তিনি চল্লিশ বছর বয়সে– যা নবুওত লাভের বয়স হিসাবে খ্যাত– প্রচার শুরু রেন।[১] প্রথম থেকেই তাঁর দর্‌স মাহফিলে ছাত্র ও শ্রোতৃবৃন্দের প্রচণ্ড ভীড় হ'ত। কতক বর্ণনাকারীর মতে তাঁর দর্‌স মাহফিলের শ্রোতার সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাযার 'ত যাদের ভেতর লেখকের সংখ্যাই হ'ত পাঁচ শতের মত। তাঁর দর্‌স মাহফিল বই মর্যাদাপূর্ণ ও গম্ভীর হ'ত। কেউ সেখানে খেল-তামাশার কথা কিংবা হাল্কা ও টুল কাজ-কর্ম– যা হাদীছের মর্যাদার খেলাফ– কখনো করতে পারত না। তাঁর জলিসে আমীর-উমারা ও দুনিয়াদার লোকদের তুলনায় গরীব ও দীন-দরিদ্র লাকদের অধিকতর সম্মান ও মর্যাদা ছিল। 'আল্লামা যাহাবী ইমাম আহমদের একজন বন্ধু ও সমসাময়িকের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন ঃ

لم ار الفقير فى مجلس اعز منه فى مجلس الى عبد الله - كان مائا
اليهم - مقصراً عن اهل الدنيا - وكان فيه حلم ولم يكن بالعجول - وكا
كثير التواضع تعلوه السكينة والوقار اذا جلس فى مجلسه الفتيا بعد
العصر لايتكلم حتى يسئال .

ইমাম আহমদের দর্‌সের মজলিসে গরীবের যে সম্মান ও মর্যাদা আমি দেখেছি– তা অন্য কোথাও দেখিনি। তিনি সর্বদা গরীবের প্রতি মনোযোগী থাকতেন এবং আমীর-উমারাকে উপেক্ষা করতেন। তিনি হিল্‌ম (ভদ্রতা, নম্রতা ও দয়া)-এর অধিকারী ছিলেন। তাঁর মেযাজে তাড়াহুড়ো ছিল না। অত্যন্ত বিনয়ী ও নম্র মেযাজের ছিলেন তিনি। তৃপ্তি ও মর্যাদা তাঁর চেহারায় পরিস্ফুট ছিল। 'আসরের পর যখন তিনি দর্‌স প্রদানের জন্য বসতেন–

. মুহাম্মদ আবূ যাহরাকৃত, ইব্‌ন হাম্বল, ৩৩-৩৪ পৃ.।

যতক্ষণ না তাকে প্রশ্ন করা হ'ত– ততক্ষণ তিনি কোন আলোচনা করতে না।[১]

তাঁর জীবন ছিল পূর্ববর্তী বুযুর্গ ইমামদের ন্যায় দারিদ্র্য, যুহ্‌দ, আল্লাহ্‌র প্রতি তাওয়াক্কুল ও অল্পে তুষ্টির জীবন। তাঁর এই দারিদ্র্য ছিল ইচ্ছাকৃত। তিনি তৎকালীন কোন খলীফা কিংবা সুলতানের কোন দান গ্রহণ করেননি। তাঁর সন্তানেরা কখনও এই বিষয়টির ওপর আলাপ-আলোচনা করতে চাইলে তিনি বলতেন ঃ এই মাল হালাল, এর দ্বারা হজ্জ করাও দুরস্ত; একে আমি হারাম মনে করে নয়, বরং অধিকতর পরহেযগারী ও সতর্কতার কারণেই পরিত্যাগ করি। তিনি পরিশ্রম করে কিংবা পিতা ও পিতামহের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির আয় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন। এইরূপ দারিদ্র্য ও কষ্টেসৃষ্টের জীবন সত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত দানশীল, মুক্তহস্ত ও উন্নত মনোবলের অধিকারী ছিলেন। তিনি বলতেন যদি সারা দুনিয়া গুছিয়ে এসে একটি লুকমায় (গ্রাসে) পরিণত হয় এবং সে লুকমাটি কোন মুসলমানের হাতে হয়, আর সেই মুসলমানটি উক্ত লুকমা অপর কোন মুসলমানের মুখে রেখে দেয়, তাহলে তা কোন মাত্রাধিক কাজ হবে না। তিনি কেবল সম্পদের বেলায়ই নয়– বরং নিজের ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কেও খুবই উদার ও উন্নত মানসিকতার অধিকারী ছিলেন। একবার এক লোক তাঁকে খুব বকা-ঝকা করে। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই সে লজ্জিত হয় এবং তাঁর কাছে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করে। তখন তিনি বলেন ঃ যেখানে এই কথা হয়েছিল সেখান থেকে কদম ওঠাবার পূর্বেই আমি তোমাকে মাফ করে দিয়েছি। খাল্‌ক'-ই কুরআনের ফিতনায় সকল দুশমনকে, এমন কি সে যুগের খলীফা, যার নির্দেশে তিনি কঠোরতম সাজা পেয়েছিলেন– তাকেও ক্ষমা করে দেন। তিনি বলতেন ঃ আমি বিদ'আতের দিকে আহ্বানকারী ছাড়া অন্য সবাইকে মাফ করি, এমন কি যারা আমাকে কষ্ট প্রদানের ক্ষেত্রে শরীক ছিল– তারাও আমার অভিযোগ থেকে মুক্ত। তিনি বলতেন "তোমাদের এতে কি লাভ যে, তোমাদের কারণে কোন মুসলমানকে কষ্ট দেওয়া হয়?"

এত সব কামালিয়াত ও গুণাবলীর অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কোনরূপ গর্বিত বাক্য তাঁর মুখ দিয়ে উচ্চারিত হ'ত না। তাঁর সঙ্গী ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মা'ঈন বলেন

ما رايت مثل احمد بن حنبل صحبته خمسين سنة ما افتخر علينا بشئ مما كان فيه من الصلاح والخير .

১. তরজমাতু'ল-ইমাম, ৩৫ পৃ.।

আমি আহমদ ইব্ন হাম্বলের মত কোন লোক দেখিনি। আমি পঞ্চাশ বছর তাঁর সঙ্গী ছিলাম। তিনি কখনো আমাদের সামনে নিজের যোগ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে গর্ব করেন নি।[১]

তাঁর বিনয় ও নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখবার অবস্থা ছিল এই যে, যদিও তিনি উচ্চ ংশীয় আরব ছিলেন (এটা সে যুগে একটা বিরাট গর্বের বিষয় ছিল), তবু তিনি এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা মোটেই পছন্দ করতেন না। 'আল্লামা যাহাবী তাঁর একজন সমসাময়িক 'আলিম আবূ নু'মান থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, "আহমদ ইব্ন হাম্বল আমার নিকট তাঁর খরচের টাকা রেখে দিয়েছিলেন এবং আবশ্যক মত তিনি তা থেকে নিতেন। একদিন আমি তাঁকে বললাম ঃ আবূ 'আবদুল্লাহ! আমি জনেছি যে, আপনি আরব। তিনি জওয়াব দিলেন ঃ يا ابا النعمان! نحن قوم مساكين ওহে আবূ নু'মান! আমরা বিত্তহীন গরীব মানুষ। আমি তাঁকে এ ব্যাপারে মনেক জিজ্ঞাসাবাদ করলাম, কিন্তু তিনি বরাবরই উত্তর এড়িয়ে গেলেন, এমন কি কান উত্তরই দিলেন না।"

খাল্ক'-ই-কুরআনের ফিতনায় তাঁর দৃঢ়-চিত্ততার কারণে গোটা মুসলিম জাহানে তাঁর ধর্মপরায়ণতার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। লোকে তাঁর প্রশংসা করত এবং তাঁর দু'আ নিত। এতদ্সত্ত্বেও তিনি নিজ সত্তা সম্পর্কে সর্বদা ভীত থাকতেন। মুরূযী বলেন ঃ একদিন আমি তাঁকে বললাম যে, আপনাকে উপলক্ষ করে ব্যাপকভাবে দু'আ হচ্ছে। তিনি বললেন ঃ না জানি ইস্তিদরাজ[২] হয়, এই আমার আশঙ্কা। কেন, তুমি এটা কিভাবে বললে? আমি বললাম ঃ তরতাউস থেকে এক ব্যক্তির আগমন ঘটেছে। সে বলেছে, "আমরা রূম দেশে জিহাদ করছিলাম। রাত্রের নীরবতার মাঝে আহমদের জন্য দু'আর শব্দ ভেসে এল। কেউ যেন বলছে, আহমদের জন্য দু'আ কর। আমরা ইমাম আহমদের পক্ষ থেকে নিয়ত করে মিনজানীকও চালাতাম। একবার এমন হ'ল যে, শত্রুপক্ষীয় এক লোক কেল্লার দেওয়ালের ওপর দাঁড়িয়েছিল এবং তার ঢালকে আড়াল বানিয়ে রেখেছিল। আহমদের পক্ষ থেকে নিয়ত করে আমি মিনজানীক চালালাম। সঙ্গে সঙ্গে ঐ লোকটির মাথা ও ঢাল উড়ে গেল।" এই কথা শুনে ইমাম আহমদ (র)-এর চেহারা পরিবর্তিত হয়ে যায়। তিনি বলে ওঠেন ঃ আল্লাহ করুন, এ যেন ইস্তিদরাজ না হয়।

---

১. হি'লয়্যাতু'ল-আওলিয়া, ৯ম খণ্ড, ১৮১ পৃ.।
২. আল্লাহ্র তরফ থেকে ঢিলা ও অবকাশপ্রাপ্ত কোন অপ্রিয় বদ 'আকীদাসম্পন্ন লোকের কারামত ও সৌন্দর্যের প্রকাশ।

তাঁকে দেখবার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে অমুসলিমরা পর্যন্ত ছুটে আসত একবার একজন 'ঈসায়ী (খৃস্টান) চিকিৎসক তাঁর চিকিৎসার জন্য আসেন চিকিৎসক বললেন ঃ আমি কয়েক বছর যাবত আপনার যিয়ারত লাভের প্রত্যাশ ছিলাম। আপনার জীবন কেবল ইসলামের জন্য নয়, বরং গোটা সৃষ্টজগতের জন্য কল্যাণ ও বরকতের কারণ। আমাদের সকল বন্ধু-বান্ধব আপনার ওপর খুব খুশি মুরূযী বলেন যে, সে যখন চলে গেল তখন আমি আরয করলাম ঃ আমার ধারণ যে, গোটা ইসলামী বিশ্বে আপনার জন্য দু'আ হয়ে থাকে। তিনি বললেন, "ভাই মনুষের সামনে যখন তার নিজস্ব হাকীকত দিবালোকের ন্যায় উদ্ভাসিত হয়ে যায়- তখন যে যা-ই বলুক- সে প্রতারিত হয় না।"[১]

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে বিনয় ও দারিদ্র্যের সাথে এই পরিমাণ প্রভাব ও মর্যাদা দান করেছিলেন যে, সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ ও সিপাহীরাও তাঁকে দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ত এবং তাঁকে সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনে বাধ্য হ'ত। তাঁর এক সমসাময়িক বলেন ঃ আমি ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (নায়েব বাগদাদ) ও অমুক অমুক শাসকের নিকট গিয়েছি। কিন্তু আমি ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলের চেয়ে অধিক প্রভাবশালী ও প্রতাপান্বিত আর কাউকে পাইনি। আমি একবার একটি মসলা নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে যাই। আমার ওপর তাঁর ভয়াবহ ব্যক্তিত্বের এমনই প্রভাব পড়ে যে, আমি ভীত হয়ে পড়ি। তাঁর যুগের সকল নিষ্ঠাবান লোক তাঁর মর্যাদার স্বীকৃতি দিত এবং তাঁকে সমীহ করত। সে যুগের 'আলিম-'উলামা ও ইমামগণ তাঁর গভীর ও বিস্তৃত জ্ঞানের কথা স্বীকার করতেন। মশহূর মুহাদ্দিছ ইবরাহীম আল-হারবী বলেন ঃ

رايت احمد بن حنبل فرأيت كان الله جمع له علم الاولين والاخرين من كل صنف يقول ماشاء ويمسك ماشاء .

আমি আহমদ ইব্ন হাম্বলকে দেখেছি। মনে হ'ত যেন আল্লাহ তা'আলা তাঁর বক্ষে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল প্রকার জ্ঞান জমা করে দিয়েছেন। তিনি যা চাইতেন, প্রকাশ করতেন আর যা চাইতেন, বুকের মাঝে লুকিয়ে রাখতেন।[২]

ইমাম আহমদের যুহ্দ ছিল প্রবাদবাক্যের মত। খলীফা মামূন, মু'তাসিম ও ওয়াছিকের যুগ তাঁর জন্য এই দিক দিয়ে পরীক্ষার ছিল যে, এই তিনজনই তাঁর জীবনের বৈরী ছিলেন। মুতাওয়াক্কিলের যুগও এই হিসাবে পরীক্ষার ছিল যে,

১. তরজমাতু'ল-ইমাম আহমদ (যাহাবী), ২১-২২ পৃ.।
২. মানাকি'ব ইবন জাওযী, মানাকি'ব হাফিজ যাহাবী, তাবাক'াত ইবনু'স- সুবকী।

খলীফা তাঁর ভক্ত ও নেহায়েত কদরদান ছিলেন। তাঁর নিকট এই যুগের পরীক্ষাটা ছিল আরও কঠিন ও শক্ত ধরনের এবং এর থেকে তিনি বেশি ভীত থাকতেন। কখনো কখনো বলতেন যে, ওদের দেয়া কষ্ট ও শাস্তি সত্ত্বেও আমার দীন ছিল নিরাপদ। এখন বৃদ্ধকালে এই দ্বিতীয় পরীক্ষার মাঝে নিক্ষিপ্ত হয়েছি। কিন্তু যেভাবে খলীফা মু'তাসিমের কষাঘাত তাঁর সুন্নতকে দৃঢ়তার সাথে আঁকড়ে ধরার মাঝে কোন পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারেনি, ঠিক তেমনি খলীফা মুতাওয়াক্কিলের ভক্তি-শ্রদ্ধাও তাঁর পার্থিব অনীহা ও আল্লাহ্‌র প্রতি তাওয়াক্কুলের ভেতর কোন পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়নি। একবার খলীফা মুতাওয়াক্কিল টাকা ভর্তি একটি বিরাট থলি খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন। তিনি পরিষ্কার ভাষায় তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এবং বলেন ঃ এতে আমার কোন প্রয়োজন নেই। আনয়নকারী বলল যে, ফেরত দেওয়া ঠিক হবে না। কেননা অনেক কষ্টে খলীফার মনকে আপনার সম্পর্কে বিদ্বেষমুক্ত করা গেছে। অস্বীকৃতির ফলে পুনরায় তার মনে খারাপ ধারণা বাসা বাঁধতে পারে। তিনি থলি এক জায়গায় রেখে দেন। গভীর রাতে তিনি তাঁর চাচাকে ডেকে পাঠান এবং বলেন ঃ এই থলির কারণে সারা রাত আমার ঘুম হয়নি। আমি ও নিয়ে খুব বিব্রত ও পেরেশানির মধ্যে আছি। তিনি আরও বলেন ঃ এখন রাত্রি অর্ধেক, লোকজন ঘুমে বিভোর; সকালে আপনার যা ভাল মনে হয় করবেন। সকালেই তাঁর চাচা কতক বিশ্বস্ত ও জানাশোনা লোককে ডেকে আনেন এবং নেককার ও দরিদ্র লোকদের একটি তালিকা তৈরি করে সমুদয় অর্থ-কড়ি তাদের মধ্যে বিতরণ করে দেন। এমন কি থলিটিও একজন দুঃস্থ লোককে দান করেন।[১]

খলীফা মুতাওয়াক্কিলের নির্দেশ ও পীড়াপীড়িতে কিছুদিনের জন্য তিনি সেনা ছাউনিতে অবস্থান করেন। সে সময় তিনি শাহী মেহমান ছিলেন। দৈনিক তাঁর জন্য যে খাবার আসত তার মূল্য ছিল আনুমানিক এক শ' বিশ দিরহাম, অথচ কোনদিনই তিনি সে খাবার গ্রহণ করেননি। তিনি অব্যাহতভাবে রোযা রাখতে থাকেন। একাদিক্রমে তিনি আট দিন পর্যন্ত রোযা রাখেন। ফলে তিনি খুবই দুর্বল হয়ে পড়েন। যদি সত্বর তিনি বিদায়ের অনুমতি না পেতেন তাহলে সে যাত্রা তাঁর জীবন বাঁচানোই কঠিন হয়ে পড়ত।[২] তাঁর পুত্র 'আবদুল্লাহ বলেন, "আমার পিতা ষোল দিন সেনা ছাউনিতে ছিলেন। তিনি এই সময়ে প্রয়োজনের এক-চতুর্থাংশ ছাতু খেয়ে থাকতেন। তাঁর চোখে কাল দাগ পড়ে গিয়েছিল।" মুতাওয়াক্কিলের

---

১. তরজমাতু'ল-ইমাম আহমদ, হাফিজ যাহাবীকৃত. ৬০ পৃ.;
২. প্রাগুক্ত ৬১ পৃ.।

পীড়াপাড়িতে তাঁর সন্তানদের জন্যও শাহী ভাতা নির্ধারিত হয়েছিল। তবে এ ক্ষেত্রে তিনি দারুণ সতর্ক ছিলেন। তাঁর পুত্র বলেন ঃ প্রথমে তো আমার পিতা কখনো কখনো আমাদের এখান থেকে দরকারী জিনিস চেয়ে নিতেন। কিন্তু যখন থেকে শাহী অর্থ আমাদের ঘরে আসতে শুরু করল তখন তিনি আর কোন জিনিসই আমাদের কাছ থেকে চেয়ে নেননি। একবার ডাক্তার তাঁকে কচুর পানি খাওয়ার পরামর্শ দেন। লোকেরা বলেন, "এটি সালেহ (ইমাম আহমদের পুত্র)-এর চুলা থেকে পাকিয়ে নাও। চুলা এখনও গরম আছে।" তিনি তাতে অস্বীকৃতি জানান।[১] অবশেষে শুধু নিজের সতর্কতাই তিনি যথেষ্ট মনে করেননি। সালেহ বলেন ঃ তিনি আমাকে একদিন বললেন, "সালেহ! আমার মন চায় যে, তোমরা এই শাহী উপঢৌকন নেওয়া একেবারে বন্ধ করে দাও। কেননা আমার কারণেই তোমরা এসব পাচ্ছ।"

৭৭ বছর বয়সে তিনি রোগাক্রান্ত হন। শুশ্রূষাকারী ও দর্শনার্থীদের ভীড় এত বেশি ছিল যে, তাদের দ্বারা ঘর সব সময় ভরে থাকত। একদল গেলে আর একদল আসত, এমন কি রাস্তা-ঘাটও থাকত জনাকীর্ণ। নয় দিন তিনি অসুস্থ ছিলেন। ভীড় ক্রমাগত বাড়তে থকে। বিষয়টি সুলতানের কর্ণগোচর হলে তিনি দরজা ও গলিতে পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করেন। তিনি যাতে প্রতিনিয়ত ইমামের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখতে পারেন সেজন্য একজন লোক নিয়োগ করেন। ঐ লোক তাঁকে সবকিছু লিখে জানাত। ভীড় প্রতি মুহূর্তে বেড়েই চলেছিল। শেষাবধি গলিও বন্ধ করে দিতে হ'ল। লোকজনে রাস্তা ও মসজিদ ভরে গেল, এমন কি বাজারে কেনা-বেচা করাও কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল। শেষ পর্যন্ত ইমামের পেশাবে রক্তের চিহ্ন দেখা গেল। চিকিৎসককে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন ঃ শোক-দুঃখ ও চিন্তা-ভাবনা তাঁর পেট টুকরো টুকরো করে দিয়েছে।[২] বৃহস্পতিবার তাঁর স্বাস্থ্যের আরও অবনতি ঘটে। তাঁর শাগরিদ মুরূযী বলেন ঃ আমি তাঁকে ওযু করালে তিনি কষ্টের অবস্থায়ও আমাকে হিদায়াত করলেন, "আঙ্গুলগুলো খেলাল করাও।" জুম'আর রাত্রিতে তাঁর অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়ে এবং ১২ই রবি'উল-আওয়াল[৩] জুমু'আর দিন তিনি ইনতিকাল করেন।[৪]

১. তরজমাতু'ল-ইমাম আহমদ, যাহাবীকৃত, ৬৪ পৃ.
২. ঐ, ৭৭ পৃ.
৩. বুখারী, তরীখে কবীর ও সগীর;
৪. জানাযা ও কাফনের বিস্তারিত বিবরণ সম্মুখে আসবে।

ফিতনা-ই-খাল্‌কে' কু'রআন

খলীফা মামূন খাল্‌কস্থ-ই-কু'রআন মসলার ব্যাপারে তাঁর গোটা মনোযোগ নিবদ্ধ করেন। ২১৮ হি.-তে তিনি বাগদাদের শাসনকর্তা ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম-এর নামে একটি বিস্তারিত ফরমান প্রেরণ করেন। এতে সাধারণ মুসলমানদেরকে, বিশেষ করে মুহাদ্দিছীন-ই-কিরামকে কঠোর নিন্দা ও অশ্রদ্ধাপূর্ণ সমালোচনা করা হয়। খাল্‌ক'-ই কুরআন 'আকীদার সঙ্গে বিরোধিতা করার কারণে তাঁদের তওহীদের 'আকীদা ত্রুটিপূর্ণ, সাক্ষ্য মরদূদ ও অনির্ভরযোগ্য বলে ঘোষণা করেন এবং তাঁদেরকে 'উম্মতের দুষ্টচক্র' আখ্যা দেন। তিনি শাসনকর্তাকে হুকুম দেন, "যে সমস্ত লোক এই মসলার ব্যাপারে আমাদের অনুকূলে না আসবে তাদেরকে তাদের পদ থেকে অপসারণ করুন এবং এ ব্যাপারে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন।" [১]

এই ফরমান মামূনের মৃত্যুর চার মাস পূর্বের। এর কপি সমস্ত মুসলিম প্রদেশে পাঠানো হয় এবং সুবাদার (গভর্নর)-দের নির্দেশ দেওয়া হয় ঃ এই মসলার ব্যাপারে নিজ নিজ প্রদেশের কাযীদের পরীক্ষা নেওয়া হোক এবং যারা এই 'আকীদার সঙ্গে একমত না হবে তাদেরকে তাদের পদ থেকে অপসারণ করা হোক।

এই ফরমানের পর মামূন বাগদাদের শাসনকর্তাকে লেখেন ঃ এই 'আকীদার বিরোধীদের নেতৃস্থানীয় সাত জন বড় মুহাদ্দিছকে আমার নিকট পাঠিয়ে দাও। মুহাদ্দিছগণ আগমন করলে মামূন তাঁদেরকে খাল্‌ক'-ই-কুরআন সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। সকলেই তাঁর সঙ্গে এ ব্যাপারে একমত হন। অতঃপর খলীফা তাঁদেরকে বাগদাদে ফেরত পাঠিয়ে দেন। সেখানে তারা 'উলামা ও মুহাদ্দিছদের একটি সমাবেশে নিজেদের এই 'আকীদার পক্ষে বিবৃতি দেন। এত কিছু সত্ত্বেও হাঙ্গামা অব্যাহত থাকে এবং সাধারণ মুসলমান ও সকল মুহাদ্দিছীন নিজস্ব 'আকীদায় কায়েম থাকেন।

ইনতিকালের পূর্বে মামূন ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীমকে তৃতীয় ফরমান পাঠান। এতে একটু বিস্তারিতভাবে তিনি তাঁর প্রথম পত্রের বিষয়বস্তু বর্ণনা করেছিলেন ও পরীক্ষা-বৃত্ত আরও বিস্তৃত করে সাম্রাজ্যের প্রশাসনের উচ্চস্তরের সদস্যবৃন্দ এবং জ্ঞানী-গুণী সকলকেই এর অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন। এই 'আকীদায় বিশ্বাস স্থাপন সবার জন্যই জরুরী বলে তিনি ঘোষণা করেছিলেন। ইসহাক মশহূর

১. এই পত্রের পূর্ণাঙ্গ বিষয়বস্তু 'তারীখে তাবারী' ও তায়ফুরের 'তারীখে বাগদাদ'-এ বর্তমান।

'উলামায়ে কিরামকে একত্র করে এই শাহী ফরমান সম্পর্কে তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন এবং তাঁদের জওয়াব ও পারস্পরিক কথাবার্তা বাদশাহকে লিখে জানান। মামূন এই চিঠি পেয়ে ভীষণ ক্রুদ্ধ হন এবং সেই সমস্ত 'উলামায়ে কিরামের মধ্য থেকে দু'জন (বাশার ইব্নু'ল-ওয়ালীদ ও ইবরাহীম ইবনু'ল-মাহ্দী)-কে হত্যার নির্দেশ দেন। উপরন্তু তিনি লিখেন ঃ অবশিষ্টদের মধ্য থেকে যেই নিজ মতে যিদ ধরে থাকবে তাকে পায়ে বেড়ি দিয়ে আমার নিকট পাঠিয়ে দেবে। এতদ্‌সত্ত্বেও বাকি ত্রিশজন 'উলামার মধ্য থেকে (যাঁরা প্রথমে স্বীকার করেন নি) চারজন নিজ মতে (কুরআন সৃষ্ট নয়– এই মতে) কায়েম থাকেন। এই চারজন ছিলেন ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল, সাজ্জাদাহ্, ক'ওয়ারিরী ও মুহাম্মদ ইবন নূহ। দ্বিতীয় দিন সাজ্জাদাহ্ এবং তৃতীয় দিন ক'ওয়ারিরী স্বীয় মত পরিবর্তন করেন। স্রেফ ইমাম আহমদ ও মুহাম্মদ ইবন নূহ অবশিষ্ট থাকেন, যাঁদেরকে তরতাউসে খলীফা মামূনের নিকট হাতকড়ি ও পায়ে বেড়িসহ পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাঁদের সঙ্গে অন্যান্য স্থানের উনিশজন 'উলামা ছিলেন, যাঁরা খাল্ক'-ই কুরআন মতবাদের অস্বীকারকারী এবং কুরআন সৃষ্ট বস্তু নয়, এই মতের অনুসারী ছিলেন। এই সমস্ত লোক কেবল রুক্কা পৌঁছেছিলেন– এমন সময় মামূনের ইনতিকালের খবর এসে পৌঁছে। অতএব, তাঁদেরকে বাগদাদের শাসনকর্তার নিকট ফেরত পাঠানো হয়। পথিমধ্যে মুহাম্মদ ইব্ন নূহ্ ইনতিকাল করেন। ইমাম ও তাঁর বন্ধু-বান্ধব বাগদাদে পৌঁছেন।

মামূন তাঁর স্থলাভিষিক্ত মু'তাসিম বিন রশীদকে ওসিয়ত করেছিলেন, যেন সে কুরআন সম্পর্কে তাঁর মত ও 'আকীদার ওপর কায়েম থাকে এবং তাঁর অনুসৃত নীতি যেন অনুসরণ করে (وخذ بسيرة اخيك فى القران)। উপরন্তু সে যেন কাযী ইব্ন আবী দাউদকে পূর্বের মতই পরামর্শদাতা ও উযীর পদে বহাল রাখে। মু'তাসিম এই দু'টি ওসিয়তের ওপর পুরোপুরি আমল করেন।

বিপদ-আপদ ও পরীক্ষার মাঝে ইমাম আহমদ (র)

এখন খাল্ক'-ই-কুরআনের বিরোধিতা, সহীহ ও বিশুদ্ধ 'আকীদার সমর্থন এবং তৎকালীন হুকুমতের সঙ্গে মুকাবিলার সম্পূর্ণ যিম্মাদারী একাকী ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বলের ওপর এসে বর্তায় যিনি সে যুগের মুহাদ্দিছগণের ইমাম এবং সুন্নাহ ও ইসলামী শরীয়তের আমানতদার ছিলেন।

ইমাম আহমদকে রুক্কা থেকে বাগদাদ আনা হয়। তাঁর পায়ে ছিল চার চারটি বেড়ি। তিনদিন পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে এই মসলা নিয়ে বিতর্ক চলে। কিন্তু তিনি তাঁর

'আকীদা এতটুকু পরিবর্তন করেননি। চতুর্থ দিনে বাগদাদের শাসনকর্তা সমীপে তাঁকে পেশ করা হয়। শাসনকর্তা বলেন ঃ আহমদ ! তোমার জীবন অত্যন্ত বিপন্ন। খলীফা কসম খেয়েছেন যে, যদি তুমি তাঁর কথা না মান তাহলে তিনি তোমাকে তলোয়ার দ্বারা কতল করবেন না বটে, তবে তোমার ওপর মারের পর মার আসবে এবং তোমাকে এমন জায়গায় নিক্ষেপ করা হবে, যেখানে কখনো সূর্যের মুখ দেখতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত ইমামকে খলীফা মু'তাসিমের সম্মুখে পেশ করা হয়। তিনি তাঁর মতে অনড় থাকেন। খলীফা তাঁকে ২৮টি বেত্রাঘাতের নির্দেশ দেন। একজন প্রাণবন্ত জল্লাদ কেবল দু'টো বেত মারত, এর পর অন্য জল্লাদ ডেকে আনা হ'ত। প্রতিটি বেত্রাঘাতের সঙ্গে ইমাম আহমদ (র) বলতেন :

اعطونى شيئاً من كتاب الله او سنة رسوله حتى اقول به .

আমার সামনে আল্লাহ্‌র কিতাব কিংবা রাসূলের সুন্নাহ পেশ কর; তাহলে আমি মেনে নেব।

ইমাম আহ্‌মদ (র)-এর মুখে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ

ইমাম আহমদ (র) উক্ত ঘটনা স্বয়ং বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ

আমি যখন বাবু'ল-বুস্তান নামক স্থানে পৌঁছুলাম, তখন আমার জন্য সওয়ারী আনা হ'ল এবং আমাকে সওয়ার হবার হুকুম দেওয়া হ'ল। আমার পায়ে ছিল শিকলের ভারী বোঝা। অথচ এমন কেউ ছিল না যে, তাকে অবলম্বন করে সওয়ার হই। এই অবস্থায় আরোহণের চেষ্টা করতে গিয়ে কয়েকবার হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে বেঁচে গেলাম। শেষ পর্যন্ত কোনমতে আরোহণ করলাম এবং মু'তাসিমের মহলে গিয়ে পৌঁছুলাম। আমাকে একটি কুঠরীতে ঢুকিয়ে দরওয়াজা বন্ধ করে দেওয়া হ'ল। অর্ধেক রাত্রে তায়াম্মুম করার উদ্দেশ্যে আমি অন্ধকারে হাত বাড়ালাম। সেখানে কোন প্রদীপ ছিল না, তবে পানির একটি পেয়ালা ও তশতরী রাখা ছিল। আমি ওযু করলাম এবং নামায পড়লাম। পরের দিন মু'তাসিমের দূত এল এবং আমাকে খলীফার দরবারে নিয়ে গেল। মু'তাসিম উপবিষ্ট ছিলেন। কাযীউ'ল-কুযাত ইব্ন আবী দাউদও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে তার চিন্তাধারার অনুসারী একটি বিরাট জনসমষ্টিও ছিল। 'আবদুর রহমান আশ-শাফি'ঈও উপস্থিত ছিলেন। আমি তাঁকে বললামঃ ইমাম শাফি'ঈ থেকে মসেহ সম্পর্কে তোমার কিছু মনে পড়ে? ইব্ন আবী দাউদ বললেন ঃ লোকটাকে দেখ! এখনই যার গর্দান উড়িয়ে দেয়া হবে

সে কিনা মসলা তাহ্'ক্বীক' (পর্যালোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণ) করছে।

মু'তাসিম বললেন ঃ ওকে আমার নিকট নিয়ে এস। তিনি অনবরত আমাকে তার নিকট ডাকতে থাকলেন, এমন কি আমি তার খুব কাছে গিয়ে পৌঁছুলাম। তিনি আমাকে উপবেশন করতে বললেন। আমি পায়ের বেড়ির ভারে ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েছিলাম। অল্পক্ষণ একটু জিড়িয়ে তাকে বললাম ঃ আমার কি কথা কইবার অনুমতি আছে? খলীফা বললেন ঃ বলো। আমি বললাম ঃ আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, আল্লাহ্‌র রসূল কোন্ জিনিসের দা'ওয়াত দিয়েছিলেন? অল্পক্ষণ চুপ থেকে নিজে থেকেই বললাম, لا إله إلا الله -এর সাক্ষ্য দেবার; তা আমি সেই সাক্ষ্যই দিচ্ছি । এরপর বললাম ঃ আপনার মহান দাদা হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন যে, যখন কবিলা 'আবদুল কায়সের প্রতিনিধিদল আঁ-হযরত (সা)-এর খিদমতে হাযির হয় তখন তারা ঈমান সম্পর্কে রসূল (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিল। তিনি বলেছিলেন ঃ তোমরা কি জান ঈমান কি? তারা বলল ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন ঃ এই কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ্ ভিন্ন আর কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্‌র রাসূল, সালাত আদায়, যাকাত প্রদান এবং মালে গণীমতের এক-পঞ্চমাংশ নির্ধারিত রাখা। তখন মু'তাসিম বললেন ঃ যদি আমার পূর্ববর্তীদের হাতে আগেই না পড়তে তাহলে আমি তোমার সঙ্গে সংঘর্ষে আসতাম না। এরপর 'আবদুর রহমান ইব্‌ন ইসহাকের দিকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ আমি কি তোমাকে আগেই হুকুম দেইনি যে, এই পরীক্ষা শেষ করে ফেল। তখন আমি বললাম ঃ আল্লাহু আকবার! এতে তো মুসলমানদের জন্য বিস্তৃতি ও ঔদার্য রয়েছে। খলীফা তখন উপস্থিত 'আলিমদের লক্ষ্য করে বললেন ঃ তাঁর সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হও এবং আলোচনা কর। অতঃপর 'আবদুর রহমানকে বললেন, এর সঙ্গে আলোচনা কর।

আলোচনা আরম্ভ হ'ল। একজন কথা বলত, আমি জওয়াব দিতাম। অপরজন কথা বলত, আমি তারও জওয়াব দিতাম। মু'তাসিম তখন বলতেন ঃ আহমদ! তোমার ওপর খোদা রহম করুক! তুমি এ কী বলছ? আমি বলতাম ঃ আমীরু'ল মু'মিনীন! আমাকে আল্লাহ্‌র কিতাব কিংবা রাসূলের সুন্নত থেকে কোন প্রমাণ দেখান, আমিও আপনার সাথে একমত হব। মু'তাসিম তখন বললেন ঃ যদি এ আমার কথা কবুল করে নেয় তাহলে আমি নিজ হাতে তাঁকে আযাদ করে দেব, স্বীয় ফৌজ ও লশকরসহ তাঁর কাছে যাব এবং তাঁর

আস্তানায় গিয়ে হাযির হব। এরপর বললেন ঃ আহমদ! আমি তোমার ওপর খুবই স্নেহশীল এবং তোমার প্রতি আমার খেয়াল ও আকর্ষণ তেমনি যেমনি আমার সন্তান হারূনের প্রতি। তুমি একী বলছ! আমি সেই একই জওয়াব দিলাম ঃ আমাকে আল্লাহ্‌র কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নত থেকে কোন প্রমাণ দেখাও, আমিও তোমাদের কথা স্বীকার করে নেব। এভাবে যখন খুব দেরী হয়ে গেল তখন খলীফা দারুণ বিরক্ত হলেন এবং আমাকে যেতে বললেন। এর পর আমাকে কয়েদ করা হ'ল এবং পূর্বের স্থানেই ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। পরের দিন পুনরায় আমাকে ডাকা হ'ল এবং বিতর্ক চলতে থাকল। আমি সকলের প্রশ্নের জবাব দিতে থাকলাম। এভাবে বেলা পড়ে গেল। তখন খলীফা বিরক্ত হয়ে বললেন ঃ একে নিয়ে যাও! তৃতীয় রাত্রে আমি মনে করলাম যে, আজ কিছু একটা হবেই। আমি রশি চেয়ে নিয়ে তা দিয়ে আমার পায়ের বেড়ি কষে বাঁধলাম। ইযারবন্দের সাহায্যে আমি যে বেড়ি বেঁধে রেখেছিলাম– কোন কঠিন মুহূর্ত এসে পড়লে উলঙ্গ হয়ে পড়ি– এই ভয়ে তা খুলে পুনরায় পায়জামায় পরে নিলাম। তৃতীয় দিন আমাকে পুনরায় ডেকে পাঠানো হয়। আমি বিভিন্ন দেউড়ি ও আঙ্গিনা অতিক্রম করতে করতে অগ্রসর হলাম। কিছু লোক তলোয়ার নিয়ে, আবার কিছু লোক কোড়া হাতে দাঁড়িয়েছিল। ভরা দরবার। গত দু'দিনের অনেক লোকই আজ ছিল না। আমি যখন মু'তাসিমের নিকট পৌঁছুলাম তখন তিনি বললেন ঃ বসে পড়। এরপর বললেন ঃ এর সঙ্গে বিতর্কে অবতরণ কর এবং আলোচনা চালাও। লোকেরা বিতর্ক জুড়ে দিল। আমি একের জওয়াব দিতাম, তার পর অন্যের। তবে সকলের ওপরেই ছিল আমার কণ্ঠস্বর। এভাবে যখন দেরী হয়ে গেল তখন খলীফা আমাকে আলাদা করে নিয়ে একান্তে কিছু কথা বললেন। তিনি বললেন ঃ আহমদ! তোমার ওপর খোদা রহম করুন! আমার কথা মান্য কর। আমি তোমাকে নিজ হাতে মুক্ত করে দেব।[১] আমি পূর্বের ন্যায়ই জওয়াব দিলাম। এতে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন ঃ একে পাকড়াও করে হিচড়াতে থাক এবং তার হাত উপড়ে ফেল। এই বলে তিনি সিংহাসনে গিয়ে বসলেন। তখন জল্লাদ পায়ে বেড়ি লাগাবার লোকগুলোকে ডাকল। খলীফা তখন জল্লাদদেরকে বললেন ঃ অগ্রসর হও। একজন অগ্রসর হ'ল এবং আমাকে দুটো কোড়া লাগাল। মু'তাসিম বললেন ঃ জোরে কোড়া লাগাও। এরপর প্রথম ব্যক্তি সরে

১. মু'তাসিম ইমাম আহমদের ব্যাপারে নরম হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু আহমদ ইবন দাউদ বরাবর তাকে উত্তেজিত করে তুলছিলেন এই বলে যে, মু'তাসিম তাঁর ভাই মামূনের পথ থেকে সরে যাচ্ছেন।

গেল এবং আর একজন আসল। সেও দু'টো কোড়া মারল। উনিশ কোড়া মারার পর মু'তাসিম আমার নিকট এলেন এবং বললেন ঃ আহমদ! কেন নিজের জীবন নিয়ে এভাবে খেলছ? আল্লাহ্‌র কসম! তোমার জন্য আমার মমতা আছে। 'আজীফ নামীয় এক ব্যক্তি তখন আমাকে তলোয়ারের হাতল দিয়ে বিরক্ত ও উৎপীড়ন করছিল এবং বলছিল ঃ তুমি এদের সবার ওপর বিজয়ী হতে চাচ্ছ? অপরজন বলছিল ঃ আল্লাহর বান্দা! খলীফা তোমার শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। অন্য আর একজন বলছিল ঃ আমীরু'ল-মু'মিনীন! রোযা রেখে আপনি রৌদ্রে দাঁড়িয়ে? মু'তাসিম বারবার আমার সঙ্গে কথা বলতেন এবং আমি তাঁকে সেই একই জওয়াব দিতাম। পুনরায় তিনি জল্লাদকে হুকুম দিতেন ঃ পূর্ণ শক্তিতে কোড়া মারো। এমতাবস্থায় আমার হুঁশ-জ্ঞান লোপ পেত। শেষ পর্যন্ত হুঁশ ফিরে পেতেই দেখতে পেলাম, আমার পায়ের বেড়ি খুলে দেওয়া হয়েছে। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি তখন বলল ঃ আমরা তোমাকে উল্টো মুখো করে মাটিতে ফেলেছি, তোমাকে মইডলা ডলেছি। আমি বললাম ঃ আমি কিছুই টের পাইনি।[১]

তুলনাহীন ইচ্ছাশক্তি ও দৃঢ়তা

এরপর আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র)-কে ঘরে পৌঁছে দেওয়া হয়। গ্রেফতারী থেকে রেহাই মুহূর্ত পর্যন্ত আটাশ মাস তিনি বন্দী দশায় কাটান। তাঁকে ৩৩টি থেকে ৩৪টি কোড়া লাগান হয়। ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুস'আব যিনি সিপাহীদের একজন ছিলেন, বলেন ঃ আমি আহমদের চেয়ে নির্ভীক ও সাহসী লোক আর দেখিনি। তাঁর দৃষ্টিতে আমাদের অস্তিত্ব ছিল একটি মাছির মত। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল বলেন ঃ আমি শুনেছি, ইমাম আহমদকে এমন শক্তভাবে কোড়া মারা হয় যে, যদি এর একটিও কোন হাতীর পিঠে পড়ত তাহলে হাতীও চিৎকার করে পালাত। ঘটনার একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেন ঃ ইমাম রোযাবস্থায় ছিলেন। আমি বললাম ঃ আপনি রোযাদার। অতএব জীবন বাঁচাবার জন্য এই 'আকীদা স্বীকার করে নেবার সুযোগ আপনার আছে। কিন্তু তিনি আমার কথার দিকে ভ্রূক্ষেপও করেন নি। একবার কঠিন পিপাসা লাগলে তিনি পানি চান। তাঁর সামনে বরফের পানির পেয়ালা রাখা হয়। তিনি তা হাতে নিলেন এবং কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখলেন। এরপর তা পান না করেই ফিরিয়ে দিলেন।[২]

১. যাহাবীর তারীখু'ল-ইসলাম, তরজমাতু'ল-ইমাম আহমদ, ৪১-৪২ পৃ. সংক্ষিপ্ত করে।
২. ঐ, ৪৯-৫০ পৃ.।

ইমাম তনয় বলেন ঃ ইনতিকালের সময়েও আমার পিতার শরীরে আঘাতের চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। আবুল 'আব্বাস আর-রাকী বলেন ঃ আহ্মদ যখন রুক্কাতে বন্দী ছিলেন তখন লোকেরা তাঁকে আত্মরক্ষার দিকটি বোঝাতে চেষ্টা করে এবং এ সম্পর্কে হাদীছও তাঁকে শোনায়। তিনি তখন বলেন ঃ খাব্বাবের হাদীছের কি জওয়াব আছে যেখানে বলা হয়েছে যে, প্রথম যুগে কতক লোক এমনও ছিল যাঁদের মাথার ওপরের দিক থেকে করাত চালিয়ে দেওয়া হ'ত; এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁরা তাঁদের দীন থেকে বিমুখ হ'ত না।

তাঁর এসব কথা শুনে লোকেরা নিরাশ হয়ে যায় এবং বুঝে নেয় যে, তিনি তাঁর পথ ও মত থেকে হটবেন না এবং সব কিছুই তিনি বরদাশত করতে প্রস্তুত রয়েছেন।

ইমাম আহ্মদ (র)-এর গৌরবময় কৃতিত্ব ও অবদান এবং তার বিনিময়

ইমাম আহ্মদ (র)-এর নজীরবিহীন অবিচলিত দৃঢ়তা প্রদর্শন ও ধৈর্যের ফলে এই ফিতনা চিরদিনের তরে খতম হয়ে যায় এবং মুসলমানরা একটি বিরাট ধর্মীয় বিপদ থেকে রক্ষা পায়। যে সমস্ত লোক এই ধর্মীয় পরীক্ষার মুহূর্তে তৎকালীন হুকুমতের সহযোগিতা করেছিল এবং সুযোগ-সন্ধানী ও স্বার্থ শিকারী মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিল তারা জনসাধারণের দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন হয়। তাদের ধর্মীয় ও জ্ঞানগত বিশ্বস্ততার কোন প্রভাবই বাকী থাকেনি। এর মুকাবিলায় ইমাম আহ্মদ (র)-এর শান-শওকত ও মর্যাদা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। সত্যপ্রিয়তা ও খোদাপ্রেম আহলে সুন্নত এবং বিশুদ্ধ 'আকীদাসম্পন্ন মুসলমানদের আলামতে পরিণত হয়। তাঁর একজন সমসাময়িক বুযুর্গ কুতায়বা বলেন ঃ

اذا رايت الرجل يحب احمد بن حنبل فاعلم انه صاحب السنة

যখন তুমি কোন লোককে আহ্মদ ইব্ন হাম্বলের প্রতি মুহব্বত পোষণ করতে দেখ তখন জেনো যে, সেই লোকটি সুন্নতের পাবন্দ।[১]

অপর একজন 'আলিম আহ্মদ ইব্ন ইবরাহীম আদ্দাওরাকীর উক্তি ঃ

من سمعتموه يذكر احمد بن حنبل بسوء فاتهموه على الاسلام

তুমি যদি কাউকে দেখতে পাও যে, সে আহ্মদ ইব্ন হাম্বল সম্পর্কে নিন্দাবাদ করছে, তাহলে তার ইসলাম সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করবে।[২]

---

১. যাহাবীর তারীখু'ল-ইসলাম, তরজমাতু'ল-ইমাম আহমদ, ৬১ পৃ.।

২. খতীবের তারীকে বাগদাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪২১।

ইমাম আহমদ তৎকালীন হাদীছশাস্ত্রের ইমাম ছিলেন। 'মুসনাদ' গ্রন্থের রচন ও সংকলন তাঁর বিরাট কীর্তি। তিনি ছিলেন মাযহাবের একজন মুজতাহিদ ও চিরস্থায়ী ইমাম। তিনি 'আবিদ ও যাহিদ ছিলেন। তাঁর এসব ফযীলত বাস্তব ক্ষেত্রে স্বীকৃত। তাঁর বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা ও ইমামতের মূল রহস্য তাঁর অটুট সংকল্প ও দৃঢ়তা, বিশ্বব্যাপী ফিতনার যুগে দীনের হেফাজত এবং স্বীয় যুগের সর্বাপেক্ষা বিরাট বাদশাহীর একাকী মুকাবিলা করার দুঃসাহস। তাঁর ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও চিরন্তন স্থায়িত্বের আসল কারণ এটাই।

اوازه خلیل زتعمیر کعبه نیست + مشهور شد ازان که در اتش نکونشت

তাঁর সমসাময়িকেরা যাঁরা সেই কোলাহলপূর্ণ যুগের ফিতনা দেখেছিলেন তাঁরা তাঁর এই কীর্তির মর্যাদা অত্যন্ত খোলা মনে স্বীকার করেছেন এবং এটিকে দীনের হেফাজত ও মকামে সিদ্দীক তথা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর সম্মানিত স্থানের সঙ্গে তা'বীর করেছেন। তাঁর সমসাময়িক ও একই উস্তাদের ছাত্র সে যুগের মশ্‌হূর মুহাদ্দিছ 'আলী ইব্‌ন আল-মাদীনী [যিনি ইমাম বুখারী (র)-এর বিখ্যাত উস্তাদ ছিলেন] বলেন ঃ

ان الله اعز هذا الدين برجلين ليس لهما ثالث ابو بكر ن الصديق يوم الردة واحمد بن حنبل يوم المحنه .

আল্লাহ্ পাক এই দীনের বিজয় ও হেফাজতের কাজ দু'জন লোক দ্বারা নিয়েছেন যাঁদের আর তৃতীয় নেই– ইসলাম বিমুখতার চেতনার (রিদ্দার) সময় আবূ বকর সিদ্দীক (রা) দ্বারা এবং খাল্‌ক'-ই-কুরআনের ফিতনার সময় ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল দ্বারা।[১]

এই মর্যাদা ও জনপ্রিয়তার ফল ছিল এই যে, যখন ২৪১ হি.-তে ইমামু'স-সুন্নাহ ইনতিকাল করলেন তখন সারা শহর ভেঙে পড়েছিল। ইতোপূর্বে আর কারো জানাযায় এত প্রচুর লোক সমাগম হয়নি। জানাযা আদায়কারীর সংখ্যা ছিল আট লক্ষ পুরুষ ও ষাট হাযার মহিলার মত।[২]

---

১. খতীবের তারীখে বাগদাদ, ৪র্থ খণ্ড, ৪১৮ পৃ.।
২. যাহাবীর তরজমাতু'ল-ইমাম আহমদ ও তারীখ-ই-ইব্‌ন খাল্লিকান।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মু'তাযিলা ফিতনা
এবং
ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী ও তাঁর অনুসারীবৃন্দ

মু'তাযিলাদের পাণ্ডিত্যসুলভ ক্ষমতা ও তাদের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া

খলীফা মু'তাসিম ও খলীফা ওয়াছিক-এর ইনতিকালে (যাঁরা মু'তাযিলা মতবাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন) মু'তাযিলাদের দাপট চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। খলীফা ওয়াছিকের স্থলাভিষিক্ত খলীফা মুতাওয়াক্কিল মু'তাযিলা মতবাদ সম্পর্কে অসন্তুষ্ট এবং মু'তাযিলাদের দুশমন ছিলেন। তিনি খুঁজে খুঁজে মু'তাযিলাদের ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির চিহ্নসমূহ মুছে ফেলেন এবং তাদেরকে হুকুমত থেকে উৎখাত করেন। কিন্তু বিদগ্ধ জনসভায় ও জ্ঞানের কেন্দ্রগুলোতে তখনো মু'তাযিলাদের প্রভাব অবশিষ্ট ছিল। খাল্‌ক'-ই-কুরআনের 'আকীদা তার শক্তি খুইয়েছিল বটে, তবে তার শাখা-প্রশাখা ও মসলা-মাসাইল তখনও তাজা ও জীবন্ত ছিল। মু'তাযিলারা তাঁদের মেধা, জ্ঞানগত যোগ্যতা ও নিজেদের কতক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বের কারণে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিলেন এবং বিচার ও ফতওয়া বিভাগ ছাড়াও হুকুমতের ভেতর কতক উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিলেন। হি. তৃতীয় শতকের মাঝখানে তাঁদের বেশ প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। সাধারণভাবে স্বীকার করা হয়ে থাকে যে, মু'তাযিলারা সূক্ষ্মদর্শী, ব্যাপক চিন্তাশীল ও বিশ্লেষক হয়ে থাকেন। বহু নব্য-বিদ্যার্থী ও খ্যাতিপ্রিয় যুবক মু'তাযিলা মতবাদকে ফ্যাশন হিসাবে গ্রহণ করেছিল। ইমাম আহমদ (র)-এর পর হাম্বলীদের ভেতর আর কোন শক্তিশালী জ্ঞানী ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের জন্ম হয় নি। মুহাদ্দিছীন ও তাঁদের সমমতাবলম্বী 'উলামায়ে কিরাম বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান তথা علوم عقلية (যুক্তিবিদ্যা), আলাপ-আলোচনা ও যুক্তিতর্কের নতুন পন্থার দিকে (যা মু'তাযিলা ও দার্শনিকদের প্রভাবে রেওয়াজ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছিল) লক্ষ্য ও মনোযোগ দেন নি। ফল এই দাঁড়িয়েছিল যে, বিতর্ক ও আলোচনা মজলিসে এবং দর্‌স মাহফিলগুলোতে মুহাদ্দিছীনে কিরামের এই জ্ঞানগত দুর্বলতা ও দর্শনের প্রাথমিক সূত্র সম্পর্কেও অজ্ঞতা অনুভূত হ'ত। এর মুকাবিলায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের

আলোচনা মাহফিলে মু'তাযিলাদের পাল্লা ভারী থাকত। যে সমস্ত লোক ধর্মের গভীর জ্ঞান রাখত না–তারা মু'তাযিলাদের উত্তম বাচনভঙ্গী, উপস্থিত বুদ্ধি তথা প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও জ্ঞানের সূক্ষাতিসূক্ষ বিষয়ের আলোচনা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হ'ত। এর ফল হয়েছিল এই যে, জাহিরী শরীয়ত ও প্রাচীনদের পথ ও মতের জ্ঞানগত মর্যাদা হারাচ্ছিল ও তাদের ওপর মানুষের অনাস্থা সৃষ্টি হচ্ছিল। খোদ মুহাদ্দিছীন-ই-কিরাম এবং তাঁদের ছাত্রদের ভেতর বহু লোক হীনমন্যতার শিকারে পরিণত হচ্ছিল এবং মু'তাযিলাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও দার্শনিকতা দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছিল। এই অবস্থা ধর্মীয় মর্যাদা ও সুন্নাহ্‌র ক্ষমতা লাভের ক্ষেত্রে ছিল খুবই বিপজ্জনক। কুরআন মজীদের তাফসীর ও ইসলামের 'আকাইদ ঐ সব লোক দেখানো দার্শনিক তার্কিকদের কাছে ছেলেদের হাতের খেলনায় পরিণত হতে চলেছিল। মুসলমানদের মধ্যে একটি ভ্রান্ত ও ক্রটিপূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তি ও ভাসা ভাসা দর্শন গ্রহণীয় হতে চলছিল। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল বুদ্ধির চর্চা ও পরিভাষার লড়াই। এই অবস্থার মুকাবিলা ও ক্রমবর্ধমান সয়লাব প্রতিরোধ করবার জন্য কেবল মুহাদ্দিছ ও হাম্বলীদের ধর্মীয় তেজস্বিতা ও জোশ, 'আবিদ ও যাহিদের যুহ্‌দ ও 'ইবাদত এবং ফক ীহদের ফতওয়া ও মসলা-মাসাইলের ক্ষেত্রে দক্ষতা ও উপস্থিত বুদ্ধি (استحضار) যথেষ্ট ছিল না।

সুন্নাহ্‌র মর্যাদা ও সম্ভ্রম রক্ষার জন্য একজন মহান ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন

এজন্য এমন একজন ব্যক্তিত্বের দরকার ছিল যাঁর মেধাগত যোগ্যতা মু'তাযিলাদের তুলনায় অনেক উচ্চ স্তরের, যিনি বুদ্ধিবৃত্তির গলি-ঘুপচি সম্পর্কে কেবল ওয়াকিফহালই নন, দীর্ঘকাল যাবত এ পথের পথিকও, যাঁর উন্নত ব্যক্তিত্ব ও মুজতাহিদসুলভ মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তি সে যুগের প্রচলিত দর্শনের পতাকাবাহীদের শুধু পরাভূত নয়, বরং বিস্মিতও করবে। যা-হোক, ইসলামের খিদমতের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে এমনি একজন ব্যক্তিসত্তার প্রয়োজন ছিল এবং শায়খ আবুল হাসান আশ'আরী ছিলেন সেই ব্যক্তিসত্তারই বাস্তব রূপ।

ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী (র)

নাম আবুল হাসান 'আলী, পিতার নাম ইসমা'ঈল, মশহূর সাহাবী হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-এর বংশধর। ২৬০ হিজরীতে বসরায় জন্ম হয়। পিতা ইসমা'ঈলের ইনতিকালের পর তাঁর মাতা আবূ 'আলী আল-জুব্বাঈকে বিবাহ করেন, যিনি ছিলেন সে সময়কার মু'তাযিলাদের ইমাম এবং মু'তাযিলা মতবাদের

মুখপাত্র। শায়খ আবুল হাসান তাঁর কোলে প্রশিক্ষণ পান এবং খুব সত্বর তাঁর নির্ভরযোগ্য বন্ধু ও সহযোগীতে পরিণত হন। আবূ 'আলী আল-জুব্বাঈ ভাল মুদাররিস ও লেখক ছিলেন। তবে বিতর্কে তাঁর খুব বেশি দক্ষতা ছিল না। এদিকে আবুল হাসান আশ'আরী শুরু থেকেই ভাষার ওপর দখল এবং উপস্থিত বুদ্ধির জন্য পরিচিত ছিলেন। এজন্য আবূ 'আলী বাহাছ ও বিতর্কমূলক আলোচনায় তাঁকেই সামনে এগিয়ে দিতেন। সত্বরই তিনি মাহফিলের মধ্যমণি এবং মজলিসের সভাপতির আসনে আসীন হন।[১] জনসাধারণের প্রকাশ্য জল্পনা-কল্পনা ও অন্যান্য কার্যকারণ সাক্ষ্য দিত যে, তিনি তাঁর মুরব্বী ও উস্তাদের স্থলাভিষিক্ত হবেন এবং মু'তাযিলা মতবাদের সমর্থন, সহযোগিতা ও প্রচারে সম্ভবত তাঁকেও অতিক্রম করে যাবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে আল্লাহ্র ইচ্ছা ও ব্যবস্থাপনাটা ছিল অন্য রকম। তিনি সুন্নাহ্র হেফাজত ও সাহায্যের জন্য সেই ব্যক্তিকেই নির্বাচিত করেন, যিনি তাঁর জীবন মু'তাযিলা মতবাদের সমর্থন ও পক্ষাবলম্বনে উৎসর্গ করে রেখেছিলেন এবং যাঁর জন্য মু'তাযিলা মতবাদের নেতৃত্বের আসন প্রস্তুত ছিল। ঘটনাক্রমে শায়খ আবুল হাসানের প্রকৃতি ও স্বভাবে মু'তাযিলাদের মনগড়া ব্যাখ্যার গোঁজামিল, অলীক জল্পনা-কল্পনা ও অনুমান-চিন্তার প্রতি ঘৃণার সঞ্চার হতে থাকে। তিনি অনুভব করতে থাকেন যে, এ সব মেধা ও বুদ্ধিমত্তার কথা এবং এগুলোর প্রতি পক্ষপাতিত্ব ও আনুকূল্য প্রদর্শনের পেছনে কোন যুক্তি নেই। প্রকৃত সত্য অন্য কিছু এবং তা হচ্ছে সাহাবায়ে কিরাম ও পূর্ববর্তীদের মত ও পথ। যা-হোক, চল্লিশ বছর পর্যন্ত মু'তাযিলা মতবাদ ও 'আকীদা-বিশ্বাসের সমর্থন এবং সেটা সুদৃঢ় করার কাজে নিয়োজিত থাকার পর তাঁর মন-মস্তিষ্কে এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়। পনের দিন তিনি ঘর থেকে বের হন নি। ষোল দিনের দিন ঘর থেকে সোজা জামে' মসজিদে গিয়ে পৌঁছেন। জুমু'আর দিন ছিল। জামে'মসজিদ ছিল লোক ভর্তি। তিনি মিম্বরে আরোহণ করে বুলন্দ আওয়াজে ঘোষণা দিলেন ঃ

> যিনি আমাকে জানেন তিনি তো জানেনই; আর যিনি জানেন না—তাকে বলছি যে, আমি আবুল হাসান আশ'আরী। আমি মু'তাযিলা ছিলাম। আমি অমুক অমুক 'আকীদায় বিশ্বাসী ছিলাম। এখন আমি তওবা করছি এবং আমার পূর্ব ধারণা থেকে বিরত হচ্ছি। আজ থেকে আমার কাজ হবে মু'তাযিলা মতবাদকে প্রতিরোধ করা এবং তার দুর্বলতা ও ভুল-ভ্রান্তিগুলো প্রকাশ করে দেওয়া।[১]

সেই দিন থেকেই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর মেধা, প্রতিভা, জ্ঞানগত

---

১. তাবঈনু কিয্‌বি'ল-মুফতারা, ১১৭ পৃ., ইব্ন 'আসাকির দামিশকীকৃত।

অভিজ্ঞতা, বাকশক্তি, লেখনী ও যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনের ক্ষমতা মু'তাযিলা মতবাদের প্রতিরোধে ও প্রাচীন মনীষীদের পথ ও মত এবং আহলে সুন্নাত ওয়া'ল-জামা'আতের 'আকীদার সমর্থন ও প্রতিষ্ঠায় ব্যয়িত হয়। যিনি প্রথম জীবনে ছিলেন মু'তাযিলাদের মুখপাত্র ও তাদের সর্বাপেক্ষা বড় উকীল, তিনিই শেষ জীবনে আহলে সুন্নাত ওয়া'ল-জামা'আতের ব্যাখ্যাতা এবং সবচেয়ে বড় সমর্থক ও মদদগারে পরিণত হন।

ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী (র)-এর তবলীগী প্রেরণা ও সত্য বিশ্লেষণ

তিনি এই দায়িত্ব ও কর্তব্যকে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের ওসীলা ও তাঁর পথে জিহাদ ও দা'ওয়াত মনে করে আঞ্জাম দিতেন এবং স্বয়ং মু'তাযিলাদের মজলিসে গিয়ে তাদেরকে প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করাবার চেষ্টা করতেন। কেউ তাঁকে বলে, আপনি বিদ'আতীদের সঙ্গে কেন মেলামেশা করেন এবং তাদের কাছে যান? তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করাই তো বাঞ্ছনীয়। তিনি জওয়াবে বলেন ঃ কি করি, তারা বড় বড় পদাধিকারী ব্যক্তি; তাদের কেউ শহরের শাসনকর্তা, কেউ কাযী। তারা তাদের পদ ও মর্যাদার কারণে আমার কাছে আসতে চায় না। এমতাবস্থায় আমিও যদি তাদের কাছে না যাই তাহলে সত্য কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তারা কিভাবে জানতে পারবে যে, আহলে সুন্নাতেরও উপযুক্ত মদদগার আছে এবং এমন সব অকাট্য দলীল-প্রমাণ রয়েছে যদ্দারা বোঝা যায় যে, তাদের মাযহাব সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত।[২]

তাঁর মানসিক যোগ্যতা ও জ্ঞানের পরিপূর্ণতা

ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী (র)-এর মধ্যে বিতর্ক, বাহাছ ও যুক্তি-প্রমাণ প্রদর্শনের অপূর্ব শক্তি ও ক্ষমতা ছিল এবং এগুলো ছিল তাঁর প্রকৃতিগত ও খোদাপ্রদত্ত যোগ্যতা। সত্য মযহাবের (তথা মযহাবে হকের) সমর্থন করবার প্রেরণা এবং আল্লাহ্র সাহায্য তাঁর সে শক্তিকে আরও উদ্ভাসিত করে তোলে। তিনি তাঁর যুগের গড় বুদ্ধিবৃত্তির মাপকাঠিতে অতি উন্নতমানের ছিলেন এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও 'ইলমে কালামে মুজতাহিদসুলভ মস্তিষ্ক ও মেধার অধিকারী ছিলেন। তিনি মু'তাযিলাদের যাবতীয় প্রশ্ন ও আপত্তির জওয়াব এত সহজে দিতেন, যেন কোন জ্ঞানবৃদ্ধ শিক্ষক ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি প্রাথমিক শ্রেণীর ছাত্রদের প্রশ্নের

১. ইব্ন খাল্লিকান-১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৭।
২. তাবঈনু কিয 'বু'ল-মুফতারা–১১৬ পৃ.।

সন্তোষজনক জওয়াব দিয়ে তাদেরকে নিশ্চুপ করে দিচ্ছেন। তাঁর একজন ছাত্র আবূ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন খফীফ তাঁর পয়লা সাক্ষাৎ এবং মজলিসের অবস্থা নিম্নভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

> আমি শীরায থেকে বসরা এলাম। আবুল হাসান আশ'আরীর দর্শন লাভে উৎসুক ছিলাম। লোকেরা আমাকে তাঁর ঠিকানা বাৎলে দিল। আমি এলাম। তিনি একটি বিতর্ক সভায় ছিলেন। সেখানে মু'তাযিলাদের একটি জামা'আত ছিল এবং তারা কথাবার্তা বলছিল। যখন তারা নিশ্চুপ হ'ল এবং নিজেদের কথা শেষ করল, তখন আবুল হাসান আশ'আরী আলোচনা শুরু করলেন। তিনি এক একজনকে সম্বোধন করে বললেন ঃ তুমি এই বলেছিলে–আর তার জওয়াব এই; তুমি এই আপত্তি তুলেছিলে- আর তার জওয়াব এই। এভাবে প্রত্যেকের জওয়াব তিনি দিয়েছিলেন। যখন তিনি সভা থেকে উঠলেন, আমি তাঁর পিছু পিছু চললাম এবং তাঁকে আপাদমস্তক দেখতে লাগলাম। তিনি বললেন ঃ তুমি কী দেখছ? আমি বললাম ঃ আমি দেখছি, আপনার কতটি মুখ, কতটি কান আর কতটি চোখ (অর্থাৎ আপনি সবার কথাই শোনেন, সব কিছুই বোঝেন এবং সকলেরই উত্তর দেন)। এই কথা শুনে তিনি হেসে ফেললেন।[১]

একটি বর্ণনায় আছে ঃ

> আমি তাঁকে বললাম ঃ আপনার সকল কথাই তো উপলব্ধিতে এল, কিন্তু এটা বুঝতে পারলাম না যে, আপনি প্রথম দিকে কেন চুপ করে থাকেন এবং কেন মু'তাযিলাদের কথা বলার সুযোগ দেন ? আপনার মর্যাদা তো এই যে, আপনিই কথা বলবেন, আলোচনা করবেন এবং আপত্তিগুলোকে নিজেই নিঃশেষ করে দেবেন। তিনি বললেন ঃ আমি সেই মসলা ও উক্তিগুলো আমার নিজ মুখে উচ্চারণ করাটাকে জায়েয মনে করি না। অবশ্য যখন এটি কারও মুখ দিয়ে বের হয়ে যায় তখন তার জওয়াব দেওয়া সত্যানুসারী হিসেবে আমার জন্য ফরয হয়ে যায়।[২]

ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী শাস্ত্রের মুজতাহিদ ও 'ইলমে কালামের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। পরের মুতাকাল্লিমগণ তাঁর আল্লাহ্প্রদত্ত প্রতিভা ও মেধা, তাঁর কালামের গভীরতা, তাঁর সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও জ্ঞানের পরিপূর্ণতার কথা এক বাক্যে স্বীকার করেছেন। জনৈক ব্যক্তি কাযী আবূ বকর বাকিল্লানীকে, যিনি তাঁর সমসাময়িকদের কাছে সুন্দর বাকভঙ্গির বক্তৃতা-বিবৃতি ও লেখনী শক্তির কারণে 'লিসানু'ল-

১. তাবঈনু কিয্‌বু'ল-মুফতারা, ৯৫ পৃ.।

আইম্মাঃ' উপাধি পেয়েছিলেন– বলেছিল ঃ আপনার কালাম আবুল হাসান আশ'আরীর কালাম অপেক্ষা অধিকতর উন্নত ও স্পষ্ট মনে হচ্ছে। তিনি জবাবে বলেছিলেন ঃ আবুল হাসানের কালাম বুঝতে পারাটাই তো আমার পরম সৌভাগ্য।[১]

'আল্লামা আবূ ইসহাক ইস্ফারাঈনীর আসন 'ইলমে কালাম ও উসূলে-ফিক্'হ-এর ক্ষেত্রে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত। তিনি বলেন ঃ

> আমি শায়খ আবুল হাসান বাহেলী (ইমাম আবুল হাসান আশ'আরীর শাগরিদ)-র সামনে এমন ছিলাম– যেমন সমুদ্রের ভেতর একবিন্দু পানি; আর শায়খ আবুল হাসান বাহেলী বলতেনঃ আমার অবস্থান ও মর্যাদা আবুল হাসান আশ'আরীর সামনে এমন ছিল যেমন সমুদ্রের পাশে এক কাতরা পানি।[২]

আবুল হাসান আশ'আরীর পথ ও মত এবং তাঁর খিদমত

ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী মু'তাযিলা ও মুহাদ্দিছদের মধ্যে ভারসাম্যময় একটি পথ ও মত উদ্ভাবন করেন। তিনি মু'তাযিলাদের মত যুক্তি-বুদ্ধির সেই অসীম শক্তি ও ক্ষমতা– যা ঐশী তথা ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়াবলীতেও অসংকোচে তার কাজ করতে পারে এবং যা আল্লাহ্ পাকের সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কেও ফয়সালা দিতে পারে–যেমন স্বীকার করতেন না, তেমনি কতক অত্যুৎসাহী মুহাদ্দিছীন ও হাম্বলী মযহাবের অনুসারীদের মত দীনের সাহায্য-সমর্থন (نصرت) ও ইসলামী 'আকাইদের হেফাজতের জন্য যুক্তি-বুদ্ধির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করাকেও জরুরী মনে করতেন না। তিনি মু'তাযিলা ও দার্শনিক 'আলিম-'উলামার সঙ্গে দার্শনিক ও জ্ঞানপূর্ণ ভাষায় কথাবার্তা বলতেন, যার ফলে তাঁর মাযহাব ও 'আকাইদ এবং আহলে সুন্নাহ্র মর্যাদা ও ওজন বৃদ্ধি পেত। كلموا الناس على قدر عقولهم ("লোকের সঙ্গে তাদের জ্ঞান ও বুদ্ধি মাফিক কথা বল") ছিল তাঁর নীতি। যেভাবে জনসাধারণের বুদ্ধিবৃত্তির পরিমাপের দিকে খেয়াল রাখা জরুরী, ঠিক তেমনি জ্ঞান-গুণী ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের বুদ্ধিবৃত্তির পরিমাপের দিকে লক্ষ্য রাখাও অপরিহার্য।

আবুল হাসান আশ'তারী তাঁর সমগ্র শক্তি দিয়ে অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে প্রমাণ করেন যে, মু'তাযিলারা ধর্মকে গ্রহণ ও তা উপলব্ধির ব্যাপারে নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ ও নিজ ফের্কার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের অন্ধ আনুগত্য (তাকলীদ) করেছে এবং ঐ সব ব্যাপারে কিতাব ও সুন্নাহ্কে মূল উৎস হিসাবে মেনে নেয় নি,

---

১. তাবঈনু কিয্‌বু'ল-মুফতারা, ১২৬ পৃ.।

বরং যে-ই কুরআনুল করীমের আয়াত ও তাদের 'আকীদার মধ্যে বৈপরীত্য লক্ষ্য করেছে-অমনি অসংকোচে জটিল ব্যাখ্যা-বিবৃতির আশ্রয় নিয়েছে। كتاب الابانة عن اصول الديانة নামক গ্রন্থে– যা তিনি মু'তাযিলাদের থেকে আলাদা হবার পর প্রথম লিখেছিলেন– বলেন ঃ

اما بعد! فان من الزائغين عن الحق من المعتزلة واهل القدر مالت بهم اهوائهم الى تقليد رؤسائهم ومن مضى من اسلافهم فتاولو القران على ارائهم تاويلا لم ينزل الله به سلطانا ولا اوضح به برهانا ولا نقلوه عن رسول الله رب العلمين ولا عن السلف المتقدمين .

বা'দ হ'াম্‌দ ও সালাত (জেনে রেখ যে), মু'তাযিলা ও কাদরিয়া ফের্কা–যারা সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে–তারা নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণে স্বীয় ইমাম ও স্বীয় ফের্কার অগ্রবর্তী নেতাদের অন্ধ আনুগত্য (তাক'লীদ) করেছে এবং নিজেদের রায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য কুরআন মজীদের এমন সব মনগড়া ও জটিল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছে যার সমর্থনে আল্লাহ্ প্রদত্ত সুস্পষ্ট কোন দলীল নেই এবং রসূল আকরাম (সা) ও প্রাচীন বুযুর্গগণ (সাহাবা-ই কিরাম ও তাবি'ঊন) থেকেও কোন বর্ণনা নেই।[১]

অতঃপর তিনি স্বীয় পথ ও মত সুস্পষ্ট করতে গিয়ে পরিষ্কার লিখেছেন ঃ

قولنا الذى نقول به وديانتنا التى ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا عليه السلام وما روى عن الصحابة والتابعين وائمة الحديث ونحن بذلك معتصمون وبما كان يقول به ابو عبد الله احمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته واجزل مثوبته قائلون ولما خالف قوله مخالفون لانه الامام الفاضل والرئيس الكامل الذى ابان الله به الحق ورفع به الضلال و اوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين فرحمة الله عليه من امام مقدم وخليل معظم مفخم .

আমাদের 'আকীদা, আমাদের পথ ও মত–যার ওপর আমরা কায়েম আছি– তা এই যে, আমাদেরকে কুরআন মজীদ ও সুন্নতে রাসূল (সা) আঁকড়ে ধরতে হবে; সাহাবায়ে কিরাম, তাবি'ঈন ও হাদীছশাস্ত্রের ইমামগণ দ্বারা যা বর্ণিত-তাকে অনুসরণ করতে হবে। আমরা এই মত ও পথের ওপর দৃঢ়ভাবে কায়েম আছি এবং ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র)-এর 'আকাইদ, মত ও পথ (আল্লাহ্ তাঁর মুখমণ্ডল জীবন্ত ও সজীব রাখুন, তাঁর দর্জা সমুন্নত রাখুন এবং

১. কিতাবু'ল-ইবানাতু 'আন উসূলিদ্দিয়ানাঃ, দাইরা ঃ-ই-মা'আরিফ, হায়দরাবাদ থেকে প্রকাশিত, ৫

তাঁকে প্রচুর পুরস্কার প্রদান করুন)-এর সমর্থক ও অনুসারী। যারা তাঁর পথ ও মত থেকে আলাদা—আমরাও তাদের থেকে আলাদা। কেননা তিনি এমন একজন বুযুর্গ ইমাম ছিলেন, যাঁর হাত দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা সত্যকে উদ্ভাসিত করেছেন, গোমরাহী অপসৃত করেছেন, 'সিরাত-ই-মুস্তাকীম' তথা সোজা-সরল পথকে আলোকিত করেছেন, বিদ'আতীদের বিদ'আত, বক্র স্বভাবীদের বক্রতা ও সন্দেহবাদীদের সন্দেহ দূরীভূত করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা এমন একজন মহান ইমামের ওপর-যিনি ভালবাসা ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন– তাঁর অফুরন্ত রহমত নাযিল করুন।[১]

কিন্তু তাঁর আসল কৃতিত্ব শুধু সুন্নাহ্‌র পথ ও মত এবং সাহাবা-ই-কিরাম ও তাবি'ঈনের 'আকীদার অনুসরণ ও এজমালী সমর্থনের মধ্যে নয়। কেননা এ কাজ তো মুহাদ্দিছীন-ই-কিরাম ও সাধারণ হাম্বলীরাও করছিলেন। তাঁর আসল কৃতিত্বপূর্ণ অবদান হ'ল, তিনি কিতাব ও সুন্নাহ্‌র হাকীকত ও আহলে সুন্নতের 'আকীদাকে যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং মু'তাযিলা ও অন্যান্য ফের্কা কর্তৃক অনুসৃত এক-একটি মসলা ও এক-একটি 'আকীদাকে তাদেরই ভাষা ও পরিভাষায় আলোচনা করে আহলে সুন্নত ওয়া'ল-জামা'আতের 'আকীদার সত্যতা তাদেরই বর্ণনা ও যুক্তি-বুদ্ধি মাফিক স্পষ্টতর করে তুলেছেন।

দীনের এই গুরুত্বপূর্ণ খেদমতের পূর্ণতা সাধন এবং যুগের এই বিরাট দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদন করতে গিয়ে তিনি মু'তাযিলা ও অন্যান্য পরাঙ্মুখ ফের্কার ক্রোধের পাত্রে পরিণত হন। আর এমনটি হওয়া ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু তিনি সেই সাথে কট্টর মুহাদ্দিছ ও অনড় হাম্বলীদের আপত্তির শিকারেও পরিণত হন যাদের নিকট ঐসব আলোচনা ও বিতর্কে অংশ গ্রহণ, দার্শনিকদের পরিভাষা ব্যবহার ও ধর্মীয় মসলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে যুক্তি-প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করাটাই ছিল বক্রতা ও গোমরাহীর নামান্তর।

ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী মু'তাযিলাদের প্রতিযোগী ও সমালোচক হওয়া সত্ত্বেও এই ধারণার সঙ্গে একমত ছিলেন না যে, ইসলামী 'আকীদা সম্পর্কে যে সব সমস্যা ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছে—হাদীছে এসব মসলা-মাসায়েল, আলাপ-আলোচনা ও বিতর্কের অনুকূলে কোন শব্দ বা পরিভাষা নেই। মুহাদ্দিছদের মতে পরিভাষার এত খোঁজাখুঁজিতে সুন্নাহ ও শরীয়তের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় এবং এতে সুন্নাহ্‌র পরাজয় ও কমযোরী প্রমাণিত হয়। কেননা 'আকাইদের উৎস হ'ল ওয়াহী ও নবূওতে মুহাম্মাদী (সা) এবং এর মাধ্যম হ'ল 'ইলমে কিতাব, সুন্নতে রাসূল

১. কিতাবু'ল-ইবানাতু 'আন উসূলিদ্দিয়ানাঃ, পৃ. ৮।

(সা) ও সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর বর্ণনা ও বাণীসমষ্টি। অতএব, এই রাস্তা মু'তাযিলা ও দার্শনিকদের থেকে একেবারেই ভিন্ন। কিন্তু ইমাম আশ'আরী 'আকাইদের সাক্ষ্য-প্রমাণে সহায়তা করবার জন্য যৌক্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দলীল-প্রমাণ, যুগ প্রচলিত শব্দ-সম্ভার ও পরিভাষাসমূহের দ্বারা কাজ নেওয়াকে কেবল জায়েয নয়, বরং সময়ের দাবির ভিত্তিতে অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ও জরুরী মনে করতেন। সেই আলোচনা ও বিতর্ক-যার সম্পর্ক যুক্তি-বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির সঙ্গে এবং মু'তাযিলা ও দার্শনিকগণ যেটাকে (অযথা) 'আকাইদের আলোচনার অংশ বানিয়ে দিয়েছিল এবং নিজেদের মেধা, প্রতিভা ও বাকচাতুর্যের দ্বারা যেটাকে হক ও বাতিলের মানদণ্ড হিসাবে অভিহিত করেছিল, ইমাম আবুল হাসান আশ'আরীর মতে, তা থেকে সরে আসা কিংবা তাকে এড়িয়ে চলা ঠিক নয় এবং শরীয়তের উকীল ও ব্যাখ্যাতার জন্য সেসব বৃত্তেও মু'তাযিলাদের মুকাবিলা করা এবং যৌক্তিক ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির দিক দিয়ে সত্যানুসারীদের মযহাব প্রমাণ করা ফরয। তাঁর মতে, এ বিষয়ে আঁ-হযরত (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের নিশ্চুপতার কারণ অজ্ঞতা ছিল না, বরং সে যুগে এ জাতীয় আলোচনা, দলীল-প্রমাণ ও যুক্তির জন্মই হয়নি। শরীয়তের মুহাফিজ ও আহলে সুন্নাহ্র মুতাকাল্লিমদের জন্য ফরয যে, 'আকীদা ও ঐশী দর্শনের বৃত্তের ভেতর যেসব নতুন প্রশ্নের জন্ম হচ্ছে অথবা নতুন আপত্তি ওঠানো হচ্ছে-সে সবের জওয়াব তারা দেবেন এবং যুগের যুক্তি-বুদ্ধি মাফিক সত্য-সঠিক 'আকীদাকে দলীল-প্রমাণ সহকারে প্রমাণিত করবেন। তিনি (ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী) এই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে প্রমাণ করবার জন্যই استحسان الخوض فى الكلام নামে একটি পুস্তিকা লিখেন।

যা হোক, ইমাম আশ'আরী দু'টি দলের সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টিকে উপেক্ষা করে দীনের সাহায্য- এবং ঈমান ও 'আকীদার হেফাজতের জন্য যেসব কর্মপন্থা ও কর্মপদ্ধতিকে জরুরী মনে করেন, বিরাট সাহসিকতার সাথে সেটাই গ্রহণ করেন এবং আপন লেখনী ও বাকশক্তি তাতেই নিয়োজিত রাখেন। ফলে মু'তাযিলা দার্শনিকদের ক্রমবর্ধমান সয়লাবকে তিনি থামিয়ে দিতে সক্ষম হন এবং বহু স্খলিত পদকে সুদৃঢ় করেন। এভাবে আহলে সুন্নাহ্র 'আকাইদ ও সাহাবায়ে কিরামসহ প্রাচীন বুযুর্গ-মনীষীদের মতামতকে জোরালো ও যুক্তিপূর্ণ ভাষায় সমর্থন করবার কারণে আহলে সুন্নত ওয়া'ল-জামা'আতের সমর্থকদের মধ্যে নতুন আশা ও নতুন আস্থার সঞ্চার হয়। হীনমন্যতাবোধ থেমে যায় যা ঘুণের ন্যায় মুসলিম উম্মার একটি বিরাট অংশকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। মু'তাযিলীরা তাঁর উপর্যুপরি হামলার ফলে পিছু হটতে থাকে এবং নিজেদের হেফাজত ও নিজেদের মযহাবের

অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। আবূ বকর ইব্ন আস-সায় রাফী বলেন ঃ

> মু'তাযিলীদের বেশ বাড় বেড়েছিল। তাদের মুকাবিলার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা ইমাম আবুল হাসান আল-আশ'আরীকে সৃষ্টি করেন। তিনি স্বীয় মেধা ও যুক্তি-প্রমাণের সাহায্য মু'তাযিলীদের মুখ বন্ধ করে দেন। তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের কারণে তাঁকে মুজাদ্দিদ (ধর্ম-সংস্কারক তথা তাঁর পুনর্জীবন দানকারী) ও সুন্নাহ্র মুহাফিজের মধ্যে গণ্য করা হয়। আবূ বকর ইসমা'ঈলীর মত কতক মনীষী দীনের তাজদীদ তথা পুনর্জীবন দান ও শরীয়তের হেফাজতের সিলসিলায় ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বলের পরই তাঁকে স্থান দিয়েছেন।[১]

রচিত গ্রন্থাদি

ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী কেবল বিতর্ক, আলোচনা ও মৌখিক বক্তৃতাকেই যথেষ্ট মনে করে নিশ্চেষ্ট বসে থাকেন নি, বরং বাতিল 'আকীদার প্রতিরোধকল্পে অনেক বিরাট পুস্তকও লিখেন। তিনি আহলে সুন্নত ওয়া'ল-জামা'আতের 'আকীদা মুতাবিক কুরআন মজীদের যে তাফসীর রচনা করেন— ইমাম যাহাবীর মতে তা তিরিশটি[২] খণ্ডে বিভক্ত। কতক লেখক ইমাম আবুল হাসান আশ'আরীর রচিত গ্রন্থাদির সংখ্যা ২৫০ থেকে তিন শ'[৩] পর্যন্ত হবে বলে মনে করেন! ঐ সব গ্রন্থের অধিকাংশই মু'তাযিলা মতবাদ প্রতিরোধকল্পে লিখিত; কিছু কিছু অপরাপর মযহাব ও ফেরকাসমূহের প্রত্যাখ্যানে লেখা হয়। এসব কিতাবের একটির নাম 'কিতাবু'ল-ফুস্'ল'। এতে তিনি প্রকৃতিবাদী, দাহরিয়া, হিন্দু, ইয়াহূদী, 'ঈসায়ী ও অগ্নি-উপাসক দার্শনিকদের মত ও পথের জোরালো সমালোচনা করেছেন। এটি একটি বিরাট গ্রন্থ এবং বারটি কিতাবের সংকলন।[৪] ইব্ন খাল্লিকান এ প্রসংগে কিতাবু'ল-লুমা', আল-মু'জিয, ঈযাহু'ল-বুরহান, আত-তাবঈনু 'আন-উসূ'লিদ্দীন, আশ-শারহু' ওয়াত্তাফস'ীলু ফি'র-রাদ্দি 'আলা আহলি'ল-ইফ্ক ওয়াত্তাদ'লীল নামক গ্রন্থেরও উল্লেখ করেছেন। যৌক্তিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও 'ইলমে কালাম ছাড়াও 'ইলমে শরীয়ত সম্পর্কিত তাঁর আরো কিছু গ্রন্থ রয়েছে যেগুলোর মধ্যে 'কিতাবু'ল-কি'য়াস', 'কিতাবু'ল-ইজতিহাদ', 'খাবরু'ল-ওয়াহি'দ'

১. তাবঈনু কিয'বু'ল-মুফতারা, ৫৩ পৃ.।
২. আল-আশ'আরী, আবুল হাসান।
৩. তাবঈনু কিয'বু'ল-মুফতারা, ১৩৬ পৃ.।
৪. ঐ, ১২৮ পৃ.।

প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইব্ন রাওয়ান্দীর 'মুতাওয়াতির' তথা অনবরত ও ক্রমাগতের নীতি অস্বীকৃতির (انكار تواتر) প্রত্যাখ্যানেও তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য কিতাব রয়েছে। তিনি তাঁর "আল-'আমাদ" নামক গ্রন্থে সে সব গ্রন্থের নাম লিখেছেন যা তিনি ৩২০ হি. পর্যন্ত ওফাতের চার বছর পূর্বে রচনা করেছিলেন, সংখ্যায় তা ৬৮টি হবে। এর ভেতর কয়েকটি কিতাব দশ-বারো খণ্ডে সমাপ্ত। জীবনের শেষ চারটি বছরের ভেতরও তিনি অনেক কিতাব প্রণয়ন করেন। مقالات الاسلامين নামক তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব অধ্যয়ন থেকে জানা যায় যে, তিনি কেবল একজন মুতাকাল্লিমই ছিলেন না বরং 'ইলমে 'আকাইদের একজন শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিত এবং সেই সাথে একজন সতর্ক ঐতিহাসিকও ছিলেন। তিনি এই গ্রন্থে মু'তাযিলা ও অন্যান্য ফেরকার কথিত উক্তি ও মযহাব যেভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন তাতে তাঁর অপরূপ সতর্কতা ও বিশ্বস্ততার পরিচয় মেলে।[১]

ইবাদত ও তাক্'ওয়া

ইমাম আবুল হাসান কেবল একজন জ্ঞানবান ও বুদ্ধিমান মানুষই ছিলেন না বরং জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে ইমামত ও ইজতিহাদের দর্জায় পৌঁছুবার সঙ্গে সঙ্গে 'ইবাদত, তাক'ওয়া ও মহান চরিত্রেও শীর্ষস্থানীয় ছিলেন এবং এটি হচ্ছে প্রাচীন ইমামগণের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। আহমদ ইব্ন আবী ফক'ীহ্ বলেন, "আমি ইমাম আবুল হাসানের বিশ বছর খেদমত করেছি। আমি তাঁর চেয়ে বেশী পরহেযগার, সতর্ক ও সংযমী, লজ্জাশীল, জাগতিক ব্যাপারে লাজুক ও পারলৌকিক ব্যাপারে অধিক দৃঢ় কাউকে দেখি নি।"[২] মুতাকাল্লিম আবুল হুসায়ন হারবী বলেন, "ইমাম আবুল হাসান বছরের পর বছর 'ইশার ওযূ দিয়ে ফজরের সালাত আদায় করেছেন।"[৩] তাঁর খাদেম বুন্দার ইব্ন আল-হুসায়ন বলেন, "ইমাম আবুল হাসান কেবল সেই একটি মাত্র স্থাবর সম্পত্তির ওপর জীবিকা নির্বাহ করতেন যা তাঁর পিতামহ বিলাল ইবন আবী বুরদাহ ইবন আবী মূসা আশ'আরী ওয়াক্'ফ করে গিয়েছিলেন যার দৈনিক আমদানী ছিল সতের দিরহাম।"[৪]

---

১. মশহূর প্রাচ্যবিদ ঘণভ্রধভডপ তাঁর ব্রফধব উরণণঢ নামক গ্রন্থের ৮৮ পৃষ্ঠায় এবং রাহ্নার مقالات الاسلامين নামক গ্রন্থের ভূমিকায় এর বিরাট প্রশংসা করেছেন (আল-আশ'আরী, আবুল হাসান)।

২. তাবঈনু কিয্বু'ল-মুফতারা, ১৪১ পৃ.।

৩. ঐ।

৪. ঐ, ১৪২ ও ইব্ন খাল্লিকান, ৪৬৫ পৃ. খতীবের হাওলাসহ।

ওফাত

৩২৪ তিজরীতে ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী ইনতিকাল করেন এবং বাগদাদের মহল্লা মাশরা'উ'য-যাওয়ায়াতে তাঁকে দাফন করা হয়।[১] তাঁর জানাযায় একটি ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল, "আজ সুন্নতের সাহায্য ও সমর্থনকারীর ইনতিকাল হয়ে গেছে।"

ইমাম আবূ মনসূর মাতুরিদী

সেই যুগেই মুসলিম বিশ্বের অপর এক প্রান্তে "মাউরাউন্নাহ্‌র" নামক স্থানে অপর একজন 'আলিম ও মুতাকাল্লিম আবূ মনসূ'র মাতুরিদী (মৃ. ৩৩২ হি.) 'ইলমে কালাম ও 'আকাইদে ইসলামের খেদমতে মনোনিবেশ করেন।[২] তিনি অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ মস্তিষ্কের অধিকারী ছিলেন। মু'তাযিলাদের সঙ্গে সদা-সর্বদা মুকাবিলারত থাকার কারণে ইমাম আবুল হাসানের 'ইলমে কালামে কতকগুলো চরমপন্থী কথাবার্তার অনুপ্রবেশ ঘটে এবং পরবর্তীকালের আশ'আরীপন্থিগণ ব্যাপারটাকে আরও বাড়িয়ে দেন। ইমাম আবূ মনসূর সে সব অপ্রয়োজনীয় ও বাহুল্য কথাবার্তা, যা আশ'আরী 'ইলমে কালামের অংশে পরিণত হয়ে গিয়েছিল–বাদ দিয়ে দেন এবং আহ্‌লে সুন্নত ওয়া'ল-জামা'আতের 'ইলমে কালামকে আরও সংস্কৃত, পরিশীলিত ও ভারসাম্যপূর্ণ করে তোলেন। ইমাম আবূ মনসূর ও তাঁর অনুসারীদের এই ইখতিলাফ ছিল আংশিক, খুঁটিনাটি বিষয়ে ও সীমাবদ্ধ গণ্ডীতে। যে সব মসলা-মাসাইলে ইমাম মাতুরিদীর অনুসারিগণ আশ'আরীপন্থীদের সঙ্গে ইখতিলাফ করেছেন–তা তিরিশ-চল্লিশটির বেশি নয় এবং বেশির ভাগই শব্দগত।[৩]

ইমাম আবূ মনসূর মাতুরিদী ফিক'হী মসলা-মাসাইলের ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। শাফি'ঈপন্থী 'উলামায়ে কিরাম ও মুতাকাল্লিমীন 'আকীদাগত ও নীতিগতভাবে যেমন আশ'আরী মতের অনুসারী, তেমনি হানাফী 'উলামায়ে কিরাম ও মুতাকাল্লিমীন সাধারণত ইমাম মাতুরিদীর অনুসারী। ইমাম

---

১. ইব্‌ন খাল্লিকান–৪৬৪।

২. এই যুগ মু'তাযিলাবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া এবং সুন্নী 'ইলমে কালাম ও 'আকাইদের সংকলনের বিশেষ যুগ ছিল। ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী ছাড়াও সে যুগে মিসরে তাহাবী (মৃ. ৩১ হি.) এবং সমরকন্দে ইমাম আবূ মনসূর মাতুরিদী (মৃ. ৩৩ হি.) জন্ম নেন। প্রথমোল্লিখিত ব্যক্তি তাঁর দু'জন নামকরা সমসাময়িকের মুকাবিলায় 'ইলমে কালামে তেমন খ্যাতি লাভ করেননি এবং ইমাম আবূ মনসুর মাতুরিদীর ওডদমমফ মত´দমলর্থ্দ্র আশ'আরী ওডদমমফ-এর সঙ্গে মিশে যায়।

৩. 'আদু 'দিয়া তা'লীক 'াতে শায়খ মুহাম্মদ 'আবদুহু প্রমাণ করেছেন যে, এই সব মসলার সংখ্যা তিরিশের বেশি হবে না (ইবন তায়মিয়া, মুহাম্মদ আবূ যাহরাকৃত–১৮৪ পৃ.)।

আবূ মনসূর একজন বড় লেখকও ছিলেন। মু'তাযিলা, রাফেযী ও কারামেতা মতকে খণ্ডন করতে গিয়ে তিনি বিরাট বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর تاويلات القرآن নামক গ্রন্থটি বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে একটি মহামূল্যবান গ্রন্থ যদ্দারা তাঁর বিরাট যোগ্যতা, বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান ও উন্নত মেধার পরিচয় পাওয়া যায়।

ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী যেহেতু মু'তাযিলা মতবাদ ও মু'তাযিলাপন্থীদের সঙ্গে সরাসরি মুকাবিলা করেছিলেন এবং তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের জ্ঞান-কেন্দ্র ইরাকে ছিলেন (যেখানে মু'তাযিলাদের বিরাট শক্তি কেন্দ্রীভূত ছিল)–তাই সেখানকার বিদ্বজ্জন সভাকে তিনি অধিক প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন এবং 'ইলমে কালামের ইতিহাসে তাঁর নাম বিখ্যাত হয়ে আছে।

আশ'আরী অনুসারী 'উলামা ও তাঁদের জ্ঞানগত প্রভাব

ইমাম আশ'আরীর পর তাঁর সিলসিলায় ও চিন্তাধারায় জলীলু'ল-কদর 'উলামা, মুতাকাল্লিম ও উস্তাদের আবির্ভাব হয়। তাঁরা তামাম মুসলিম বিশ্বের ওপর নিজেদের উন্নত মেধা ও যোগ্যতার প্রভাব কায়েম করেন এবং তাঁদেরই কারণে মুসলিম বিশ্বের জ্ঞানগত ও মেধাগত (ذهنى) নেতৃত্ব মু'তাযিলাদের কাছ থেকে 'উলামায়ে আহলে সুন্নত ওয়া'ল-জামা'আতের হাতে চলে আসে। চতুর্থ শতাব্দীতে কাযী আবূ বকর বাকিল্লানী (মৃ. ৪০৩ হি.) ও শায়খ আবূ ইসহাক ইস্ফারাঈনী (মৃ. ৪১৮ হি.) অত্যন্ত নামকরা মুতাকাল্লিম ও মর্যাদাবান 'আলিম ছিলেন। পঞ্চম শতাব্দীতে 'আল্লামা আবূ ইসহাক শীরাযী (মৃ. ৪৭৬ হি.) ও ইমামুল-হ'ারামায়ন আবুল মা'আলী 'আবদুল মালিক আল-জুওয়ায়নী (মৃ. ৪৬৮ হি.) তাঁদের 'ইল্‌ম ও বদান্যতার বদৌলতে সবিশেষ খ্যাতি লাভ করেন।

'আল্লামা আবূ ইসহাক শীরাযী নিজামিয়া মাদরাসার প্রধান অধ্যাপক (সদর মুদার্রিস) ছিলেন। খলীফা মুক'তাদী বিল্লাহ্ তাঁকে মালিক শাহ সালজুকীর নিকট দূত করে পাঠান। তিনি আড়ম্বরপুর্ণ মর্যাদার সঙ্গে বাগদাদ থেকে নিশাপুর পৌছেন। যে শহরের ওপর দিয়েই তিনি যেতেন, সেখানকার নাগরিকবৃন্দ তাঁকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা জানাত। ভক্তি ও শ্রদ্ধার আবেগাতিশয্যে তারা তাঁর পায়ের নীচের মাটি উঠিয়ে নিত। দোকানদাররা তাদের পণ্য-দ্রব্যাদি তাঁর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করত এবং মিঠাই, ফলমূল, মূল্যবান কাপড়-চোপড় বৃষ্টিধারার ন্যায় তাঁর দিকে নিক্ষেপ করত। তিনি নিশাপুর পৌছলে গোটা শহর তাঁর অভ্যর্থনায় ভেঙে পড়ে। ইমামু'ল-হ'ারামায়ন তাঁর অশ্বের জিনের ওপরকার আচ্ছাদনী স্বীয় স্কন্ধের

ওপর রেখে খাদেমের ন্যায় তাঁর আগে আগে অগ্রসর হন এবং বলেন, আমি এ জন্য গর্বিত।[১]

আল্‌প আরসালান সালজুকীর সাম্রাজ্যে ও নিজামু'ল-মুল্‌ক-এর মন্ত্রিত্বকালে সর্ববৃহৎ ইসলামী রাষ্ট্রে ইমামু'ল-হ'ারামায়নের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় পদমর্যাদা ছিল। তিনি নিশাপুরে খতীব, ইসলামী আওক'াফের নাজিম ও তত্ত্বাবধায়ক এবং নিজামিয়া মাদরাসার প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। ইব্‌ন খাল্লিকান লিখেন ঃ

وبقى على ذالك قريباً من ثلثين سنة غير مزاحم ولا مدافع مسلم له المحراب والمنبر والخطابة والتدريس ومجلس التذكير يوم الجمعة .

তিরিশ বছর পর্যন্ত তিনি এভাবে অবস্থান করেন যে, 'ইল্‌ম ও ধর্মীয় ময়দানে তাঁর কোন সমকক্ষ কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। মেহরাব ও মিম্বরের তিনি ছিলেন সৌন্দর্য। খুতবা, বক্তৃতা কিংবা দর্‌স প্রদানে, ওয়া'জ-নসীহত কিংবা আলোচনা বৈঠকে তাঁকেই সর্বাধিক যোগ্য মনে করা হ'ত।

তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি ও উচ্চ মরতবার অবস্থা ছিল এই যে, একবার মালিক শাহ সালজুকী 'ঈদের চাঁদ দেখার ঘোষণা দিয়ে দেন। ইমামু'ল-হ'ারামায়নের মতে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হয় নি বিধায় তিনি প্রচার করে দেন, আগামীকাল পর্যন্ত রমযান মাস। যে আমার ফতওয়ার ওপর আমল করতে চায় তাকে আগামীকাল রোযা রাখতে হবে। মালিক শাহ এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেন, "সাম্রাজ্য বিষয়ক ফরমানের ক্ষেত্রে আপনার আনুগত্য ও অনুসরণ আমাদের ওপর বাধ্যতামূলক। তবে শরীয়তের নির্দেশের ক্ষেত্রে 'উলামায়ে কিরামের ফতওয়া সবার জন্যই পালনীয়। রোযা রাখা, 'ঈদ উদ্‌যাপন এসব ফতওয়ার বিষয় ; এ সবের ওপর বাদশাহ্‌র কোন কর্তৃত্ব নেই।" অনন্তর বাদশাহ ঘোষণা করেন, "আমার নির্দেশ ভুল ছিল, ইমামু'ল-হ'ারামায়নের হুকুমই সঠিক।'"[২]

তাঁর ইনতিকালে নিশাপুরের বাজার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, শোকের ছায়ায় ঢাকা পড়েছিল মুসলিম বিশ্ব। তাঁর শাগরিদের সংখ্যা ছিল চার শ'র মত। সকলেই শোকে-দুঃখে তাদের দোয়াত-কলম ভেঙে ফেলেছিল। লোকে একে অপরকে শোক জ্ঞাপন করত। সারা বৎসরই এই অবস্থা বিরাজমান ছিল।[৩]

নিজামু'ল-মুল্‌ক তূসীর মন্ত্রিত্বকালে– যিনি 'আকীদাগতভাবে আশ'আরী ছিলেন এবং সে যুগের সর্ববৃহৎ মুসলিম সাম্রাজ্যের (সালজূকী) দণ্ডমুণ্ডের কর্তা

১. তাবাকাতু'শ-শাফি'ঈয়াতু'ল-কুবরা, ৩য় খণ্ড, ৯১-৯২ পৃ.।
২. আখলাকে জালালী, ১১৯পৃ.।
৩, ইব্‌ন খাল্লিকান. ২য় খণ্ড, ২৪৪ পৃ.।

ছিলেন– আশ'আরী মতবাদের বিরাট বিস্তার লাভ ঘটে এবং তা সরকারী সাহায্য-সমর্থনও লাভ করে। বাগদাদ ও নিশাপুরের নিজামিয়া মাদরাসাসমূহ– যেগুলো আশ'আরী 'উলামা ও শিক্ষকমণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে ছিল–আশ'আরী মতবাদকে জ্ঞানগত বিস্তৃতি ও দৃঢ়তা দান করে। বাগদাদের নিজামিয়া মাদরাসা ছিল তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান (দারু'ল-'উলূম) এবং বিরাট সম্মান ও শ্রদ্ধার বস্তু। এখানে পড়া ও পড়ানো ছিল এক বিরাট গর্বের বিষয়। অতএব, এর প্রভাবে ছাত্র ও জনসাধারণের আশ'আরী মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হওয়াটা ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক।

সপ্তম অধ্যায়

‘ইলমে কালামের অবনতি, দর্শন ও বাতেনী মতবাদের বিকাশ এবং একজন নতুন মুতাকাল্লিমের আবশ্যকতা

‘ইলমে কালামের বিপথ গমন ও অধঃপতন

সে সময় যদিও আশ‘আরী ‘উলামায়ে কিরামের চিন্তাধারা গোটা মুসলিম বিশ্বের শিক্ষা ব্যবস্থা ও মাযহাবী জীবনের ওপর ছেয়ে গিয়েছিল, কিন্তু খোদ সে চিন্তাধারার মধ্যেই দেখা দিয়েছিল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও দুর্বলতা। ইমাম আবুল হাসান আশ‘আরীর শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিবৃত্তি ও মুজতাহিদসুলভ মস্তিষ্ক মু‘তাযিলাদের যাদুর মায়া জাল ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল এবং সুন্নত ও শরীয়তের ক্ষমতাকে নতুনভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিল। এ ক্ষেত্রে শুধু তাঁর উসূল তথা মূলনীতি ও কায়দা-কানুনেরই ভূমিকা ছিল না, বরং তাঁর উন্নত মেধাগত যোগ্যতা, পাণ্ডিত্য-সুলভ ও যুক্তিসিদ্ধ ইজতিহাদী ক্ষমতারও বিরাট ভূমিকা ছিল। কিন্তু তাঁর অনুসারীরা ক্রমান্বয়ে মানসিক স্থবিরতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক নিঃস্বতার শিকারে পরিণত হয়। ফলে ‘ইলমে কালামে এবং তাজদীদ ও ইজতিহাদে অনুকরণ ও তস্য অনুকরণের সিলসিলা শুরু হয়ে যায়। যে সমস্ত লোক যুগের পরিবর্তনকে অনুভব করতে সক্ষম হন তারা নতুনত্বের অনুসারী হন এবং ‘ইলমে কালামে এমন সব যুক্তি ও প্রমাণ-পদ্ধতি ঢুকিয়ে দেন যা কুরআনুল করীমের যুক্তি ও প্রমাণ-পদ্ধতির মত প্রকৃতিসম্মত, সাধারণের বোধগম্য ও চিত্তাকর্ষক ছিল না।[১] এভাবে তার আহলে সুন্নত ওয়া’ল-জামা‘আত এবং সাহাবা-ই-কিরাম ও তাবি‘ঈনের মত ও পথের সঠিক প্রতিনিধিত্ব করতে ব্যর্থ হন। অপরদিকে নির্ভেজাল দার্শনিক মহলেও তারা সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হতে পারেন নি।

দর্শনের রেওয়াজ

অপরদিকে খলীফা মামূনের আগ্রহাতিশয্যে ও অনুবাদকদের কঠোর পরিশ্রম ও সাধনার ফলে সুরিয়ানী, গ্রীক ও ফারসী ভাষা থেকে গ্রীক দর্শনের বহু গ্রন্থ, বিশেষ করে এ্যারিস্টটলের রচনাবলী আরবীতে ভাষান্তরিত হয়ে গিয়েছিল এবং তা

---

১. যেমন ইব্‌ন তায়মিয়া (র) তাঁর কতক রচনায় বিশেষ করে “আর-রাদ্দু ‘আলা’ল-মানতি ‘কি’য়্যীন”-এ করেছেন।

দ্রুত মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তা–ভাবনার ওপর প্রভাব বিস্তার করছিল। অবশ্য এই ভাষান্তরে যুক্তিবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, অংকশাস্ত্র ও আরো কিছু বিষয় ছিল যার ব্যবহারে ক্ষতির কোন আশংকা ছিল না। তবে যে সমস্ত বিষয় ছিল ঐশী ও ইন্দ্রিয়াতীত তা ছিল প্রকৃতপক্ষে গ্রীকদের সেই প্রতিমাবিদ্যা (দেবমালা) যাকে তারা বেশী চালাকি ও চাতুর্যের সঙ্গে দার্শনিকসুলভ ভাষা ও শাস্ত্রীয় (علمى) পরিভাষার পোষাকে আবৃত করে নিয়েছিল। এগুলো ছিল স্রেফ মনগড়া ও কাল্পনিক ইন্দ্রজাল যার কোন অস্তিত্ব বা বাস্তবতা ছিল না। এমন একটি উম্মত যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা নবূওত-রূপ সম্পদ দ্বারা ধন্য করেছিলেন এবং মুহ'ম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাধ্যমে স্বীয় সত্তা ও গুণাবলীর সঠিক পরিচয় এবং মানব জাতির ও বিশ্বজগতের আদি-অন্ত, সূচনা ও পরিণতির নিশ্চিত জ্ঞান দান করেছিলেন, তাদের এই সব মনগড়া কল্প-কাহিনী, রূপকথা ও ঐন্দ্রজালিক কায়কারবারে মগ্ন হবার কিংবা এই সব বিষয়ের গবেষণায় কালক্ষেপণ করার কোন প্রয়োজনই ছিল না। কিন্তু যে সমস্ত লোক গ্রীকদের যুক্তিবিদ্যা, প্রকৃতিবিদ্যা তথা দর্শন ও অংকশাস্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত ছিল–তারা ঐশী সংক্রান্ত ঐ সমস্ত বিষয়কেও আসমানী কিতাবের মতই কবুল করে নেয় এবং এমন ভাব দেখায় যেন তাদের নিকট রসূল ও আসমানী কিতাবের মাধ্যমে কোন ঐশী জ্ঞানই আসেনি।

গ্রীক দর্শনের আরব অনুবাদক ও ভাষ্যকার

গ্রীক দর্শন মুসলমানদের মধ্য থেকে ইয়া'কূ'ব আল-কিন্দী (মৃ. ২৫০ হি.), আবূ নসর ফারাবী (মৃ. ৩৩৯ হি.) ও শায়খ আবূ 'আলী ইব্ন সীনা (মৃ. ৪২৮ হি.)-এর মত উৎসাহী উকীল ও সমর্থক পেয়ে যায়। স্বয়ং গ্রীসেও এঁদের মত প্রতিভার নজীর মেলা ছিল ভার। তাঁরা এ্যারিস্টটলকে পবিত্রতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন একটি মর্যাদায় (ওয়াজিবু'ল-ওজুদ) পৌঁছিয়েছেন যা সম্ভবত গ্রীক ধর্মতত্ত্বের সূচনা কালেও ঘটেনি। এটাও একটা দুর্ভাগ্য যে, মুসলমানদের ভাগে গ্রীসের জ্ঞান-ভাণ্ডারের যে অংশ পড়েছিল তার অধিকাংশই ছিল এ্যারিস্টটলের রচনাবলী ও চিন্তাধারা, যা পয়গম্বরদের শিক্ষা তথা ধর্মের (دين) রূহ ও মেযাজের সঙ্গে খুব কমই সম্পর্ক রাখত। আরেকটি দুর্ভাগ্য এই যে, আরব দার্শনিকদের ভেতর কেউই গ্রীক দর্শনের আসল উৎস ও তার মূল ভাষা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন না। তাঁদের সকল নির্ভরতা ছিল মূলত অনুবাদের ওপর। আর অনুবাদ থেকে মূল লেখকের অভিপ্রায় বুঝে ওঠা মোটেই সহজ নয়। উপরন্তু মুসলিম পণ্ডিতদের ওপর

এ্যরিস্টটলের জ্ঞানগত প্রভাব ও তাঁর ব্যক্তিত্বের যাদু এমনিভাবে ক্রিয়াশীল ছিল যে, তারা তাঁর চিন্তাধারা ও মতামতের ওপর আলোচনা-সমালোচনা করবার প্রয়োজনটুকুও বোধ করেন নি, বরং যুক্তিতর্কের বিষয়গুলোকেও ওয়াহীর মত অটল ও অভ্রান্ত বাণী বলে তারা ধরে নিয়েছিলেন।

জামা'আতে ইখওয়ানু'স-সাফা ও তাদের পুস্তিকাসমূহ

চতুর্থ শতাব্দীর শেষ ভাগে মুসলিম বিশ্বের ওপর গ্রীক দর্শনের প্রভাব পড়ে। প্রত্যেক মেধাসম্পন্ন ও অনুভূতিপ্রবণ যুবক উক্ত দর্শনকে আগ্রহ ও মর্যাদার চোখে দেখত। চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগেই বাগদাদে "ইখওয়ানু'স-সাফা" নামে 'ফ্রী ম্যাসন' ধরনের একটি গোপন সংগঠন গড়ে ওঠে, যার ভেতর গ্রীক দর্শনকে মানদণ্ড ধরে ধর্মীয় আলোচনা ও 'আকাইদের ওপর কথাবার্তা হ'ত এবং সেই নিরিখে উদ্ভূত সমস্যাবলীর সমাধান বের করা হ'ত। এই সংগঠনের কর্মসূচী তাদের ভাষায়ই ছিল নিম্নরূপ ঃ

ان الشريعة الاسلامية قد تنجست بالجهالات واختلطت بالضلالات ولا سبيل الى غسلها وتطهيرها الا بالفلسفة لانها حادية للحكمة الاعتقادية والمصلحة الاجتهادية وانه متى انتظمت الفلسفة اليونانية والشريعة المحمدية صفقد حصل الكمال .

> ইসলামী শরীয়ত মূর্খতা ও গোমরাহীর সংমিশ্রণে দূষিত হয়ে গেছে। একে কেবল দর্শন দ্বারাই ধৌত ও পবিত্র করা যায়। কেননা দর্শন 'আকীদাগত জ্ঞান, হিকমত ও ইজতিহাদী উপযোগিতাকে পরিবেষ্টন করে আছে। এখন কেবল গ্রীক দর্শন ও শরীয়তে মুহাম্মদীর সংমিশ্রণের দ্বারা পরিপূর্ণরূপে বাঞ্ছিত বস্তু লাভ করা যেতে পারে।[১]

তারা তাদের বিশিষ্ট সাথীদেরকে বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছিল, তারা যেন বয়স্ক ও দৃঢ় বিশ্বাসী লোকদের ব্যাপারে বেশী সময় নষ্ট করার পরিবর্তে যুব ও অল্পবয়সী তরুণদের দিকে বিশেষভাবে নজর দেয় এবং তাদেরকে তাদেরই চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত করার চেষ্টা চালায়। কেননা বয়স্ক লোকদের ভেতর 'আকীদাগত দৃঢ়তা ও স্থবিরতা বিদ্যমান থাকায় তারা নতুন জিনিস গ্রহণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কেবল যুবা ও তরুণরাই নতুন বস্তু কবুল করার মত যোগ্যতা রাখে।[২]

---

১. তারীখ ফালাসাফাতু'ল-ইসলামু ফি'ল-মাশরিক' ওয়া'ল-মাগ'রিব, মুহাম্মাদ লুত'ফী জুমু'আ, ২৫৩ পৃ.।
২. প্রাগুক্ত, ২৬০-৬১ পৃ.।

তারা এই আলোচনা ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে ৫২টি পুস্তিকা প্রণয়ন করে। তাদের 'রাসাইল ইখওয়ানু'স-সাফা' নামক পুস্তক সাহিত্য ও ইতিহাসে মশহূর হয়ে আছে। এতে প্রকৃতি বিজ্ঞান, অংকশাস্ত্র ও বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনাও রয়েছে। মু'তাযিলা ও তাদের সমমনা ও সমমতাবলম্বী লোকেরা অত্যন্ত আগ্রহের সাথে 'রাসাইল'কে লুফে নেয়। এগুলো তারা তাদের মজলিসে পড়ত এবং যেখানেই যেত সঙ্গে নিয়ে যেত। এমন কি এক শতাব্দীর মধ্যে তা স্পেন পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে।[১]

মু'তাযিলা ও দার্শনিকদের মধ্যকার পার্থক্য

মু'তাযিলাদের দ্বারা জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে শরীয়ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তারা জ্ঞান-বুদ্ধির শক্তিকে সীমাহীন মনে করে আল্লাহ্র যাত ও সিফাত (সত্তা ও গুণাবলী)-এর ন্যায় নাযুক ও বুদ্ধিবহির্ভূত (বুদ্ধির পরিপন্থী নয়) সমস্যাকে শিশুদের ক্রীড়া-কৌতুকে পরিণত করেছিল। কিন্তু তারা মূলত ধর্মীয় মানসিকতাপুষ্ট লোক ছিল, ওয়াহী ও নবূওতের ওপর ঈমান রাখত এবং সাধারণত মলিনতা (متقشف), অন্যায় ও পাপাচার থেকে সতর্ক থাকত। তারা 'ইবাদত-বন্দেগী ও দীনী দা'ওয়াতের ব্যাপারে উৎসুক ছিল এবং 'আম্‌র বি'ল-মা'রূফ ও নাহী 'আনি'ল-মুনকার' তথা সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ—এই নীতির কঠোর পাবন্দ ছিল।[২] কেননা এগুলো ছিল তাদের নীতি, আদর্শ ও 'আকীদারই দাবী।[৩] এ কারণেই মু'তাযিলা মতবাদের বিস্তার এবং মু'তাযিলাদের শাসন ক্ষমতা লাভের ফলে মুসলিম বিশ্বে কুফর, ধর্মহীনতা, নবুওত অস্বীকার, পরজগত অস্বীকার, আমল ও ধর্ম প্রত্যাখ্যান করবার প্রবণতা সৃষ্টি হতে পারেনি এবং মুসলমানদের ধর্মীয় চেতনা ও উপলব্ধি আহত কিংবা কমযোরও হয়নি।

কিন্তু দার্শনিকদের ব্যাপারটা ছিল এর থেকে একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির। দর্শন নবুওয়াত-এর সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় চললেও তা ধর্মের মূলনীতি, বুনিয়াদী 'আকীদা ও মসলা-মাসাইলের সঙ্গে সংঘর্ষশীল। এজন্যে দর্শনের জনপ্রিয়তা ও মর্যাদা যে পরিমাণে বেড়েছে, ধর্মের গুরুত্ব, প্রভাব ও আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালাম-এর মর্যাদা ও মাহাত্ম্যও সে পরিমাণে কমেছে এবং 'আকীদা থেকে শুরু করে 'আমল ও আখলাক পর্যন্ত এই মানসিক পরিবর্তন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

১. তারীখ-ই-ফালাসাফাতু'ল-ইসলামু ফি'ল-মাশরিক' ওয়া'ল-মাগরিব, মুহাম্মাদ লুত'ফী জুম'আ. ২৫৪ পৃ.।

২. বিস্তারিত জানতে পড়ুন ضحى الاسلام—৩য় খণ্ড, ১ম অধ্যায়।

৩. তাদের মতে গোনাহ কবীরায় লিপ্ত হলে মানুষ চিরতরে জাহান্নামী হয় এবং আম্‌র বি'ল-মা'রূফ ওয়া নাহী 'আনি'ল-মুনকার একজন মুসলমানের পক্ষে ফরয।

এতে করে মুসলমানদের মধ্যে এমন একটি দল ও গ্রুপের সৃষ্টি হয় যারা প্রকাশ্যে ধর্মকে অবজ্ঞা করত এবং ইসলামের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্কহীনতার কথা গর্বভরে ঘোষণা করত। তাদের এতখানি নৈতিক সাহস ছিল না যে, প্রকাশ্যত ধর্মীয় প্রথা-পদ্ধতি অস্বীকার করবে, কিন্তু আন্তরিকভাবে কোন অর্থেই তারা মুসলমান ছিল না।

বাতেনী মতবাদের ফেতনা

দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে ও তার প্রভাবে একটি নতুন ফেতনা জন্ম লাভ করে যা ইসলাম ও নবুওতের শিক্ষামালার জন্য দর্শনের চেয়েও অধিক বিপজ্জনক ছিল ! এটা ছিল বাতেনীদের ফেতনা। এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা ও আহ্বায়ক ছিল প্রধানত সেই সব জাতিগোষ্ঠীর লোক, যারা ইসলামের মুকাবিলায় নিজেদের সাম্রাজ্য ও শাসন ক্ষমতা খুইয়েছিল এবং প্রকাশ্য মুকাবিলা ও যুদ্ধ দ্বারা নিজেদের হৃত ক্ষমতা ফিরে পাবার আশা মন থেকে ধুয়ে মুছে ফেলেছিল। তারা ছিল প্রবৃত্তি পূজারী, ভোগবাদী এবং ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের অভিলাষী। বিভিন্ন লক্ষ্যের অনুসারী ও অভিসারী এই সব লোক বাতেনী মতবাদের ঝাণ্ডাতলে একত্র হয়। তারা ভালভাবে বুঝে নিয়েছিল যে, সামরিক শক্তির মাধ্যমে তারা ইসলামকে পরাজিত করতে পারবে না কিংবা মুসলমানদেরকে খোলাখুলিভাবে কুফর ও ইলহাদের দিকেও দা'ওয়াত দিতে পারবে না। কেননা এরূপ করলে মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতি ও বাতিলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধস্পৃহা জেগে উঠবে। তাই তারা অনেক ভেবে-চিন্তেই একটি নতুন রাস্তা এখতিয়ার করে।

জাহির ও বাতেনের বিভ্রম

তারা দেখল যে, শরীয়তের উসূল-'আকাইদ, হুকুম-আহকাম ও মসলা-মাসাইলসমূহ শব্দমালার ভেতর দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে আর মানুষের উপলব্ধি সৃষ্টি ও আমলের দিক-দর্শনের জন্য এমনটি করার প্রয়োজনও ছিল।

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ .

"আমি কোন নবীকে তাঁর সম্প্রদায়ের ভাষা ছাড়া পাঠাইনি, যাতে করে তিনি লোকদের সাথে পষ্টাপষ্টি ও খোলাখুলিভাবে তার বক্তব্য পেশ করতে পারেন।" –সূরা ইবরাহীম ঃ ৪ আয়াত;

এই সব শব্দসমষ্টির অর্থ ও মর্ম পরিষ্কার। রাসূলুল্লাহ (সা) নিজ মুখে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং নিজের আমল দ্বারা এর প্রমাণও দেখিয়েছেন। এই অর্থ ও

মর্ম মুসলিম উম্মাহ্‌র কর্মের মাধ্যমেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গোটা উম্মাহ্ তা জানে এবং মানে। নবুওত ও রিসালত, মালাইকা, আখিরাত তথা পারলৌকিক জীবন, জান্নাত, জাহান্নাম, শরীয়ত, ফরয ও ওয়াজিব, হালাল–হারাম, সালাত, যাকাত, সিয়াম, হজ্জ– এইগুলো সেই সব শব্দ যা বিশেষ ধর্মীয় হাকীকত বর্ণনা করে। যেভাবে এই সব ধর্মীয় হাকীকত নিরাপদ ও সংরক্ষিত অবস্থায় চলে আসছে, সেভাবে ধর্মীয় হাকীকত আদায়কারী এই শব্দসমষ্টিও নিরাপদ ও সংরক্ষিত অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে।

যখন নবুওত ও রিসালত কিংবা নবী-রসূল অথবা সালাত ও যাকাত শব্দ উচ্চারণ করা হয় তখন সেই হাকীকতই উপলব্ধিতে ধরা পড়ে এবং সেই বাস্তব রূপই সামনে আসে যা রাসূলুল্লাহ (সা) বাতলে দিয়েছেন, যা সাহাবা-ই-কিরাম বুঝেছেন, আমল করেছেন এবং অন্যদের কাছেও পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। এভাবেই বংশপরম্পরায় সে জিনিস মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে হস্তান্তরিত হয়ে আসছে। তারা তাদের মেধার সাহায্যে এ কথাটি বুঝে নিয়েছেন যে, শব্দ ও অর্থের এই সম্পর্ক মুসলিম উম্মাহ্‌র গোটা জীবনের ও ইসলামের চিন্তাগত ও বাস্তব নীতির ভিত্তি এবং এর দ্বারাই মুসলিম উম্মাহ্‌র অতীত ও ভবিষ্যৎ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। যদি এই সম্পর্ক টুটে যায় এবং ধর্মীয় শব্দসমষ্টি ও পরিভাষাগুলোর মর্মার্থ নির্ধারিত না থাকে অথবা সন্দেহ ও সংশয়যুক্ত হয়ে পড়ে তাহলে এই উম্মাহ যে কোন লোকের দা'ওয়াত ও আহ্বান এবং যে কোন দর্শন ও মতবাদের শিকারে পরিণত হতে পারে। আর এতে করে ইসলামের সঙ্গীন কেল্লায় শত শত চোরা দরজা ও হাযার হাযার ফাটলের সৃষ্টি হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক।

এই নীতিটি হৃদয়ঙ্গম করার পর তারা (বাতেনীরা) তাদের সকল শক্তি এই প্রচারে নিয়োগ করে যে, প্রতিটি শব্দের একটি প্রকাশ্য অর্থ আছে, আর আছে একটি প্রকৃত ও গোপন অর্থ। এভাবেই কুরআন ও হাদীছের কিছু প্রকাশ্য ও কিছু প্রকৃত হাকীকত বা মূল সত্য রয়েছে। এসব হাকীকতের সঙ্গে ঐসব প্রকাশ্য বিষয়গুলোর সম্পর্ক ঠিক সেই রকম যে রকম সম্পর্ক মজ্জা ও মস্তিষ্কের সঙ্গে খোসা ও চামড়ার। মূর্খেরা কেবল প্রকাশ্যটার খবর রাখে ; তাই তাদের কাছে কেবল খোসা ও বাকলের ছড়াছড়ি। অপরদিকে জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীরা বিষয়বস্তুর হাকীকত সম্পর্কেও জ্ঞান রাখেন। তাই তাদের ভাগে পড়েছে মগজ। তারা জানেন যে, এই শব্দসমষ্টি প্রকৃতপক্ষে হাকীকতের গুপ্ত রহস্য ও প্রচ্ছন্ন ইশারা-ইঙ্গিত। এ সবের অর্থ তা নয় যা জনসাধারণ বোঝে ও আমল করে। এ সবের অর্থ আরও কিছু যার জ্ঞান কেবল রহস্যজ্ঞানী তথা গুপ্ত জ্ঞানের অধিকারীরাই রাখেন। তাদের কাছে

থেকেই অন্যরা এটা হাসিল করতে পারে। যারা সেই হাকীকত পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে নি এবং যারা প্রকাশ্য বিষয়াবলীর মধ্যে বন্দী রয়েছে তারা প্রকাশ্য বেড়ি ও শরীয়তের বাধ্যবাধকতার মধ্যেই আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে। তারা অত্যন্ত নীচু স্তরেই অবস্থান করছে। যারা হাকীকত ও গুপ্ত রহস্যের উচ্চতম সোপানে পৌঁছেছেন তাদের গর্দান থেকে এই বেড়ি ও শৃঙ্খল নেমে যায় এবং তারা শরীয়তের পাবন্দী থেকে মুক্ত ও আযাদ হয়ে যায়।[১] এটাই এই আয়াতের মর্ম ঃ

وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالاَغْلاَلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۔

"(নবী) তাদেরকে সেই বোঝা থেকে নাজাত দেবে যার নিচে তারা চাপা পড়ে আছে এবং সেই ফাঁদ থেকে বের করে আনবে যার ভেতর তারা বন্দী।" —সূরা আ'রাফ ঃ ১৫৭ আয়াত

এই মূলনীতি যখন মেনে নেওয়া হ'ল এবং হাকীকত ও জাহিরী বিষয়ের এই দর্শন যখন কবুল করে নেওয়া হ'ল তখনই তারা নবী, ওয়াহী, নবূওত, ফিরিশতা, আখিরাত তথা পারলৌকিক জীবন ও শরীয়তের পরিভাষাগুলোর এমন সব মনগড়া ব্যাখ্যা দেওয়া শুরু করল যার কিছু দুর্লভ নমুনা নিম্নে দেওয়া গেল ঃ

> নবী সেই সত্তার নাম যাঁর ওপর কুদসিয়া সাফিয়া শক্তির ফয়েয বর্ষিত হয়েছে। জিবরীল কোন সত্তার নাম নয়, শুধু ফয়েয-এর নাম। প্রত্যাবর্তনস্থল (معاد) বলতে বোঝায় প্রতিটি বস্তুর নিজ হাকীকতের দিকে ফিরে আসা। (جنابت) বলতে বোঝায় রহস্যের প্রকাশ। গোসল দ্বারা বোঝায় অঙ্গীকারের পুনরুজ্জীবন বা নবায়ন। যেনা (ব্যাভিচার) বলতে বোঝায় 'ইলমে বাতেনের বীজকে এমন কোন সত্তার দিকে স্থানান্তরিত করা যে অঙ্গীকারে শরীক নয়। তাহারাত তথা পবিত্রতা বলতে বোঝায় বাতেনিয়া মযহাব ভিন্ন প্রতিটি মযহাব থেকে মুক্তি লাভ। তায়াম্মুম অর্থ এজাযতপ্রাপ্ত ব্যক্তি থেকে 'ইল্ম হাসিল। সালাত দ্বারা বোঝায় যুগের ইমামের দিকে আহ্বান। যাকাত বলতে বোঝায় যোগ্য ব্যক্তি ও সূফীর ভেতর 'ইল্ম-এর প্রচার। সিয়াম (রোযা) বলতে বোঝায় গুপ্ত রহস্য প্রকাশ থেকে পরহেয করা ও সতর্কতা অবলম্বন করা।

---

১. শরীয়ত থেকে অব্যাহতি লাভের স্থায়ী 'আকীদাও তাদের ভেতর পাওয়া যায়। একজন বাতেনী ইমাম ও দা'ঈ "সায়্যিদুনা" ইদরীস লিখেন ঃ بعث الله محمد بن اسماعيل وهو نبى ناطق بنسخ شريعة محمد صـ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈলকে আল্লাহ তা'আলা নবীয়ে নাতি'ক' বা বাকসম্পন্ন নবী হিসাবে প্রেরণ করেন এবং তিনি মুহাম্মদ (স)- এর শরীয়ত মনসুখ করে দেন (عاصمة نفوس المهتدين وقاصمة ظهور المعتدين لسيدنا ادريس)। মু'ইয্ লেদীনিল্লাহ ফাতিমী থেকেও এ ধরনের উক্তি বর্ণিত আছে।

হজ্জ-এর অর্থ সেই জ্ঞান অন্বেষণ করা যা 'আকল বা বুদ্ধির কিবলা ও মনযিলে মকসুদ। জান্নাত বলতে 'ইলমে বাতেন ও জাহান্নাম বলতে 'ইলমে জাহিরকে বোঝায়। কা'বা বলতে খোদ নবীর সত্তা এবং বাবে কা'বা বলতে হযরত 'আলী (রা)-এর সত্তাকে বোঝায়। কুরআন মজীদে নূহ' (আ)-এর তুফান বলতে বোঝায় 'ইলমের তুফান যার ভেতর শাহাদাতের অধিকারীদেরকে (আহলে শাহাদাত) ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল। নমরূদের আগুন বলতে প্রকৃত আগুন নয়, বরং নমরূদের ক্রোধকে বোঝায়। যবাহ দ্বারা বোঝায় ইবরাহীম (আ) যার জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন এবং সন্তান থেকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ। ইয়া'জুজ ও মা'জুজ বলতে জাহিরীপন্থী এবং মুসা (আ)-এর লাঠি বলতে তাঁর দলীল-প্রমাণ বোঝায়[১]—ইত্যাদি।

নবূওতে মুহাম্মাদীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত শরীয়তের শব্দমালার অর্থ ও মর্মকে অস্বীকার এমন একটি সফল আঘাত যার সুযোগ ইসলামী নিজাম-ই-ই'তিকাদ ও নিজাম-ই ফিক্‌র তথা ইসলামের 'আকীদাগত ও চিন্তাগত নীতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীরা প্রতিটি যুগেই নিয়েছে। ইসলামের গোটা প্রাসাদ-সৌধকে এভাবে সহজেই ধ্বংস করা এবং ইসলামের প্রকাশ্য ও বাহ্যিক খোলসের অভ্যন্তরে আরও একটি সাম্রাজ্য গড়ে তোলা সম্ভব। আমরা দেখতে পাই যে, পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে যে সব বাতিল ফেরকা এবং মুনাফিকদের যেসব দল নবূওতে মুহাম্মাদীর বিরুদ্ধে অর্থগত বিদ্রোহ করতে চেয়েছে তারা বাতেনীদের এই অস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করেছে এবং এই অর্থগত ধারাবাহিকতাকে অস্বীকার করে গোটা ইসলামী রীতিনীতি তথা ইসলামী নিজামকে সন্দেহযুক্ত করে তোলার প্রয়াস পেয়েছে। তারা নিজেদের জন্য ধর্মীয় নেতৃত্ব, এমন কি নতুন নবূওতের দরজাও খুলে দিয়েছে। ইরানের বাহাই মতবাদ ও ভারতবর্ষের কাদিয়ানী মতবাদ এর সর্বোত্তম উদাহরণ।[২]

---

১. কাওয়াইদ 'আকাইদ আলে-মুহাম্মাদ (বাতেনিয়া), মুহাম্মাদ ইবন হাসান দায়ালামী য়ামানী কর্তৃক হি. ৭০৭ সনে রচিত ; পৃ. ৮-১৬।

২. কাদিয়ানীরাও বাতেনীদের ন্যায় শব্দমালা বাকী রেখে সে সবের নতুন অর্থ বর্ণনা করেছে এবং অর্থগত উত্তরাধিকারিত্ব ও ধারাবাহিকতা কার্যত অস্বীকার করেছে। তারা খতমে নবূওত, মসীহ ও মসীহ্‌র অবতরণ, মু'জিযা, দাজ্জাল ইত্যাদি শব্দের ব্যাখ্যায় ও সামঞ্জস্য বিধানে বাতেনীদের মতই উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। মীর্জা সাহেবের গ্রন্থ ও মওলবী মুহাম্মাদ আলী লাহোরীর তফসীর এ ধরনের উদাহরণে ভরপুর। বাহাইরা একেবারে নতুন শরীয়ত আবিষ্কার (পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন) (পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর) করেছে। সে সবের কতকগুলো দফা এইরূপ ঃ রোযা বছরে এক মাসেরই কিন্তু মাস ১৯ দিনের ; রোযার প্রারম্ভ সুবহে সাদিকের পরিবর্তে সূর্যোদয় থেকে : মানুষ ১১ বছর বয়স

প্রকাশ থাকে যে, এই সব সমালোচনাকে (যার কতিপয় দৃষ্টান্ত ওপরে পেশ করা হ'ল) কোন সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু 'ইলমে কালামের আলোচনা ও বিতর্ক মুসলিম বিশ্বে এক মানসিক অস্থিরতার সৃষ্টি করে এবং ঐ সমস্ত মানুষের ওপর বাতেনীদের প্রভাব যাদুর ন্যায় বিস্তার লাভ করে যারা প্রাচীন জ্যোতিষ্কবিদ্যা, প্রকৃতিবিদ্যা, গ্রীক দর্শনের সমস্যাবলী, গ্রীক পরিভাষা ইত্যাদিকে স্বাধীনভাবে ব্যবহার করেছিল। আর তাদের পাশে গিয়ে জড়ো হয় বিভিন্ন প্রভাব ও বিবিধ উদ্দেশ্যের লোক-কেউ প্রতিশোধ কামনায়, কেউ রহস্য ও সূক্ষ্ম ইশারা-ইঙ্গিতের আগ্রহে ও আকর্ষণে, কেউ ভ্রান্ত কিসিমের জাহিরীয়াত ও মালিন্যের (تقشف) প্রতিক্রিয়ায়, কেউ লোভ ও প্রবৃত্তির গোলামী এবং নফ্স পূজার অবাধ স্বাধীনতার লোভে, কেউ বা আহলে বায়তের নামে। এভাবে বাতেনীরা এমন সব গোপন সংগঠন কায়েম করে যার ফলে শক্তিশালী হুকুমতগুলো পর্যন্ত দীর্ঘদিন যাবত পেরেশানীর মাঝে কাল কাটায়। মুসলিম বিশ্বের যোগ্যতম কতিপয় ব্যক্তিত্ব (নিজামুল-মুল্‌ক, ফখরুল-মুল্‌ক প্রমুখ) তাদের শিকারে পরিণত হয়।[১] অনেক দিন পর্যন্ত কোন বড় 'আলিম ও মুসলিম বাদশাহ কিংবা উযীর এ ব্যাপারে নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত ছিলেন না যে, ভোর বেলা তিনি সহীহ্-সালামতে উঠতে পারবেন। ইব্‌নে জওযী লিখেছেন যে, ইস্ফাহানে কোন লোক যদি 'আসর পর্যন্ত ঘরে না ফিরত তাহলে ধরে নেওয়া হ'ত যে, সে কোন বাতেনী গুপ্ত ঘাতকের শিকারে পরিণত হয়েছে। এই অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতা ছাড়াও তারা মন-মানস, সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানকেও কলুষিত করতে শুরু করে এবং ধর্মের মূলনীতি, নস ও অকাট্য বিষয়গুলোর মনগড়া ও বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে ব্যাপক ধর্মহীনতার দরজা উন্মুক্ত করে দেয়।

থেকে ২৪ বছর বয়স পর্যন্ত শরীয়তের হুকুম-আহকাম পালনে বাধ্য থাকে, এরপর বাধ্যবাধকতা উঠে যায়। ওযু ফরয নয়, মুস্তাহাব; মহিলাদের প্রতি দৃকপাত জায়েয; পর্দা-পুশিদা বলে কোন কিছু নেই। যে গৃহে মযহাবের প্রতিষ্ঠাতার (বাব মযহাব) জন্ম হয়েছে তা যিয়ারত করা ওয়াজিব। জানাযার ক্ষেত্রেই কেবল জামা'আতে সালাত শরীয়তের বিধান। ঈমান আনয়নের পর আর কোন বস্তুই অপবিত্র থাকে না, বরং কেবল বাবী ধর্মের আনুগত্য ও অনুসরণের দ্বারাই মানুষ পবিত্র হয়ে যায় এবং আর কখনও ময়লা ও পূতিগন্ধময় হয় না এবং যে জিনিসেই তার হাতের স্পর্শ লাগে তাও পবিত্র হয়ে যায়। পানি সর্বদাই পাক-পবিত্র থাকে। বাহাইদের উত্তরাধিকার আইন আলাদা (হাযির 'আলামু'ল-ইসলামী, ফ্রেঞ্চ ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলামের বরাতে)। মসিও হুবার্ট তাঁর "বাবী মতবাদ" নামক নিবন্ধে যথার্থই লিখেছেন যে, বাব ইসলামের ভেতর সংস্কারের নামে একটি নতুন ধর্মের জন্ম দিয়েছে, যার 'আকীদা ও উসূল স্বতন্ত্র এবং তা নতুন একটি সমাজ ও সামাজিক কাঠামোর জন্ম দিয়েছে। একই অবস্থা কাদিয়ানী মতবাদেরও। দুই স্থানেই নতুন নবুওত এবং নতুন ধর্মীয় রীতিনীতির ভিত্তি রচনা করা হয়েছে। বস্তুতপক্ষে এসবই বাতেনী মতবাদের পুনরুচ্চারিত কণ্ঠস্বর।

১. বাতেনীদের হাতে যাঁরা শহীদ হয়েছিলেন তাঁদের বিস্তারিত তালিকা দেখতে চাইলে দ্র. "নিজামু'ল-মুল্‌ক তূসী", ৫৬০-৫৬৩ পৃ.।

একজন নতুন ব্যক্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা

দর্শন ও বাতেনী মতবাদের এই ইসলাম দুশমন প্রভাবের বিরুদ্ধে এমন একজন ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন ছিল, যিনি ধর্মীয় ও জাগতিক জ্ঞান-বুদ্ধি– এই উভয় দিকেই পুরোপুরি অভিজ্ঞ ও সূক্ষ্ম দৃষ্টির অধিকারী, যিনি সকল শাখায় মুজতাহিদসুলভ জ্ঞান ও প্রতিভায় স্বীয় অবস্থান সুদৃঢ় করেছেন– যিনি খোদাদাদ মেধা, প্রকৃতিগত উদ্ভাবন শক্তি ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে গ্রীক দার্শনিক এবং প্রাচীন নেতৃস্থানীয় চিন্তাবিদদের থেকে কম যান না, যিনি বহুবিধ জ্ঞান নতুন পন্থায় সংকলিত করবার যোগ্যতা রাখেন, যিনি জ্ঞানের ক্ষেত্রে পূর্ণ ও প্রশস্ত দৃষ্টির অধিকারী হবার সঙ্গে সঙ্গে ঈমান ও য়াকীনরূপ সম্পদেও ধন্য, যিনি স্বীয় ব্যক্তিগত চিন্তা–ভাবনা, অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ, 'ইবাদত ও রিয়াযত দ্বারা ধর্মের চিরন্তন হাকীকতের ওপর নতুন ঈমান লাভ করেছেন, যিনি নবতর আস্থা, জীবন্ত ও সজীব বিশ্বাসের সঙ্গে দূরদৃষ্টি সহকারে ধর্মের আনুগত্য ও রাসূলের অনুসরণের দিকে দা'ওয়াত দিতে এবং মুসলিম বিশ্বে ও জ্ঞানের জগতে স্বীয় 'ইল্ম ও ইয়াকীন এবং চিন্তা-ভাবনা ও স্বচ্ছ দৃষ্টির সাহায্যে একটি নতুন রূহ' ও যিন্দেগীর একটি নতুন প্রবাহ সৃষ্টি করতে সমর্থ। হি. পঞ্চম শতাব্দীর ঠিক মাঝখানে ইসলাম এমনই একজন ব্যক্তিত্ব লাভ করে, মুসলিম বিশ্বে যাঁর প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশী। সন্দেহ নেই ইমাম গাযালী (র) ছিলেন সেই ব্যক্তিত্ব।

অষ্টম অধ্যায়

ইমাম গাযালী (র)

শিক্ষা লাভ ও জ্ঞানের উচ্চমার্গে আরোহণ

ইমাম গাযালী (র)-এর নাম মুহাম্মাদ, ডাকনাম আবূ হামেদ। পিতার নামও মুহাম্মাদ ছিল। তূস জেলায় ৪৫০ হিজরীতে তাহিরান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার ওসিয়ত মুতাবিক তাঁর এক বন্ধু–যিনি একজন একনিষ্ঠ 'ইল্‌ম-দোস্ত ও সূফী গরীব মুসলমান ছিলেন–তাঁর শিক্ষার বন্দোবস্ত করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন এবং তাঁকে কোন মাদরাসায় ভর্তি হবার পরামর্শ দেন। অনন্তর তিনি একটি মাদরাসায় ভর্তি হয়ে শিক্ষা অর্জনে আত্মনিয়োগ করেন।

ইমাম গাযালী (র) স্বদেশে শায়খ আহমাদ আর-রাযেকানীর নিকট থেকে শাফি'ঈ মযহাবের ফিক্'হশাস্ত্রে তা'লীম হাসিল করেন। এরপর জর্দানে ইমাম আবূ নসর ইসমা'ঈলীর নিকট পড়াশুনা করেন। এরপর নিশাপুর গিয়ে ইমামু'ল-হ'ারামায়নের মাদরাসায় ভর্তি হন এবং অতি অল্পদিনেই তিনি তাঁর ৪০০ সহপাঠীর মধ্যে একটি বিশিষ্ট আসন লাভ করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর খ্যাতিমান উস্তাদের সহযোগী (নায়েব)-তে পরিণত হন, এমন কি ইমামু'ল-হ'ারামায়ন তাঁর সম্পর্ক বলতেন, "গাযালী (র) গভীর সমুদ্র।" ইমামু'ল-হ'ারামায়ন-এর ইনতিকালের পর তিনি নিশাপুর থেকে বহির্গত হন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল ২৮ বছর, অথচ তখনো তাঁকে বড় বড় বর্ষীয়ান 'উলামা'র চেয়ে অধিকতর বিশিষ্ট ও কামালিয়তের অধিকারী মনে করা হ'ত।

পঠন-পাঠন থেকে ফারিগ হবার পর ইমাম গাযালী (র) নিজামু'ল-মুলকের দরবারে যান। তাঁর খ্যাতি ও বিশেষ যোগ্যতার কারণে নিজামু'ল-মুল্‌ক তাঁকে অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে দরবারে গ্রহণ করেন। এখানে ছিল দুর্লভ রত্নসম জ্ঞানী-গুণীদের সমাবেশ। জ্ঞানের আলোচনা ও ধর্মীয় মুনাজারা (বিতর্ক) তখনকার দরবার, মজলিস, এমন কি বিবাহানুষ্ঠান ও শোক সভারও একটি অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। ইমাম গাযালী (র) যাবতীয় বিতর্ক আলোচনায় সকলের ওপর জয়ী হতেন। তাঁর অতুলনীয় যোগ্যতাদৃষ্টে নিজামুল'-মুল্‌ক তাঁকে নিজামিয়া মাদরাসার অধ্যক্ষ হিসাবে মনোনীত করেন, যা ছিল সে যুগে একজন 'আলিমের জন্য সম্মান ও মর্যাদার সর্বোচ্চ সোপান। সে সময় গাযালীর বয়স ৩৪ বছরের বেশী ছিল না।

৪৮৪ হিজরীতে তিনি বিরাট শান-শওকতের সঙ্গে বাগদাদে প্রবেশ করেন এবং নিজামিয়ায় পাঠ দান শুরু করেন। অল্পদিনেই তাঁর যোগ্য শিক্ষকতা, উত্তম আলোচনা ও জ্ঞানের গভীরতার কথা সারা বাগদাদে ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্র- শিক্ষক ও জ্ঞানী-গুণী তাঁর বিদ্যাবত্তা থেকে উপকৃত হবার জন্য চতুর্দিক থেকে নিজামিয়ায় এসে ভীড় জমাতে লাগল। তাঁর দর্‌স-মাহফিল গোটা মনুষ্যকুলের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়। তিন শ'র মত সমাপ্ত পর্যায়ের ছাত্র, শত শত আমীর-উমারা' ও রঈস এতে শরীক হতেন। ক্রমে ক্রমে তাঁর উন্নত মস্তিষ্ক ও মেধা, 'ইল্‌মী ফযীলত ও শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব বাগদাদে এমন প্রভাব-প্রতিপত্তি সৃষ্টি করে যে, তিনি সাম্রাজ্যের নেতৃস্থানীয় সদস্যবর্গের সমমর্যাদা লাভ করেন। তাঁর সম্পর্কে তাঁর সমসাময়িক শায়খ 'আবদুল গাফির ফারসী বলেন, "তাঁর জাঁকজমক ও আড়ম্বরের সামনে আমীর-উমারা', উযীর, এমন কি স্বয়ং দরবারে খিলাফতের শান-শওকত পর্যন্ত নিষ্প্রভ হয়ে যায়।"[১] এমনি সময়ে ৪৮৫ হিজরীতে তাঁকে 'আব্বাসী খলীফা মুক্'তাদী বিল্লাহ্ মালিক শাহ সালজুকীর বেগম তুর্কান খাতুনের নিকট (যিনি সে সময় সাম্রাজ্যের হর্তা-কর্তা ছিলেন) স্বীয় দূত বানিয়ে পাঠান। খলীফা মুক্'তাদী বিল্লাহ্‌র স্থলাভিষিক্ত খলীফা মুস্তাজহির ইমাম গাযালী (র)-এর সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক রাখতেন এবং তাঁর একনিষ্ঠ ভক্ত ও অনুরক্ত ছিলেন। তাঁরই নির্দেশে ইমাম গাযালী (র) বাতেনী মতবাদের বিরুদ্ধে কিতাব লিখেন এবং খলীফার সঙ্গে সম্পর্কিত করে এর নাম রাখেন 'মুস্তাজহিরী'।

এগার বছরের চলমান জীবন (رهنوردی) এবং এর অভিজ্ঞতা

এই চরম উন্নতি ও উত্থানের স্বাভাবিক দাবি ছিল যে, ইমাম গাযালী (র) এতে তৃপ্তি লাভ করবেন এবং এই বৃত্তের মাঝেই তিনি তাঁর গোটা জীবন কাটিয়ে দেবেন, যেমনটি তাঁর কতক উস্তাদ করেছেন এবং লোকেও সাধারণত তাই করে থাকে। কিন্তু তাঁর অস্থির স্বভাব ও প্রকৃতি, উন্নত মনোবল, দুরন্ত সাহসিকতা উন্নতির এই চরম পর্যায়েও তাঁকে সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত রাখতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে এই উন্নত মনোবল ও হিম্মতই তাঁকে 'ইমাম' ও 'হু'জ্জাতু'ল–ইসলাম' বানিয়েছিল। দুনিয়াতে জাঁকজমক, আড়ম্বর, সম্মান ও পদবীর কুরবানী এবং স্বীয় উদ্দেশ্যের প্রতি একাগ্রতা ও সত্যের প্রতি আকর্ষণের এমন দৃষ্টান্ত বিরল। ইমাম গাযালী (র) স্বয়ং সেসব অবস্থা ও কার্যকারণ বর্ণনা করেছেন যা তাঁকে এমন পদক্ষেপ গ্রহণে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং যা তাঁকে টেনে বের করেছিল শিক্ষা ও দর্‌স

১. তা'বাক'াতু'শ–শাফি'ঈয়্যাতু'ল-কুবরা, ৪র্থ খণ্ড, ১০৭ পৃষ্ঠা।

প্রদানের কাজ থেকে। যা হোক, শেষ পর্যন্ত তিনি জ্ঞান রাজ্যের বাদশাহী ছেড়ে নিশ্চিত জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়াতীত (বাতেনী) সম্পদের তালাশে বেরিয়ে পড়েন এবং স্বীয় লক্ষ্যে কামিয়াবী লাভ করেন। المنقذ من الضلال। বা 'ভ্রান্তির অপনোদন' নামক গ্রন্থে তিনি এ সম্পর্কে লিখেছেন :

শৈশব থেকেই আমার স্বভাব ছিল সব কিছু বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখা এবং যে কোন তথ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য চিন্তা-ভাবনা করা। প্রতিটি ফের্কা ও দলের সঙ্গে আমি মিশতাম এবং তাদের 'আকীদা ও ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে অবহিত হবার চেষ্টা করতাম। এর ফলে ক্রমে ক্রমে আমা থেকে তাকলীদ তথা অন্ধ পরানুগত্যের বন্ধন ছুটে যায়। যে 'আকীদা-বিশ্বাস শৈশব থেকেই আমার মস্তিষ্কে দানা বেঁধেছিল তা নড়বড়ে ও শিথিল হয়ে পড়ে। আমি লক্ষ্য করলাম যে, একজন খৃস্টান ও একজন ইয়াহূদী তাদের নিজ নিজ 'আকীদা-বিশ্বাসের ওপর লালিত-পালিত হয়। প্রকৃত 'ইল্‌ম এই যে, তাতে কোন প্রকার সন্দেহের এতটুকু অবকাশ কিংবা আশংকা থাকবে না। উদাহরণত, আমার এ ব্যাপারে স্থির বিশ্বাস আছে যে, দশ সংখ্যাটি তিন-এর অধিক। এখন যদি কেউ বলে, "তিন সংখ্যাটিই অধিক এবং আমি আমার দাবির সপক্ষে আমার এই লাঠিটাকে সাপ বানাতে পারি", অতঃপর তিনি যদি তা বানিয়ে দেখিয়েও দেন তবুও তা আমার জ্ঞানের ক্ষেত্রে এতটুকু সন্দেহ কিংবা সংশয় সৃষ্টি করবে না। আমি বিস্মিত হব ঠিকই, কিন্তু তা আমার স্থির ও নিশ্চিত বিশ্বাসে এতটুকু চিড় ধরাতে পারবে না। আমার বিশ্বাস অটল ও অনড় থাকবে যে, তিনের চেয়ে দশ বেশী। আমি গভীরভাবে ভেবে দেখে বুঝতে পারলাম যে, এ ধরনের নিশ্চিত জ্ঞান কেবল অনুভূতিলব্ধ ও অপরিহার্য সত্য সম্পর্কিত বিষয়াবলীর গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ। কিন্তু যখন আরও বেশী সাধনা চালালাম তখন জানতে পারলাম, এতেও সন্দেহের অবকাশ পুরোপুরি বিদ্যমান। আমি দেখলাম যে, পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ইন্দ্রিয় হচ্ছে দৃষ্টিশক্তি, অথচ এতেও ভুল হয়। আমার এই সন্দেহ এত দূর বৃদ্ধি পেল যে, আমার ইন্দ্রিয়ানুভূতির নিশ্চিত হবার ব্যাপারে কোন নিশ্চয়তাই থাকল না। পুনরায় আমি বুদ্ধিবৃত্তির ওপর গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলাম। কিন্তু তাকে ইন্দ্রিয়ানুভূতির চেয়েও বেশী সন্দেহযুক্ত ও কমযোর পেলাম। প্রায় দু'মাস অবধি আমার এই দোদুল্যমান অবস্থা চলতে থাকল এবং আমার ওপর সোফিস্ট মতবাদের প্রাধান্য বজায় রইল। অতঃপর আল্লাহ্ পাক আমাকে এই বিমারী থেকে আরোগ্য দান করলেন এবং আমার স্বভাবে সুস্থতা ও ভারসাম্য ফিরে এল এবং

বুদ্ধিবৃত্তিক ও যুক্তিনির্ভর অপরিহার্য সত্যের ওপর তৃপ্তি ফিরে পেলাম, বরং এটি ছিল আমার অন্তরাত্মায় আল্লাহ্‌প্রদত্ত নূরের আকস্মিক ঝলকানি। এই ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভ করবার পর এখন আমার সামনে চারটি দল রয়ে গেল–যাদের সত্য-সন্ধানী বলে মনে হচ্ছিল। মুতাকাল্লিমীন–যারা জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী বলে দাবি করত; বাতেনীদের দাবি ছিল যে, তাদের নিকট বিশেষ শিক্ষামালা গুপ্ত রহস্য আছে এবং তারা সরাসরি নিষ্পাপ ইমাম (ইমামে মা'সূ'ম) থেকে হাকীকতে 'ইল্‌ম তথা জ্ঞানের হাকীকত হাসিল করেছে; দার্শনিকদের বক্তব্য হ'ল, কেবল তাঁরাই যুক্তিবাদী এবং কেবল তাঁরাই দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে কথা বলেন। সূফীগণ নিজেদেরকে কাশ্‌ফ ও শুহূদ তথা অন্তর্দৃষ্টি ও পর্যবেক্ষণ জ্ঞানের অধিকারী মনে করেন। আমি প্রতিটি দলের কিতাবাদি ও চিন্তাধারা অধ্যয়ন করলাম। কিন্তু কারো ব্যাপারেই নিশ্চিন্ত হতে পারিনি। 'ইলমে কালাম সম্পর্কে এই বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের (মুহাক্কিক) রচিত গ্রন্থাদি পড়ি এবং নিজেও এই বিষয়বস্তুর ওপর বই-পুস্তক লিখি। আমি দেখলাম যে, যদিও এটি এমন একটি বিষয় যা স্বীয় উদ্দেশ্য পূরণ করে, কিন্তু তা আমাকে সান্ত্বনা প্রদানের জন্য যথেষ্ট নয়। কেননা তার ভেতর এমন সব প্রস্তাবনার ওপর ভিত্তি রাখা হয়েছে যা সম্মুখস্থ প্রতিপক্ষের পেশকৃত এবং মুতাকাল্লিমীন (ধর্মতাত্ত্বিক) যেগুলোকে কেবল অন্ধ আনুগত্যের কারণে মেনে নিয়েছেন অথবা তা ইজমা' কিংবা কুরআন ও হাদীছ-এর নস। এসব জিনিস সেই ব্যক্তির মুকাবিলায় খুব একটা কার্যকর নয়, যারা যুক্তিসঙ্গত অপরিহার্য সত্য ছাড়া আর কিছু স্বীকার করে না। দর্শন সম্পর্কে মতামত কায়েম করবার জন্য প্রথমে আমি গবেষণামূলক মনোভঙ্গী নিয়ে তা করাকে অত্যাবশ্যক মনে করলাম যদিও অধ্যাপনা ও পুস্তক রচনায় অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় ফুরসত মিলত খুব কম। আমার দরসের মাহফিলে বাগদাদের তিন-তিন শ' ছাত্র যোগদান করত। এতদ্‌সত্ত্বেও আমি এজন্য কিছুটা সময় বের করে নিলাম এবং দু' বছরের ভেতরই দর্শনের তাবৎ জ্ঞান-ভাণ্ডার অধ্যয়ন করে দেখলাম। অতঃপর এক বছর পর্যন্ত এর ওপর চিন্তা-ভাবনা করলাম। আমি দেখলাম, তাদের জ্ঞান ছয় প্রকারের ঃ যথা ঃ অংকশাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা, প্রকৃতিবিদ্যা বা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি, নীতিশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্র। প্রথম পাঁচ প্রকারের জ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের হাঁ-না কোন সম্পর্কই নেই এবং ধর্মের ইতিবাচক দিক সপ্রমাণ করবার জন্য সে সবের অস্বীকৃতিরও কোন প্রয়োজন নেই। কতক দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সাথে ধর্মের টক্কর লাগে, কিন্তু তা কতিপয় জিনিসে মাত্র।

এই ব্যাপারে নীতিগতভাবে এই 'আকীদা পোষণ করতে হবে যে, প্রকৃতি বা স্বভাব আল্লাহ্‌র এখতিয়ারাধীন এবং বিজ্ঞান স্বয়ম্ভর ও স্বশাসিত নয়। অবশ্য যে সমস্ত লোক ঐ সমস্ত জ্ঞান ও নিবন্ধে দার্শনিকদের মেধা ও সূক্ষ্মদৃষ্টি লক্ষ্য করে তারা সাধারণত ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং মনে করে যে, জ্ঞানের সকল শাখা-প্রশাখায়ই বুঝি তাদের এরূপ অধিকার রয়েছে! অথচ এটা জরুরী নয় যে, কোন ব্যক্তির জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখায় অতুলনীয় দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা আছে বলে এর সব শাখাতেই তার দক্ষতা থাকবে। এরপর যখন তারা এই সমস্ত লোকের মধ্যে ধর্মহীনতা ও ধর্মকে অস্বীকার করবার মানসিক প্রবণতা লক্ষ্য করে তখন তারা এসব জ্ঞানী (?) ও বিজ্ঞানীদের প্রতি অন্ধ আনুগত্যবশত ধর্মকে অস্বীকার এবং ধর্মের ভূমিকাকে হাল্কা ও খাটো করে দেখবার প্রয়াস পায়। অপরদিকে ইসলামের কতক নাদান দোস্ত দার্শনিকদের প্রতিটি দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত এবং তাদের প্রতিটি দাবিকেই প্রত্যাখ্যান করাকে তাদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য বলে গণ্য করেন এবং এটাকে তারা ইসলামের খিদমত বলে মনে করেন। এমন কি তারা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাদের সকল অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণকেও অস্বীকার করতে এগিয়ে যান। এর একটি ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া এই যে, যে সব লোক তাদের বিজ্ঞান সম্পর্কীয় মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গির সত্যতার ব্যাপারে নিশ্চিত এবং তাদের নিকট সে সব বস্ত প্রমাণিত সত্যের চূড়ায় উপনীত, উপরিউক্ত ধর্মান্ধতার কারণে তাদের ইসলাম সম্পর্কে' আকীদাই নড়বড়ে হয়ে যায় এবং দর্শনশাস্ত্র অস্বীকার করার পরিবর্তে তারা ইসলাম সম্পর্কেই বিরূপ ধারণা পোষণ করতে থাকেন। মোট কথা, আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম যে, দর্শনশাস্ত্র দ্বারা আমার চিত্ত সান্ত্বনা পাবে না এবং বুদ্ধি একাকী সকল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আয়ত্ত করতে পারেও না বা সকল অসুবিধা দূর করবার ক্ষমতাও রাখে না। থাকল বাতেনীয়া সম্প্রদায়। এ সম্পর্কে আমার গ্রন্থ 'মুস্তাজহিরী' রচনা করতে গিয়ে তাদের মযহাব সম্পর্কে বেশ ভালভাবে অধ্যয়ন করার সুযোগ পেয়েছিলাম। আমি দেখতে পেলাম তাদের 'আকীদার ভিত্তি যুগের ইমামের শিক্ষার ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু যুগের ইমামের অস্তিত্ব ও তার সত্যতা প্রমাণ সাপেক্ষ বস্তু এবং এ দু'টোই সীমাতিরিক্ত সন্দেহে ভরপুর। এখন রইল কেবল তাসাওউফ। সার্বক্ষণিকভাবে তাসাওউফের প্রতি আমি মনোনিবেশ করলাম। তাসাওউফ যেমন জ্ঞানগত বিষয়– তেমনি ব্যবহারিক বিষয়ও বটে। আমার কাছে জ্ঞানগত ব্যাপার অনেকটা সহজ ছিল। আমি আবূ তালিব মক্কীর 'কূ'তু'ল-কু'লূব', হারিছ মুহাসিবীর রচিত গ্রন্থাদি ও হযরত

জুনায়দ বাগদাদী, হযরত শিবলী,হযরত আবূ ইয়াযীদ বিস্তামী (র)-এর 'মালফূজাত' পড়লাম এবং 'ইল্‌ম-এর রাস্তা ধরে যা কিছু অর্জন করা যায় তা অর্জন করলাম। অতঃপর আমি বুঝতে পারলাম যে, মূল হাকীকত তথা আসল সত্য পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যমে নয়, বরং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, যওক বা স্বাদ, তন্ময় সাধনা ও অবস্থার পরিবর্তনের দ্বারা পৌঁছা যায়। যে জ্ঞান আমার পুঁজি ছিল, চাই তা শরীয়ত সম্পর্কিত হোক অথবা বুদ্ধিবৃত্তিক, তদ্দ্বারা আমি আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, নবূওত ও আখিরাতের (পারলৌকিক জীবনের) ওপর সুদৃঢ় ঈমান লাভ করেছিলাম। অবশ্য তা কেবল দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতেই নয়, বরং ঐ সব কার্যকারণ, ঘটনাপরম্পরা ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার মাধ্যমে লাভ করেছিলাম যার বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া মুশকিল।

আমার কাছে এটা বেশ ভাল রকম পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, পারলৌকিক সৌভাগ্য লাভের পন্থা কেবল তাক'ওয়া তথা আল্লাহ্‌-ভীতি অবলম্বন করা এবং নফ্‌স তথা প্রবৃত্তিকে তার কামনা থেকে ফিরিয়ে রাখা। এজন্য যে কৌশল অবলম্বন করতে হবে তা হ'ল, এই নশ্বর পৃথিবীর মায়া ও আকর্ষণ ত্যাগ করে পারলৌকিক জীবনের প্রতি আকর্ষণ বাড়ানো এবং পূর্ণ একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে আল্লাহ্‌র দিকে মনোনিবেশের মাধ্যমে অন্তরের দুর্নিবার স্বাভাবিক আকর্ষণকে দুনিয়া থেকে ছিন্ন করা। আর তা একমাত্র পার্থিব শান-শওকত, ধন-সম্পদ, মান-মর্যাদা ও ভোগ-লালসার আকর্ষণ পরিত্যাগ করার মাধ্যমেই সম্ভব হতে পারে।

আমি আমার অবস্থা গভীরভাবে নিরীক্ষণ করলাম। বুঝতে পারলাম যে, আমার আপাদমস্তক পার্থিব আসক্তির কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ। আমার সর্বোত্তম আমল হিসাবে শিক্ষা দান ছিল উল্লেখ করার মত। কিন্তু গভীরভাবে অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে বুঝতে পারলাম, আমার গোটা সাধনা ও মনঃসংযোগই ছিল সেই সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি যা তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না এবং আখিরাতের স্বার্থের প্রতিও তা তেমন কল্যাণকর ছিল না। আমার অধ্যাপনার পেছনে যে নিয়ত ক্রিয়াশীল ছিল সে সম্পর্কে আমি ভেবে দেখলাম এবং বুঝতে পারলাম যে, তা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ছিল না, বরং তার পেছনে পার্থিব শান-শওকত বৃদ্ধি, প্রভাব-প্রতিপত্তি কায়েম ও সুখ্যাতি অর্জনের মানসিক-তাটাই সর্বাধিক সক্রিয় ছিল। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস হ'ল যে, আমি ধ্বংসোন্মুখ নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে আছি। আমি যদি আমার অবস্থার সংস্কার সাধনে প্রয়াসী না হই তা হলে আমার জন্য তা কঠিন বিপদের কারণ হবে।

দীর্ঘকাল পর্যন্ত আমি এই সব ছেড়ে-ছুঁড়ে বাগদাদ পরিত্যাগ করার চিন্তা-ভাবনা করতে থাকি। কিন্তু চূড়ান্ত ফয়সালায় উপনীত হতে ব্যর্থ হই। ছ'মাস এরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মাঝে কেটে যায়। কখনো পার্থিব কামনা-বাসনা আমাকে আকৃষ্ট করত, আবার কখনো আমার ঈমান আমাকে ডেকে বলত, "যাত্রার সময় নিকটবর্তী, জীবন বড় ক্ষণস্থায়ী, অথচ চলার পথ অনেক দীর্ঘ। এই সব 'ইল্‌ম ও আমল স্রেফ লোক দেখানো ভণ্ডামি ও প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়।" কখনো আমার 'নফ্‌স' (শয়তানী প্রবৃত্তি) আমাকে বলত, "এসব সাময়িক চিত্তবৈকল্যমাত্র। আল্লাহ্ পাক তোমাকে যা কিছু প্রভাব-প্রতিপত্তি ও মান-মর্যাদা দান করেছেন– বাগদাদ ছেড়ে দেবার পর যদি আবার কখনো ফিরে আস তাহলে এগুলো আবার ফিরে পাওয়া তোমার পক্ষে মুশকিল হবে।" মোট কথা, এই উভয়বিধ টানাপোড়েনের মাঝে আরও ছয়টি মাস কেটে গেল, এমন কি পরিস্থিতি আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। আমার মুখের ভাষা হ'ল বন্ধ, যেন কেউ আমার মুখে তালা লাগিয়ে দিয়েছে। আমি চেষ্টা করতাম আমার নিকট আগত ও নির্গত লোকদের (ছাত্র ও অতিথি-অভ্যাগত) মনস্তুষ্টির জন্য একই দিনে সব কিছু পড়িয়ে দিই। কিন্তু কি করব, আমার জিহ্‌বা আমার সহযোগিতা করছিল না এবং আমার মুখ দিয়ে একটি শব্দও উচ্চারিত হচ্ছিল না।

জিহ্‌বা ও মুখের এই আড়ষ্টতা আমার অন্তরে দুশ্চিন্তা ও বেদনার সৃষ্টি করল, যার ফলে আমার হযম শক্তিও লোপ পেতে লাগল, এমন কি এক চুমুক পানি পান ও এক লোকমা খাদ্য হযম করাও আমার জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে উঠল। ক্রমান্বয়ে আমার শারীরিক শক্তিতেও ভাটা দেখা দিল। শেষাবধি চিকিৎসকেরা -ও আমার চিকিৎসার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়লেন এবং বললেন: আসলে অসুখ আপনার হৃদয়-অভ্যন্তরে এবং তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে আপনার সর্বশরীরে। যতদিন আপনার মন থেকে এ অসুখ না সারবে ততদিন পর্যন্ত কোন চিকিৎসাই ফলপ্রসূ হবে না।

অগত্যা আমি আল্লাহ্‌র শরণাপন্ন হলাম এবং নিতান্ত অসহায়ভাবে কাতর স্বরে তাঁকে ডাকতে লাগলাম। এর ফলে আমার পক্ষে এই প্রভাব-প্রতিপত্তি, পদ-মর্যাদা, ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন সব কিছু ছেড়ে দেওয়া সহজ মনে হতে লাগল। আমি মক্কা শরীফ গমনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করলাম। আমার অন্তরের এই বাসনা ছিল যে, আমি শামও সফর করব। এরপর অত্যন্ত চমৎকারভাবে আমি বাগদাদ ত্যাগ করবার বন্দোবস্ত করে ফেললাম।

ইরাকবাসী যখন আমার অভিপ্রায় সম্পর্কে অবহিত হ'ল তখন তারা চতুর্দিক থেকে আমাকে ভর্ৎসনা করতে লাগল। কেননা কারোর ধারণায় এটা আসছিল না যে, এত সব কিছু ছেড়ে দেবার পেছনে কোন ধর্মীয় কারণ থাকতে পারে। কেননা তাদের ধারণায় আমি তো ধর্মীয় খিদমতের জন্য সর্বোচ্চ পদটিতে সমাসীন ছিলামই।

অতঃপর জনমনে নানারূপ জল্পনা-কল্পনা শুরু হ'ল। যাঁরা রাজধানী থেকে দূরে অবস্থান করতেন তাঁরা মনে করলেন যে, এর ভেতর সরকারী কর্মকর্তাদের ইশারা-ইঙ্গিত রয়ে গেছে অর্থাৎ সরকারী কোপানলই আমার এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পেছনে কাজ করছে। কিন্তু যাঁরা সরকারী মহলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত তাঁরা দেখছিলেন যে, সরকারী মহল আমাকে ধরে রাখবার জন্য কি প্রাণান্তকর কোশেশই না করছে! তাঁরা বলেছিলেন, ইসলামের এই রওনক ও জ্ঞানমার্গের এই উজ্জ্বল জোতিষ্কের ওপর কারো বদনজর পড়েছে, আর তাইতেই তিনি সব কিছু অবহেলায় ত্যাগ করে নিরুদ্দেশের পথে পা বাড়িয়েছেন– এ ছাড়া তাদের আর কিই-বা বলার থাকতে পারে!

মোট কথা, আমি বাগদাদ ত্যাগ করলাম। আমার নিকট মাল-মাত্তা যা কিছু ছিল, চলার মত কিছু রেখে বাকী সব কিছুই বিলি-বণ্টন করে দিলাম। বাগদাদ থেকে আমি শামে এলাম এবং সেখানে দু'বছরের কাছাকাছি থাকলাম। সেখানে আমার কাজ রিয়াযত ও মুজাহাদা, নিঃসঙ্গ জীবন যাপন ও নির্জনতা অবলম্বন ছাড়া আর কিছুই ছিল না। 'ইলমে তাসাওউফ থেকে আমি কিছু হাসিল করেছিলাম। সেই মুতাবিক তাযকিয়ায়ে নফ্স তথা আত্মশুদ্ধি, চারিত্রিক সংশোধন, পরিমার্জন ও আল্লাহ্র যিকিরের জন্য নিজ কলবকে পরিষ্কৃতকরণের কাজে মগ্ন থাকি। অনেক দিন পর্যন্ত আমি দামিশকের মসজিদেই ই'তিকাফরত ছিলাম। মসজিদের মিনারে আরোহণ করতাম এবং সমস্ত দিন দরজা বন্ধ করে সেখানেই বসে থাকতাম।

অবশেষে আমি দামিশ্ক থেকে বায়তু'ল-মুক'দ্দাসে আসি। সেখানেও আমি দৈনিক মসজিদে সাখরার অভ্যন্তরে চলে যেতাম এবং দরজা বন্ধ করে সময় কাটাতাম। অতঃপর সায়্যিদুনা হযরত ইবরাহীম ('আ)-এর রওয়া যিয়ারতের পর আমার মনে হজ্জে বায়তুল্লাহ্ ও যিয়ারতে রওযা পাক (সা)-এর প্রবল বাসনা জাগ্রত হ'ল এবং মক্কা মুকাররামা ও মদীনা মুনাওয়ারার বরকত লাভ করে উপকৃত হবার খেয়াল জাগল। অনন্তর আমি হজ্জে গমন করলাম। হজ্জ

করার পর পরিবার-পরিজনের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ ও সন্তান-সন্ততির ডাকে আমাকে দেশে ফিরতে হ'ল, অথচ একদিন দেশের নাম শুনলেই আমি কয়েক মাইল পালাতাম। সেখানে গিয়েও আমি একাকিত্বের মাঝেই কাটাবার ব্যবস্থা করলাম, আত্মশুদ্ধির ব্যাপারে এতটুকু অলসতার প্রশ্রয় দিলাম না। কিন্তু নানান ঘটনা-প্রবাহ, পরিবার-পরিজনের চিন্তা ও অর্থনৈতিক প্রয়োজন তথা জীবিকার তাগিদ আমার স্বভাব ও প্রকৃতিতে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করত এবং এতে মনের একাগ্রতা ও চিত্তের প্রশান্তি অখণ্ডভাবে জুটত না। কিন্তু তাতে আমি নিরাশ হতাম না; সময় সময় এ থেকে বরং লাভবানই হতাম।

এভাবে কাটিয়ে দিলাম দশটি বছর। এই নির্জন নিঃসঙ্গ মুহূর্তগুলোতে আমার নিকট যে সব রহস্য উদ্ঘাটিত হয়েছে এবং আমি যা লাভ করেছি তার বিস্তারিত বর্ণনা দান সম্ভব নয়। তবে পাঠকের উপকারের জন্য এতটুকু অবশ্যই বলব যে, আমি নিশ্চিতভাবেই অবহিত হয়েছি যে, কেবল সূফীরাই আল্লাহ্র পথের পথিক। তাঁদের সীরাত (জীবনচরিত)-ই সর্বোত্তম সীরাত, তাঁদের পথই সর্বাধিক সুদৃঢ়, তাঁদের আখলাক তথা নৈতিক চরিত্রই সর্বাধিক ট্রেনিংপ্রাপ্ত, বিশুদ্ধ ও সঠিক। বুদ্ধিজীবীদের বুদ্ধি, জ্ঞানীদের হিকমত ও শরীয়তের সূক্ষ্ম রহস্যবিদদের 'ইল্‌ম মিলেও যদি তাঁদের সীরাত ও নৈতিক চরিত্র থেকে উত্তম কিছু আনতে চায় তবে তা সম্ভব নয়। তাঁদের সকল প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য গতি ও স্থৈর্য নবূওতের প্রদীপালোক থেকে উৎসারিত এবং নবূওতের জ্যোতি থেকে বড় কোন আলো এ ধরার বুকে নেই যা থেকে আলো-কণা পাওয়া যেতে পারে।

জনসমাবেশের দিকে প্রত্যাবর্তন

সম্ভব ছিল ইমাম গাযালী (র) এই নিঃসঙ্গ জীবন ও নির্জনতার মাঝেই থেকে যেতেন এবং বাকী জীবনও রূহানী আনন্দ উপভোগ এবং একাগ্রতার আরাম ও পরিতৃপ্তির মাঝেই কাটিয়ে দিতেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর থেকে যে বিরাট মহান খিদমত নিতে চাচ্ছিলেন তার জন্য অপরিহার্য ছিল যে, তিনি নির্জনবাস থেকে বেরিয়ে আসবেন এবং পঠন-পাঠন, রচনা সংকলন ও সামাজিক জীবন এখতিয়ার করবেন যাতে করে গোটা সৃষ্টিকুলের কল্যাণ সাধিত হয়, ধর্মদ্রোহী মতবাদ ও দর্শন প্রত্যাখ্যাত হয় এবং জ্ঞানগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক উপায়ে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও সত্যতা প্রমাণিত হয়। বিশেষ করে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এমন নিশ্চিত জ্ঞান, বিশ্বাস ও পর্যবেক্ষণের স্তরে পৌঁছে দিয়েছিলেন যে, তৎকালীন

মুসলিম বিশ্বে তাঁর থেকে অধিক যথার্থ ও যোগ্য ব্যক্তিত্ব আর কেউ ছিলেন না। যেহেতু এই কর্মের পেছনে আল্লাহ্‌র মঞ্জুরী ছিল এবং ইসলামেরও এর ভীষণ প্রয়োজন ছিল, এজন্য স্বয়ং তাঁর নিজের মনেই এর অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হ'ল এবং এ ধারণাও প্রাধান্য পেল যে, এটি সাধনার ধন এবং এটি আম্বিয়া-ই-কিরাম ('আ)-এর প্রতিনিধিত্ব, যুগের দাবি ও সর্বোত্তম 'ইবাদত। তিনি তাঁর নিজ অনুভূতিকে খোদ নিজেই বর্ণনা করেছেন এবং নিঃসঙ্গ জীবন থেকে জনসমাবেশে ফিরে আসার কারণও লিপিবদ্ধ করেছেন।

আমি দেখতে পেলাম যে, দর্শনশাস্ত্রের প্রভাবে তাসাওউফের বহু দাবিদারের গোমরাহী, অনেক 'আলিম-'উলামা'র বে'আমল জীবন ও মুতাকাল্লিমদের ত্রুটিপূর্ণ ও দুর্বল প্রতিনিধিত্বের কারণে অধিকাংশ শ্রেণীর ঈমান দোদুল্যমান ও নড়বড়ে হয়ে গেছে এবং 'আকীদা তথা ধর্মবিশ্বাসের ওপর এর খুবই খারাপ প্রতিক্রিয়া পড়ছে। দর্শনশাস্ত্রজাত বহু লোক শরীয়তের প্রকাশ্য বিধি-বিধান ও হুকুম-আহকামের পাবন্দও বটে, কিন্তু নবূওত ও দীনের হাকীকতের ওপর তাদের ঈমান নেই। কতক লোক কেবল শারীরিক ব্যায়ামের ধারণায় নামায পড়ে, কেউ পড়ে কেবল সোসাইটি ও নগরবাসীর অভ্যাসের অনুসরণ এবং নিজেদের হেফাজতের জন্য। কতক লোক শর'ঈ হুকুম-আহকামের বস্তুগত সুবিধা লাভ এবং সেগুলো পালন না করলে জাগতিক ক্ষতি হবে ধারণা করে তা পালন করে। আমি দেখছি যে, আমি সে সব সন্দেহ নিরসন করবার মত যোগ্যতা রাখি এবং সহজেই তা করতে পারি, এমন কি ঐ সব লোককে পর্দান্তরালে প্রেরণ আমার কাছে পানি পান করার চেয়েও অধিকতর সহজ বলে মনে হয়। এতদ্দৃষ্টে আমার মনে শক্তভাবে এই ধারণার সৃষ্টি হ'ল যে, আমার এই কাজই করা উচিত এবং এটাই সময়ের অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্য। আমি আপন মনেই বললাম, "এই নিঃসঙ্গ ও জনমানবের সঙ্গে সম্পর্কহীন জীবন তোমার জন্য কবে এবং কখন জায়েয হ'ল? রোগ-ব্যাধি চতুর্দিকে ছড়িয়ে গেছে। চিকিৎসক নিজেই আজ রোগী। আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জগত আজ ধ্বংসের প্রান্তে এসে উপনীত।" অতঃপর আমি বললাম, "এই এতবড় বিরাট ও মহান দায়িত্ব তোমা দ্বারা কিভাবে পালিত হতে পারে! বর্তমান যুগ তো নবী যুগ থেকে বহু দূরে এসে গেছে। চারদিকে বাতিলেরই রাজত্ব। যদি তুমি আল্লাহ্‌র সৃষ্টিজগতকে তাদের প্রিয় ও পরিচিত বস্তুসমূহ থেকে সরিয়ে নিয়ে আসতে চেষ্টা কর তাহলে গোটা যুগ-যমানা তোমার বিরোধী হয়ে যাবে। তুমি একাকী কিভাবে তাদের মুকাবিলা করবে এবং কীভাবে জীবন যাপন করবে? এটা তো

তখনই সম্ভব যখন যুগ-যমানা অনুকূল হয় এবং সমকালীন সুলতানও দীনদার হন।" আমি এই বলে আমার মনকে বুঝ দিলাম এবং নিজের জন্য নিঃসঙ্গ ও নির্জন জীবন যাপন জায়েয বলে অভিহিত করলাম। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার অন্য কিছু মঞ্জুর ছিল। তিনি তৎকালীন সুলতানের মনে নিজেই একটি বিপ্লাবত্মক পরিবর্তন এনে দিলেন।

তিনি (সুলতান) আমাকে এই ফেতনা মুকাবিলা করবার জন্য নিশাপুর পৌঁছবার জন্য জোর তাগিদসহ নির্দেশ দিলেন। সুলতানের এই নির্দেশ এই পর্যায়ের ছিল যে, আমি অনুভব করলাম, যদি আমি এই হুকুম তা'মিল না করি তাহলে এর পরিণতি সুলতানের অসন্তুষ্টি পর্যন্ত পৌঁছবে। আমি ভাবলাম যে, এবার আমার জন্য আর কোন ওযর অবশিষ্ট রইল না। এরপরও যদি আমি নির্জনতা অবলম্বন করি এবং নিঃসঙ্গ জীবনকেই বেছে নিই তা হবে আমার অলসতা, আরামপ্রিয়তা এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যের বোঝা হাল্‌কা করবারই নামান্তর, তা হবে পরীক্ষা ও দুঃখকষ্টপূর্ণ অবস্থা থেকে গা বাঁচিয়ে চলবার স্বার্থেই, অথচ আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوْا أَنْ يَّقُوْلُوْا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ - وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ
مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ

"মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' একথা বললেই ওদেরকে পরীক্ষা না করেই অব্যাহতি দেওয়া হবে! আমি তো এদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম; আল্লাহ্ অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন কারা সত্যবাদী আর কারা মিথ্যাবাদী"। –সূরা 'আনকাবূত, ২-৩ আয়াত।

অধিকন্তু রসূল করীম (সা)-এর প্রতি, যিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত ও মর্যাদাবান ছিলেন, ইরশাদ করেন ঃ

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَأُوْذُوْا حَتّٰى أَتَاهُمْ
نَصْرُنَا - وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ - وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَّبَإِ الْمُرْسَلِيْنَ *

"তোমার পূর্বেও অনেক রসূলকে অবশ্যই মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল; কিন্তু তাদেরকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দেওয়া ও ক্লেশ দেওয়া সত্ত্বেও তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল যে পর্যন্ত না আমার সাহায্য তাদের নিকট এসেছে। আল্লাহ্‌র আদেশে কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। রসূলদের কিছু সংবাদ তোমার নিকট অবশ্যই এসেছে।" –সূরা আন'আম, ৩৪ আয়াত।

আমি কতিপয় সূফী ও আধ্যাত্মিক পুরুষের সঙ্গে এ ব্যাপারে পরামর্শ করলাম। তাঁরা সকলেই একমত হয়ে আমাকে নির্জনতা ছেড়ে বেরিয়ে আসবার পরামর্শ দিলেন। এর সমর্থনে আল্লাহ্‌র বহু সৎকর্মশীল বান্দা একাদিক্রমে স্বপ্ন দেখেন যা থেকে আমি অবহিত হই যে, আমার এ পদক্ষেপ বিরাট কল্যাণ ও বরকতের কারণ হবে এবং হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর শুরুতে যার এক মাস মাত্র বাকী– সম্ভবত কোন বিরাট ও মহান সংস্কারমূলক কাজ হবে। আর তা এজন্য যে, হাদীছ শরীফে এসেছে, "আল্লাহ্ তা'আলা প্রতি শতাব্দীর মাথায় এমন একজন মানুষ পয়দা করেন যিনি এই উম্মতের দীনকে জীবন্ত করে তোলেন।" এই সব আলামত ও কার্যকারণদৃষ্টে আমার মনেও এরূপ আশা জাগরূক হ'ল। আল্লাহ্ তা'আলা আমার জন্য নিশাপুরের সফরের আয়োজন করে দিলেন এবং আমি এই মহান খিদমতের জন্য নিয়ত করে ফেললাম। এটি ৪৯৯ হিজরীর যি'ল-কা'দা মাসের ঘটনা। ৪৮৮ হিজরীর যি'ল-কা'দাঃ মাসে বাগদাদ থেকে বহির্গত হয়েছিলাম। এই হিসাবে দেখা যায় আমি ১১ বছর নির্জন বাস করেছি। এসবই তকদীরে ইলাহীর পরিকল্পিত ব্যবস্থামাত্র। বাগদাদ থেকে বহির্গত হওয়া এবং সেখানকার প্রভাব-প্রতিপত্তি ও পদমর্যাদাকে বিদায় সালাম জানানো আমার কল্পনায় আসত না, কিন্তু আল্লাহ্‌র হুকুমে তা সহজে হয়ে গেল। অনুরূপভাবে আমার এই নির্জনতা অবলম্বন কালীন যুগে নিঃসঙ্গ জীবন থেকে জনসমাবেশের মাঝে পুনর্বার ফিরে যাবার ধারণাও মনে উদয় হ'ত না, অথচ সময়ে তার আয়োজনও সম্পন্ন হয়ে গেল।

মোটকথা, ৪৯৯ হিজরীর যি'ল-কা'দা মাসে ইমাম সাহেব পুনরায় নিশাপুরের দিকে গতি ফেরালেন। তিনি নিজামিয়া মাদরাসায় অধ্যাপনার কাজে যোগ দিলেন এবং পুনর্বার অধ্যাপনা ও কল্যাণধর্মী কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। কিন্তু ইমাম গাযালী (র)-এর এবারকার দরস ও তাদরীস তথা পঠন-পাঠন, সংস্কার ও সৎ পথ প্রদর্শন এবং পূর্বেকার পঠন-পাঠন কার্যক্রম, ওয়া'জ-নসীহত ও ইরশাদ-এর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য ছিল। অনন্তর বিষয়টি তিনি নিজেই পরিষ্কার ভাষায় লিখেছেন :

আমি অনুভব করি যে, যদিও 'ইল্‌ম-এর প্রচার ও প্রসারের দিকে পুনরায় আমি ফিরে এলাম, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একে আমার প্রথম অবস্থার দিকে প্রত্যাবর্তন বলা ঠিক হবে না। আমার পূর্বের ও পরের অবস্থার ভেতর আসমান-যমীন ফারাক। প্রথমে আমি সেই 'ইল্‌ম-এর প্রচার করতাম যা প্রভাব ও পদমর্যাদা বৃদ্ধির মাধ্যম ছিল এবং আমি আমার কথা ও কর্ম দ্বারা তারই দা'ওয়াত দিতাম এবং এটাই ছিল আমার অভীষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। কিন্তু

এখন আমি সেই 'ইল্‌ম-এর দা'ওয়াত দিই যার কারণে পদমর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির মায়া চিরদিনের তরে কাটাতে হয়। এখন আমি আমার নিজের ও অন্যের সংস্কার ও সংশোধন চাই। আমি জানি না, আমি আমার অভীষ্ট লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছুতে পারব কিনা অথবা এর পূর্বেই আমাকে কর্মের জগত থেকে চিরবিদায় নিতে হবে। কিন্তু নিজস্ব য়াকীন ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে আমার ঈমান এই যে, আসল শক্তি আল্লাহ্‌রই শক্তি। তাঁরই কারণে মানুষ গোমরাহী ও মন্দ থেকে বাঁচতে পারে এবং হিদায়াত ও আনুগত্যের শক্তি অর্জন করতে পারে। আসলে আমি নিজের তরফ থেকে সচল ও সক্রিয় হই নি, আল্লাহ্‌ই আমাকে সচল ও গতিশীল বানিয়েছেন। আমি নিজে থেকে কাজ শুরু করিনি, আল্লাহ পাকই আমাকে কাজে লাগিয়েছেন। আমার দু'আ, আল্লাহ পাক প্রথমে আমাকে সংশোধন করুন, অতঃপর আমা দ্বারা অন্যদের সংস্কার ও সংশোধন হোক; প্রথমে আমাকে পথে আনুন, এরপর আমা দ্বারা অন্যদের পথ প্রদর্শনের কাজ নিন। সত্য যেন আমার সম্মুখে উদ্ভাসিত হয় এবং ঠার বদৌলতে আমি যেন আনুগত্য করার সৌভাগ্য লাভ করতে পারি; বাতিল যেন আমার চোখে উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত হয় এবং আমি যেন তার অনুসরণ থেকে বাঁচি।[১]

ইমাম গাযালী (র)-এর সংস্কার ও ইসলামী পুনর্জাগরণমূলক কাজ

ইমাম গাযালী (র) এরপর যে সংস্কার ও ইসলামী পুনর্জাগরণমূলক কাজ আঞ্জাম দেন তাকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

১. দর্শন ও বাতেনী মতবাদের বর্ধিত প্লাবনের মুকাবিলা এবং ইসলামের পক্ষ থেকে সে সবের মূল ভিত্তির ওপর আঘাত হানা।

২. সমাজ ও ব্যক্তিগত জীবনের ইসলামী ও নৈতিক পর্যালোচনা এবং সে সবের ওপর সমালোচনা ও সংস্কার।

দর্শনের ওপর কার্যকর অপারেশন

তাঁর প্রথম ও সর্ববৃহৎ কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের বিস্তারিত বিবরণ এই যে, ধর্মদ্রোহী মতবাদ ও বাতেনিয়াদের বিরুদ্ধে তখন পর্যন্ত যা কিছু করা হচ্ছিল তা ছিল আত্মরক্ষামূলক এবং প্রত্যুত্তর দেওয়ার মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল। সে সময় পর্যন্ত দর্শন ইসলামের ওপর হামলারত ছিল এবং মুতাকাল্লিমগণ ইসলামের সমর্থনে সাফাই পেশ করছিলেন। দর্শনশাস্ত্র ইসলামের মূল বুনিয়াদের ওপর কুঠারঘাত

১. আল-মুনকি'য' মিনা'দ্দ'লাল, ২৮-৩০ পৃ. সংক্ষেপে।

করত এবং 'ইলমে কালাম ইসলামের ঢাল হবার কোশেশ করত। সেই সময় পর্যন্ত মুতাকাল্লিমগণ ও 'উলামায়ে ইসলামের ভেতর কেউই স্বয়ং দর্শনের ভিত্তির ওপর আঘাত হানবার সাহস করেন নি। 'দর্শন' যে সব 'কাল্পনিক ও মনগড়া' বিষয়ের ওপর দাঁড়িয়েছিল কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত সে সবের ওপর আঘাত হানা এবং সে সবের জ্ঞানগর্ভ সমালোচনা করার হিম্মত কারো হয়নি। ইমাম আবুল হাসান আশ'আরীকে বাদ দিলে (দর্শনের সঙ্গে যাঁর সরাসরি টক্কর লাগে নি) গোটা 'ইল্‌মে কালামের কণ্ঠস্বর তথা উচ্চারণ ভঙ্গী ছিল ওযরখাহী ও আত্মরক্ষামূলক। ইমাম গাযালী (র)-ই প্রথম ব্যক্তি যিনি দর্শনকে বিস্তারিত ও সমলোচনার নিরিখে অধ্যয়ন করেন। এরপর مقاصد الفلاسفه বা দার্শনিকদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য-এই নামে একটি বই লিখেন। এতে তিনি সহজ সরল ভাষায় বিশ্লেষণমূলক পন্থায় যুক্তিবিদ্যা, অধিবিদ্যা তথা Metaphysics ও প্রকৃতিবিদ্যার খোলাসা বা সারসংক্ষেপ পেশ করেন এবং পরিপূর্ণ নিরপেক্ষতার সঙ্গে দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গি ও আলোচনা লিপিবদ্ধ করেন। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি খোলাখুলিভাবে বলেছেন যে, গণিতশাস্ত্রে আলোচনা কিংবা তর্ক-বিতর্কের সুযোগ নেই এবং ধর্মের সঙ্গে এর 'হাঁ' বা 'না'-এর কোনরূপ সম্পর্ক নেই। কিন্তু ধর্মের আসল সংঘর্ষ অধিবিদ্যার সঙ্গে। যুক্তিবিদ্যায়ও খুব অল্পই ভুল আছে। যদি কিছু মতভেদ থাকে তা পরিভাষার ক্ষেত্রে। প্রকৃতিবিদ্যায় অবশ্যই সত্য-মিথ্যার তথা হক ও বাতিলের মিশ্রণ আছে। এজন্য তার আলোচ্য বিষয় প্রকৃতপক্ষে অধিবিদ্যা এবং কিছুটা পরিমাণ প্রকৃতিবিদ্যা। আর যুক্তিবিদ্যা কেবল ভূমিকাস্বরূপ ও পরিভাষার জন্য।

এই গ্রন্থ শেষ ক'রে, যা 'ইলমে কালামের শিবিরে খুবই দরকার ছিল, তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'তাহাফতু'ল-ফালাসিফা' (দার্শনিকদের ভ্রান্তি ও অসঙ্গতি) লেখেন যার জন্যই তিনি 'মাক 'সি 'দু'ল-ফালাসিফা' লিখেছিলেন। এতে তিনি দর্শন, অধিবিদ্যা ও প্রকৃতিবিদ্যার ওপর ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচনা করেন এবং তার জ্ঞানগত দুর্বলতা, তার যুক্তি-প্রমাণের অসারতা এবং দার্শনিকদের পারস্পরিক বৈপরীত্য ও মতভেদকে পরিপূর্ণ শক্তি ও সাহসিকতার সঙ্গে প্রকাশ করেন। উক্ত গ্রন্থে তাঁর কণ্ঠস্বর ও উচ্চারণভঙ্গী আ'াপূর্ণ, তাঁর ভাষা শক্তিশালী ও প্রস্ফুটিত, কোথাও কোথাও তা বিদ্রূপাত্মক ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ ভঙ্গি অনুসরণ করে, যা কিনা দর্শনশাস্ত্রের ভয়ে ভীত ও অভিভূত মহলের জন্য দরকার ছিল। তা পাঠ করলে অনুভূত হয় যে, গ্রন্থের গ্রন্থকার দার্শনিকদের মুকাবিলায় হীনমন্যতাবোধের সামান্যতম মিশ্রণ থেকেও মুক্ত ও পবিত্র, আস্থা ও দৃঢ় বিশ্বাসে তিনি ভরপুর এবং দর্শনশাস্ত্র সম্পর্কে তিনি এতটুকু আতংকিত কিংবা অভিভূত নন। তিনি গ্রীক

দার্শনিকদেরকে তারই কাতারের মানুষ মনে করেন এবং তাঁদের সঙ্গে সমতার ভিত্তিতে ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাষায় কথা বলেন। সে সময় এমন একজন লোকেরই দরকার ছিল, যিনি দর্শনশাস্ত্রের চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারেন এবং আত্মরক্ষামূলক ও জবাবদিহির ভূমিকার পরিবর্তে দর্শনশাস্ত্রের ওপর পূর্ণ শক্তিতে আঘাত হানতে পারেন। ইমাম গাযালী (র) 'তাহাফতু'ল-ফালাসিফা' নামক গ্রন্থে এই খেদমতই আঞ্জাম দিয়েছেন। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছেনঃ

> আমাদের যুগে এমন কিছু লোক জন্মেছে যাদের ধারণা এই যে, তাদের দিল ও দিমাগ তথা মন ও মস্তিষ্ক সাধারণ লোকের তুলনায় বিশিষ্ট। এ সমস্ত লোক ধর্মীয় বিধি-বিধান ও বাধ্যবাধকতাকে অবজ্ঞার চোখে দেখে। এর কারণ একমাত্র এই যে, তারা সক্রেটিস, হিপোক্রেট (Hippocrate- খৃ. পূ. ৪৬০-৩৭৭), প্লেটো ও এরিস্টটলের ভীতিপূর্ণ নাম শুনেছে এবং তাঁদের শানে তাদের অনুরাগী ভক্তবৃন্দের বিরাট স্তুতিপূর্ণ গালগল্প ও লম্বা-চওড়া ফিরিস্তি শুনেছে। তারা জানতে পেরেছে যে, অংকশাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা ও অধিবিদ্যার ক্ষেত্রে তাঁরা (সক্রেটিস প্রমুখ দার্শনিক) বিরাট সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন এবং তাঁদের বুদ্ধি ও মেধার সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। তাঁরা তাঁদের উন্নত মস্তিষ্ক ও মেধার সঙ্গে ধর্ম ও তার আনুষঙ্গিক বিষয়ের অস্তিত্ব অস্বীকার করত। তাদের নিকট তাদের ধর্মের মূলনীতি ও নিয়মবিধি ছিল মনগড়া ও কৃত্রিম। ব্যস, আর কথা নেই, তারাও তাদের গুরুদের অন্ধ আনুগত্যে বাদরামি অনুকরণ করতে গিয়ে ধর্ম অস্বীকার করাকে নিজেদের জন্য একটা ফ্যাশন বানিয়ে নিল। তারা শিক্ষিত ও প্রগতিশীল নামে অভিহিত হবার খাহেশ মেটাতে ধর্মকে অস্বীকার করতে থাকল যাতে করে তাদের মর্যাদা সাধারণের তুলনায় উন্নত মনে করা হয় এবং তারা যাতে জ্ঞানী-গুণী ও বুদ্ধিজীবীদের কাতারে শামিল হতে পারে। এরই ভিত্তিতে আমি ইচ্ছা করলাম যে, ঐসব জ্ঞানী দার্শনিকরা ঐশী বিদ্যা (অধিবিদ্যা)-র ওপর যা কিছু লিখেছেন সে সবের ভ্রান্তি আমি দেখিয়ে দিই এবং প্রমাণ করে দিই যে, তাদের সংকট, সমস্যাবলী ও মূলনীতিগুলো ছেলেমিপূর্ণ এবং তাদের অনেক উক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গি সীমাহীন রকমের হাস্যকর।[১]

এই গ্রন্থের সম্মুখে গিয়ে তাঁর বর্ণনাশক্তি ও বিদ্রূপাত্মক লেখনী পদ্ধতি আরও শাণিত ও উদ্ধত হয়ে যায় এবং আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে দার্শনিকদের অত্যাশ্চর্য বিষয়সমূহ, বুদ্ধিবৃত্তি ও আকাশমার্গের পুরো বংশতালিকা লেখেন যা দার্শনিকরা লিখেছেন ঃ

---

১. তাহাফতু'ল-ফালাসিফা, ২-৩ পৃষ্ঠা;

قلنا ما ذكرتموه تحكمات وهى على التحقيق ظلمات فوق ظلمات لو حكاه الانسان عن منام رأه لاستدل على سوء مزاجه .

তোমাদের এই যে বিস্তৃত বিবরণ, তা কেবল গালভরা দাবি ও স্বেচ্ছাচারিতা ছাড়া আর কিছু নয়, বরং প্রকৃতপক্ষে তা অন্ধকারের ওপর অন্ধকারের প্রলেপ মাত্র। যদি কোন ব্যক্তি তার নিজের দেখা এমন স্বপ্নও বর্ণনা করে তাহলেও তার মস্তিষ্ক বিকৃতির প্রমাণ হবে।

সামনে এগিয়ে তিনি লিখেন ঃ

لست ادرى كيف يقنع المجنون من نفسه بمثل هذه الاوضاع فضلا عن العقلاء الذين يشقون الشعر بزعم فى المعقولات .

আমার বিস্ময় জাগে যে, পাগলেও কিভাবে এ ধরনের স্বনির্মিত ও স্বকপোলকল্পিত কথার ওপর তুষ্ট হতে পারে! সেখানে জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীদের কথা তো ভাবাই যায় না, যাঁরা তাঁদের নিজস্ব ধারণা মাফিক বোধগম্য বস্তুনিচয় ও সম্ভাবনার ভেতরও চুলচেরা বিশ্লেষণ করে ছাড়েন।[১]

অন্যত্র লিখেন ঃ

انتهى بهم التعمق فى التعظيم الى ان ابطلوا كل ما يفهم من العظمة وقربوا حاله الميت الذى لاخبر له بما يجرى فى العالم الا انه فارق الميت فى شعوره بنفسه فقط – وهكذا يفعل الله بالزائغين عن سبيله والناكبين عن طريق الهدى المنكرين لقوله تعالى مَا اَشْهَدْتُّهُمْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَا خَلْقَ اَنْفُسِهِمْ الظانين بالله ظن السوء المعتقدين ان الامور الربوبية تستعلى كنهها القوى البشرية المغرورين بعقولهم زاعمين ان فيها مندوحة عن تقليد الرسل واتباعهم فلا جرم اضطروا الى الاعتراف بان لباب معقولاتهم رجع الى مالوحكى فى المنام لتعجب منه .

প্রথম স্বয়ম্ভূর সম্মানে উচ্ছ্বাস ও সীমাতিরিক্ততা প্রকাশ করতে গিয়ে তাঁকে (স্বয়ম্ভু বা প্রথম স্রষ্টাকে) এমন সীমায় পৌঁছে দিয়েছে যে, তারা মর্যাদার সব শর্ত ও আবশ্যকীয় বিষয়াবলীকেও বাতিল আখ্যায়িত করেছে এবং আল্লাহ তা'আলাকে (নিজেদের দর্শনে) সেই মুর্দা লাশের ন্যায় বানিয়ে দিয়েছে যে জানেই না যে, বহির্জগতে কি হচ্ছে কিংবা ঘটছে। অবশ্য এই দিক দিয়ে তিনি (স্রষ্টা, স্বয়ম্ভু) মুর্দা অপেক্ষা ভাগ্যবান যে, তাঁর উপলব্ধি ও অনুভূতি শক্তি লোপ পায়নি, বরং তা আছে (আর মৃত লাশের উপলব্ধি, চেতনা কিংবা অনুভূতি থাকে না)। আল্লাহ পাক এ ধরনের লোকদেরকে এমন পরিণতির সম্মুখীন

---

১. তাহাফুতু'ল-ফালাসিকা-৩৩ পৃ.।

করেন যে, তারা আল্লাহ্র পথ থেকে দূরে সরে যায়, সৎ ও সত্য পরিত্যাগ করে এবং নিম্নোক্ত আয়াতকে অস্বীকার করে :

مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ .

"আর আমি সেই সব কাফির ও মুশরিকদেরকে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করবার সময় সাক্ষী বানাই নি, এমন কি তাদের পয়দা করবার মুহূর্তেও না", যারা আল্লাহ্র প্রতি কুধারণা পোষণ করে এবং খারাপ 'আকীদা রাখে, যাদের ধারণা যে, আল্লাহ্র রবূবিয়তের (পালনবাদ-এর) হাকীকতের ওপর মানবীয় শক্তি প্রভাব বিস্তার করতে পারে, যারা তাদের নিজেদের জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার ব্যাপারে গর্বিত এবং মনে করে যে, তাদের উপস্থিতি ও বর্তমান থাকা অবস্থায় পয়গম্বরদের অনুকরণ ও আনুগত্যের প্রয়োজন নেই। নিশ্চিতরূপেই এর পরিণতি এই হয়েছে যে, তাদের মুখ দিয়ে (যুক্তিবুদ্ধির নামে) এমন সব হাস্যকর কথাবার্তার বেরোয়, যদি কেউ এ ধরনের স্বপ্নের বর্ণনাও দেয় তাহলে লোকে বিস্মিত হবে।[১]

তাহাফতু'ল-ফালাসিফার প্রভাব

দর্শনশাস্ত্রের ওপর এই সাহসিকতাপূর্ণ সমালোচনা এবং নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত তার প্রতি অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য প্রদর্শন 'ইলম-ই-কালামের ইতিহাসে এমন একটি নতুন যুগের সৃষ্টি করে যার সার্বিক কৃতিত্ব ইমাম গাযালীর প্রাপ্য। পরে শায়খুল ইসলাম ইমাম ইব্ন তায়মিয়া (র) এর পূর্ণতা দান করেন এবং দর্শনশাস্ত্র ও যুক্তিবিদ্যার মৃতদেহের "পোস্ট মর্টেম"-এর দায়িত্ব পালন করেন। দর্শনশাস্ত্রের অপারেশনের এই ধারার সূচনাও ইমাম গাযালী (র)-এর রচিত গ্রন্থাদি থেকেই।

'তাহাফতু'ল-ফালাসিফা' দর্শনশাস্ত্রের কাল্পনিক ভোজবাজির ওপর কার্যকর আঘাত হানে এবং তার শ্রেষ্ঠত্ব, মর্যাদা ও মেধাগত পবিত্রতাকে বেশ ক্ষতিগ্রস্ত করে। এই গ্রন্থের রচনা দর্শনশাস্ত্রের জগতে একটি অস্থিরতা, চাঞ্চল্য ও ক্রোধের জন্ম দেয়। কিন্তু শত বছর পর্যন্ত এর প্রত্যুত্তরে কোন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রণীত হয়নি, এমন কি হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষে দর্শনশাস্ত্রের প্রখ্যাত উৎসাহী প্রবক্তা ও এরিস্টটলের অনুসারী ইব্ন রুশ্দ (মৃত্যু ৫৯৫ হিজরী) "তাহাফতু'ত- তাহাফুত" নামের একটি বইয়ের মাধ্যমে এর জবাব লেখেন। পাশ্চাত্যের বিদ্বানমণ্ডলী বলেন, যে দর্শনশাস্ত্র গাযালী (র)-এর আক্রমণে প্রায় মরণদশায় পৌঁছে গিয়েছিল, ইব্ন রুশদের সমর্থন তাকে এক শ' বছরের জন্য পুনরায় জীবন দান করে।[২]

১. তাহাফতু'ল-ফালাসিফা, ৩১ পৃ.।
২. প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে ইসলামী দর্শনের ইতিহাস-মুহাম্মদ লুৎফী জুম'আ, পৃ. ৭২।

বাতেনী মতবাদের ওপর হামলা

দর্শনশাস্ত্র ছাড়াও ইমাম গাযালী (র) বাতেনী মতবাদের ফেতনার দিকেও মনোযোগ দেন। তিনি বাগদাদের নিজামিয়া মাদরাসায় অধ্যাপনাকালে বাতেনীদের প্রত্যাখ্যানে তৎকালীন খলীফার ইঙ্গিতে 'আল-মুস্তাজহির' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন, যার উল্লেখ তিনি তাঁর আত্মজীবনীমূলক 'আল-মুনকি'য' মিনা'দ্দ'লাল' নামক গ্রন্থে করেছেন। এই গ্রন্থ ছাড়াও এই বিষয়ের ওপর তাঁর আরও তিনটি গ্রন্থ রয়েছে যা সম্ভবত তাঁর ভ্রমণকালীন সময়ের রচনাঃ হু'জ্জাতু'ল-হক, মুফাস'স'ালু'ল-খিলাফ ও ক'াসামু'ল-বাতেনিয়া'[১]। তাঁর গ্রন্থের তালিকায় এই বিষয়ের ওপর فضائح الاباحية ও مواهم الباطنية নামক আরও দু'টি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। বাতেনিয়া মতবাদের প্রত্যাখ্যানের জন্য প্রকৃতপক্ষে আহলে সুন্নাত ওয়া'ল-জামা'আত মহলে তাঁর চেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি মেলা মুশকিল ছিল। তিনি দর্শনশাস্ত্র, তাসাওউফ, জাহিরী 'ইল্‌ম ও হাকীকত ও মা'রিফতের উভয় দিককার গলি-ঘুপচি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন এবং তিনি বাতেনী মতবাদের রহস্য ভেদ ও তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ষড়যন্ত্রের পর্দা সহজেই উন্মোচন করতে পারতেন। বাতেনী মতবাদের বড় অস্ত্র ছিল দর্শনশাস্ত্র ও তার পরিভাষাসমূহ। শুধু ইমাম গাযালী (র)-এর মতই কোন পরিপক্ক ব্যক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির পর্যালোচক সে সবের প্রত্যাখানের কাজটি করতে পারতেন। বাস্তবেও তিনি তাই করেন। তিনি জ্ঞানগত দিক দিয়ে দর্শনশাস্ত্রকে এক নিষ্প্রভ ও গুরুত্বহীন বস্তুতে পরিণত করেন।

জীবন ও সমাজের ইসলামী পর্যালোচনা

ইমাম গাযালী (র)-এর অপর সংস্কারমূলক কাজ ছিল জীবন ও সমাজের ইসলামী পর্যালোচনা এবং তার সংস্কার ও পুনর্জাগরণের প্রচেষ্টা। তাঁর এই প্রচেষ্টার একটি সফল পরিণতি তাঁর জীবন্ত ও চিরন্তন গ্রন্থ "ইহ'য়া' 'উলূমুদ্দীন"।

"ইহ'য়া' 'উলূমুদ্দীন"

ইসলামের ইতিহাসে যে কতিপয় গ্রন্থ মুসলমানদের দিল ও দিমাগ তথা মন ও মস্তিষ্ক এবং তাদের জীবনের ওপর সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করেছে তার ভেতর "ইহ'য়া 'উলূমুদ্দীন"-এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'আলফিয়াহ' নামক গ্রন্থের লেখক হাফিজ যয়নুদ্দীন আল-'ইরাকী (মৃত্যু ৮০৬ হি.), যিনি 'ইহ'য়া'তে উল্লিখিত হাদীছগুলো খুঁজে বের করেছেন, বলেছেনঃ ইমাম গাযালী (র)-এর

---

১. এই তিনটি গ্রন্থের উল্লেখ ইমাম গাযালী (রা) 'জাওয়াহিরু'ল-কু'রআন' নামক গ্রন্থে করেছেন।

"ইহ্'য়াউ'ল-'উলূম" ইসলামের সর্বোত্তম গ্রন্থের একটি।[১] ইমাম গাযালী (র)-এর সমসাময়িক ও ইমামু'ল-হ'ারামায়ন-এর শাগরিদ 'আবদুল গাফির ফারসী বলেন : ইহ্'য়াউ'ল-'উলূম-এর পূর্বে এ ধরনের কোন কিতাব রচিত হয়নি।[২] শায়খ মুহাম্মদ গাযারুনীর দাবি ছিল, "যদি দুনিয়ার সমস্ত জ্ঞান-ভাণ্ডার নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয় তাহলে আমি "ইহ্'য়াউ'ল-'উলূম"-এর দ্বারা পুনরায় তা জীবিত করে দেব।"[৩] হাফিজ ইবন জওযী কতিপয় বিষয়ে মতভেদ সত্ত্বেও এই গ্রন্থের প্রভাব ও ব্যাপক জনপ্রিয়তার স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং "মিনহাজু'ল-ক'াসে'দীন" নামে এর সংক্ষিপ্তসার লিখেছেন।

এই গ্রন্থটি বিশেষ অবস্থা, মনোভঙ্গি ও বিশেষ প্রেরণা ও উৎসাহ নিয়ে লেখা হয়েছে। বাগদাদ থেকে সত্যের অন্বেষায় এবং সুদৃঢ় প্রত্যয় ও বিশ্বাসের সন্ধানে যে সফর ইমাম গাযালী (র) শুরু করেছিলেন যা সুদীর্ঘ দশটি বছরের কঠোর-কঠিন সাধনা, মুজাহাদা ও নির্জনবাসের পর সফলতা লাভের মাধ্যমে শেষ হয়েছিল– 'ইহ্'য়াউ'ল-'উলূম' ছিল সেই সফরেরই বিশিষ্ট সওগাত, যা তিনি (গাযালী) স্বীয় দেশবাসীর জন্য বহন করে এনেছিলেন। এটি ছিল তাঁর হৃদয়ের অভিব্যক্তি ও প্রতিক্রিয়া, জ্ঞানগত অভিজ্ঞতা, সংস্কারমূলক ধ্যান-ধারণা এবং হৃদয়ের স্বতঃউৎসারিত আবেগ ও মত্ততাবস্থারই দর্পণ।

মওলানা শিবলী নু'মানী তাঁর 'আল-গাযালী' (র) নামক গ্রন্থে লিখেছেন :

> তাঁর মধ্যে সত্য অনুধাবনের প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি হয়। দুনিয়ার বুকে প্রচলিত সকল ধর্ম-বিশ্বাসই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তিনি দেখেন। কিন্তু কোনটিই তাঁকে পূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারেনি, আশ্বস্ত করতে পারেনি। শেষাবধি তিনি তাসাওউফের দিকে ঝুঁকে পড়েন। কিন্তু তা মুখে বলে বোঝাবার বস্তু ছিল না, বরং ছিল আপাদমস্তক অনুভব করবার বিষয়, ছিল অনুশীলনের মাধ্যমে উপলব্ধি করবার বস্তু। আর তার পয়লা সৌন্দর্য (زينة) অভ্যন্তরীণ সংস্কার তথা ইসলাহে বাতেন ও তাযকিয়ায়ে নফ্স তথা আত্মার পরিশুদ্ধি। ইমাম সাহেবের কর্মব্যস্ততা ও পেশা ছিল এ পথের প্রতিবন্ধক। একদিকে জনপ্রিয়তা, নাম, খ্যাতি, পদমর্যাদা, সম্মান, প্রতিপত্তি, আলোচনা-বিতর্ক, আর অন্যদিকে আত্মার পরিশুদ্ধি। উভয়ের মাঝে সহস্র যোজনের ব্যবধান। این ره که می روی تو بمنزل نمی رود শেষ পর্যন্ত তিনি সব কিছু ছেড়ে ছুঁড়ে একটি কম্বলমাত্র পরিধান করে বাগদাদ

---

১. ২ ও ৩ শায়খ আবদুল কাদির আল-হাসানীর – تعريف الاحياء افضائل الاحياء!

থেকে বেরিয়ে পড়েন। তখন থেকেই তাঁর প্রান্তর-জীবনের শুরু। অতঃপর কঠোর রিয়াযত ও মুজাহাদার পর তিনি তাসাওউফের রহস্য উদ্যানে প্রবেশাধিকার লাভ করেন। এখানে পৌঁছার পর স্বীয় অবস্থায় মত্ত হয়ে গোটা জীবন ও জগত থেকে তাঁর বেখবর হয়ে পড়ার আশংকা ছিল। কিন্তু এই অবস্থায়ও সাধারণের কল্যাণের দিকে ছিল তাঁর কড়া নজর। তিনি দেখতে পেলেন, ব্যাপক জনগণের অবস্থা বিগড়ে গেছে। ধনী-দরিদ্র, বিশিষ্ট-অবিশিষ্ট, জ্ঞানী-মূর্খ, চরিত্রবান-দুশ্চরিত্র সকলেরই নৈতিক চরিত্র হয় ধ্বংস হয়ে গেছে, নয়ত হতে যাচ্ছে। 'উলামা সম্প্রদায়, যারা সত্য পথের দলীলস্বরূপ হতে পারতেন, তারাই জাঁকজমক ও পদমর্যাদার কাঙাল। এসব দৃশ্য তাঁকে ব্যথিত করে তোলে। আর তারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেন। ভূমিকায় তিনি নিজেই লিখেছেন, "আমি দেখতে পেলাম, রোগব্যাধি গোটা জগতটাকে ছেয়ে ফেলেছে এবং পারলৌকিক সৌভাগ্যর রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। 'উলামা, যাঁরা ছিলেন সত্য পথের দলীলস্বরূপ, ক্রমেই তাঁদের অস্তিত্ব লোপ পাচ্ছে। 'আলিম নামধারী যাঁরা এখনো আছেন, তাঁরা নামকা ওয়াস্তে 'আলিম, ব্যক্তিগত স্বার্থ ও উদ্দেশ্য তাদেরকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। তাঁদের মতে, 'ইল্‌ম স্রেফ তিনটি জিনিসের নাম, যথা : মুনাজারাহ বা পারস্পরিক বিতর্ক অনুষ্ঠান (যা গর্ব, অহমিকা ও যশ লাভের মাধ্যম); ওয়া'জ বা বক্তৃতা (যার ভেতর জনসাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য রঙীন ও ছন্দোবদ্ধ ছড়া, কবিতা ও শ্লোক আবৃত্তি করা হয়) এবং ফতওয়া প্রদান (যা বিভিন্ন মামলা-মোকদ্দমার ফয়সালার মাধ্যম)। বাকী রইল আখিরাতের 'ইল্‌ম। এটা মূল লক্ষণীয় বিষয় হলেও অধিকাংশ 'আলিমই তা ভুলে গিয়েছে। এতদ্দৃষ্টে আমি আর ধৈর্য ধারণ করতে পারলাম না। আমার নিস্তব্ধতা ভেঙে চুরে খান খান হয়ে গেল।"[১]

পর্যালোচনা ও হিসাব-নিকাশ

ইমাম গাযালী (র)-এর গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য ছিল ইসলাহ ও তরবিয়ত তথা সংস্কার-সংশোধন ও প্রশিক্ষণ। আর এজন্য জরুরী ছিল সে সব দুর্বলতা ও খারাপ দিকগুলো চিহ্নিত করা যা শিক্ষা ও ধর্মীয় কেন্দ্রগুলোতে এবং সাধারণভাবে মুসলিম জনসমাজে বিদ্যমান ছিল। অধিকন্তু প্রয়োজন ছিল, নফ্‌স ও শয়তান কিভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে ধোঁকা দিয়ে রেখেছে, হাকীকতসমূহ কিভাবে বদলে গেছে, মানুষ কিভাবে হাকীকত থেকে সরে গিয়ে বাহ্যিক আবরণ, চাকচিক্য ও

১. আল-গাযালী, শিবলী নু'মানীকৃত।

রসম-রেওয়াজের মধ্যে নিজেদের বন্দী করে ফেলেছে অর্থাৎ জীবনের মূল লক্ষ্য তথা পারলৌকিক সৌভাগ্য, রিযা-ই-ইলাহী ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি থেকে কিভাবে তারা গাফিল হয়ে পড়েছে, তা জনসাধারণের গোচরীভূত করা। এজন্য তিনি স্বীয় যুগের জীবন-যাত্রা ও সমসাময়িক সমাজের কার্যকলাপের পূর্ণ পর্যালোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন এবং প্রতিটি শ্রেণীর রোগ-ব্যাধি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি তথা ভুল-ভ্রান্তিগুলো পরিষ্কার ভাষায় বর্ণনা করেন, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও উপায়-উপকরণাদির ভেতর পার্থক্য নির্ণয় করেন, 'ইল্ম-এর মধ্যে ধর্মীয় 'ইল্ম ও পার্থিব 'ইল্ম, অতঃপর প্রশংসিত 'ইল্ম ও নিন্দনীয় 'ইল্ম, অতঃপর ফরয-ই-আইন, ফরয-ই-কিফায়া ইত্যাদির শ্রেণী বিন্যাস করেন। তিনি সময়ের দাবি অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং মূল কর্মের দিকেও সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। ধনিক ও বিত্তশালীদের দায়িত্বহীনতা, গাফিলতি ও তাদের বিশেষ ও যথার্থ রোগ-ব্যাধিগুলো খোলাখুলি বর্ণনা করেন। সুলতান ও শাসন কর্তৃত্বে সমাসীন ব্যক্তিবর্গের নির্ভীক সমালোচনা করেন এবং তাদের জোর-জুলুম ও নির্যাতন, শরীয়তবিরুদ্ধ কার্যকলাপ ও আইন-কানুনের নিন্দা করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি জনসাধারণের ব্যাধিসমূহ, বিভিন্ন শ্রেণীর ও স্থানের গর্হিত আচরণসমূহ, নিন্দনীয় অভ্যাস এবং ইসলাম বিরোধী ধর্মীয় প্রথা-পদ্ধতি ও বিদ'আতমূলক কর্মের বিস্তারিত বিবরণ দেন। মোট কথা, এই গ্রন্থটি ইসলামের প্রথম বিস্তারিত ও যুক্তি-প্রমাণভিত্তিক গ্রন্থ যার মধ্যে গোটা জীবনের ও বিগড়ে যাওয়া ইসলামী সমাজব্যবস্থার পরিপূর্ণ খতিয়ান রয়েছে এবং নৈতিক চরিত্রের ব্যাধিগুলোর উৎস ও তার কারণ এবং এর চিকিৎসা-পদ্ধতির ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

'উলামা ও ধার্মিক ব্যক্তিবর্গ

ইমাম গাযালী (র)-এর মতে, বিশ্বব্যাপী অশান্তি, বিপর্যয় ও ধর্মীয় ও চারিত্রিক অবনতির সর্বাপেক্ষা বড় যিম্মাদার 'উলামায়ে কিরাম যারা মুসলিম উম্মার জীবনে লবণস্বরূপ। যদি লবণই নষ্ট হয়ে যায় তাহলে এমন কোন্ বস্তু আছে যা তাকে ভাল করতে পারে? কবির ভাষায় ঃ

يا معشر القراء يا ملح البلد + ما يصلح الملح اذ الملح فسد

ওহে 'উলামা সম্প্রদায়! তোমরা যারা শহরের লবণসদৃশ, আমাকে বলে দাও, যদি লবণই নষ্ট হয়ে যায় তাহলে আর কি দিয়ে তা ভাল করা যায়?

অন্তরের ব্যাধির আধিক্য ও সাধারণ মানুষের গাফিলতির কারণ বর্ণনা করতে

গীয়ে এক স্থানে তিনি লিখেছেন ঃ

الثالثة وهو الداء العضال فقد الطبيب فان الا طباء هم العلماء وقد مرضوا فى هذه الاعصار مرضا شديداً وعجزوا عن علاجه .

তৃতীয় কারণ এবং সেটাই এমন ব্যাধি যার চিকিৎসা নেই আর তা এই যে, রোগী বর্তমান, কিন্তু চিকিৎসক লাপাত্তা। 'উলামায়ে কিরাম সমাজের চিকিৎসক আর তাঁরাই এ যুগে ব্যাধিতে সাংঘাতিকভাবে আক্রান্ত। সুতরাং চিকিৎসা করতে তারা অক্ষম।

তাঁর মতে, সুলতান ও শাসকবর্গের খারাপ হবার কারণ 'উলামায়ে কিরামের কমযোরী এবং স্বীয় দায়িত্ব পালনে তাঁদের গাফিলতি। এক স্থানে তিনি লিখেছেন:

وبالجملة انما فسدت الرعية بفساد الملوك وفساد الملوك بفساد العلماء فلولا القضاة السوء والعلماء السوء لقل خوفا من انكارهم .

সংক্ষিপ্তসার এই যে, প্রজাবর্গের খারাপ হবার কারণ রাজা-বাদশাহ্‌র তথা শাসন কর্তৃত্বে সমাসীন ব্যক্তিবর্গের খারাবী এবং 'উলামায়ে কিরামের খারাপ হওয়া বাদশাহ তথা শাসকবর্গের খারাপ হবার কারণ। যদি আল্লাহ্‌ভীতিহীন কাযী ও 'উলামায়ে 'সূ' (নীতি, আদর্শ ও চরিত্রহীন স্বার্থসর্বস্ব দুনিয়াদার 'আলিম) না থাকত তাহলে শাসককুল এভাবে বিগড়ে যেত না, বরং তারা 'আলিমদের সমালোচনাকে ভয় করেই চলত।

সে যুগের 'আলিমদের সম্পর্কে ইমাম গাযালী (র)-এর অভিযোগ যে, তারা পূর্ব যুগের আলিম-'উলামার ন্যায় 'আমর বি'ল-মা'রূফ ওয়া নাহী 'আনি'ল-মুনকার' তথা সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ এবং অত্যাচারী শাসকের সম্মুখে হক-কথা বলার দায়িত্ব পালন করছেন না। তাঁর মতে, এর কারণ এই যে, 'আলিম-'উলামা দুনিয়াদার হয়ে গেছেন এবং পদমর্যাদার পেছনে ঘুরছেন। তিনি সে যুগের সুলতান ও শাসনকর্তৃত্বে সমাসীন ব্যক্তিবর্গের সম্মুখে সত্যপন্থী 'উলামায়ে কিরামের সাহসিকতা, নির্ভীকতা ও হিসাব গ্রহণ ও অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের প্রভাবমণ্ডিত ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করবার পর বলেন ঃ

এই ছিল 'আলিমদের কর্মপদ্ধতি এবং 'আমর বি'ল-মা'রূফ ও নাহী 'আনি'ল-মুনকার'-এর অবস্থা। রাজা-বাদশাহ্‌র শান-শওকতের এতটুকু পরওয়া তাঁদের ছিল না। তাঁরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের ওপর আস্থাশীল ছিলেন এবং নিশ্চিন্ত ও আশ্বস্ত ছিলেন যে, আল্লাহতা'আলা তাঁদেরকে হেফাজত করবেন। তাঁরা আল্লাহ তা'আলার সেই ফয়সালার ওপরও রাযী ছিলেন যে, তাঁদের ভাগ্যে

শাহাদত লাভ ঘটুক। যেহেতু তাঁদের নিয়ত ছিল খালেস, সেহেতু তাঁদের কথায় পাথরও মোমের মত গলে যেত এবং বিরাট থেকে বিরাটতর পাষাণ হৃদয়ও প্রভাবিত হ'ত। এখন তো অবস্থা এই যে, দুনিয়ার লোভ 'আলিমদের বোবা বানিয়ে দিয়েছে এবং তারা একেবারে নিশ্চুপ। আর যদি কখনও তারা মুখ খোলে তাহলে দেখা যায় তাদের কথা ও কাজের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই। ফলে তাদের কথায়ও কোন আছর হয় না। যদি আজও তারা নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে কাজ করেন এবং 'ইল্ম-এর হক আদায় করার চেষ্টা করেন তাহলে অবশ্যই তারা কামিয়াব হবেন। কেননা প্রজাবৃন্দের খারাপ আচরণ শাসকবর্গের খারাপ আচরণের পরিণতিমাত্র। আর শাসকবর্গের আচরণের খারাপ দিকগুলো আলিম-'উলামার খারাপ আচরণের পরিণতি ছাড়া কিছু নয়। 'আলিমদের মন্দ হওয়ার কারণ পার্থিব সম্পদ ও উচ্চ পদমর্যাদা প্রীতি। কেননা যার ওপর দুনিয়ার ভালবাসা চেপে বসে সে উচ্চ পর্যায়ের লোক কিংবা রাজা-বাদশাহ্দের সমালোচনা করাতো দূরের কথা[১], নিম্নশ্রেণীর একটি লোকেরও হিসাব গ্রহণের এবং তার ভুল-ত্রুটিগুলো ধরিয়ে দেবার সাহস রাখে না।

ইমাম গাযালী (র)-এর যুগে একজন 'আলিমের জগত ফিক্'াহের ছোটখাটো ও খুঁটিনাটি ইখতিলাফী মসলা-মাসাইলের ভেতরই সীমাবদ্ধ ছিল। আলোচনা-সমালোচনা ও তর্ক-বিতর্কের মজলিস বসত ঘরে ঘরে, দেশের-আনাচে-কানাচে। বাদশাহ্দের দরবারগুলোর রওনকও ছিল এই সব মাযহাবী ও ফিক্'হী বাহাছ-মুবাহাছা ও বিতর্কমূলক অনুষ্ঠান। এ ব্যাপারে 'উলামা ও ছাত্রদের মগ্নতা ও বাড়াবাড়ি এতটা বেড়ে গিয়েছিল যে, অন্যান্য সব জ্ঞান-বিজ্ঞান, পেশা ও দীনী খেদমতের বিভিন্ন বিভাগ উপেক্ষিত হ'তে চলেছিল। এর সীমা এত দূর বিস্তৃত হয়েছিল যে, ইসলাহে নফ্স তথা আত্মার সংস্কার, চারিত্রিক শালীনতা ও পারলৌকিক সৌভাগ্য যেই ইল্ম ও প্রয়াসের ওপর নির্ভরশীল (انحصار) তা থেকে সবার মনোযোগ সরে গিয়েছিল। ইমাম গাযালী (র) এই অবস্থা সম্পর্কে সমালোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন :

"যদি কোন ফকীহ্কে সে সব বিষয়ের (সবর, শোক্র, আশা ও ভয় অথবা হিংসা, বিদ্বেষ, ঈর্ষা, অকৃতজ্ঞতা, প্রতারণা, ধোঁকা ইত্যাদির) কোন একটি সম্পর্কে অথবা ইখলাস, তাওয়াক্কুল ও রিয়া থেকে বেঁচে থাকবার পন্থা সম্পর্কে

১. ইহ্'য়া 'উলূমুদ্দীন, ৩য় খণ্ড, ৩১২ পৃ.।

জিজ্ঞাসা করা হয় যা জানা তার জন্য ফরযে 'আইন এবং এর প্রতি এতটুকু গাফিলতি প্রদর্শনের ভেতর আখিরাত বরবাদ হবার বিপদাশংকা বিদ্যমান, তাহলে তিনি জবাব দিতে পারবেন না। আর যদি (ক) লি'আন, (খ) জিহার সবক ও (গ) রমী সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় তাহলে তিনি এর জবাবে এমন সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও খুঁটিনাটি বিষয়ের অবতারণা করবেন, বহুকাল ধরে যার কোন আবশ্যকতা দেখা দেয় নি এবং কখনো যদি দেখাও দেয় তাহলে শহরে এ সম্পর্কে ফতওয়া দেবার মত লোকের কোন অভাব নেই। অথচ দেখা যাচ্ছে, এই সব 'আলিম দিনরাত শুধু এই জাতীয় খুঁটিনাটি বিষয় নিয়েই মাথা ঘামাচ্ছেন এবং মুখস্থ করে এগুলোরই পাঠ দানে ব্যাপৃত রয়েছেন। অপরদিকে তারা সেই সব বিষয় থেকে পরাঙমুখ রয়েছেন যা ধর্মীয় দিক দিয়ে তাদের জন্য জরুরী। যদি কখনো তাদেরকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হয় তাহলে তাঁরা বলেন : আমরা এই 'ইল্ম-এর ভেতর মশগুল রয়েছি এজন্য যে, এটা ধর্মীয় 'ইল্ম ও ফরযে কিফায়া। তাঁরা তাঁদের শিক্ষা দান ও শিক্ষা গ্রহণ সম্পর্কে নিজেদেরকেও ভুল পথে পরিচালিত করেন এবং অন্যদেরকেও বিভ্রান্ত করেন। অথচ বুদ্ধিমান ও সমঝদার মানুষ বেশ ভালভাবেই জানেন যে, যদি তাদের উদ্দেশ্য হয় ফরযে কিফায়ার হক আদায় করা এবং স্বীয় যিম্মাদারীর হাত থেকে মুক্ত হওয়া, তাহলে তারা সেই ফরযে কিফায়ার ওপর এই ফরযে 'আইনকে অগ্রাধিকার দিতেন। তাছাড়া আরো কিছু কিছু ফরযে কিফায়া আছে যেগুলোর ওপরও গুরুত্ব দেওয়া উচিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বহু শহর এমন রয়েছে যেখানে কেবল অমুসলিম চিকিৎসক রয়েছেন যাদের সাক্ষ্য ফিক্'হী বিধানে কবূল করা যায় না। অথচ আমরা দেখতে পাই না যে, কোন 'আলিম (এই কমতি ও যরুরত অনুভব করে) চিকিৎসাশাস্ত্রের দিকে মনোযোগ দিয়েছেন, বরং দেখা যায় এর মুকাবিলায় ছাত্ররা 'ইল্মে ফিক্'হ্, বিশেষ করে বিরোধিতা ও বিতর্কমূলক বিষয়ের ওপরই ঝাঁপিয়ে পড়ছে। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের 'আলিম দ্বারা শহর ভর্তি যাদের একমাত্র কাজ ফতওয়া প্রদান ও মসলা-মাসায়েল বাৎলে দেওয়া। আমার উপলব্ধিতে আসে না, 'উলামায়ে দীন শুধু এ ধরনের ফরযে কিফায়ার ভেতর মশগুল হওয়াকে কিভাবে সঠিক মনে করেন এবং এমন ফরযকে কিভাবে তারা পেছনে ফেলে রাখেন যার প্রতি এখনই মনোযোগ দেওয়া জরুরী। এর কারণ কি এই যে, চিকিৎসাশাস্ত্রের মাধ্যমে ওয়াক্'ফ সম্পত্তির মুতাওয়াল্লী, য়াতীমের ধন-সম্পদের তত্ত্বাবধায়ক

১. ইহ্'য়া 'উলূমুদ্দীন, পৃ. ১৯।

এবং কাযী বা মুফতী হওয়া যায় না কিংবা সমবয়সীদের ওপর প্রাধান্য অর্জন এবং দুশমন ও প্রতিপক্ষের ওপর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব লাভ করা যায় না![১]

অন্য এক স্থানে লিখেছেন ঃ

এমন অনেক ফরযে কিফায়া আছে যেগুলোর দিকে দৃষ্টি দেবার কেউ নেই। 'আলিম-'উলামাদেরও সে দিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। বেশি দূর যাবার দরকার নেই। চিকিৎসাশাস্ত্রের কথাই ধরুন। অধিকাংশ মুসলিম শহরে কোন মুসলিম চিকিৎসক নেই, অথচ একমাত্র তাদের সাক্ষ্যই শর'ঈ বিষয়াবলীতে নির্ভরযোগ্য। 'উলামায়ে কিরামের এই পেশার প্রতি এতটুকুও আকর্ষণ নেই। অনুরূপভাবে আম্‌র বি'ল-মা'রূফ ও নাহী 'আনি'ল-মুনকারও ফরযে কিফায়া (কিন্তু এটিও পরিত্যক্ত হচ্ছে)।[১]

তিনি এক স্থানে মূর্খতা, অলসতা ও দীন-ধর্ম সম্পর্কে ব্যাপক অজ্ঞতার এবং তাবলীগ ও সাধারণ তা'লীমের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেনঃ যে ব্যক্তির নিজের দীন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা ও উদ্বেগ আছে সে তাবলীগ ও তা'লীম ছেড়ে এমন সব বিষয় নিয়ে, যা কদাচিৎ ঘটে, কখনো ব্যস্ত থাকতে পারে না।[২]

কেন ইখতিলাফী মসলা-মাসাইল বিগত যুগগুলোতে অত্যধিক গুরুত্ব ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছে? 'উলামায়ে কিরাম কেন একে নিজেদের মেধা ও পরিশ্রমের ক্ষেত্র বানিয়ে নিয়েছেন? ইমাম গাযালী (র)-এর মতে এর কিছু ঐতিহাসিক কারণ রয়েছে এবং সে সবের ফলে এমনটি হওয়া বিলকুল স্বাভাবিক ছিল। তিনি লিখেছেন ঃ

মহানবী (সা)-এর পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হযরত খুলাফায়ে রাশেদীন (রা) নিজেরা স্বয়ং বড় 'আলিম, ফকীহ্ ও ফতওয়া দানের অধিকারী ছিলেন। তাই তাঁদের কদাচিৎ কোন বিশেষ অবস্থায় অন্য কোন জ্ঞানী ও বিজ্ঞ সাহাবা (রা)-এর দ্বারস্থ হবার প্রয়োজন হ'ত। ফলে 'আলিম সাহাবীরা পারলৌকিক 'ইলম-এর মধ্যেই ডুবে ছিলেন। যদি কখনও কোন ফতওয়া এসে উপস্থিত হ'ত তাহলে তাঁরা এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য নিজেদের মধ্যে যোগ্যতর ব্যক্তিকেই অগ্রাধিকার দিতেন এবং নিজেরা সার্বক্ষণিকভাবে আল্লাহ্‌র ধ্যানে নিবিষ্ট থাকতেন। যখন সে সব লোকের পালা আসল যাঁরা খিলাফতের হকদার বা যোগ্য ছিলেন না এবং যাদের ভেতর কোন বিষয়

১. ইহ্'য়া 'উলূমুদ্দীন, ৩৮ পৃ.; ২. ঐ, ৩৭-৩৮।

ফয়সালা করার বা ফতওয়া দেবার যোগ্যতা ছিল না তখন থেকেই 'উলামায়ে কিরামের প্রত্যক্ষ সাহায্য-সহযোগিতার প্রয়োজন দেখা দেয়। অযোগ্য শাসকরা 'আলিমদের নিজেদের সঙ্গে রাখতে শুরু করে যাতে তাদের থেকে ফতওয়া লাভ করা যায়। তাবি'ঈ' আলিমদের ভেতর তখনও এমন লোক জীবিত ছিলেন যাঁরা প্রাচীন ভাবধারার অনুসারী ছিলেন এবং যাঁদের ভেতর দীনের হাকীকত ও প্রাচীন বুযুর্গদের শান জাগরূক ছিল। যখন তাঁদেরকে ডাকা হ'ত তখন তাঁরা শাসকদের এড়িয়ে চলতেন এবং তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন। তাই খলীফারাই বাধ্য হয়ে (বনী উমায়্যা ও বনী 'আব্বাস) তাঁদেরকে খুঁজে বের করতেন। সে যুগের মানুষ যখন 'উলামাদের এই শান (প্রভাব ও মর্যাদা) প্রত্যক্ষ করল তখন তারা ধরে নিল যে, ফিক্‌হ্‌ (ইসলামী আইন ও বিধি-বিধান) সম্পর্কিত জ্ঞানই হচ্ছে সম্মান ও পদমর্যাদা লাভের সর্বোত্তম মাধ্যম। এর দ্বারা শাসকবর্গের নৈকট্য, ফতওয়া ও বিচার বিভাগীয় পদ লাভ করা যায়। ব্যস! তারা সকলেই শুধু ফিক্‌'হশাস্ত্রের দিকে মনোনিবেশ করল এবং উচ্চ পদের লোভে নিজেদের শাসকবর্গের সামনে পেশ করল। এ প্রচেষ্টায় কতক লোক সফল হ'ল, আবার কতক লোক কিছুই পেল না। যারা কিছুই পেল না তারা তো ইহলোক-পরলোকে ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল। আর যারা কিছু পেল, সম্মান প্রার্থী হবার কারণে তারাও হীন হ'ল। ফল দাঁড়াল এই যে, যে 'উলামা' ছিলেন সকলের কাঙ্ক্ষিত, মুখাপেক্ষীহীনতার কারণে ছিলেন সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয়, দুনিয়াদারদের দিকে লক্ষ্য ও মনোযোগ দেবার কারণে হয়ে গেলেন হেয় ও লাঞ্ছিত। অবশ্য এই সামগ্রিক অবস্থার মধ্যেও প্রতিটি যুগেই আল্লাহ্‌র কিছু সংখ্যক বান্দার মধ্যে এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা গেছে।

সেই সমস্ত যুগে সর্বাধিক গুরুত্ব ও মনোযোগ ছিল ইসলামী বিধি-বিধান ও ফতওয়ার দিকে। অবশ্য রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ব্যবস্থাপনা ও মামলা-মোকদ্দমার ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনও ছিল। অতঃপর ইসলামী উসূল ও 'আকীদার প্রতিও কোন কোন শাসকের আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। তাদের আগ্রহ জন্মে প্রতিটি পক্ষের দলীল-প্রমাণ ও পারস্পরিক আলোচনা শুনবার এবং তাদের বাহাছ-মুবাহাছার দৃশ্য দেখবার। মানুষ যখন শাসকদের এই রুচি ও স্বাদের ব্যাপারটা জানতে পারল তখন তারা 'ইলমে কালামের প্রতিও ঝুঁকে পড়ল। গ্রন্থকাররা এ বিষয়ের ওপর ভূরি ভূরি কিতাব লিখলেন এবং পারস্পরিক বিতর্ক প্রতিযোগিতার মূলনীতি ও নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করলেন, জন্ম দিলেন তারা যুক্তি-প্রমাণ রদকারী এবং প্রতিপক্ষের ওপর সমালোচনা বাণ নিক্ষেপকারী

একটি শাস্ত্রের। তাদের ভাষায়, এর দ্বারা তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল, কর্মের অনুকূলে প্রতিরোধ সৃষ্টি, সুন্নাহ্‌র সাহায্য ও সমর্থন এবং বিদ'আতের বিরোধিতা ও মূলোৎপাটন। তাদের এ বক্তব্য তাদের পূর্বসূরীদের বক্তব্যেরই অনুরূপ। পূর্বসূরীরা বলত, ফতওয়ার ক্ষেত্রে তাদের লিপ্ত হওয়ার উদ্দেশ্য কেবল দীন ও খাল্‌কে'র খিদমত তথা ধর্ম ও সৃষ্টির সেবা ও কল্যাণ সাধন। অতঃপর দেখা গেল, কোন কোন শাসক 'ইল্‌মে কালাম ও বিতর্ক অনুষ্ঠান পসন্দ করছেন না। তাঁদের মতে এর দ্বারা পক্ষপাতিত্ব, ঝগড়া-বিবাদ এবং কোন কোন সময় রক্তারক্তির ন্যায় অনেক অনাসৃষ্টি কাণ্ড ঘটে যায়। অবশ্য ফিক্‌'হী আলোচনা ও বিতর্কের প্রতি ঐ সব শাসকের অন্তরের টান ছিল, বিশেষ করে একটি ব্যাপারে তাঁদের আগ্রহের মাত্রা বেশী ছিল যে, ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর মযহাবই অধিকতর সঠিক। এতদ্দৃষ্টে মানুষ কালাম ও 'আকাইদশাস্ত্রের মাধ্যমে ইখতিলাফী মসলা-মাসাইল, বিশেষ করে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর মতভেদমূলক বিষয়গুলোকে আলাপ-আলোচনার বিষয়ে পরিণত করল এবং ইমাম মালিক (র), ইমাম সুফিয়ান ছওরী ও ইমাম আহমদ (র) প্রমুখের মযহাব ও মতভেদগুলোকে উপেক্ষা করল এজন্য যে, এঁদের মতানৈক্যগুলোর প্রতি শাসকবর্গের কোন আকর্ষণ নেই। তাদের বক্তব্য ছিল, তাদের ভাষায় এ ক্ষেত্রেও তাদের উদ্দেশ্য শরীয়তের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলোর প্রকাশ, মযহাবের বিভিন্ন কার্যকারণ বর্ণনা এবং ফতওয়ার মূলনীতি প্রণয়ন ও সংকলন্। এ বিষয়ে তারা প্রচুর বই-পুস্তক লেখেন, মসলা-মাসাইল খুঁজে বের করেন এবং তর্কশাস্ত্র ও পুস্তক প্রণয়নের ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করেন। এই ধারা এখনো অব্যাহত আছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, মতবাদমূলক মসলা-মাসাইল ও পারস্পরিক বিতর্ক অনুষ্ঠানের প্রতি 'আলিমদের আকর্ষণ এবং এর প্রতি নিমগ্নতার কারণ তাই ছিল যার বর্ণনা আমরা এই মাত্র দিলাম। যদি দুনিয়াবাসী ও ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গ (ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম শাফি'ঈ ভিন্ন) অন্য কোন ইমাম অথবা (ইখতিলাফী মসলা-মাসাইল ও বিতর্ক অনুষ্ঠান ভিন্ন) অন্য কোন বিদ্যার প্রতি আকর্ষণ বোধ করে তা হলে আমার বিশ্বাস 'আলিমরাও সেদিকে ঝুঁকে পড়বে এবং পড়ার কারণ হিসাবে বলবে যে, তাদের উদ্দেশ্য 'ইল্‌মে দীন ও আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ ব্যতিরেকে অন্য কিছু নয়।[১]

---

১. ইহ্‌'য়া 'উলূমুদ্দীন, ৩৮ পৃ.।

অতঃপর ইমাম গাযালী (র) বিস্তারিতভাবে তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনা-সমালোচনার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষয়ক্ষতির দিকগুলো বর্ণনা করেন। তিনি দীর্ঘ দিন এই ক্ষেত্রে একজন কৃতবিদ্য পুরুষ ছিলেন। তাঁর বর্ণনা চাক্ষুষ সাক্ষ্যের মর্যাদা রাখে এবং তা ছিল প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ওপর প্রতিষ্ঠিত।[1]

অবশ্য এ ব্যাপারে একটি বড় ভ্রম পরিলক্ষিত হ'ত এবং তা ছিল শব্দ-সম্পর্কিত। ইমাম গাযালী (র)-এর যুগের প্রচলিত জ্ঞান– সেগুলোর বিকৃত রূপ ও কাঠামোর জন্য যে সব শব্দ শিরোনামের কাজ দিত সেগুলো ছিল ঐ সব প্রাচীন বুযুর্গদের জীবন-চরিতে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইখতিলাফী মসলা-মাসাইল ও ফিক্'হের ক্ষেত্রে কদাচিৎ ঘটে এমন সব খুঁটিনাটি ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ের জন্য বিনা দ্বিধায় "ফিক্'হ্" শব্দের ব্যবহার চলত আর সব ধরনের জ্ঞান সম্পর্কিত কায়কারবার এবং শরীয়তসম্মত ও শরীয়তবিরোধী 'ইল্‌মের জন্য ঢালাওভাবে ব্যবহৃত হত 'ইল্‌ম শব্দটি। 'ইল্‌মে কালাম ও দার্শনিকসুলভ আলোচনাকে "তাওহীদ" নামে অভিহিত করা হ'ত। আগা-মাথাহীন ভাসা ভাসা কথার ফুলঝুরি ছড়ানো বর্ণনাকে "তায'কীর" আখ্যা দেওয়া হ'ত। সব ধরনের ঠিকানা-পরিচয়হীন পেঁচালো রচনাভঙ্গিকে বলা হত "হিকমত"। অতঃপর ঐ সব স্বনির্মিত কার্যকলাপ ও কাজকারবারের ওপর সেই সব ফযীলতের ছাপ মারা হ'ত যা কুরআন ও হাদীছে ঐ সব শব্দ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। উদাহরণত, ফিক'হ্-এর এই বিকৃত রূপ ও কাঠামোর (কেবল মতভেদ ও খুঁটিনাটি বিষয়গুলোর জন্য) ফযীলত বর্ণনায় কুরআন মজীদের আয়াত لِيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنَ এবং হাদীছ مَنْ يُرِدِ اللّٰه بِه خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ-এর দর্শন ও পঞ্চম শতাব্দীর 'ইল্‌মে কালামের ফযীলত বর্ণনায় وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا-এর খোশ খবর, মূর্খ জাহিল ও আল্লাহভীতিহীন ওয়াইজ ও বক্তাদের সাধারণ ওয়া'জ-নসীহতের ফযীলত বর্ণনায় فَذَكِّرْ اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرٌ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আয়াত কারীমা ও হাদীছে রাসূল (সা) উদ্ধৃত করা হ'ত। ইমাম গাযালী (র) এই বিভ্রান্তির পর্দা উন্মোচন করেন এবং বিস্তারিতভাবে বলেন যে, এই শব্দসমষ্টি তার আসল হাকীকত খুইয়েছে এবং তা প্রকৃত অর্থ ও মর্ম থেকে অনেক দূরে সরে পড়েছে। ইসলামের প্রথম যুগে এ সবের যে অর্থ ও মর্ম ছিল তার সাথে 'আলিমদের বর্ণিত অর্থ ও মর্মের কোন সম্পর্ক নেই।

সুলতান ও শাসন কর্তৃত্বে সমাসীন ব্যক্তিবর্গ

১. ঐ, দ্র. ইহ্'য়াউ'ল-'উলূম, ১ম খণ্ড, ৪০-৪৩ পৃ.।

দ্বিতীয় যে কারণটি ইমাম গাযালী (র) -এর মতে এই পৃথিবীব্যাপী ফিতনা-ফাসাদ, নৈতিক ও চারিত্রিক অধঃপতন এবং ধর্মীয় অধঃগতির যিম্মাদার ছিল তা হচ্ছে সরকারী কর্মচারী, সুলতান ও তাঁর আমীর-উমারার কার্যকলাপ। ইমাম গাযালী (র)-এর দু'শ' বছর আগে হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইবন মুবারক (র) উল্লিখিত দু'টি শ্রেণী[২] ('আলিম-'উলামা তথা পণ্ডিতমণ্ডলী ও শাসকবর্গ)-কেই ধর্মের বিকৃতি সাধনকারী হিসাবে অভিহিত করেছিলেন।

وهل افسد الدين الا الملوك واحبار سوء ورهبانها .

ইমাম গাযালী (র) এমন একটি যুগে উল্লিখিত দু'টি শ্রেণীকে পরিপূর্ণ সাহসের সঙ্গে স্বাধীনভাবে সমালোচনার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেন যখন বাদশাহ ছিলেন একচ্ছত্র কর্তৃত্বের অধিকারী এবং সব ধরনের আইন-কানুন ও বিধি-নিষেধের ঊর্ধ্বে। তখন বাদশাহর প্রতি সমালোচনা বাণ নিক্ষেপ করা ছিল মৃত্যুকে সাদর হাতছানি দেবারই নামান্তর। তাঁর যুগে বাদশাহের উপহার, দান ও পেশকৃত লোভনীয় প্রস্তাব কবূল করাই ছিল সাধারণ রেওয়াজ। ইমাম গাযালী (র) বাদশাহ ও শাসকবর্গের ধন-সম্পদকে নাজায়েয ও হারাম বলে ঘোষণা করেন। এক স্থানে তিনি লিখেছেন :

اغلب اموال السلاطين حرام فى هذه الاعصار والحلال فى ايديهم معدوم او عزيز .

বাদশাহদের ধন-সম্পদ এ যুগে সাধারণভাবে হারাম। হালাল ধন-সম্পদ তাদের নিকট হয়ই না আর হলেও পরিমাণে খুব কম।

তিনি অন্যত্র লিখেছেন :

ان اموال السلاطين فى عصرنا حرام كلها او اكثرها - وكيف لا والحلال هو الصدقات والفئ والغنيمة ولا وجود لها وليس يدخل منها فى يد السلطان ولم يبق الا الجزية وانها توخذ بانواع من الظلم لا يحل اخذها به فانهم يجاوزون حدود الشرع فى المأخوذ والماخوذ منه والوفاء له بالشرط ثم اذا نسب اليهم من الخراج المضروب علي المسلمين ومن المصادرات والرشاد صنوف الظلم لم يبلغ عشر معشار عشيرة .

সুলতান তথা শাসকদের ধন-সম্পদ আমাদের যুগে হয় সবটাই হারাম নতুবা এর বৃহত্তম অংশ। আর এর মধ্যে আশ্চর্যের কিছু নেই। কেননা তাদের হালাল মাল বলতে যাকাত, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (মালে গনীমত) অথবা বিনা যুদ্ধে লব্ধ সম্পদই বোঝাত, অথচ আজ কোথাও এর অস্তিত্ব নেই। এসবের কিছুই বাদশাহ্ পর্যন্ত পৌঁছে না। এখন বাকি থাকল শুধু জিয্য়া। আর জিয্য়ার অবস্থা

এই যে, তা নানান অত্যাচার ও নির্যাতনের মাধ্যম আদায় করা হয় যা আদৌ জায়েয নয়। সরকারী কর্মচারীরা শরীয়তের নির্ধারিত সীমা লংঘন করে থাকে। মালের পরিমাণের ক্ষেত্রে যেমন শরীয়তের বিধান মেনে চলা হয় না, তেমনি যিম্মী, যাদের থেকে জিযয়া উসূল করা হয়, তাদের ক্ষেত্রেও শর'ঈ বিধানের তোয়াক্কা করা হয় না। মুসলমানদের ওপর নির্ধারিত রাজস্বও যবরদস্তিমূলকভাবে আদায় করা হয়।

ইমাম গাযালী (র) আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে লিখেছেন :

"যুগের সুলতান থেকে সেই অর্থ কবুল করাটাও সমীচীন নয়, যে অর্থ সম্পর্কে এই ধারণাই বেশী যে, তা সন্দেহমুক্ত ও জায়েয নয়। কেননা এর মধ্যে বহু ধর্মীয় বিপর্যয় (লুকিয়ে) রয়েছে।" অবশ্য এক্ষেত্রে অতীত যুগের দৃষ্টান্ত পেশ করা হয় এবং বলা হয় যে, প্রাচীন বুযুর্গদের মধ্য থেকে কোন কোন 'আলিম ও সালিহ (জ্ঞানী, সৎ ও সত্যনিষ্ঠ) ব্যক্তি স্বীয় যুগের খলীফা ও সুলতানের পেশকৃত উপহার-উপঢৌকনের প্রস্তাব কোন কোন সময় কবূল করেছেন। তাই ইমাম গাযালী এ যুগ ও সে যুগের রাজা-বাদশাহ ও সুলতানদের অবস্থার পার্থক্য নিম্নভাবে বর্ণনা করেছেন :

প্রথম যুগের জালিম সুলতানদের অন্তরে খুলাফায়ে রাশেদীনের খিলাফত যুগের নৈকট্যের কারণে জুলুম ও নির্যাতনমূলক আচরণের কিছুটা অনুভূতি ছিল। উপরন্তু তারা সাহাবায়ে কিরাম ও তাবি'ঈদের অন্তর জয় ও নিজেদের দিকে তাঁদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করত এবং এমন ধরনের ব্যবহার করত যাতে তাঁরা কোন না কোনভাবে তাদের উপহার-উপঢৌকন ও পুরস্কারাদি গ্রহণ করেন। তারা তাঁদের নিকট এসব অর্থ ও নযরানা না চাইতেই এবং তাঁদের শান ও মর্যাদার ওপর কোনরূপ কটাক্ষ না করেই পাঠাত। শুধু তাই নয়, তারা তাদের প্রদত্ত উপহারাদি গ্রহণ করার কারণে কৃতজ্ঞও থাকত এবং আনন্দ প্রকাশ করত। ঐ সব বুযুর্গও এসব উপহার গ্রহণ করে সঙ্গে সঙ্গে তা সাধারণ্যে বণ্টন করে দিতেন। তাঁরা সুলতানদের নিয়ত ও লক্ষ্যের দিকে দৃকপাত করতেন না, তাঁদের সঙ্গে কোন অন্যায় কাজে সহযোগিতাও করতেন না এবং তাঁদের দরবারে মুলাকাতের উদ্দেশ্যে গমনও করতেন না। তাঁরা দীর্ঘায়ু হোন, প্রকাশ্যে তাঁরা এ ধরনের কোন কামনাও করতেন না, বরং তাঁরা জালিম শাসকদের ব্যাপারে প্রকাশ্যে বদ্দু'আ করতেন। তাঁদের সম্পর্কে স্বাধীনভাবে মতামত ব্যক্ত করতেন এবং তাঁদের মুখের ওপর তাঁদের শরীয়তবিরুদ্ধ কাজের তাঁরা সমালোচনা করতেন।

তাই ঐ সব গ্রহণ তাঁদের জন্য অবৈধ ছিল না। অপর দিকে আজকের সুলতানগণ সেই সব লোককেই মুক্ত হস্তে দান করেন যাদের সম্পর্কে তাদের ধারণা যে, তাদের থেকে যে কোন ব্যাপারে সমর্থন আদায় করা যাবে, তাদের পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া যাবে, উপরন্তু তাদের দ্বারা দরবার ও মজলিসের রওনকও বৃদ্ধি পাবে। সর্বোপরি তারা সব সময় তাদের জন্য দূ'আ করবে, প্রশংসা কীর্তন করবে এবং সাক্ষাতে-অসাক্ষাতে তাদের তা'রীফ ও গুণপনা বর্ণনায় মেতে থাকবে। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে প্রথম স্তর শাসকদের কাছে নিজেদের মর্যাদাকে হেয় করা; দ্বিতীয়, তাদের খেদমতের জন্য আনাগোনা; তৃতীয়, তাদের প্রশংসা কীর্তন ও তাদের জন্য দু'আ প্রার্থনা; চতুর্থ, তাদের ন্যায়-অন্যায় উদ্দেশ্য হাসিলে সহায়তা করা; পঞ্চম, তাদের ভাড়ামি করা, তাদের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ এবং প্রতিদ্বন্দ্বীর মুকাবিলায় তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করা; ষষ্ঠ, তাদের জুলুম ও কুকর্ম ঢেকে রাখা। যদি কোন ব্যক্তি এগুলোর কোন একটি করতেও সম্মত না হন তাহলে তিনি ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর ন্যায় মরতবা ও মর্যাদার অধিকারী হলেও এই সব সুলতান তার জন্য একটি পয়সাও ব্যয় করতে রাযী হবে না। এজন্যই বর্তমান যুগে এই সব বাদশাহ্র থেকে কোন ধন-সম্পদ গ্রহণ করা জায়েয হবে না। কেননা এর পরণতি তাই হবে যার উল্লেখ ওপরে করা হয়েছে। এখন যদি কেউ ঐ সব সুলতানের অর্থ-সম্পদ সাহসিকতার সংগে কবুল করে এবং নিজের পক্ষে সাহাবী ও তাবি'ঈদের নজীর পেশ করে তাহলে আসলে সে ফেরেশতাদেরকে একজন কর্মকারের সঙ্গে তুলনা করল। কেননা এই অর্থ সম্পদ কবুল করার পর সুলতানদের সঙ্গে তার মেলামেশার এবং পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্ব স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে, তাদেরকে তার সমীহ করে চলতে হবে, তাদের (নিয়োজিত) কর্মকর্তা ও শাসনকর্তৃত্বে আসীন কর্মচারীদের সেবা করতে হবে এবং তাদের সম্মুখে মস্তকাবনত হয়ে চলতে হবে। অতঃপর তাদের প্রশংসা কীর্তন এবং তাদের দরবারে হাযিরা দেওয়া ছাড়া তার কোন গত্যন্তর থাকবে না। আর এ সবই পাপ ও অন্যায়।

হ্যাঁ, যদি কেউ শাহী অর্থের ভেতর থেকে একটা অংশ কবুল করে যা হালাল এবং সে তার হকদার এবং ঐ অর্থ তার নিকট ঘরে বসে থাকা অবস্থায়ই আসে, কোন শাসক কিংবা অনুচরের সন্ধান ও খিদমত এবং ঐ সব সুলতান ও শাসকের প্রশংসা-কীর্তন ও সাক্ষ্য-প্রমাণেরও প্রয়োজনীয়তা দেখা না দেয়, তাদেরকে সাহায্য ও সমর্থন দিতে হবে-এমন শর্তাদিও না থাকে, তাহলে

১. ইহ্'য়া' 'উলূমুদ্দীন, ২য় খণ্ড, ১২৩ পৃ.।

(মাসআলার দিক দিয়ে) এমন অর্থ গ্রহণ হারাম নয়। তবে অন্যান্য মন্দ, সুদূরপ্রসারী পরিণতি ও ফলাফলের দিক চিন্তা করলে তা অবশ্যই মাকরূহ।[১]

অন্য এক স্থানে শাসক ও রাজন্যবর্গের সংস্পর্শ থেকে দূরে অবস্থানের প্রয়োনজীয়তা এবং তাদের প্রতি কি ধরনের আচরণ করতে হবে সে সম্পর্কে তিনি বলেছেন ঃ

الحالة الثانية ان يعتزل عنهم فلا يراهم ولا يرونه وهو الواجب والسلامة فيه فعليه ان يعتقد بغضهم على ظلمهم ولا يحب بقائهم ولا يثنى عليهم فلا يستخبر عن احوالهم ولا يتقرب الى المصلين بهم .

দ্বিতীয় অবস্থা এই যে, মানুষ সেই সব শাসক ও রাজন্যবর্গের সাহচর্য এমনভাবে এড়িয়ে চলবে যাতে তাদের সম্মুখেই পড়তে না হয়। এটা অবশ্যই কর্তব্য এবং এর ভেতরই নিরাপত্তা নিহিত। মানুষকে তারা জুলুম-নিপীড়ন করে বলে তাদের দীর্ঘায়ু যেমন কামনা করা যাবে না, তেমনি তাদের প্রশংসাও কীর্তন করা হবে না। তাদের অবস্থার যেমন খোঁজ-খবর রাখা যাবে না, তেমনি করা যাবে না বন্ধু-বান্ধব ও তাদের সভাসদদের সাথে মেলামেশা।

সেই যুগে যখন অত্যাচারী ও স্বৈরাচারী রাজা-বাদশাহ এবং স্বেচ্ছাচারী উযীর ও শাসকবর্গের দয়ার ওপর গোটা কওমের জীবন ও যিন্দেগী ছিল নির্ভরশীল, যখন সামান্যতম সন্দেহেও ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চালানো হ'ত, সেসময় ইমাম গাযালী (র)-এর স্পষ্ট ভাষণ ও সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও আয়-ব্যয়ের ওপর খোলাখুলি ও প্রকাশ্য সমালোচনা, সুলতান ও শাসকদের দান ও উপহার-উপঢৌকন কবুল না করার জন্য 'আলিমদের উৎসাহ প্রদান (যাকে সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা ও অসন্তোষ প্রকাশ অথবা সম্পর্কহীনতার আলামত বলে গণ্য হ'ত) এমন একটি জিহাদ ছিল যা সংবাদপত্র ও বাক-স্বাধীনতার এই যুগেও অনেকটা অকল্পনীয়।

ইমাম গাযালী (র) কেবল লেখা ও গ্রন্থ রচনাকেই যথেষ্ট মনে করেন নি, বরং যখনই সে যুগের বাদশাহর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পেয়েছেন অমনি তার জনাকীর্ণ দরবারেও হক-কথা সমুচ্চ কণ্ঠে উচ্চারণ করতে দ্বিধা করেননি। মালিক শাহ সলজুকী তনয় সুলতান সঞ্জর গোটা খোরাসানের শাসনকর্তা ছিলেন। ইমাম গাযালী (র) একবার এক সাক্ষাতে তাঁকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

১. মকতূবাতে ইমাম গাযালী, পৃ. ১৯।

দুঃখ হয় যে, মুসলমানদের গর্দান বিপদ-মুসীবত ও দুঃখ-কষ্টের ভারে ভেঙে পড়ছে, আর তোমার ঘোড়ার গর্দান ভেঙে পড়ছে সোনালী জিঞ্জিরের ভারে।[১]

তিনি মুহাম্মদ ইবন মালিক শাহকে (যিনি ছিলেন সুলতান সঞ্জরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং সে যুগের সর্বাপেক্ষা বড় বাদশাহ) একটি হেদায়াতনামা লিখে পাঠান যাতে দেশ ও জনগণের প্রতি তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় স্মরণ করিয়ে দেন।[১]

প্রাচ্যের সাম্রাজ্যগুলোতে যেহেতু রাষ্ট্রের আইন-শৃংখলা ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা উযীরদের হাতেই ন্যস্ত থাকত এবং যেহেতু তারাই হুকুমতের যাবতীয় ভাল-মন্দের ব্যবস্থাপক ও যিম্মাদার হতেন, তাই তাদেরই সজাগ দৃষ্টি আকর্ষণের মাধ্যমে দেশের সংস্কার হতে পারত। ইমাম গাযালী (র) এই বাস্তবতা সম্পর্কে পুরাপুরি ওয়াকিফহাল ছিলেন। তাই তিনি সলজূকী সুলতানদের তুলনায় অধিকতর মনোযোগ দেন তাদের উযীরদের প্রতি। তাঁদের কাছে তিনি বিস্তারিত চিঠি ও হেদায়াতনামা লিখে পাঠান এবং অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে ও পরিষ্কার ভাষায় হুকুমতের অব্যবস্থাপনা ও বিশৃংখলাপূর্ণ অবস্থা, অধিকার লঙ্ঘন ও শাসকদের অপচয়ের প্রতি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তাঁদের অন্তরে খোদা-ভীতির উন্মেষ ঘটিয়ে তাঁদের অতীত উযীর ও সরকারী ক্ষমতাধিপতিদের পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে সংশোধনের চেষ্টা করেন। তাঁর এসব চিঠিপত্র ছিল ব্যক্তিগত সাহসকিতা এবং নির্বিঘ্নে সত্য প্রকাশের সর্বোত্তম নমুনা।

মুসলমানদের অন্যান্য শ্রেণী

'উলামা শ্রেণী, সুলতান ও শাসকশ্রেণী ছাড়াও তিনি সাধারণ মানব শ্রেণীর আচার-আচরণেরও পর্যালোচনা করেছেন। তাতে যে পরিমাণ ধর্মহীনতা, বিদ'আত, গর্হিত উপাদান, প্রতারণা ও আত্মপ্রবঞ্চনা প্রবেশ করেছে তিনি সে সবের সমালোচনা করেছেন। 'ইহ্'য়াউ'ল-'উলূম' পাঠে পরিষ্কার বোঝা যায় যে তিনি জ্ঞান জগতে গভীর মগ্ন এবং 'আলিমসুলভ জীবন যাপন করা সত্ত্বেও সেই যুগের সমাজ ও সাধারণ জনজীবন সম্পর্কে তাঁর অধ্যয়ন ছিল অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক। তিনি মুসলমানদের সাধারণ জীবন এবং মুসলিম উম্মার বিভিন্ন শ্রেণী,

---

১. এই হেদায়াতনামাটি ছিল একটি পুস্তিকাকারে লিখিত। নাম ছিল, "নসীহ'াতু'ল-মুলূক" (বাদশাহগণের প্রতি উপদেশ)। সুলতান মুহাম্মাদ শাহ্‌র মাতৃভাষা ছিল ফারসী বিধায় পুস্তিকাটিও ফারসী ভাষায় লিখিত হয়েছিল।

তাদের নানাবিধ রোগ-ব্যাধি ও দুর্বলতা যেভাবে চিহ্নিত করেছেন তা থেকে অনায়াসে তাঁর পর্যবেক্ষণ শক্তি ও দূরদৃষ্টির পরিমাপ করা যায়। তিনি একটি পৃথক অধ্যায়ে সে সব গর্হিত কর্মের ফিরিস্তি বর্ণনা করেছেন যার অনুপ্রবেশ ঘটেছে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের আচার-আচরণে, অথচ এসব কাজ যে শরীয়ত ও নৈতিকতাবিরোধী তা মানুষ অনুভব করতে পারছে না। এই অধ্যায় তিনি গোটা নাগরিক জীবনের ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপণ করেছেন এবং তাতে সংঘটিত যাবতীয় গর্হিত কর্মের ওপর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। মসজিদ থেকে শুরু করে বাজার, সড়ক, হাম্মামখানা, ওয়া'জ মাহফিল পর্যন্ত যেখানে যা ঘটেছে তার একটি পরিসংখ্যান তিনি এতে তুলে ধরেছেন।[১]

তিনি ইহ্'য়াউল-'উলূ'ম-এর একটি পৃথক অধ্যায় (كتاب ذم الغرور) সেই সব লোকের বর্ণনা দিয়েছেন যারা বিভিন্ন রকমের প্রতারণা ও আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত রয়েছে। এই সূত্রে তিনি প্রতিটি শ্রেণীর প্রতারিত ব্যক্তিবর্গ এবং তাদের ভ্রান্ত উপলব্ধি ও আত্ম-প্রবঞ্চনার দিকটিও তুলে ধরেছেন এবং তাদের এমন কতক মানসিক ব্যাধি ও বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করেছেন যা কেবল একজন সূক্ষ্মদর্শী সংস্কারক ও একজন অভিজ্ঞ মনস্তত্ত্ববিদের চোখেই ধরা পড়তে পারে। এই অধ্যায়ে তিনি 'উলামা, 'ইবাদত-গুযার 'আবিদ, যাহিদ, আমীর-উমারা, সূফী-দরবেশ সবারই পর্যালোচনা করেছেন এবং তাঁদের বিশেষ বিশেষ রোগ-ব্যাধি ও ভারসাম্যহীনতার পর্দা উন্মোচন করেছেন। এ থেকে তাঁর তীক্ষ্ণ মেধা, সূক্ষ্মদর্শিতা ও বাস্তবতাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

তাঁর যুগের 'উলামায়ে কিরাম 'ইল্ম চর্চায়– যেমন ফিক্'হ্-এর খুঁটিনাটি মসলা-মাসায়েল ও বিতর্কিত বিষয়াদি, ইল্মে কালাম সম্পর্কিত আলাপ-আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক, ওয়া'জ-নসীহত, যিক্র-আযকার, ইল্ম-ই হাদীছ ও তৎসম্পর্কিত নাহ্'ও, অভিধান, কাব্য ও ব্যাকরণের বিশ্লেষণ, সূফী-দরবেশের বাণীসমষ্টি ও অবস্থাদি হুবহু মুখস্থ রাখা প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে সীমা লঙ্ঘন করেছিলেন তার যথাযথ বিশ্লেষণ করে বাস্তব অবস্থা সর্বসমক্ষে তুলে ধরেছেন। অবশেষে এক্ষেত্রে নিজের যে অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন তা হ'ল পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞানে– যেমন, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, অংক শাস্ত্র এবং শিল্প বিজ্ঞানে এতটা খোশ-কল্পনা ও আত্ম-প্রবঞ্চনা নেই যতটা আছে 'ইলমে শরী'য়তে। আর তা এজন্য যে, কারোরই এ ধারণা নেই যে, পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞান নিজেই মাগফিরাতের মাধ্যম হতে পারে। কিন্তু 'ইলমে

১. ইহ্'য়া 'উলূমুদ্দীন, দ্র. ২য় খণ্ড, ২৯৪-৯৯ পৃ.।
২. ঐ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৩।

শরী'য়তের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঠিক উল্টো। কেননা উদ্দেশ্য ও ফলাফলের দিকে না তাকিয়ে স্বয়ং 'ইল্‌মে শরী'য়তকেই মাগফিরাত ও আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের মাধ্যম মনে করা হয়।[২] স্বীয় যুগের 'আবিদ, যাহিদ ও তাসাউফপন্থীদেরকেও তিনি বেশ গভীর দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেছেন এবং তাঁদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ত্রুটি-বিচ্যুতি, খোশ-উপলব্ধি এবং আত্ম-প্রবঞ্চনার স্বরূপ তুলে ধরেছেন। বহুবিধ জাহিরী 'আমল ও রসম-রেওয়াজের অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা তাদের আত্মপূজা, পদমর্যাদা কামনা (جاه طلبى), লোক-দেখানো সৎকর্ম, বাহ্যিক অনুকরণ ও প্রাণহীন প্রথাগুলোও তাঁর চোখে পড়েছে এবং তিনি অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় তা প্রকাশ করে দিয়েছেন।[১]

বিত্ত-সম্পদের অধিকারী ধনিকগোষ্ঠীর ওপরও তিনি সমালোচনার কষাঘাত হেনেছেন। তাদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর লেখনী অত্যন্ত বাস্তব চিত্র অংকন করেছে। এক স্থানে তিনি বলেছেন :

ঐসব ধনীর ভেতর অনেক লোকই হজ্জের ব্যাপারে টাকা-পয়সা দেদার খরচ করতে বেশ আগ্রহী। তারা বারবার হজ্জ পালন করে। কখনও এমন হয় যে, তারা তাদের প্রতিবেশীদের ভুখা-নাঙ্গা রেখে হজ্জ করতে যায়। হযরত 'আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাস'ঊদ (রা) ঠিকই বলেছেন, "শেষ যুগে নিষ্প্রয়োজনে হজ্জ গমনকারীদের সংখ্যাই বেশী হবে। টাকা-পয়সার কমতি না থাকায় সফর করা তাদের কাছে খুব সহজ মনে হবে। কিন্তু তারা হজ্জ থেকে ফিরে আসবে বঞ্চিত ও নিঃস্ব অবস্থায়। তারা স্বয়ং বালি ও কংকরময় যমীনের মাঝ দিয়ে নির্বিঘ্নে সফর করবে, অথচ তাদের প্রতিবেশী তাদের পাশেই থাকবে বালা-মুসীবতে গ্রেফতার হয়ে। কেউ তাকে শোকে সান্ত্বনা দেবে না এবং তার সঙ্গে ভাল ব্যবহারও করবে না।"

আবু নসর তুম্মার বলেন, "এক ব্যক্তি বাশার ইব্‌ন আল-হারিছের নিকট এসে বলল ঃ আমি হজ্জ করতে ইচ্ছা করেছি। আপনার কোন কাজ আছে ? তিনি বললেন ঃ তুমি ব্যয় নির্বাহের জন্য কি রেখেছ ? লোকটি বলল ঃ দু'হাজার দিরহাম। বাশার বললেন ঃ হজ্জ করবার পেছনে তোমার উদ্দেশ্য কি! যুহ্‌দ প্রকাশ, কা'বার প্রতি আগ্রহ, না আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা ? সে বলল ঃ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা। তিনি বললেন ঃ আচ্ছা, আমি যদি তোমাকে এমন কোন তদবীর বাৎলে দিই যাতে তুমি ঘরে বসেই আল্লাহ্‌র রেযামন্দী হাসিল করতে

১. ইহ'য়াউ'ল-'উলূমুদ্দীন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৫-৫০।

পার তাহলে কি তুমি তাতে রাযী আছ ? যদি তুমি এ দু'হাজার দির্হাম খরচ করে দাও আর নিশ্চিত হও যে, আল্লাহ্র রেযামন্দী হাসিল হয়ে গেছে, তাহলে কি তুমি তার জন্য তৈরি আছ ? সে বলল ঃ হ্যাঁ, আনন্দের সঙ্গে। তিনি বললেন :

আচ্ছা যাও, এই অর্থ এমন দশজন লোককে দিয়ে এস যারা ঋণগ্রস্ত। তারা এই অর্থ দিয়ে ঋণ শোধ করুক, দারিদ্র্যাবস্থা পরিবর্তন করুক, নিঃস্ব পিতা তার সন্তান-সন্ততির জন্য দরকারী সামান সংগ্রহ্ করুক, য়াতীমের অভিভাবক য়াতীমের অন্তর-মানস আনন্দে ভরে তুলুক। আর তোমার মন যদি চায় তাহ্লে একজনকেই সবটা অর্থ দিয়ে এস এজন্য যে, মুসলমানের অন্তর-মনকে খুশী করা, উপায়হীন অসহায়কে সাহায্য করা, কারোর বিপদ দূর করা এবং দুর্বলের সাহায্য করা এক শত নফল হজ্জ অপেক্ষাও উত্তম। যাও, যেমনটি আমি বললাম তেমনটি করে এস। অন্যথায় তুমি তোমার মনের কথাটি আমাকে বলে ফেল। সে বলল ঃ হে শায়খ ! সত্যি কথা এই যে, সফর করবার দিকেই আমার ঝোঁক বেশী। বাশার একথা শোনার পর মুচকি হাসলেন এবং বললেন : ধন-সম্পদ যখন পচা ও সন্দেহযুক্ত হয় তখনি প্রবৃত্তি এগুলোর দ্বারা কামনা-বাসনা পূরণের তাকীদ দিতে থাকে, অথচ আল্লাহ্ তা'আলা ওয়াদা করেছেন যে, "তিনি কেবল মুত্তাকীদের 'আমলই কবুল করবেন" ।[১]

ধনিকদের আর একটি দল তাদের কার্পণ্যের কারণেই ধন-দৌলতের হেফাজতের ধান্দায় মশগুল থাকে এবং এমন সব শারীরিক ও দৈহিক 'ইবাদত-বন্দেগীর প্রতি তারা আকৃষ্ট থাকে যার ভেতর সম্পদ ব্যয়ের কোন প্রয়োজন হয় না। যেমন দিনের বেলায় সিয়াম পালন, রাতের বেলা ইবাদত ও খতমে কুরআন। তারা প্রতারণা ও প্রবঞ্চনায় লিপ্ত এজন্য যে, ধ্বংসাত্মক কার্পণ্যই তাদের অন্তর-রাজ্যের অভিভাবক সেজেছে। এটি দূর করবার জন্য অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন, অথচ তারা এমন সব 'আমলে মশগুল রয়েছে যাতে অর্থ ব্যয়ের কোন প্রয়োজনই নেই। এর উদাহরণ হ'ল, এক ব্যক্তির কাপড়ের ভেতরে সাপ ঢুকে পড়েছে, যার ফলে তার জীবন বিপন্ন, অথচ সেদিকে তার লক্ষ্য নেই; সে সুকানজাবীন[২] তৈরীতে ব্যস্ত যা খেয়ে তার পিত্ত আরাম পেতে পারে। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, সাপের দংশনে সে মারা যেতে বসেছে,

---

১. ইহ্'য়াউ'ল-'উলূমুদ্দীন, ৩৫১-৩৫২ পৃ.।
২. অম্লরসের সঙ্গে মধু বা চিনি সহযোগে প্রস্তুত রুচিকর উপকরণ বিশেষ।

এমতাবস্থায় সুকানজাবীনের তার কোন দরকারই নেই। সূফী বাশার হাফীকে কেউ বলেছিল, "অমুক ধনী ব্যক্তি খুব বেশী বেশী রোযা রাখে এবং নামায পড়ে।" তিনি বললেন ঃ বেচারা নিজের কাজ ছেড়ে অন্যের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। তার পক্ষে এটাই সমীচীন ছিল যে, সে ক্ষুধার্তকে অন্ন দান করবে, নিঃস্ব মিস্‌কীনের জন্য ব্যয় করবে। বেশি বেশি (নফল) নামায পড়ার চেয়ে সেটাই ছিল উত্তম। তা না করে সে একদিকে দুনিয়ার সম্পদ লুণ্ঠনে ব্যস্ত রয়েছে, অন্যদিকে দরিদ্রকে তার প্রাপ্য হক থেকে বঞ্চিত করছে।[১]

সাধারণ লোকের ব্যাধি ও আত্মপ্রতারণার কথা উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন ঃ

ধনিক ও সাধারণ দরিদ্র শ্রেণীর ভেতর কিছু লোক এমন আছে যারা ওয়া'জ-নসীহতের মজলিস ও মাহফিলে যোগদানের ব্যাপারে ধোঁকায় রয়েছে। তাদের বিশ্বাস, কেবল ধর্মীয় মাহফিলে অংশ গ্রহণ করাটাই যথেষ্ট। এটাকে তারা রোজকার অভ্যাসে পরিণত করে নিয়েছে। তারা মনে করে যে, 'আমল ও ধর্মীয় উপদেশ অনুসরণ ছাড়াই কেবল ওয়া'জ মাহ্‌ফিলে শরীক হয়েই ছওয়াব অর্জন করা যায়। অথচ ওয়া'জ-মাহ্‌ফিলের উদ্দেশ্য হ'ল, এ থেকে ভাল ও উত্তম কর্মের অনুপ্রেরণা লাভ। যদি এ থেকে ভাল ও উত্তম কর্মের অনুপ্রেরণা না পাওয়া যায় তাহলে এতে কোনই কল্যাণ নেই। উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার প্রয়োজন এজন্য যে, এটা কর্মের শক্তি যোগায়। যদি এটা কর্মের শক্তি না যোগায় তাহলে এর মধ্যেও কোন কল্যাণ নেই। কখনো কখনো তারা ওয়ায়েজীনের মুখে ওয়া'জ-মাহ্‌ফিল ও আল্লাহ্‌র দরবারে কান্নাকাটির ফযীলত শুনে প্রতারিত হয় এবং মেয়েদের মত অঝোরে কাঁদতে থাকে। তাদের চক্ষু থেকে অবিরাম অশ্রু বর্ষিত হতে থাকে। কিন্তু তাদের মধ্যে সুদৃঢ় ইচ্ছা শক্তি ও মনোবল জাগ্রত হয় না। কখনো কখনো তারা ভয়াবহ ও ভীতিকর বর্ণনা শোনার পর বুক ফাটা বিলাপ করে বলতে থাকে ঃ ইলাহী, তওবা করছি। হে খোদা ! তোমার আশ্রয় ভিক্ষা চাচ্ছি। এসব করেই তারা ভাবে, এতেই বুঝি হক আদায় হয়ে গেছে! না, হক আদায় হয়নি, বরং তারা ধোঁকার মধ্যে রয়েছে। তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে সেই অসুস্থ রোগীর ন্যায় যে কোন চিকিৎসকের চিকিৎসাকেন্দ্রে গিয়ে বসে থাকে এবং শুধু প্রেসক্রিপশনের (ব্যবস্থাপত্রের) কথা শোনে, কিন্তু ঔষধ খায় না। এই রোগী কখনো আরোগ্য লাভ করতে পারে না। যেমন একজন ক্ষুধার্ত মানুষ শুধু সুস্বাদু খাবারের তালিকাসূচী শ্রবণে তার

১. ইহ্‌'য়া, ৩য় খণ্ড, ৩৫২ পৃ.।

ক্ষুধা নিবৃত্তি করতে পারে না, ঠিক তেমনি শুধু বিবিধ 'আমলের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও বিস্তারিত বিবরণ শ্রবণ আল্লাহ্র দরবারে কোন কাজে আসবে না। যে ওয়া'জ তোমার ভেতর কোন পরিবর্তন আনতে পারে না এবং দুনিয়ার প্রতি তোমার অনাসক্তি ও নিস্পৃহতা সৃষ্টি করতে পারে না, সে ওয়া'জ তোমার জন্য বিপদ এবং এটা তোমার বিরুদ্ধে একটি দলীল হয়ে দাঁড়াবে। তোমরা যদি মিছামিছি কেবল ওয়া'জকেই নাজাতের ওসীলা ও ক্ষমা লাভের মাধ্যম মনে কর তাহলে তোমরা বিরাট বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছ।[১]

একটি সংস্কার ও প্রশিক্ষণমূলক গ্রন্থ

ইহ্'য়াউ'ল-'উলূম কেবল একটি সমালোচনামূলক গ্রন্থই নয়, তা সংস্কার ও প্রশিক্ষণের একটি পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থও বটে। গ্রন্থকার এটাকে এমনভাবে রচনা করেছেন, যা একজন সত্য সন্ধানীর জন্য তার নিজের সংস্কার ও প্রশিক্ষণ এবং অন্যদের তা'লীম ও তাবলীগের ক্ষেত্রে একাই যথেষ্ট। এটি একটি বিরাট ও বিস্তৃত গ্রন্থাগারের অভাব অনেকটা মেটাতে পারে এবং ধর্মীয় জীবনের কার্যকর সংবিধান হিসাবেও ব্যবহৃত হতে পারে। এটাকে 'আকাইদ[২] ও ফিক্'হ, তাযকিয়ায়ে নফ্স ও চারিত্রিক সভ্যতা ও তাসাওউফ– এই তিনটি শাখার পূর্ণাঙ্গ সংকলন বলা যেতে পারে। এই গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য ও সুস্পষ্ট গুণ হ'ল এর প্রভাব। মাওলানা শিবলী (র)-এর ব্যক্ত এই প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে হাযার হাযার পাঠক একমত হবেন যে, "ইহয়াউ'ল'উলূম"-এর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হ'ল, তা পাঠকের অন্তর-মানসের ওপর অত্যাশ্চর্য প্রভাব বিস্তার করে। এর প্রতিটি বাক্য ছবির মত অন্তরে গেঁথে যায়, প্রতিটি কথা যাদুর ন্যায় প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং প্রতিটি শব্দেরই যেন এক একটি পৃথক কম্পন রয়েছে। এর সবচেয়ে বড় কারণ হ'ল, এই গ্রন্থ যে যুগে লেখা হয়েছিল সে যুগে ইমাম নিজেই প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার নেশায় মত্ত ছিলেন।[৩] গ্রন্থকারের ঐ অবস্থার (যা সেই সফর ও গ্রন্থ প্রণয়নের যুগে তাঁর ওপর বিরাজ করছিল এবং যদ্দ্বারা এই গ্রন্থ প্রভাবিত হয়েছে) প্রভাবেই পাঠক কোন কোন মুহূর্তে অনুভব করেন যে, তার অন্তর–মন দুনিয়া থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। কোন কোন সময় যুহ্দ ও তাকাশুফ-এর একটি ভীষণ প্রতিক্রিয়া এই হয় যে, তখন যেন ভয়-ভীতি ও ত্রাসের একটি দুর্গম প্রান্তর পাড়ি দিতে হয়, যা কখনো কখনো স্বাস্থ্য ও কাজকর্মের ওপরও প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি

১. ইহ্ইয়া-ই'উলূমুদ্দীন, ৩য় খণ্ড, ৩৫২ পৃ. ;
২. ইমাম গাযালী শাফি'ঈ মযহাবের অনুসারী ছিলেন এবং সে যুগে শাফি'ঈ ফিকহ্-এর জোর ছিল তুঙ্গে। এজন্য এই গ্রন্থে তিনি শাফি'ঈ ফিক্হ্ এখতিয়ার করেছিলেন।; ৩. আল-গাযালী, ৩৩ পৃ. ;

করে। এটা তারই পরিণতি যে, স্বয়ং গ্রন্থকারের ওপর এই গ্রন্থ প্রণয়নের যুগে ভীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। এজন্য বহু মাশায়েখ প্রাথমিক দীক্ষা গ্রহণকারীদের এই কিতাব অধ্যয়নের পরামর্শ দিতেন না। পরিপূর্ণ ভারসাম্য ও সঠিক মধ্যবর্তী অবস্থার সাক্ষাত তো কেবল রসূল আকরাম (সা)-এর সীরাত ও হাদীছ সংকলনের অধ্যয়ন এবং কোন পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ নমুনার সাহচর্য ও প্রশিক্ষণ দ্বারাই লাভ করা যেতে পারে।

ইহ্‌'য়াউ'ল-'উলূম ও চরিত্র দর্শন

ইমাম গাযালী (র) একাধারে ছিলেন উঁচু দরের ফক'ীহ্‌, মুজতাহিদ, মুতাকাল্লিম, কামিল সূফী, ইসলামী আখলাক ও চরিত্র-দর্শনের নামকরা লেখক, সূক্ষ্মদর্শী ও সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ও মনস্তাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞ। ইসলামী আখলাক ও চরিত্র-দর্শনের কোন ইতিহাস তাঁর আলোচনা ব্যতিরেকে পরিপূর্ণ হতে পারে না।[১] ইহ্‌'য়াউ'ল-'উলূম উল্লিখিত বিষয়ের ওপর তাঁর একটি কৃতিত্বপূর্ণ অবদান। অন্তরের ব্যাধি ও মানসিক অবস্থার ওপর তিনি যা কিছু লিখেছেন তা তাঁর সূক্ষ্মদৃষ্টি ও সুস্থ চিন্তারই বহিঃপ্রকাশ। এখানে আরও একটি নমুনা পেশ করা হচ্ছে।

মর্যাদা প্রীতি

ইহ্‌'য়াউ'ল-'উলূম গ্রন্থে بيان سبب كون الجاه محبوباً بالطبع حتى لا يخلو عنه قلب الا بشديد المجاهدة ('উচ্চ পদমর্যাদা লাভের প্রতি মানুষ স্বভাবতই এত মোহাবিষ্ট যে, কঠোর সাধনা ব্যতিরেকে এ থেকে অন্তরকে মুক্ত ও পবিত্র রাখা যায় না) শীর্ষক শিরোনামে ইমাম গাযালী (র) লিখেছেন ঃ

> জানা দরকার যে, যে কারণে স্বর্ণ-রৌপ্য ও ধন-সম্পদ মানুষের নিকট প্রিয়, ঠিক সে কারণেই উচ্চ পদ-মর্যাদাও তার নিকট প্রিয়। এটা জানা কথা যে, স্বর্ণ কিংবা রৌপ্য মুদ্রার নিজস্ব কোন আকর্ষণ বা মৌলিকত্ব নেই। এটাকে না খাওয়া যায়, আর না পান করা যায়। এটাকে যেমন বিয়ে-শাদী করা যায় না, তেমনি পরিধানও করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে নিজস্ব সত্তার দিক দিয়ে মুদ্রা একটি চাক্‌তি ছাড়া কিছু নয়। স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার প্রতি মানুষের আকর্ষণ শুধু

১. ড. মুহাম্মাদ ইউসুফ মুসা, উস্তায, কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়-এর তারীখু'ল-আখলাক ও ফালসাফাতু'ল-আখলাক ওয়া সালাতুহা বি'ল-ফালসাফাতু'ল-আফরীকি'য়্যার লেখক।

এজন্য যে, এর দ্বারা কাম্য বস্তুসামগ্রী লাভ করা যায়। অন্য কথায়, এটা মনের বাসনা পূরণের একটি হাতিয়ার। ঠিক একই ব্যাপার উচ্চ পদমর্যাদার ক্ষেত্রেও। উচ্চ পদমর্যাদা মানুষের অন্তর-রাজ্য জয়ের অপর নাম। যেভাবে স্বর্ণ-রৌপ্যের মালিকানা এতখানি শক্তি প্রদান করে যদ্দ্বারা মানুষ তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হাসিল করতে পারে, ঠিক তেমনি উচ্চ পদমর্যাদা দ্বারা আল্লাহ্‌র বান্দাদের অন্তর-মন জয় করে মানুষ তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হাসিল করতে পারে। এ কারণেই স্বর্ণ-রৌপ্য ও উচ্চ পদ মানুষের এত প্রিয়।

জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে সমতুল্য হওয়া সত্ত্বেও যে কয়েকটি কারণে ধন-সম্পদের ওপর উচ্চপদের অগ্রাধিকার রয়েছে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণ তিনটি ঃ প্রথম কারণ হ'ল, উচ্চপদের সাহায্যে ধন-সম্পদ পর্যন্ত পৌঁছুনো ধন-সম্পদের সাহায্যে উচ্চ পদ পর্যন্ত পৌঁছুনোর তুলনায় সহজ। এটা তো পরিষ্কার কথা যে, একজন 'আলিম কিংবা যাহিদ যিনি জনগণের অন্তরে শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত, তিনি যদি সম্পদ লাভ করতে চান তাহলে তার জন্য সেটা মোটেই কষ্টসাধ্য নয়। কেননা টাকা-পয়সা ও ধন-দৌলত মানব মনের অধীনস্থ হয়ে থাকে। এখন মানব-মন যদি কারো অধীনস্থ্ হয়ে যায় তাহলে মানুষের ধন-সম্পদও তারই অধীনস্থ্ হয়ে পড়বে, মানুষ তাদের ধন-দৌলতও ঐ ব্যক্তির পায়ের ওপর ঢেলে দেবে। এর বিপরীতে একজন স্বল্প সম্মান ও স্বল্প মর্যাদার অধিকারী অথবা নীচ পর্যায়ের ব্যক্তি, যার মধ্যে পরিপূর্ণতার কোন গুণই নেই, হঠাৎ যদি কোন ধন-ভাণ্ডারের অধিকারী হয় এবং সে ধন-ভাণ্ডারের সাহায্যে উচ্চপদ পর্যন্ত পৌঁছুতে চায় তাহলে তার পক্ষে তা সম্ভব হবে না। কারণ উচ্চপদ বিত্ত-সম্পদের হাতিয়ার ও মাধ্যম। যে উচ্চপদের অধিকারী—সে অতি সহজে বিত্ত-সম্পদেরও মালিক হতে পারে, কিন্তু যে বিত্ত-সম্পদের মালিক সে সর্বাবস্থায় উচ্চপদের অধিকারী হতে পারে না। আর এজন্যই উচ্চপদ বিত্ত-সম্পদের চেয়েও প্রিয় বস্তু। দ্বিতীয় কারণ এই যে, বিত্ত-সম্পদের জন্য সর্বদাই বিপদের আশংকা থাকে, না জানি কখন আবার তা পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, চুরি অথবা ছিনতাই হয়ে যায়। বাদশাহ্ ও অত্যাচারী জালিমরা এর প্রতি শ্যেন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। বিত্ত-সম্পদের জন্য মুহাফিজ, পাহারাদার ও সুরক্ষিত সিন্দুকের প্রয়োজন। এরপরও তার জন্য হাযারো কিসিমের বিপদ রয়ে গেছে। অপরদিকে মানুষের অন্তর যখন কোন ব্যক্তির গোলামে পরিণত হয় তখন সে ব্যক্তির কোন বিপদ থাকে না। বস্তুত তখন সে নিরাপদ ও সুরক্ষিত ধন-ভাণ্ডারে পরিণত হয়। চোর, ডাকাত ও দুষ্কৃতিকারীদের

অন্যায় হস্তক্ষেপ থেকে সে মুক্ত। মালিকানাধীন বস্তুর মধ্যে সবচেয়ে নিরাপদ হচ্ছে জমি ও স্থাবর সম্পত্তি। কিন্তু এর ওপরও ছিনতাই তথা জোরপূর্বক দখল ও নিপীড়নমূলক কর্মকাণ্ডের বিপদ রয়ে গেছে। তাই হেফাজত ও পাহারার ব্যবস্থা তার জন্য প্রয়োজন। কিন্তু অন্তরের সম্পদ আপনাআপনি নিরাপদ ও সুরক্ষিত, এটা কারো হাতে চুরি কিংবা ছিনতাই হবার ভয় নেই। হ্যাঁ, অন্তরের ওপর অল্প-বিস্তর জোর-যবরদস্তি করা যায়, যার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি রয়েছে–তার সম্পর্কে খারাপ ধারণার সৃষ্টি করা যায়। তবে এমনটি করা সবার জন্য মোটেই সহজসাধ্য নয়।

তৃতীয় কারণ এই যে, অন্তরের মালিকানার মধ্যে ক্রমশ পরিবর্ধন হতে থাকে। এজন্য কোনরূপ পরিশ্রম ও সহিষ্ণুতার প্রয়োজন নেই। বস্তুত যখন কেউ কোন ব্যক্তির 'ইল্‌ম কিংবা 'আমলের কারণে তার ভক্তে কিংবা অনুরক্তে পরিণত হয় তখন সে তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে। সে অন্যের নিকটও এ নিয়ে আলোচনা করে। ফলে নতুন নতুন অন্তর ঐ ব্যক্তির কাছে বন্দী হতে থাকে। এ কারণেই মানুষ স্বাভাবিকভাবে খ্যাতি ও যশের প্রতি আকৃষ্ট থাকে। এর বিপরীতে যে যতটা সম্পদের মালিক সম্ভবত সে ততটারই মালিক থাকে। কঠোর মেহনত ও কষ্ট-সহিষ্ণুতা ছাড়া ঐ সম্পদ বাড়ে না, কেউ বাড়াতে পারে না। কিন্তু উচ্চপদ নিজে নিজে এবং আপনাআপনি বাড়তে থাকে। আর এর কোন সীমা-সরহদও নেই। ধন-সম্পদ একই অবস্থায় থেমে থাকে। কিন্তু উচ্চ পদ-মর্যাদা ফলে-ফুলে বিকশিত ও সুশোভিত হতে থাকে! এজন্যেই উচ্চপদের ক্ষেত্রে যখন ব্যাপ্তি ঘটে এবং লোক যখন কোন ব্যক্তির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে তখন ধন-সম্পদ তার দৃষ্টিতে মূল্যহীন প্রতিভাত হয়। সংক্ষেপে এগুলোই হ'ল অর্থ-বিত্তের ওপর উচ্চ পদের অগ্রাধিকার পাবার উল্লেখযোগ্য কারণ।

যদি কেউ বলে যে, এই বক্তৃতার ফল তো এই যে, মানুষের উচ্চপদ ও ধন-সম্পদের প্রতি ততটা আকর্ষণ থাকা দরকার যতটা তার আরাম-আয়েশ এনে দেবে এবং দুঃখ-কষ্ট দূর করবে। আর বিত্ত-সম্পদ ও উচ্চপদ হ'ল প্রিয়তম বস্তু লাভের মাধ্যম এবং প্রিয়তম বস্তু লাভের মাধ্যম বা উপায়ও প্রিয় হয়ে থাকে! কিন্তু এর কি কারণ যে, ব্যাপারটি এখানেই শেষ হয়ে যায় না। মানুষ বিত্ত-সম্পদ পুঞ্জীভূত করা, ধন-ভাণ্ডারের পর ধন-ভাণ্ডার এবং সঞ্চয়ের পাহাড় সৃষ্টিতে ব্যস্ত থাকে ! এমন কি সে প্রয়োজনের সীমারেখাও অতিক্রম করে যায়। শেষাবধি তার অবস্থা এমন হয় (যা হাদীছের ভাষায় বলা হয়েছে)

যে, যদি তার নিকট দু'টি স্বর্ণখনি থাকে তাহলে সে তৃতীয়টির আকাঙ্ক্ষী হয়। ঠিক তেমনি মানুষ উচ্চপদের বিস্তৃতি ও উন্নতির চিন্তায়ও মগ্ন থাকে এবং তার কামনা হয়, তার খ্যাতি সেই সব দূর-দূরান্তের দেশে ছড়িয়ে পড়ুক- যে সব দেশে কোনদিন তার পা ফেলারও সম্ভাবনা নেই ; সেখানকার অধিবাসীদের সাথে সাক্ষাতেরও কোন আশা নেই যে, তাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা দৃষ্টে অন্তর-মন তৃপ্তিতে ভরে উঠবে অথবা তারা তাদের ধন-সম্পদ তার জন্য ব্যয় করবে কিংবা তার কোন উদ্দেশ্য পূরণ করবে। এত সব জেনেশুনেও তার অন্তর কামনা করে যে, তার আলোচনা সব দেশেই হোক এবং সর্বত্রই সে উচ্চপদ লাভ করুক। বাহ্যত এটিকে একটি বোকামি বলেই মনে হয়। কেননা এটি এমন একটি জিনিসের কামনা যার পারলৌকিক জীবনে কানাকড়ি মূল্যও নেই। তাহলে এর কারণ ? জওয়াব হ'ল, আসলেই উচ্চপদের প্রতি আকর্ষণ মানুষের অন্তরের এমন একটি সাধারণ অবস্থা যার মূলোৎপাটন সম্ভব নয়। এর দু'টো কারণ রয়েছে ঃ একটি প্রকাশ্য যা সকলেই বুঝতে পারেন। অপরটি সূক্ষ্ম যা বড় কারণ, কিন্তু এত নাযুক যে, হাবা-গোবা তো দূরের কথা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারীও তা বুঝে উঠতে হিমসিম খেয়ে যান। কেননা এর সম্পর্ক মানুষের প্রবৃত্তি ও স্বভাবের এমন একটি বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে যার জ্ঞান খুবই সূক্ষ্ম এবং তা আয়ত্ত করতে পারেন তাঁরাই যাঁরা মানবীয় স্বভাব ও প্রকৃতির গভীরে ডুব মারতে পারেন।

প্রথম কারণটি হ'ল, মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই তার প্রিয়জন বা প্রিয় বস্তু সম্পর্কে কাল্পনিক ভীতি অনুভব করে এবং তার বিপদাপদ দূর করতে চায়।

عشق است وهزار بد گمانی .

মানুষের সারা বছরের জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীও যদি মওজুদ থাকে, তথাপি তাঁর আকাঙ্ক্ষা ও কামনা-বাসনার ফিরিস্তি থাকে অনেক দীর্ঘ। তার মনে ঘুরে ফিরে এই আশংকার উদয় হয়, না জানি, যে সম্পদ আপাতত প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট, তা যদি হঠাৎ খুইয়ে বসি অথবা তা যদি নষ্ট হয়ে যায় এবং অতিরিক্ত সম্পদের প্রয়োজন হয় তখন আমার দশা কী হবে ? যখন তার মনে এ ধরনের ধারণা আসে তখন সে দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনায় অস্থির হয়ে ওঠে। তাঁর অন্তরের দুঃসহ যাতনা কেবল তখনই দূরীভূত হতে পারে, যখন অপরাপর মালামাল মিলে যাবার কারণে সে এই ভেবে আশ্বস্ত হয় যে, যদি এই পয়লা মাল-সামান নষ্ট হয়ে যায় কিংবা এর ওপর কোন বিপদ ও বিপর্যয় আসে তাহলে প্রয়োজন পূরণের জন্য অন্য মালামাল তো মওজুদ

আছে। নিজ ব্যক্তিসত্তার প্রতি আকর্ষণ এবং জীবনের প্রতি ভালবাসার কারণে সে এই কাল্পনিক হিসাব কষে। নতুন নতুন সমস্যা ও বিপর্যয়ের সৃষ্টি হবে–এই কল্পিত আশংকায় সে শিহরিত হতে থাকে। কাজেই সে এই সব বিপদাশংকা দূরীভূত করবার উপায়-উপকরণ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে থাকে। আর তার দৃষ্টিতে এর সবচেয়ে বড় উপায়-উপকরণ হ'ল, ধন-সম্পদ এত বেশি হবে যে, যদি তার কোন অংশের ওপর ক্ষতির আশংকা দেখাও দেয় তবু অপরাংশ দ্বারা কাজ চালিয়ে নেওয়া যাবে। এই ভয় ও দুশ্চিন্তাই মানুষকে নির্দিষ্ট ধন-সম্পদের ওপর তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত হতে দেয় না এবং তা কোন সীমারেখাও মানে না, এমন কি এভাবে সে সারা দুনিয়াকে স্বীয় মালিকানাধীনে নিয়ে আসার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। এজন্যই রসূল (সা) বলেছেন, "দুটো লোভ এমন যে, তা কখনো পরিতৃপ্ত হয় না। তার একটি জ্ঞানের প্রতি লোভ, আর অপরটি ধন-সম্পদের প্রতি লোভ।" ঠিক একই কারণ দূর-দূরান্তের শহর ও অপরিচিত লোকের হৃদয় কন্দরে ভক্তি-শ্রদ্ধা ও প্রভাব-মাহাত্ম্য সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষার মধ্যে লুক্কায়িত। উচ্চপদের ক্ষেত্রেও মানুষ এই সব কাল্পনিক বিপদাশংকা করতে থাকে যা অনাগত দিনে দেখা দিতে পারে। হতে পারে যে, তাকে হয়ত তার দেশ থেকেই চিরবিদায় নিতে হবে অথবা অন্য দেশের লোক তার শহরে আসতে পারে এবং কোন না কোন কাজে তাদের তার প্রয়োজন হ'তে পারে। এসব চিন্তা-ভাবনার পর তার মন খুশীতে ভরে ওঠে এই ভেবে যে, ঐ সব দূর-দূরান্তের লোকদের মনেও তার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা কায়েম আছে যাদের দিয়ে কোনদিন তার পার্থিব উদ্দেশ্য হাসিল হতেও পারে।

দ্বিতীয় কারণটি আরও শক্তিশালী আর তা হ'ল এই যে, রূহ' হুক্‌মে রব্বানী বা আল্লাহ রাব্বু'ল-'আলামীনের একটি আদেশমাত্র। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ – قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ ط

হুকমে রব্বানী হবার অর্থ এই যে, তা কাশ্‌ফ জ্ঞানের রহস্য-ঘেরা বিষয়াবলীর একটি এবং তা প্রকাশ করবার অনুমতি নেই। স্বয়ং রসূল আকরাম (সা) ও এর হাকীকত প্রকাশ করেন নি। কিন্তু তার হাকীকতের জ্ঞান লাভ ব্যতিরেকেও তুমি এতটুকু জানতে পার যে, মানুষের অন্তরে পশুসুলভ গুণাবলীর (খানা-পিনা ও সঙ্গমের) প্রতি একটি ঝোঁক ও প্রবণতা আছে। একটি প্রবণতা (ইচ্ছা ও অভীপ্সা) আছে হিংস্র-পশুর গুণাবলীর–যেমন মারা, হত্যা ও কষ্ট দেওয়ার প্রতি; একটি শয়তানী গুণাবলীর–যেমন, ধোঁকা ও প্রতারণার প্রতি এবং অন্যটি রবূবিয়তের গুণাবলীর–যেমন শ্রেষ্ঠত্ব, মাহাত্ম্য, মর্যাদা ও অহংকারের প্রতি।

মানব হৃদয় বিভিন্ন মূলনীতি ও মৌলিক উপাদানে সমৃদ্ধ। এর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্র খুবই দীর্ঘ। হৃদয়ে হুকমে রব্বানীর যে অংশ রয়েছে তারই ভিত্তিতে মানুষের ভেতর রবুবিয়তের আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হয়। রবুবিয়ত কি? পরিপূর্ণতা ও চরমোৎকর্ষের (কামালিয়াতের) এমন একটি রূপ যা অন্যের করুণাধন্য হতে লজ্জাবোধ করে। এজন্যই পরিপূর্ণতা ও চরমোৎকর্ষ আল্লাহ্র গুণাবলীর অন্যতম। অতএব, স্বাভাবিকভাবেই তা মানুষেরও প্রিয়। পরিপূর্ণতা ও চরমোৎকর্ষ এই যে, অস্তিত্বের ক্ষেত্রে তা একক হবে ! আর তা এজন্য যে, অস্তিত্বের ক্ষেত্রে অন্য কারোর শরীকানা নিশ্চিতই একটি ত্রুটি। সূর্যের পূর্ণতা এই যে, অস্তিত্বের ক্ষেত্রে সে একক। যদি অন্য কোন সূর্য থাকত তাহলে সেটি এই সূর্যের পরিপূর্ণতার ক্ষেত্রে একটি কলংকই হ'ত। কেননা সূর্য হিসাবে শান ও মর্যাদার ক্ষেত্রে সে আর একক হ'ত না। আর অস্তিত্বের এককত্ব কেবল আল্লাহ্রই রয়েছে এজন্য যে, তাঁর সম্মুখে কারোর (সত্যিকার) কোন অস্তিত্ব নেই। তিনি ভিন্ন যা কিছু আছে তা তাঁর কুদরতের অপার বিস্ময় ও চমৎকারিত্ব, যা নিজ শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। সেসব তাঁরই শক্তির আশ্রয়ে টিকে আছে। তাহলে বাস্তবপক্ষে তাঁর সম্মুখে কারোর অস্তিত্বই নেই এজন্য যে, সহগামী ও সঙ্গীত্বের জন্য সম্মান ও মরতবার ক্ষেত্রে সাম্য জরুরী এবং মরতবার সাম্য পরিপূর্ণতা ও চরমোৎকর্ষের জন্য একটি ত্রুটি। পূর্ণ সেই যার সমমর্যাদাসম্পন্ন কেউ হবে না। সূর্যের আলোর তাপ বিশ্বজাহানে প্রতিটি বস্তুর অস্তিত্ব কুদরতের আলোকমালার উত্তাপের ফয়েয বা প্রভাব। এসবই অনুগত, কারোর আনুগত্য লাভের হকদার তারা নয়। অতএব, রবুবিয়তের শান ও মর্যাদা হ'ল অস্তিত্বের এককত্ব ও উপমাহীনতা। আর এরই নাম চরমোৎকর্ষ ও পূর্ণতা। প্রকৃতিগতভাবেও মানুষ এ ব্যাপারে খুবই আগ্রহী এবং মানুষ চায় যে, সেও পূর্ণতা ও চরমোৎকর্ষের ক্ষেত্রে উপমাহীন হোক। কতক সূফী বুযুর্গ বলেছেন যে, প্রত্যেক মানুষের অন্তরে সেই কথাটিই লুক্কায়িত যা ফির'আওন সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার ভাষায় বলেছিল, انا ربكم الاعلى "আমি তোমাদের মহান প্রভু।" কিন্তু সবার তো আর এ ধরনের মওকা মেলে না।[১] নফসের গোলামী ও দাসত্ব এজন্যই নফসের ওপর কষ্টকর এবং রবুবিয়ত এজন্যই প্রকৃতিগতভাবে সহজ ও উৎসাহব্যঞ্জক। এটি সেই রব্বানী সম্পর্কের কারণে যার দিকে قل الروح من امر ربى এর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে।

---

১. মওলানা রূম বর্ণনা করেছেন,

نفس ما راكمتر ازفرعون نيست + ليك او راعون ما راعون نيست

কিন্তু সে যখন পরিপূর্ণতার শীর্ষে উপনীত হতে ব্যর্থ হয় তখনও তার পরিপূর্ণতা লাভের খাহেশ একেবারে মিটে যায় না। তখনও সে পরিপূর্ণতা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা ও আশাবাদ পোষণ করে। এটা কামালিয়াত তথা পরিপূর্ণতা ব্যতিরেকে অন্য কোন উদ্দেশ্যের খাতিরে নয় (যা কামাল বা পূর্ণতার মাধ্যম), বরং নফসে কামাল-এর খাতিরে। দুনিয়ার বুকে যা বিদ্যমান তা তাঁর নিজ সত্তা ও সত্তার পরিপূর্ণতার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক রাখে। প্রত্যেকের কাছেই ধ্বংস ও বিলুপ্তি একেবারে না-পসন্দ (نا مرغوب)। এটা এজন্য যে, এতে স্বীয় সত্তা ও তার পরিপূর্ণ গুণাবলী ধ্বংস হবে বলে সে মনে করে। পরিপূর্ণ তো এটাই যা অস্তিত্বের ক্ষেত্রে একক এবং তামাম অস্তিত্বশীল জিনিসের ওপর যার প্রাধান্য ও শাসন-কর্তত্ব প্রতিষ্ঠিত। তোমার চরমতম পরিপূর্ণতা এই যে, অন্যের অস্তিত্ব তোমারই অবদান। যদি তা তোমার অবদান না হয়, তাহলে কমপক্ষে এতটা হবে যে, তুমি তার ওপর বিজয়ী হবে। এই প্রেক্ষিতে সকলের ওপর জয় লাভ করা মানুষের কাছে প্রকৃতিগতভাবেই প্রিয়। এটি পরিপূর্ণতা ও চরমোৎকর্ষের একটি রূপ। প্রতিটি অস্তিত্বশীল বস্তু যা স্বীয় সত্তার কাছে পরিচিত, তা স্বীয় সত্তার প্রেমিক এবং তার চরমোৎকর্ষেরও 'আশিক। এর অনুভূতির দ্বারা সে একটি মিষ্টি আমেজ লাভ করে। কোন বস্তুর ওপর জয় লাভের অর্থ এই যে, তুমি তার ওপর প্রভাব ফেলতে পারবে, স্বীয় বাসনা ও অভিপ্রায় মুতাবিক তার ভেতর পরিবর্তন ঘটাতে পারবে এবং আপন মর্জি মুতাবিক তা ব্যয় করতে পারবে। মানুষ তো এই চেয়েছিল যে, অস্তিত্বশীল সকল বস্তুর ওপর সে প্রাধান্য লাভ করবে। কিন্তু অস্তিত্বশীল বস্তুরাজির মধ্যে কিছু বস্তু এমন আছে যা কোন পরিবর্তন কবুল করে না ; যেমন আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলী। আর কতক অস্তিত্বশীল বস্তু এমন আছে যা পরিবর্তন কবুল করে, কিন্তু সে সবের ওপর সৃষ্ট জগতের কোন ক্ষমতা নেই এবং তার ওপর তাদের কোন জোর-যবরদস্তিও চলে না; যেমন আকাশমণ্ডল, তারকারাজি, ফেরেশ্‌তাকুল, জ্যোতিষ্কমণ্ডল, আত্মাসমূহ, জিন্ন ও শয়তান, পাহাড় ও সমুদ্র এবং সে সবের অভ্যন্তরস্থ বস্তুসকল। তৃতীয় প্রকার সেই সব বস্তু যার ভেতর মানুষ স্বীয় শক্তিতে পরিবর্তন আনতে পারে। যেমন, যমীন ও তার অংশসমূহ, খনিজ দ্রব্য, উদ্ভিদ, জীবকুল ইত্যাদি। অন্য এক প্রকারের বস্তু আছে যার ওপর মানুষ শক্তি রাখে না; যেমন ঐশী সত্তা, ফেরেশ্‌তামণ্ডলী, আকাশমণ্ডল তথা বিশ্ব-জাহান। মানুষের ভেতর ইচ্ছা জাগল যে, সে কমসে-কম আকাশমণ্ডলী সম্পর্কে অধিক থেকে অধিকতর জ্ঞান লাভ

করবে, আর তা এজন্য যে, এটাও এক ধরনের প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি লাভ। কেননা যার সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করা যায় সে জ্ঞান লাভকারীর কিছুটা অধীনস্থ হয়ে পড়ে। এই প্রেক্ষিতেও বিদ্বান ব্যক্তি এক ধরনের বিজয়ীর মর্যাদা রাখে (সে তার জ্ঞান দ্বারা শাসন কর্তৃত্বের আবেগ, প্রশাসন ও উঁচু শ্রেণীতে উন্নীত হবার আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করে)। এরই ভিত্তিতে আল্লাহ্র মা'রিফত, ফেরেশতামণ্ডলী, নভোমণ্ডল তথা বিশ্ব-জাহান, আকাশের তারকারাজি, অত্যাশ্চর্য বস্তুসমূহ, সপ্তাকাশ, গ্রহরাজি, সমুদ্রের বিস্ময়কর বস্তু ইত্যাদির জ্ঞান হাসিলের আগ্রহ মানুষের অন্তরে সৃষ্টি হয়। এজন্যই তোমরা দেখে থাকবে, যে ব্যক্তি কোন অত্যাশ্চর্য জিনিষ তৈরি করতে পারে না, সে অন্ততপক্ষে তার নির্মাণ কৌশল সম্পর্কে জানতে আগ্রহী (এর দ্বারাই সে তার শিল্প সৃষ্টির খাহেশকে পূরণ করে)। যে ব্যক্তি দাবার ছক তৈরি করিতে অক্ষম, সে কমপক্ষে দাবা খেলার নিয়ম-পদ্ধতি শিখতে চায় এবং এটা জানতে চায় যে, দাবার ছক কিভাবে বানানো হয়েছে। ব্যক্তি কোন জ্যামিতি কিংবা কারিগরী কৌশল অথবা ক্রেন-এর যন্ত্রপাতি দেখে এবং যখন অনুভব করে যে, সে এ সব তৈরিতে অক্ষম তখন সে এসব যন্ত্র কিভাবে বানানো হয় অন্তত তাই জানতে চায়। সে স্বীয় অক্ষমতার কারণেই তাকলীদ্ ও জ্ঞানের চরমোৎকর্ষের বাহ্যিক জ্ঞান দ্বারা প্রকৃত জ্ঞানের তৃপ্তি মেটাতে চায়।

দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞান যার ওপর মানুষ শক্তি ও সামর্থ্য (قدرت) লাভ করতে পারে তা হ'ল ভূমি সম্বন্ধীয় বিষয় প্রভৃতি। সে স্বভাবতই এসব বস্তুর ওপর এতটা প্রাধান্য এবং এতখানি শক্তি ও সামর্থ্য লাভ করতে চায় যেন এগুলোর মধ্যে আপন ইচ্ছা মাফিক তাসার্রুফ (تصرف) করতে পারে। এ আবার দু'প্রকার– যথা : দৈহিক ও আত্মিক। দৈহিক বস্তু হ'ল টাকা-পয়সা ও অন্যান্য উপায়-উপকরণ। মানুষ চায় যেন এসবের ব্যবহারে তার পরিপূর্ণ এখতিয়ার থাকে। এগুলো সে যাকে চাইবে দেবে, যাকে চাইবে না–দেবে না। এটাই হ'ল শক্তি আর শক্তি পরিপূর্ণতা চায় এবং পরিপূর্ণতা লাভ রবূবিয়তের গুণাবলীরই অন্যতম। আর রবূবিয়ত প্রকৃতিগতভাবেই সকলের প্রিয়। কাজে কাজেই ধন-সম্পদও সকলের প্রিয়, চাই কি তা পরিধানের হোক অথবা আহার্যের, স্বীয় কামনা-বাসনা পূরণ করবার জন্য কোনদিন তার প্রয়োজন পড়ুক অথবা না-ই পড়ুক। অগণিত দাসদাসী রাখা, স্বাধীন ও শরীফ মানুষদেরকে গোলামে পরিণত করা, চাই কি জোর-যবরদস্তির মাধ্যমে হোক অথবা প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে হোক– তার নিকট সমান প্রিয়। ভীতিজনক প্রভাব-প্রতিপত্তিও

মানুষের নিকট প্রিয় যার ভিত্তি হ'ল জোর-যবরদস্তি– এজন্য যে, এর ভেতরও শক্তির প্রকাশ ঘটে থাকে। দ্বিতীয় প্রকারের মানুষ, যাদের ধড়ে প্রাণ আছে, আছে হৃদয় আর এটি সারা দুনিয়ার সর্বাধিক মূল্যবান ও পবিত্র বস্তু– চায় যে, তার সেই মনের ওপর শক্তি ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হোক যাতে করে সকল মানুষ তার (ব্যক্তিত্বের মোহজালে) বন্দী হয়ে পড়ে এবং তারা তার ইশারায় কাজ করে। কেননা এর ভেতর প্রাধান্যের পূর্ণতা পাওয়া যায় এবং তা রবূবিয়তের গুণাবলীর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। ভালবাসা দিয়েই কেবল মানুষের মন জয় করা যায় এবং ভালবাসা পরিপূর্ণতা তথা কামালিয়াতের 'আকীদা-বিশ্বাস থেকেই সৃষ্টি হয়ে থাকে। সব কামালিয়াতই প্রিয় এবং পরিপূর্ণতা এজন্য প্রিয় যে, তা ঐশী গুণাবলীর অন্যতম। আর ঐশী গুণাবলী স্বভাবতই সকল মানুষের প্রিয়, আর তা এজন্য যে, মানুষের ভেতর একটি রব্বানী (ঐশী) সম্পর্ক পাওয়া যায়, আর এই সম্পর্ক অবিনশ্বর। মৃত্যু যেমন তাকে নিঃশেষ করতে পারে না, তেমনি মাটিও পারে না তাকে কাবু করতে। আর এই রব্বানী সম্পর্কই ঈমান ও মা'রিফতের রাজপ্রাসাদ। এটিই বাকা-ই ইলাহী পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে। অতএব, মানুষের মনের নিকট যে বস্তু স্বভাবতই প্রিয়–তাই পরিপূর্ণতা, চাই কি তা জ্ঞান ও বিদ্যার মাধ্যমেই হাসিল হোক, চাই কি স্বর্গীয় শক্তির সাহায্যে। মাল-মাত্তা ও উচ্চপদ প্রকৃতির উপকরণসমূহের প্রধান এজন্য যে, তা প্রেমাস্পদের ওসীলা ও প্রিয় হয়ে থাকে। জানার যেমন কোন শেষ নেই, তেমনি শক্তি-সামর্থ্যেরও কোন শেষ নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত এমন একটি বস্তুও পৃথিবীতে আছে যাকে জানা যেতে পারে এবং এমন একটি বস্তুও পৃথিবীতে আছে যার ওপর সর্বময় কর্তৃত্ব হাসিল করা যেতে পারে ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের আগ্রহ বা লিপ্সার কোন পরিতৃপ্তি আসে না। এজন্যই মহানবী (সা) বলেছেন : দু'জন লোভী কখনো তৃপ্ত হয় না।[১]

আত্মজিজ্ঞাসা

উক্ত গ্রন্থের প্রভাবমণ্ডিত অংশ সেইটি যেখানে ইমাম গাযালী (র) নসীহত, উৎসাহ প্রদান ও সতর্কীকরণের ওপর কলম ধরেন এবং দুনিয়ার অনিত্যতা, আখিরাতের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য, ঈমান ও সৎ কর্মের আবশ্যকতা, সংস্কার-সংশোধন ও আত্মার শুচি-শুভ্রতার গুরুত্ব এবং অন্তরের ব্যাধি ও প্রবৃত্তির ক্ষতিকর বিষয়াবলীর প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। এক্ষেত্রে তিনি একই সঙ্গে এমন

---

১. ইহ্'য়া' 'উলূমুদ্দীন, ৩য় খণ্ড, ২৪১-৪৪ পৃ.।

বিজ্ঞান ও অলংকারশাস্ত্রেরও নমুনা বটে। প্রতিটি যুগে হাযার হাযার মানুষ তাঁর ওয়া'জ ও কথামালা দ্বারা উপকৃত হয়েছে। তিনি অসংখ্য মানুষের সংস্কার ও মনো-বিপ্লবের মাধ্যম হয়েছেন। গ্রন্থের শেষ চতুর্থাংশে এ ধরনের জ্ঞানের যে বিরাট ভাণ্ডার রয়েছে তার একটি উদ্ধৃতি পেশ করা গেল। এখানে তিনি নফ্সকে সতর্ক করেছেন এবং অধ্যয়নকারীদেরকে তা'লীম দিয়েছেন কিভাবে তারা তার সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন, কিভাবে বলা উচিৎ এবং মনযিলে আখিরাতের জন্য কিভাবে তাকে তৈরি করা দরকার। المرابطه السادسة فى توبيخ النفس ومعاتبتها শিরোনামের অধীনে নফ্সের সঙ্গে কথোপকথন করতে গিয়ে এক স্থানে তিনি লিখেছেন ঃ

হে নফ্স ! একটুখানি ইনসাফ কর, যদি একজন ইয়াহূদীও তোমাকে বলে যে, অমুক সুস্বাদু খাবার তোমার জন্য ক্ষতিকর তাহলে তুমি সবর কর, তা পরিত্যাগ কর এবং তার খাতিরে কষ্টও স্বীকার কর। আম্বিয়ায়ে কিরামের বাণী যা মু'জিযা দ্বারা সমর্থিত অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ফরমান ও আসমানী সহীফাসমূহের নিবন্ধও কি তোমাকে সেই পরিমাণ প্রভাবান্বিত করে না– যে পরিমাণ প্রভাবান্বিত করে তোমাকে সেই ইয়াহূদীর অনুমাননির্ভর উক্তি যার মধ্যে বুদ্ধির স্বল্পতা ও জ্ঞানের কমতি পরিস্ফুট? আশ্চর্য যে, যদি একটা বাচ্চাও বলে যে, তোমার কাপড়ের ভেতর একটা বৃশ্চিক আছে, তখন দলীল-প্রমাণ না চেয়েই এবং চিন্তা-ভাবনা না করেই তুমি নিজের কাপড় খুলে ছূঁড়ে ফেলে দাও। তাহলে কি আম্বিয়া-ই-কিরাম, 'আলিম-'উলামা, আউলিয়া-দরবেশ ও বিজ্ঞ পণ্ডিতবর্গের সর্বসম্মত কথা তোমার কাছে ঐ শিশুটির কথার চেয়েও কম মর্যাদার দাবিদার ? তাহলে কি জাহান্নামের আগুন, তার শৃঙ্খলসমূহ, তার গুর্জ, তার শাস্তি, তার যক্কূম বৃক্ষ, তার জ্বলন্ত অঙ্গার, তার সাপ, বিচ্ছু ও বিষাক্ত সব জিনিস তোমার নিকট একটি বিচ্ছুর চেয়েও কম যন্ত্রণার, কম কষ্টের–যার কষ্ট বড় জোর একদিন কিংবা তার থেকেও কম সময় বিদ্যমান থাকে ? এটি বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়। যদি কোথাও ও কখনো চতুষ্পদ জন্তুগুলো তোমার অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারে তাহলে তোমাকে নিয়ে হাসবে এবং তোমার বুদ্ধিমত্তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে। হে নফ্স ! যদি তোমার এসব জানা থাকে এবং এ সবের ওপর তোমার ঈমান থাকে, তাহলে কি কারণে তুমি কর্মের ভেতর অলসতা ও দোটানা অবস্থার আশ্রয় নিচ্ছ ? অথচ মৃত্যু ওঁৎ পেতে তোমার অপেক্ষায় রয়েছে। সে তোমাকে এতটুকু অবকাশ না দিয়েই ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে। যদি এক শত বছরেরও অবকাশও মেলে তবু যাকে

একটি ঘাঁটি অতিক্রম করতে হবে সে যদি সেই ঘাঁটির উৎরাইয়ে নিশ্চিন্তে ও পরম আরামের সঙ্গে স্বীয় জানোয়ারগুলোকে ঘাস খাওয়ায় তাহলে কি সে কখনো সেই ঘাঁটি অতিক্রম করতে পারবে ? যদি তুমি এটা মনে কর তাহলে কি তুমি নাদান নও ? এরকম লোকের সম্পর্কে তোমার কী ধারণা—যে জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে বিদেশ ভ্রমণ করে, অথচ সেখানে বছরের পর বছর বেকার অবস্থায়ই কাটিয়ে দেয় এই ধারণায় যে, যে বছর দেশে ফিরবে, সব জ্ঞান ও বিদ্যা সে বছরই হাসিল করে নেবে ? তুমি নিশ্চয়ই তার বুদ্ধি দেখে হাসবে এবং তার এই ধারণার জন্য তাকে নিয়ে বিদ্রূপ করবে। কেননা জ্ঞান ও ধর্মোপলব্ধি এত স্বল্প সময়ে হাসিল হয় না। বিচারকের পদ জ্ঞান ও ধর্মোপলব্ধি ব্যতিরেকে কেবল তাওয়াক্কুলের বরকতেই পাকা আপেলের মত হাতে এসে পড়ে না। এতদ্‌সত্ত্বেও যদি এটা মেনে নেওয়া যায় যে, শেষ বয়সের চেষ্টা-সাধনা ফলপ্রসূ ও কল্যাণকর এবং তা বুলন্দ দর্জা পর্যন্ত মানুষকে পৌঁছিয়ে দেয়, তাহলে এটাও তো হতে পারে যে, এই আজকের দিনই তোমার জন্য শেষ দিন। অতএব, আজই তুমি কর্মে মশগুল হচ্ছ না কেন ? যদি আল্লাহ তা'আলা তোমাকে বাৎলেও দিয়ে থাকেন যে, তোমাকে অবকাশ দেওয়া হবে তাহলেও তো তাড়াতাড়ি করবার পথে তোমার জন্য কোন অন্তরায় থাকে না। আজ নয়—কাল, কাল নয়—পরশু করবারই বা কারণ কি ? এটাই কারণ হতে পারে যে, স্বীয় প্রবৃত্তির বিরোধিতা করা তোমার নিকট কষ্টকর মনে হয়। কেননা এতে কঠোর মেহনত রয়েছে। তুমি কি এমন কোন দিনের অপেক্ষায় রয়েছ যেদিন প্রবৃত্তির বিরোধিতা করা তোমার জন্য সহজ হয়ে যাবে ? এমন দিন আল্লাহ্ তা'আলা আদৌ সৃষ্টিই করেন নি, আর করবেনও না। যে কাজ তুমি আজ আনজাম দিতে পারনি, কাল সে কাজ আনজাম দেওয়া তোমার জন্য আরও কঠিন হবে। আর তা এজন্য যে, কামনা-বাসনার দৃষ্টান্ত একটি কাঁটাযুক্ত গাছের ন্যায় যাকে উপড়ে ফেলা মানুষ ফরয মনে করে। যদি কেউ তা উপড়ে ফেলতে ব্যর্থ হয় এবং সে যদি তা কালকের জন্য রেখে দেয় তাহলে তার উদাহরণ হবে সেই যুবকের ন্যায়-যে আজ একটি গাছ উপড়ে ফেলতে পারেনি এবং সে সেই কাজটি পরবর্তী বছরের জন্য তুলে রাখল, অথচ সে জানে যে, যত সময় যাবে—গাছ তত সুদৃঢ় হবে এবং তার শেকড় আরো বেশী মযবুত ও বিস্তৃত হতে থাকবে, অপরদিকে উৎপাটনকারীর কমযোরী ও দুর্বলতা বাড়তে থাকবে। আর এটাতো পরিষ্কার কথা যে, যৌবনে যে গাছকে উপড়ে ফেলা গেল না, বার্ধক্যে তাকে কোনমতেই উপড়ানো যাবে

না। কেননা বৃদ্ধ বয়সের ব্যায়াম ও পরিশ্রম খুবই কষ্টদায়ক হয়ে থাকে। সতেজ ও সবুজ শাখা-প্রশাখা নমনীয় হয়ে থাকে এবং তা অবনমিত করা যায়। যখন তা শুকিয়ে যায় এবং এই অবস্থায় কিছুকাল অতিবাহিত হয় তখন তাকে আর দুমড়ানো যায় না। অতএব, হে নফ্‌স ! তুমি যদি এই বাস্তবতা বিশ্বাস না কর তাহলে এর চেয়ে বড় বোকামি আর কি হতে পারে? তুমি এমন স্বাদ ও আনন্দ কেন তালাশ কর না যা সমস্ত ক্লেদ ও আবর্জনা থেকেও মুক্ত ও পবিত্র এবং যা চিরদিনের জন্য তোমার আনন্দ ডেকে আনবে ? কেবল ফুর্তি ও মজা লুটবে, এটাই যদি তোমার কাছে পসন্দীয় হয়ে থাকে তাহলে তার খাতিরেও তো তোমাকে তোমার নফসের সাময়িক ও আপাত কামনা-বাসনার বিরোধিতাই করা উচিৎ। আর তা এজন্য যে, অনেক সময় একটি মাত্র লুকমা কয়েকটি লুকমা থেকে মানুষকে মাহরূম করে দেয়। সেই রোগী সম্পর্কে তোমার কী ধারণা যাকে চিকিৎসক কেবল তিন দিনের জন্য ঠাণ্ডা পানি পান থেকে বিরত থাকতে বলেছে যাতে করে সে লুপ্ত স্বাস্থ্য ফিরে পেয়ে সারা জীবন ঠাণ্ডা পানির স্বাদ ভোগ করার সুযোগ পায় ? চিকিৎসক তাকে এই মর্মে সতর্ক করে দিয়েছে যে, শরীরের এমত অবস্থায় ঠাণ্ডা পানি পান তার জন্য ভীষণ ক্ষতিকর। কিন্তু সে যদি সতর্কবাণীতে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে এবং পানি পান অব্যাহত রাখে তাহলে কি তাকে জীবন ভর ঠাণ্ডা পানি পানের আশা পরিত্যাগ করতে হবে না ? সত্যি করে বল, এক্ষেত্রে বুদ্ধির দাবি কি ? বুদ্ধির দাবি নিশ্চয়ই এই যে, তিন দিন সবর তাকে করাই উচিৎ যাতে করে সারাটা জীবন সে আরামে কাটাতে পারে। গোটা জীবনের মুকাবিলায় তিনদিনের যেমন কোন গুরুত্বই নেই–ঠিক তেমনি অনন্ত জীবনের তুলনায় তোমার গোটা জীবনেরও কোন হাকীকত নেই। তোমার জৈবিক প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনা থেকে সংযত হবার কষ্ট কি জাহান্নামের অগ্নি-শাস্তি অপেক্ষা অধিক কষ্টকর ও দীর্ঘ ? যে ব্যক্তি মামুলী কষ্টও বরদাশ্‌ত করতে পারে না–সে আল্লাহ্‌র শাস্তি কিভাবে বরদাশ্‌ত করবে ? আমি দেখতে পাচ্ছি যে, তুমি দু'টি কারণে স্বীয় সত্তাকে অবকাশ দাও। একটি কারণ (১) কুফ্‌রে খফী (প্রচ্ছন্ন ও পরোক্ষ কুফ্‌র), আর অপরটি (২) সুস্পষ্ট বোকামি। কুফ্‌রে খফী এই যে, হিসাব-নিকাশ দিবসের ওপর তোমার ঈমান কমযোর এবং পুরস্কার ও শাস্তি সম্পর্কে তুমি অনবহিত। আর সুস্পষ্ট বোকামি আল্লাহ্‌র গুপ্ত কর্মধারা ও তার গোপন রহস্য সম্পর্কে কোনরূপ ধারণা ব্যতিরেকেই তাঁর ক্ষমা ও বদান্যতার ওপর তোমার আস্থা। অপরদিকে তুমি রুটির একটি টুক্‌রা, গমের একটি দানা

এবং মুখ থেকে বহির্গত একটি বাক্যের জন্যে আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করবার জন্য তৈরি হও না, বরং তা লাভ করবার জন্য হাযারো যত্ন কর এবং এই মূর্খতা ও অজ্ঞতার কারণে তুমি মহানবী (সা)-এর সেই বাণীর লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হও :

الكيس من دان نفسه لما بعد الموت والاحمق من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامانى .

"সতর্ক ও বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি যে স্বীয় নফ্‌সকে আত্মজিজ্ঞাসার সম্মুখীন করে এবং মৃত্যুপরবর্তী যিন্দেগীর জন্য 'আমল করে এবং আহম্মক সেই ব্যক্তি যে স্বীয় নফ্‌সকে আপন প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনার পশ্চাদ্বর্তী করে এবং আল্লাহ্‌র ওপর আশায় বুক বাঁধে।"

আফসোস ! ওহে নফ্‌স, জীবনের ফাঁদ সম্পর্কে তোমার হুঁশিয়ার থাকা উচিৎ ছিল। শয়তানের প্রতারণা সম্পর্কে তোমার নিজের প্রতি তোমার করুণা দৃষ্টি রাখা উচিত। তোমাকে নিজের সম্পর্কেই চিন্তা-ভাবনা করতে আদেশ দেওয়া হয়েছে। দেখ, তুমি নিজের সময় নষ্ট কর না। তোমার কাছে হাতে গোণা শ্বাস-প্রশ্বাস রয়েছে। যদি তোমার একটি নিঃশ্বাসও বৃথা নষ্ট হয় তাহলে তোমার জীবনের মোট পুঁজির একটা অংশই নষ্ট হয়ে গেল। অতএব, রুগ্ন হবার আগে স্বাস্থ্যকে, ব্যস্ততার পূর্বে অবকাশকে, দারিদ্র্যের পূর্বে ধন-সম্পদকে, বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকে এবং মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে মূল্যবান সম্পদ মনে কর। তুমি পারলৌকিক জীবনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর এই ভেবে যে, তোমাকে সেখানে চিরদিন থাকতে হবে। ওহে নফ্‌স ! যখন শীতকাল মাথার ওপর এসে হাযির হয় তখন তুমি কি সেই গোটা মুদ্দতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর না ? প্রয়োজনীয় খাদ্য, পোশাক ও জ্বালানি কি সংগ্রহ কর না ? তুমি তো এই ভরসায় থাক না যে, কেবল সুতির আচ্‌কান গায়ে চাপিয়ে জ্বালানি ব্যতিরেকেই শীতকালটা কাটিয়ে দেবে। তোমাদের কি ধারণা যে, জাহান্নামের ভীষণ শীত পার্থিব শীতের চাইতে কম ভয়াবহ ? বাস্তব ঘটনা কিন্তু তা নয়। তীব্রতা ও ঠাণ্ডার দিক দিয়ে জাহান্নামের শীতের সাথে পার্থিব শীতের কোন তুলনাই হয় না। তুমি কি মনে কর যে, কোনরূপ চেষ্টা-তদবীর ছাড়াই তুমি তার হাত থেকে নাজাত পেয়ে যাবে ? যেমনি পশমী কাপড়, চাদর, আগুন ও এমনি ধরনের অন্যান্য জিনিস ব্যতিরেকে শীত যায় না, ঠিক তেমনি জাহান্নামের ঠাণ্ডাকেও তওহীদের দুর্গ ও (আল্লাহ্‌র) আনুগত্যের পরিখা ব্যতিরেকে প্রতিরোধ করা যায় না। আল্লাহ্ তা'আলার দান এই যে, তিনি

তোমাকে হেফাজতের পন্থা ও কৌশল সম্পর্কে অবহিত রেখেছেন এবং তার উপায়-উপকরণও সহজ করে দিয়েছেন। এই বিশ্বের বুকে আল্লাহ্‌র বিধানই হ'ল, তিনি শীত সৃষ্টি করেন, আবার তার জন্য আগুনও পয়দা করেন, আর চকমক পাথর ঠুকে আগুন বের করার তরীকাও বাৎলে দেন যাতে তুমি সেই পথে ফায়দা হাসিল কর এবং নিজেকে ঠাণ্ডার হাত থেকে রক্ষা করতে পার। লাকড়ি খরিদ করা, পশমী কাপড় সংগ্রহ করা যেমন আল্লাহ্‌র প্রয়োজন নয়, বরং মানুষেরই প্রয়োজন, ঠিক তেমনি মানুষের আনুগত্য ও 'ইবাদতেরও আল্লাহ্‌র কোন প্রয়োজন নেই। এটা তোমাদের কর্তব্য তার ওসীলায় নাজাত লাভ করা।

وَمَنْ اَحْسَنَ فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَاللّٰهُ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ .

"যে ভাল কাজ করল সে তার নিজের জন্যই করল, আর যে খারাপ কাজ করল তার বোঝা তার ওপরই পড়ল। আল্লাহ্ সমগ্র সৃষ্টি জগত থেকে বেপরোয়া।"

ওহে নফ্‌স ! অজ্ঞতা ও মূর্খতার পর্দা ছিঁড়ে ফেল এবং পারলৌকিক জীবন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা কর। مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ .

"তোমাদের সৃষ্টি, তোমাদের উত্থান একটি জীবনের মতই।"

كَمَا بَدَاْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهٗ .

"যেমন আমি প্রথমবার পয়দা করেছিলাম, তেমনি আমি এর পুনরাবৃত্তি ঘটাই।" كَمَا بَدَاَكُمْ تَعُوْدُوْنَ "যেমন তিনি তোমাদেরকে প্রথমে পয়দা করেছিলেন– ঠিক তেমনি আবার তোমরা (তাঁর দরবারে) প্রত্যাবর্তন করবে।"[১]

ইহ্‌য়াউ'ল-'উলূমুদ্দীন-এর সমালোচনা

শায়খুল ইসলাম ইব্‌ন তায়মিয়া (র) সামগ্রিকভাবে ইহ্‌য়াউ'ল-'উলূম গ্রন্থের প্রশংসা করেছেন। তিনি লিখেছেন, كلامه فى الاحياء غالبه جيد ইহ্‌য়া গ্রন্থে তাঁর কালাম (বাণী) প্রধানত সুন্দর ও অর্থপূর্ণ।[২] তিনি চারটি দৃষ্টিকোণ থেকে এই গ্রন্থের ওপর আলোচনা করেছেন। প্রথমত, দার্শনিকদের অনেক কথা-তওহীদ, নবূওত ও আখিরাত সম্পর্কে তাঁদের ধ্যান-ধারণা এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অবশ্য

১. ইহ্‌য়া' 'উলূমুদ্দীন, ৪র্থ খণ্ড, ৩৫৬–৩৫৮ পৃ.।

২. ফাতাওয়া শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া (র)।

তাঁর মতে, ইমাম গাযালী (র) দার্শনিকদের প্রভাব থেকে কিছু না কিছু প্রভাবান্বিত হয়েছেন। তিনি যদিও তাঁদের বিরাট সমালোচক ও বিরোধী, কিন্তু তাঁর (গাযালীর) গ্রন্থগুলোতে তাদের ধ্যান-ধারণার (অজ্ঞাতসারে) ঝলক কোথাও কোথাও এসে গেছে। শায়খুল ইসলাম ইব্‌নে তায়মিয়া (র)-এর অনুভূতি দর্শনশাস্ত্র ও দার্শনিকদের সম্পর্কে যেহেতু খুবই তীক্ষ্ণ, তাই তাঁর মাপকাঠিতে ইমাম গাযালীর কতক জিনিস যদি দর্শনশাস্ত্র দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েই থাকে তবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। দ্বিতীয়ত, এতে এমন কতকগুলো কালাম সম্পর্কিত বাহাছ-মুবাহাছা রয়েছে যা ইব্‌ন তায়মিয়া (র)-এর নিকট আল্লাহ্‌র কিতাব ও রসূলের সুন্নাহ্‌র রূহ'-এর সঙ্গে পরিপূর্ণরূপে সামঞ্জস্যশীল ও সঙ্গতিপূর্ণ নয় এবং যা কুরআন ও সুন্নাহ্‌র মাপকাঠিতেও উৎরায় না। তৃতীয়ত, এর ভেতর তাসাওউফ-পন্থীদের কয়েকটি কঠোর ও বিভ্রান্তিপূর্ণ উক্তি রয়েছে। চতুর্থ, ইহ্‌'য়াউ'ল-'উলূমে বহু য'ঈফ (দুর্বল) হাদীছ রয়েছে। এতসব সত্ত্বেও শায়খুল ইসলাম লিখেছেন ঃ

وفيه مع ذالك من كلام المشائخ الصوفيه العارفين المستقيمين فى اعمال القلوب الموافق الكتاب والسنة ما هو اكثر مما يرد منه فلهذا اختلف فيه اجتهاد الناس وتنازعوا فيه .

এতদ্‌সত্ত্বেও 'ইহ্‌'য়া' গ্রন্থে সেই সব সূফী মাশাইখদের–যাঁরা ছিলেন 'ইলমে মা'রিফত ও দৃঢ় চিত্তের অধিকারী, কলবের আমল সম্পর্কে এমন বহু বাণী ও উক্তি রয়েছে যা কিতাব ও সুন্নাহ্‌র সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ (موافق) এবং যার অধিকাংশই গ্রহণযোগ্য। এজন্যই 'উলামায়ে কিরাম এই গ্রন্থ সম্পর্কে কিছুটা ভিন্ন মত পোষণ করলেও সকলেই এর বিরোধী নন।[১]

'আল্লামা ইবনে জওযী (র) ও এর দুর্বল ও মওযূ' বর্ণনার[২] কঠোর সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে, ইমাম গাযালী (র) হাদীছ সম্পর্কে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী না হবার কারণেই এমনটি ঘটেছে।[৩] 'আলফিয়াহ' গ্রন্থের গ্রন্থকার হাফিজ যয়নুদ্দীন আল-'ইরাকী ইহ্‌'য়া'র অনুকূলে বিরাট খিদমত আনজাম দিয়েছেন। তিনি ইহ্‌'য়া'তে বর্ণিত হাদীছগুলো খুঁজে বের করেছেন এবং প্রতিটি রাবী (বর্ণনাকারী) ও হাদীছের শ্রেণী বিভাগ এবং তা কোন্ পর্যায় ও মর্যাদার হাদীছ তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

---

১. ফাতাওয়া শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া (র), পৃ. ১৯৪ ও আত্তাজু'ল-মুকাল্লিল, নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান, পৃ. ৩৮৮।
২. ঐ, ২য় খণ্ড, ১৯৪ পৃ.।
৩. আল-মুনতাজাম, ৯ম খণ্ড, ১৬৯-১৭০ পৃ.।

ইব্‌ন জওযী (র) ইমাম গাযালীর কয়েকটি ঐতিহাসিক তথ্য এড়িয়ে যাওয়া সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। এর দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, হাদীছের মতই ইতিহাস সম্পর্কে তেমন গভীর ব্যুৎপত্তি লাভের সুযোগ তিনি পান নি।[১]

তাঁর দ্বিতীয় আপত্তি এই বিষয়ের ওপর যে, কতক মানসিক ও আত্মিক ব্যাধির (লোক দেখানো 'ইবাদত, পদ মর্যাদার প্রতি মোহ ইত্যাদি) চিকিৎসার উদ্দেশ্যে এবং আত্মবিলোপ (نفس كشى) ও আত্মসংশোধনের জন্য তিনি সূফীদের এমন কতকগুলো ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন যা অনুকরণযোগ্য নয়, এমন কি ফিক্'হ গ্রন্থ অনুযায়ী এগুলো জায়েয প্রমাণিত হওয়া কঠিন ব্যাপার।[২] এত সব ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও তিনি ইহ্'য়াউ'ল-'উলূম-এর গুরুত্ব ও এর জনপ্রিয়তার স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং স্বয়ং মিনহাজু'ল-ক'াসিদীন' নামে এর একটি সংক্ষিপ্ত-সারও লিপিবদ্ধ করেছেন। এতে তিনি আপত্তিকর বিষয়গুলো বাদ দিয়েছেন। কিন্তু এতে মূল গ্রন্থের প্রাণ ও প্রভাব খুব একটা অবশিষ্ট থাকে নি।

ইমাম গাযালী ও 'ইলমে কালাম

ইমাম গাযালী (র) যেই ইজতিহাদী মেধা শক্তির অধিকারী ছিলেন তাতে তাঁর জন্য খুবই কঠিন ছিল যে, তিনি কেবল তাঁর পূর্বসূর জ্ঞানী-গুণীদের আলোচনা-পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের অনুকরণ করবেন, তাঁদের মুখপাত্র ও টীকাকার হিসাবে কাজ করবেন এবং কোথাও তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটবে না। দুর্ভাগ্য যে, চতুর্থ শতাব্দীর 'ইলমে কালামের মাহফিলও স্থবির ও অন্ধ আনুগত্যের শিকারে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। আশ'আরীপন্থী কালামশাস্ত্র গবেষণা ও বিশ্লেষণের ফলাফল এবং তাদের 'আকীদা প্রমাণ করবার জন্য ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী, 'আল্লামা আবু বকর বাকিল্লানী প্রমুখ যে সব মুকদ্দমা ও দলীল-প্রমাণাদি কায়েম করেছেন সেগুলো যেন হুবহু মেনে নেওয়া হয় এবং সেগুলো ভিন্ন অন্য কোন মুকদ্দমা ও দলীল-প্রমাণাদির সাহায্য যেন গ্রহণ না করা হয়। ইমাম গাযালী (র) স্বীয় রচনায় মুজতাহিদসুলভ ভঙ্গীতে ইসলামী উসূল ও 'আকাইদের ওপর আলোচনা করেছেন এবং তা প্রমাণ করবার জন্য এমন কতকগুলো নতুন মুকদ্দমা ও দলীল-প্রমাণ পেশ করেছেন যা তাঁর নিকট অধিকতর প্রভাবমণ্ডিত, কার্যকর, চিত্তাকর্ষক ও হৃদয়গ্রাহী ছিল। আল্লাহ্‌র গুণাবলী, নবুওত, মু'জিযা, শরীয়তের আরোপিত বিধানসমূহ, শাস্তি ও পূণ্য, বারযাখ ও কিয়ামত সম্পর্কে তিনি নবতর মুতাকাল্লিমসুলভ ভঙ্গীতে আলোচনা করেছেন এবং সে সব প্রমাণ

---

১. আল-মুনতাজাম, ৯ম খণ্ড, ১৬৯ পৃ.; ২. প্রাগুক্ত।

করবার জন্য তিনি অনেক মুতাকাল্লিমের ন্যায় সম্ভাবনা, সন্দেহ ও যৌক্তিক মুকদ্দমা ও ফলাফলের পরিবর্তে সাধারণের পক্ষে অধিক বোধগম্য ও তৃপ্তিদায়ক প্রমাণাদি সরবরাহ করেছেন। এই পর্যায়ে তিনি পূর্বসূরী মুতাকাল্লিমদের পেশকৃত দলীল-প্রমাণ, ভাষা, পরিভাষা ও তাদের বিন্যাসের হুবহু অনুসরণ করেন নি। এভাবে তিনি নবরূপে আশ'আরী 'ইলমে কালামের খিদমত আনজাম দেন যার জন্য আশ'আরীপন্থী মুতাকাল্লিমদের তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত এবং তাঁর 'আজীমুশ্বান ধর্মীয় খিদমতের স্বীকৃতিও দেওয়া উচিত। কিন্তু যেহেতু কোথাও কোথাও তাঁর মতের সাথে ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী ও তাঁর নামকরা অনুসারীদের মতের কিছুটা ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় সেজন্য আশ'আরী চিন্তানুকারিগণ (যার সঙ্গে স্বয়ং ইমাম নিজেও সম্পর্কিত ছিলেন) তাঁর সেই 'ইলমে কালাম ও সেই সব মুকদ্দমা ও দলীলাদি সমর্থন করেন নি এবং সেটাকে পূর্ববর্তী বুযুর্গদের মত ও পথ থেকে তাঁর বিচ্যুতি বলেই আখ্যায়িত করেছেন। ইহ'য়াউ'ল-'উলূম রচনা ও তার অস্বাভাবিক প্রচার ও জনপ্রিয়তা লাভের পর এই মসআলার ব্যাপারে আশ'আরীপন্থী 'আলিমদের মধ্যে কানাঘুষা অনেক বেড়ে যায় এবং অনেক লোকেরই মনে ইমাম সাহেবের 'আকীদার ব্যাপারে নানা রকম সন্দেহ সৃষ্টি হতে থাকে। জনৈক নিষ্ঠাবান ভক্ত ইমাম সাহেবকে এ ব্যাপারে একটি চিঠি লেখেন এবং বিষয়টি সম্পর্কে তাঁর নিজের মানসিক কষ্টের কথাও তুলে ধরেন। ইমাম সাহেব তাকে বিস্তারিত উত্তর দেন যা একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة (ইসলাম ও ইসলামবিরোধী মতবাদের মধ্যে পার্থক্যের বিধান) নামে বিদ্যমান। পুস্তিকার শুরুতে তিনি লিখেছেন ঃ

> স্নেহধন্য ভাই! হিংসুকদের একটি দল আমার কতক রচনার (দীনের অন্তর্নিহিত রহস্যসমূহ সম্পর্কিত) ব্যাপারে সমালোচনা করছে এবং তারা মনে করছে যে, এগুলো বোধ হয় ইসলামের প্রাচীন মনীষী ও কালামশাস্ত্রবিদদের স্বীকৃত মতের বিরোধী। তারা আরো মনে করছে যে, আশ'আরী 'আকীদা থেকে চুল পরিমাণ সরে আসাটাও বুঝি কুফরী! এতে যে তুমি কষ্ট পাচ্ছ এবং তোমার মধ্যে অন্তর্জ্বালার সৃষ্টি হয়েছে সে ব্যাপারে আমি সম্যক অবহিত। কিন্তু প্রিয় ভাইটি আমার ! তোমার সবর করা উচিত। যেখানে রসূলুল্লাহ (সা) নিজে গালি-গালাজ ও নিন্দা-ভর্ৎসনা (مطاعن) থেকে বাঁচতে পারেন নি, সেখানে আমি আর কোন্ ছার ? যে ব্যক্তির ধারণা এই যে, আশ'আরী, মু'তাযিলা, হাম্বলী অথবা এই জাতীয় কোন ফির্কার বিরোধিতা করা পরিষ্কার কুফরী–তার সম্পর্কে তুমি জেনে নাও যে, সে একজন অন্ধ সমর্থক (মুকাল্লিদ) ছাড়া কিছু

নয়। তার সংস্কার ও সংশোধনে তুমি অনর্থক সময় নষ্ট করো না। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত ধর্ম ও মযহাবের (কালামীদের) সাথে আশ'আরীদের মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। এখন যদি কেউ দাবি করে যে, বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি সকল বিষয়ে আশ'আরীদের অনুসরণ করা জরুরী এবং তাদের সামান্যতম বিরোধিতাও কুফরী, তবে তাকে জিজ্ঞেস কর, এটা কোথা থেকে প্রমাণিত হ'ল যে, সত্য শুধু আশ'আরীদের জন্যই নির্ধারিত এবং নাজাত শুধু তাদের অনুসরণের ওপরই নির্ভরশীল। যদি এমনটিই হয় তাহলে সম্ভবত তারা (ইমাম) বাকি'ল্লানীকে কুফরীর ফতওয়া দেবে এজন্য যে, তিনি 'বাক'া' গুণের ব্যাপারে আশ'আরীদের সঙ্গে মতভেদ করেছেন এবং তাঁর ধারণা যে, তা (অর্থাৎ 'বাক'া' গুণ) আল্লাহ্র ঐশী সত্তার অতিরিক্ত কোন গুণ নয়। এরপরও প্রশ্ন থাকে, বাকি'ল্লানীই কেন আশ'আরীর বিরোধিতা করবার জন্য কাফির হবেন আর বাকি'ল্লানীর সঙ্গে মতবিরোধের জন্য আশ'আরী কাফির হবেন না? তাদের ভেতর কেবল একজনের ক্ষেত্রে কেন সত্য সীমাবদ্ধ থাকবে? যদি বলা হয় যে, আশ'আরী অগ্রবর্তী, তাহলে আশ'আরীর তুলনায় মু'তাযিলাপন্থীরা যে আরও অগ্রবর্তী ! তবে কি মু'তাযিলাদেরকেই সত্যপন্থী হিসাবে স্বীকার করে নিতে হবে ? যদি বাকি'ল্লানীর ইমাম আশ'আরীর সঙ্গে মতভেদ করার অনুমতি থাকে তাহলে বাকি'ল্লানীর পরবর্তীতে যারা এসেছেন তাঁরা কেন এই অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকবেন এবং এক্ষেত্রে কোন একজনকেই কেন নির্দিষ্ট করা হবে ? [১]

'ইলমে কালামের ওপর মুজতাহিদসুলভ আলোচনা এবং এতে অনেক পরিবর্ধনের পর ইমাম গাযালী (র) স্বীয় সত্যপ্রিয়তা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, 'ইলমে কালামের ফায়দা খুবই সীমাবদ্ধ এবং কোন কোন মুহূর্তে এর ক্ষতি উপকারিতার চাইতেও বেশী। অধিকন্তু এটা এমন একটা ওষুধ– সুস্থ মন-মস্তিষ্ক ও শান্ত স্বভাববিশিষ্ট লোকের যার কোন প্রয়োজন নেই। অপরদিকে যে বস্তু থেকে কোন মানুষই বেপরোয়া থাকতে পারে না তা হ'ল কুরআন মজীদ ও তার প্রমাণ-পদ্ধতি। এ থেকে সবাই নিজ নিজ অংশ লাভ করে এবং কেউই এ থেকে বঞ্চিত হয় না। ইমাম গাযালীর ভাষায় ঃ

فادلة القران مثل الغذاء وينتفع به كل انسان واذلة المتكلمين مثل الدواء وينتفع به احاد الناس ويستضر به الاكثرون بل ادلة القران كالماء الذى ينتفع به الصبى الرضيع والرجل القوى وسائر الادلة كالاطعمة التى ينتفع بها الاقوايا ءمرة ويمرضون بها اخرى ولا ينتفع بها الصبيان اصلا .

১. فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة

কুরআনী প্রমাণ-পঞ্জী খাদ্যের ন্যায় ; মানুষ এ থেকে ফায়দা লাভ করে। আর মুতাকাল্লিমদের প্রমাণ-পঞ্জী ঔষধের ন্যায় ; এর দ্বারা কেউ কেউ উপকার পায় বটে, তবে অধিকাংশ মানুষই এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বরং বলা চলে, কুরআনী দলীল-প্রমাণের দৃষ্টান্ত পানির মত। দুধের শিশু থেকে শুরু করে শক্তিশালী লোকটি পর্যন্ত সবাই এ থেকে সমভাবে উপকৃত হয়। আর বাদ বাকী দলীল-প্রমাণ (কালামশাস্ত্রবিদদের) বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের ন্যায় যদ্দারা কখনও শক্তিশালী মানুষ উপকার পায় ও কখনও অপকার এবং বাচ্চাদের তা আদৌ কোন কাজেই আসে না।[১]

'ইলমে কালাম দ্বারা যে ক্ষতি হয় তার উল্লেখ করে তিনি বলেন ঃ

والدليل على تضرر الخلق به المشاهدة والعيان والتجربة وما ثار من الشر منذ نبغ المتكلمون وفشت صناعة الكلام مع سلامة العصر الاول من الصحابة عن مثل ذالك .

'ইলমে কালামের মাধ্যমে লোকের যে ক্ষতি হয় তার প্রমাণ স্বয়ং তার পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোক জানেন যে, যখন থেকে মুতাকাল্লিমের জন্ম হয়েছে এবং 'ইলমে কালামের চর্চা শুরু হয়েছে তখন থেকেই যেন চিন্তা জগতে সব মুসিবত এসে নাযিল হয়েছে এবং মন্দের বিস্তার ঘটেছে। সাহাবীদের যুগ এই মন্দ থেকে মুক্ত ছিল।[২]

অধ্যাপনার জন্য পুনরায় অনুরোধ এবং ইমাম গাযালী কর্তৃক অক্ষমতা জ্ঞাপন

৪৯৯ হি. যু'ল-ক'া'দাহ মাসে ইমাম গাযালী (র) নিশাপুরের নিজামিয়া মাদ্রাসায় পুনরায় অধ্যাপনা শুরু করেন। এটা ছিল সঞ্জর সালজুকীর (মালিক শাহ্র পুত্র) রাজত্বকাল ও ফখরু'ল-মুল্ক (নিজামু'ল্-মুল্কের পুত্র)-এর প্রধান মন্ত্রিত্বের যুগ। ফখরু'ল-মুল্ক ৫০০ হিজরীতে একজন বাতেনী কর্তৃক শাহাদত বরণ করেন। তাঁর ওফাতের অল্পদিন পরেই ইমাম নিজামিয়া মাদরাসার অধ্যাপনা থেকে সরে আসেন এবং স্বীয় বাসভবন তূসে বসবাস করতে থাকেন। তিনি তাঁর বাসভবন সংলগ্ন স্থানে একটি মাদরাসা ও একটি খানকাহ্র ভিত্তি রাখেন এবং সেখানেই তা'লীম ও তরবিয়তে আত্মনিয়োগ করেন।

৫০০ হিজরীতে সুলতান মুহাম্মদ ইবন মালিক শাহ নিজামু'ল-মুল্ক-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র আহমদকে উযীরে আ'জম নিযুক্ত করলে তিনি ইমাম সাহেবকে পুনরায় বাগ্দাদে ডেকে আনতে মনস্থ করেন। কেননা শূন্য পদ পূরণ করা হলেও

১. ইলযামু'ল-'আওয়াম 'আন 'ইলমি'ল-কালাম, ২০ পৃ.।
২. প্রাগুক্ত।

প্রকৃতপক্ষে নিজামিয়া মাদরাসায় ইমাম গাযালীর পদটি শূন্যই ছিল। কেননা ইমামের স্থলাভিষিক্ত হতে পারেন এমন লোক তৎকালীন মুসলিম জাহানে বলতে গেলে কেউ ছিলেনই না। মাদরাসা নিজামিয়া ছিল 'আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের সৌন্দর্য এবং বাগদাদের সম্ভ্রম ও মর্যাদার প্রতীক। ইমামের শূন্যতাজনিত ক্ষতির অনুভূতি সকলেরই ছিল। খলীফার দরবারেও প্রস্তাব উত্থাপিত হয় যে, ইমাম গাযালী (র)-কে মাদরাসা নিজামিয়ায় পুনরায় ফিরিয়ে আনা হোক। উযীরে আ'জম ক'াওয়ামুদ্দীন নিজামু'ল-মুল্‌ক স্বয়ং পত্র লিখেন এবং তাতে দরবারে খিলাফতের সমস্ত সদস্যের দস্তখত ছিল। তাতে বলা হয়েছিল, "খিলাফতের ও সালতানাতের সদস্য ও অমাত্যবর্গ সকলেই ইমাম সাহেবের শুভ পদার্পণের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।" আহমদ ইব্‌ন নিজামু'ল-মুল্‌ক স্বয়ং ইমাম সাহেবকে যে চিঠি লিখে ছিলেন তার মোদ্দা কথা ছিল ঃ

যদিও আপনি যেখানেই তশ্‌রীফ রাখবেন সেই স্থানই সাধারণের শিক্ষাগারে পরিণত হবে, কিন্তু আপনি যেরূপ 'মুক'তাদায়ে 'আওয়াম' তাতে আপনার অবস্থানস্থল সেই শহরই হওয়া উচিত যা ইসলামী বিশ্বের কেন্দ্র ও কিবলাগাহ্ এবং যেখানে গোটা বিশ্বের প্রতিটি অংশের লোক খুব সহজে পৌছুতে পারে। আর এমন জায়গা হচ্ছে শুধু দারু'স-সালাম বাগদাদ।

ইমাম সাহেব ঐসব চিঠি-পত্র ও সরকারী ফরমানের জবাবে একটি দীর্ঘ পত্র লেখেন এবং বাগদাদে না আসবার পক্ষে অনেকগুলো ওযর পেশ করেন। সেগুলোর একটি হ'ল ঃ

এখানে (তূস নগরীতে) দেড় শ' কার্যক্ষম ছাত্র 'ইল্‌ম হাসিলে মগ্ন। তাদের পক্ষে বাগদাদ যাওয়া কঠিন। দ্বিতীয়ত, আমি যখন প্রথমে বাগদাদে ছিলাম তখন আমার পরিবার-পরিজন বলতে কেউ ছিল না। এখন আমার ছেলেমেয়ের কোলাহল-কোন্দল লেগেই আছে। তাদের পক্ষে দেশ ত্যাগের ধকল সহ্য করা কঠিন। তৃতীয়ত, আমি মকামে খলীল-এ প্রতিজ্ঞা করেছি যে, আমি আর কখনও তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনা-সমালোচনায় যাব না, আর বাগদাদে আলোচনা-সমালোচনা ও তর্ক-বিতর্কে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। এছাড়াও আমাকে খলীফার দরবারে সালাম দিতে হাযির হতে হবে। আর এ আমি সহ্য করতে পারব না। সব থেকে বড় কথা হ'ল, আমি কোন প্রকার বেতন কিংবা ভাতা গ্রহণ করতেও পারব না, অথচ বাগদাদে আমার খোরপোষ চলার মত স্থাবর-অস্থাবর কোন সম্পত্তিই নেই।

মোট কথা, খিলাফত ও সালতানাতের পক্ষ থেকে বহু আহ্বান-অনুরোধ

আসে, কিন্তু ইমাম সাহেব পরিষ্কার ভাষায় তা অস্বীকার করেন এবং নিরাপদ ও নিরিবিলি স্থান পরিত্যাগ করতে অসম্মতি জানান।[১]

বাকী জীবন ও মৃত্যু

ইমাম গাযালী (র) বাকী জীবন জ্ঞান ও ধর্ম সাধনায় কাটিয়ে দেন। তাঁর ভেতর তখনও ছাত্রসুলভ অনুপ্রেরণা বাকী ছিল। তিনি প্রথম জীবনে হাদীছের দিকে তেমন মনোনিবেশ করতে পারেন নি, যেমনটি বুদ্ধিবৃত্তিক ও কতক ধর্মীয় জ্ঞানের ক্ষেত্রে পেরেছিলেন। শেষ যুগে তিনি তাঁর এই ঘাটতি পূরণের দিকেই মনোনিবেশ করেন। তিনি হাফিজ ওমর ইব্‌ন আবি'ল-হাসান আর– রিওয়াসী নামক জনৈক মশহুর মুহাদ্দিছকে নিজের কাছে মেহমান হিসাবে রেখে তাঁর নিকটই সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম শরীফের দরস নেন এবং সনদ হাসিল করেন। মোট কথা, তাঁর শেষ জীবনটি হাদীছের গভীর অধ্যয়ন ও গবেষণার ভেতরই কাটে। ইব্‌ন 'আসাকির বলেন ঃ

وكانت خاتمة امره اقباله على حديث المصطفى صـ ومجالسة اهله
ومطالعة الصحيحين البخارى ومسلم الذين هما حجة الاسلام .

তাঁর জীবনের শেষ কর্ম ছিল এই যে, তিনি হাদীছে নববী (সা)-এর দিকে পরিপূর্ণরূপে মনোনিবেশ করেন, হাদীছশাস্ত্রের ইমামদের সান্নিধ্য অবলম্বন করেন এবং হাদীছের দু'টি বিশুদ্ধ গ্রন্থ বুখারী ও মুসলিম অধ্যয়ন করেন যা ইসলামের দলীলরূপে গৃহীত।[২]

ইন্তিকালের এক বছর পূর্বে ৫০৪ হিজরীতে তিনি 'আল-মুস্তাসফা' নামক একটি গ্রন্থ লেখেন, যাকে উসূলে ফিক্‌হ-এর তিনটি রুক্‌ন-এর অন্যতম মনে করা হয়।[৩] এই গ্রন্থের প্রতি 'উলামায়ে কিরামের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। এটিই ছিল তাঁর শেষ গ্রন্থ।

ইমাম গাযালী (র) তাহিরান নামক স্থানে ১৪ই জমাদিউ'ল-উখরা, ৫০৫ হিজরীতে ৫৫ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। ইব্‌নে জওযী (র) তাঁর ইনতিকালের ঘটনা তাঁরই ভাই আহমদ গাযালীর বরাতে

---

১. আল-গাযালী, ২১ পৃ.।

২. তাবঈন কিয্‌বু'ল-মুফতারা-২৯৬ পৃ.।

৩. এই তিনটি কিতাব যাকে উসূলে ফিক্‌হ-এর 'তিনটি স্তম্ভ' মনে করা হয়, তা হচ্ছে আবুল হুসায়ন বসরীর আল-মু'তামিদ, ইমামু'ল-হ'রামায়ন-এর-'আল-বুরহান' ও ইমাম গাযালীর 'আল-মুস্তাস ফা'।

এভাবে বর্ণনা করেছেন :

সোমবার দিন তিনি ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠেন। ওযূ করে সালাত আদায় করেন। এরপর কাফনের কাপড় চেয়ে পাঠান এবং তা চোখের সঙ্গে ঠেকিয়ে বলেন, "প্রভুর নির্দেশ অবনত মস্তকে মেনে নিচ্ছি।" এই বলে দু'পা ছড়িয়ে দেন। এর পর লোকেরা দেখতে পেল, তাঁর প্রাণ-পাখী দেহ পিঞ্জর ছেড়ে দূর নীলাকাশের পথে পাড়ি জমিয়েছে।[১]

ইমাম গাযালী (র)-এর দু'টি বিশেষ বৈশিষ্ট্য

ইমাম গাযালী (র)-এর দু'টি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আর তা হচ্ছে ইখলাস (নিষ্ঠা) ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা। তাঁর ইখলাসের স্বীকৃতি শত্রু-মিত্র সবাই দিয়েছে এবং তাঁর রচনার প্রতিটি শব্দ থেকেই উদ্ভাসিত হয়েছে। শায়খু'ল-ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র), যদিও তাঁর অন্যতম সমালোচক এবং বহু বিষয়ে তাঁর সাথে দ্বি-মত পোষণ করেন, তাঁকে একজন মহান মুখলিস (নিষ্ঠাবান) হিসাবে গণ্য করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাদি জনপ্রিয় হবার মূল কারণও ছিল এই ইখলাস। এই ইখলাসই তাঁকে জ্ঞান জগতের শাহী মসনদ পরিত্যাগ, বছরের পর বছর মরু-ময়দান ও উন্মুক্ত বিয়াবান অতিক্রম, শাহী দরবারের উপর্যুপরি আহ্বান ও ঐকান্তিক অনুরোধ এবং সে যুগের সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদা উপেক্ষা করার শক্তি যোগায় এবং পরমুখাপেক্ষীহীন করে রাখে। তিনি এক স্থানে লিখেছেন, "সিদ্দীকদের অন্তর থেকে সর্বশেষ যে জিনিসটি বের হয় তা হচ্ছে জাঁকজমক ও পদমর্যাদা-প্রীতি।" তাঁর শেষ জীবন সাক্ষ্য দেয়, তিনি নিশ্চিতভাবেই এই মকামে পৌঁছুতে পেরেছিলেন।

উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর জীবনের বিশেষ প্রতীক। তিনি ইল্‌ম ও 'আমলের গণ্ডীর মধ্যে স্বীয় যুগের মান এবং আপন সমসাময়িকদের কোন মার্গেই সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত থাকেন নি। তিনি 'ইল্‌ম ও 'আমলের যেই উন্নত মার্গেই পৌঁছেছেন সেখানেই তাঁর কানে যেন এ আওয়াজ এসে গুঞ্জরিত হয়েছে, مسافر! یہ تیرا نشیمن نہیں "মুসাফির ! এ তোমরা বাসা (শেষ লক্ষ্যস্থল) নয়।"

বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানের ক্ষেত্রেও তিনি স্বীয় যুগের ও আপন সমসাময়িকদের চাইতে অনেক উন্নতমানের ছিলেন। ফিক্'হ ও উসূলে ফিক্'হ-এর ক্ষেত্রে তিনি যা রচনা করেছেন, শতাব্দীর পর শতাব্দীর ধরে 'উলামায়ে কিরাম তারই টীকা ও ভাষ্য রচনায় মশগুল ছিলেন। অতঃপর তিনি স্বীয় যুগের প্রথা, রীতি ও ধর্ম জ্ঞানে

---

১. ইতহাফ আস-সাদাতু'ল-মুত্তাকীন–ইহ্'য়াউ'ল-উলূম-এর শরাহ, ১১-১২ পৃ.।

সুপণ্ডিতদের নিয়মের বাইরে বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানের দিকেও মনোনিবেশ করেন এবং যুক্তিশাস্ত্র তথা দর্শন এমনভাবে অধ্যয়ন করেন, যা ছিল কাযী আবূ বকর ইবনু'ল-'আরাবীর মতে দর্শনের মর্মমূল ও দার্শনিকদের জন্য বিস্ময়। অতঃপর তিনি সে সবের আলোচনা ও প্রত্যাখ্যানে এমন সব গ্রন্থ প্রণয়ন করেন যদ্দারা শতাব্দীকাল পর্যন্ত জ্ঞান জগত প্রকম্পিত থাকে।

'আমলের ক্ষেত্রে বলা যায়, তিনি মেধা, জ্ঞান, চরিত্রগত ও আধ্যাত্মিক উন্নতি ও পরিপূর্ণতার কোন একটি দিকও উপেক্ষা করেন নি। জ্ঞানের ক্ষেত্রে গভীরতা, ব্যাপকতা ও কামালিয়াত (পরিপূর্ণতা) লাভের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সে যুগের একজন মুখলিস ও দৃষ্টিমান শায়খ-ই-তরীকত শায়খ আবূ 'আলী ফারমাদীর (মৃ. ৪৭৭ হি.) হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন এবং 'ইলমে তাসাওউফও হাসিল করেন। এ পথে তিনি তাঁর সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে ঈপ্সিত লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছেন এবং পরম সন্তোষ ও তৃপ্তি লাভ করেন।

সংস্কার ও বিপ্লব (ইসলাহ্ ও ইনকিলাব)-এর ক্ষেত্রে তিনি কেবল গ্রন্থ রচনা ও পুস্তক প্রণয়নের মধ্যেই নিজের প্রচেষ্টাকে সীমাবদ্ধ রাখেন নি, বরং একটি নবতর ইসলামী সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপনেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। মাওলানা শিবলী লিখেন ঃ

> ইমাম-সাহেবের মনে সান্ত্বনা ছিল না। তিনি দেখেছিলেন, বর্তমান সাম্রাজ্যগুলোর গোড়াতেই গলদ রয়ে গেছে এবং এর মূল বিকৃত হয়ে গেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না ইসলামের মূলনীতি মাফিক একটি নতুন সাম্রাজ্যের পত্তন করা যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আসল লক্ষ্য হাসিল হবে না। কিন্তু রিয়াযত, মুজাহাদা ও মুরাকাবার কারণে তাঁর এতটা ফুরসত ও অবসর ছিল না যে, তিনি এই বিরাট কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ঘটনাক্রমে ইহ্'য়াউ'ল-'উলূম প্রকাশিত হওয়ার পর ৫০১ হিজরীতে তা স্পেনে পৌঁছুতেই স্পেনের বাদশাহ্ 'আলী ইবন ইউসুফ ইবন তাশফীন ঈর্ষাকাতর ও সংকীর্ণ মানসিকতার বশবর্তী হয়ে উক্ত গ্রন্থটি জ্বালিয়ে ফেলার নির্দেশ দেন।[১] অত্যন্ত নির্মম ও নিষ্ঠুরতার সঙ্গে এ আদেশ পালিত হয়। ইমাম সাহেব ব্যাপারটি জানতে পেরে খুবই মর্মাহত হন। সে সময়ই স্পেন থেকে মুহাম্মাদ ইবন 'আবদুল্লাহ্ তূমার্ত নামক এক যুবক ইমাম সাহেবের খিদমতে 'ইল্‌ম হাসিলের জন্য আসেন। তিনি ছিলেন এক সম্ভ্রান্ত বংশের লোক। তাঁর পিতা-পিতামহসহ সকল পূর্বপুরুষই স্বাধীনতা-প্রিয় ও দৃঢ় মনোবলের অধিকারী ছিলেন। ইমাম সাহেবের খিদমতে

১. শরাহ ইহ্'য়াউ'ল-উলূম।

থেকে তিনি সর্বজ্ঞানে সুপণ্ডিত হয়ে ওঠেন এবং স্বীয় ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্খার কারণেই হোক কিংবা ইমাম সাহেবের সাহচর্যে থাকার বদৌলতেই হোক, স্পেনে 'আলী ইবন ইউসুফ ইবন তাশফীনের রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে একটি নতুন সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপনের সংকল্প গ্রহণ করেন। ইমাম সাহেবের সামনে তিনি এর পরিকল্পনা পেশ করেন। ইমাম সাহেব নিজেই একটি ন্যায় ও সুবিচারমূলক সাম্রাজ্যের অভিলাষী ছিলেন বিধায় এ পরিকল্পনা তিনি অনুমোদন করেন। কিন্তু প্রথমেই তিনি জানতে চান, এ ধরনের বিরাট দায়িত্ব আঞ্জাম দেবার মত উপকরণ তার আছে কিনা। মুহাম্মাদ ইবন 'আবদুল্লাহ[1] ইমাম সাহেবকে এ ব্যাপারে আশ্বস্ত করলে পর তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে তার পরিকল্পনা অনুমোদন করেন। 'আল্লামা ইব্‌নে খলদুন এ ঘটনা সম্পর্কেই লিখেছেন ঃ

وبقي فيما زعموا ابا حامد الغزالي وفاوضه بذات صدره فاراده عليه لما كان فيه الاسلام يومئذ باقطار الارض من اختلال الدولة وتفويض اركان السلطان الجامع للامة المقيم للملة بعد ان سأله عمن له من العصابة

---

১. মুহাম্মাদ ইবন 'আবদুল্লাহ এক বিরাট সাম্রাজ্য কায়েম করেন এবং ইমাম গাযালী (র) যে নীতি ও আদর্শ চাইতেন তিনি ঠিক তাই প্রতিষ্ঠিত করেন। আমরা তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইব্‌নু'স-সুবকীর 'ত'াবাক'াতু'শ–শাফি'ইয়্যা' থেকে উদ্ধৃত করছি, "মুহাম্মাদ ইবন 'আবদুল্লাহ দূর পাশ্চাত্যের (মরক্কোর) অধিবাসী ছিলেন। প্রথমে নিজ জন্মভূমিতেই লালিত-পালিত ও বর্ধিত হন। অতঃপর প্রাচ্য ভূ-খণ্ড সফর করেন এবং ফিক্'হ ও 'ইলমে কালাম শিক্ষা করেন। তিনি খুবই পরহেযগার, 'আবেদ ও অল্পে তুষ্ট ছিলেন। অধ্যয়নের কাজ সমাপ্তির পর তিনি সৎ কাজে আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধের ক্ষেত্রে কোমর বেঁধে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি প্রথমে মিসরে গিয়ে জনসাধারণকে বিভিন্ন অন্যায় ও গর্হিত কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখতে চেষ্টিত হন। এতে লোকজন তাঁর শত্রু হয়ে দাঁড়ায় এবং তাঁকে শহর থেকে বের করে দেয়। তিনি মিসর থেকে আলেকজান্দ্রিয়া যান এবং সেখানে কিছুদিন অবস্থানের পর পশ্চিমে আফ্রিকার দিকে রওয়ানা হন। ৫০৫ হিজরীতে তিনি মাহদিয়া পৌঁছে স্বীয় মিশনে পুনরায় মগ্ন হয়ে পড়েন।

তিনি সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে বিজায়া ও বিজায়া থেকে মরক্কো যান। সেখানেও তিনি অত্যন্ত নির্ভীকভাবে আমরু বি'ল-মা'রূফ-এর খিদমত আনুজাম দেন, এমন কি খোদ শাহী খান্দানের সঙ্গেও এ ব্যাপারে তিনি মুখোমুখি হন। তখনকার বাদশাহ 'আলী ইবন ইউসুফ তাশফীন তাঁকে দরবার ডেকে পাঠান। দরবারের 'আলিমগণ তাঁকে বলেন, "এমন একজন ন্যায়-বিচারক ও ইনসাফকারী বাদশাহ্‌র হুকুমতের প্রতি আপনার অসন্তোষের কারণ কি?" মুহাম্মাদ ইবন 'আব্দুল্লাহ অত্যন্ত জোশের সঙ্গে বলেন, "আপনারা কি অস্বীকার করতে পারেন, এ শহরের প্রকাশ্যে মদের ক্রয়-বিক্রয় হয় না ? য়াতীমের সম্পদ কি জোরপূর্বক ও অন্যায়ভাবে ছিনিয়ে নেওয়া হয় না ?" তাঁর এই আবেগময় বক্তৃতায় উপস্থিত সকলে, এমন কি বাদশাহ্‌ও প্রভাবিত হন। তাঁর চোখেও অশ্রু দেখা দেয়। মুহাম্মাদ মরক্কো থেকে বেরিয়ে আগিম্মাতে যান এবং ক্রমান্বয়ে একটি বিরাট দল তাঁকে অনুসরণ করে। অতঃপর তায়মাল নামক স্থানে যান এবং মুসামিদা কবিলার সহযোগিতায় একটি নতুন সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রচেষ্টা চালান ও তাতে সফলকাম হন।

والقبائل التى يكون بها الاعتزاز والمنعة.

লোকের ধারণা যে, তিনি (মুহাম্মাদ ইবন 'আবদুল্লাহ্ তুমার্ত) ইমাম আবূ হামেদ আল-গাযালীর সঙ্গে মিলিত হন এবং তাঁর সঙ্গে স্বীয় অন্তরের অভিপ্রায় সম্পর্কে আলোচনা করেন। ইমাম সাহেব তাঁর সে অভিপ্রায় সমর্থন করেন। কেননা সে যুগে ইসলাম সারা বিশ্বে দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে চলেছিল এবং এমন কোন সুলতান বর্তমান ছিলেন না যিনি গোটা মুসলিম উম্মাহ্কে একত্র করতে পারেন এবং দীন ও ইসলাম কায়েম রাখতে পারেন। কিন্তু প্রথমেই ইমাম সাহেব জানতে চান, তার কাছে এতটা সাজ-সরঞ্জাম ও জনশক্তি আছে কিনা যদ্দারা প্রভাব-প্রতিপত্তি ও নিরাপত্তা লাভ করা যায়।

মোট কথা, মুহাম্মাদ ইবন 'আবদুল্লাহ্ সৎ কাজে আদেশের প্রতীক হিসাবে একটি নতুন সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন যা দীর্ঘদিন কায়েম ছিল। এই শাসকদের 'মুওয়াহ্হিদীন' নামে অভিহিত করা হ'ত। 'আলী ইবন ইউসুফ-এর রাজ্যে শক্তি প্রয়োগ, সীমা লংঘন ও বাড়াবাড়ি খুবই বিস্তার লাভ করেছিল। ফৌজের সদস্যরা প্রকাশ্যে জনসাধারণের বাড়ী-ঘরে ঢুকে পড়ত এবং সতী-সাধ্বী রমণীদের সম্ভ্রম নষ্ট করত। 'আলী ইবন ইউসুফ-এর খান্দানে অনেক কাল ধরে এই উল্টো নিয়ম চলে আসছিল যে, পুরুষেরাই মুখে ওপর নেকাব পরত এবং মহিলারা মুখ খোলা অবস্থায়ই চলাফেরা করত। এসব লোককে 'মিলছামীন' (ملثمين) বলা হ'ত। মুহাম্মাদ ইব্ন তূমার্ত প্রথমে এ দু'টি বিদ'আত উচ্ছেদের জন্য বিরাট আন্দোলন শুরু করেন। এরই ফলশ্রুতিতে "মিলছামীন"-এর হুকুমত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং প্রতিষ্ঠিত হয় এক নতুন সাম্রাজ্য। মুহাম্মাদ ইবন তূমার্ত স্বয়ং সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে মোটেই আগ্রহী ছিলেন না। তাই তিনি 'আবদুল মু'মিন নামক একজন যোগ্য লোককে সিংহাসনে বসান।

'আবদুল মু'মিন ও তাঁর খান্দান যে পদ্ধতি ও যেই কাঠামোতে রাজ্য শাসন করেন তা হুবহু সেই মূলনীতি মাফিক ছিল যা ইমাম গাযালী (র) চেয়েছিলেন। ইব্নে খলদুন তাঁর "আখবারে বারবার" নামক গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে 'আবদুল মু'মিন ও তাঁর সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে লিখেছেন :

তাঁর হুকুমতে 'আলিম-'উলামাকে সম্মান করা হ'ত, যাবতীয় ঘটনা ও পারস্পরিক ব্যাপারে পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করা হ'ত। ফরিয়াদীর ফরিয়াদ শোনা হ'ত। যদি কোন সরকারী কর্মচারী কোন প্রজার ওপর কখনো জুলুম করত তাহলে তাকে কঠিন সাজা দেওয়া হ'ত। অত্যাচারী জালিমের হাত যেন

ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। শাহী চত্বরেই মসজিদ নির্মাণ করা হয়। সকল য়ুরোপীয় সীমান্ত, যেখানে আক্রমণের আশংকা ছিল, সামরিক শক্তি দ্বারা মযবুত করা হয়। ক্রমেই যুদ্ধ এবং উপর্যুপরি বিজয়ের দিগন্ত প্রসারিত হতে থাকে।[১]

মুসলিম বিশ্বে ইমাম গাযালী (র)-এর প্রভাব

মুসলিম বিশ্বের ওপর তাঁর জ্ঞানগত ও 'আমলী কামালিয়াত এবং তাঁর শক্তিশালী ও সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের গভীর প্রভাব পড়ে। তাঁর যুগোত্তীর্ণ রচনাবলী ও আলোচনাসমূহ পণ্ডিত মহলে মানসিক বিপ্লব ও স্বাধীন চিন্তাধারার সৃষ্টি করে। ইসলামের যে কতিপয় ব্যক্তিত্ব শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুসলিম বিশ্বের দিল্ ও দিমাগ (মন ও মস্তিষ্ক) এবং জ্ঞান ও চিন্তার জগতকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল ইমাম গাযালী (র) তাঁদের অন্যতম। তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব, জ্ঞানের উচ্চমান, রচনাবলীর গুরুত্ব শত্রুমিত্র সকলেই স্বীকার করে নিয়েছেন। শত ইনকিলাবের পরও তাঁর 'নাম ও কাম' আজও জীবিত। তাঁর রচনাবলীর একটি বিরাট অংশ আজও জনপ্রিয়। পাঠকের মনকে এখনও তা নাড়া দেয়, প্রভাবিত করে।

সাধারণ দা'ওয়াত ও উপদেশ প্রদানের আবশ্যকতা এবং সাধারণ সংস্কার ও বাগদাদের দা'ঈ

ইমাম গাযালী (র)-এর ব্যক্তিত্ব ও তাঁর জ্ঞানগত ও সংস্কারমূলক কার্যাবলীর প্রভাব নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। এতদ্‌সত্ত্বেও সাধারণ দা'ওয়াত ও উপদেশ প্রদানের আবশ্যকতা বাকি ছিল। কেননা বিরাট সংখ্যক মুসলমান তখন জ্ঞানগত সন্দেহ, চারিত্রিক দুর্বলতা, 'আমলের ক্ষেত্রে উদাসীনতা, ত্রুটি-বিচ্যুতি ও মূর্খতার শিকারে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। সত্বর এর প্রতিকারের প্রয়োজন ছিল। এজন্য তাৎক্ষণিকভাবে এমন একজন যাদুকরী বক্তৃতা শক্তির অধিকারী খতীব (বক্তা, ধর্মোপদেশ প্রদানকারী) ও বুলন্দ রূহ'ানী ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন ছিল, গণমানুষের সঙ্গে যাঁর নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে এবং যিনি স্বীয় দা'ওয়াত, ওয়া'জ-নসীহত, আত্মার পরিশুদ্ধি ও সংস্কার-সংশোধন (তাযকিয়া ও ইসলাহ) দ্বারা গোটা মুসলিম জনজীবনে ধর্মীয় রূহ' ও নতুন ঈমানী যিন্দেগী পয়দা করতে সক্ষম। স্বেচ্ছাচারী সরকারগুলো চার শ' বছর পর্যন্ত মুসলমানদের নৈতিক চরিত্র কলুষিত করে

১. আল-গাযালী, ১১৬–১৭ পৃ.।

ফেলেছিল এবং তাদের মধ্যে এমন একটি শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল যাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যই ছিল সম্পদ, সম্মান ও পদমর্যাদা লাভ। 'আকীদার দিক দিয়ে যদিও তারা আল্লাহ্ ও আখিরাতের অস্বীকারকারী ছিল না, কিন্তু কার্যত ছিল আল্লাহবিস্মৃত, পারলৌকিক জীবন সম্পর্কে গাফিল এবং আরাম-আয়েশ ও বিলাসিতায় মত্ত। অনারব তাহযীব-তমদ্দুন তখনকার মুসলিম সমাজ জীবনকে আচ্ছাদিত করে ফেলেছিল এবং অনারব আচার-অনুষ্ঠান ও জাহিলী রসম-রেওয়াজ মুসলিম জীবনের অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হয়েছিল। বিজয়ী জাতি হিসাবে মুসলমানদের জীবন মান খুবই সমুন্নত হয়ে গিয়েছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণী আমীর-উমারাদের পদাংক অনুসরণ করে চলেছিল এবং জনসাধারণ ও শ্রমজীবী মানুষ মধ্যবিত্তের শ্রেণী-চরিত্র ও আচার-অভ্যাস দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছিল। জীবিকার উপায়-উপকরণ যাদের হাতে ছিল তারা তা অন্যায় পথে খরচ করে আমোদ-ফুর্তিতে মত্ত ছিল। আমীরানা ঠাট থেকে যারা বঞ্চিত ছিল, তারা দারুন মনঃকষ্টে ভুগছিল এবং নিজেদের চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও ভাগ্যহীন ভাবছিল। সম্পদশালী লোকের থেকে আত্মত্যাগ, সহানুভূতিবোধ, সংবেদনশীলতা ও কৃতজ্ঞতাবোধের প্রেরণা দূরে সরে গিয়েছিল। দুর্দশাগ্রস্ত ও মেহনতী মানুষ ধৈর্য, আত্মতুষ্টি, য়াকীন ও আত্মবিশ্বাস থেকে বঞ্চিত হতে চলেছিল। এভাবে তাদের জীবন ছিল গভীর সঙ্কটে নিপতিত। সে মুহূর্তে অবশ্যই এমন একটি দা'ওয়াতের প্রয়োজন ছিল যা পার্থিব কামনা-বাসনার সংকট কমিয়ে দেবে, ঈমানকে পুনরুজ্জীবিত করবে, আখিরাতের প্রতি মানুষের বিশ্বাস বাড়িয়ে দেবে, আল্লাহ্কে পাবার জন্য তাদের ভেতর আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করবে, আল্লাহ তা'আলার সতিকার পরিচয় (মা'রিফত), তাঁর বন্দেগী ও রিযামন্দীর ক্ষেত্রে উন্নত মনোবল ও দৃঢ় হিম্মতের সঙ্গে কাজ করার অনুপ্রেরণা যোগাবে, পরিপূর্ণ তওহীদ (তওহীদ-ই কামিল)-কে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করবে এবং দুনিয়াদার ও বিত্ত-সম্পদের অধিকারী লোকদের গুরুত্বহীনতা ও পার্থিব উপায়-উপকরণের অসারতাকে খোলাখুলিভাবে সর্বসমক্ষে তুলে ধরবে।

একজন দা'ঈ-র জ্ঞানগত যোগ্যতা

হিজরী পঞ্চম শতাব্দী ইসলামের ইতিহাসে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিভিন্ন শাস্ত্রের উন্নতির ক্ষেত্রে একটি স্বর্ণ যুগ। এ যুগে ধর্মীয়, বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বড় বড় পণ্ডিত ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছে। এ শতাব্দীরই শেষভাগে 'আল্লামা আবূ ইসহাক শীরাযী (মৃ. ৪৭২ হি.) ও ইমাম গাযালী (মৃ. ৫০৫ হি.)-এর মত প্রতিভাধর বিজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, আবুল ওয়াফা ইব্নে 'আকীল (মৃ. ৫১০

হি.)-এর ন্যায় ফকীহ ও মুহাক্কিক 'আলিম, 'আবদুল কাহির জুরজানী (মৃ. ৪৭১ হি.)-এর মত মুজতাহিদ, আবূ যাকারিয়া তাবরীযী (মৃ. ৫০২ হি.)-এর মত আভিধানিক ও বৈয়াকরণ, আবুল কাসিম হারীরী (৫১৬ হি.)-এর মত নবতর স্টাইলের লেখকের আবির্ভাব হয় যাঁরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষের মন-মেযাজ ও রুচির ওপর রাজত্ব করেছেন। প্রতিভাপূর্ণ এই যুগে বাগদাদের মত শস্য-শ্যামল উর্বর ভূমিখণ্ডে মর্যাদাপূর্ণ ধর্মীয় খিদমতের জন্য এবং মানুষের মন-মানসিকতা ও প্রকৃতির মোড় পরিবর্তনের জন্য উন্নত মানের জ্ঞানগত যোগ্যতা ও সামগ্রিক ক্ষেত্রে পরিপূর্ণতার অধিকারী এমন এক ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন ছিল, যিনি সে যুগের প্রচলিত জ্ঞান-বিজ্ঞানেও অভিজ্ঞ ও পারদর্শী হবেন এবং যাঁর আধ্যাত্মিক মর্যাদা, 'ইল্‌ম ও ফযীলতকেও অবজ্ঞা করা কারো পক্ষে সম্ভব হবে না। উপরন্তু যিনি হবেন সে যুগের মান অনুযায়ী উন্নত ভাষা জ্ঞানের অধিকারী, যাঁর মজলিসে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক অংশ গ্রহণ করে উপকৃত হবে, কেউই তাঁকে "মূর্খ ও জাহিল দরবেশ" অথবা "নাদান বক্তা" বলে উপেক্ষা করার সাহস পাবে না এবং দুর্বল ঈমানের লোকেরাও যাঁর ওয়া'জ মজলিস ও দর্‌স মাহফিল থেকে ইয়াকীনের শক্তি, ঈমানের উত্তাপ, সংশয় ভঞ্জনের ওষুধ ও 'আমল করার অনুপেরণা লাভ করবে।

বাগদাদের দু'জন দা'ঈ

ঠিক এমনি যুগে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের মধ্যে আবার নতুন করে ঈমানের উত্তাপ ও অনুপ্রেরণা সৃষ্টির জন্য দু'জন ব্যক্তিত্বের জন্ম দিলেন। তাঁদের একজনের নাম সায়্যিদুনা হযরত 'আবদুল কাদির জিলানী (র) এবং অপর জনের নাম 'আবদুর রহমান ইবনু'ল-জওযী। রুচি ও অভিরুচিতে ভিন্নতা থাকলেও তাঁরা উভয়েই নিজ নিজ যুগের মুসলিম গণজীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের দ্বারা ইসলামের বিরাট খিদমত নিয়েছেন। আল্লাহ্‌র একটি বিরাট হিকমত এই যে, বাগদাদ ছিল তাঁদের উভয়েরই অবস্থান ও দীনী দা'ওয়াতের কেন্দ্রভূমি। আর সে যুগের বাগদাদ ছিল তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের প্রাণকেন্দ্র এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও রাজনীতির পীঠস্থান। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা দীনী খেদমতের জন্য তাঁদেরকে দীর্ঘ জীবন ও বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র দান করেছিলেন।

হাম্বলী মযহাবের একটি গৌরবোজ্জ্বল দিক এই যে, এই উভয় বুযুর্গই ছিলেন হাম্বলী মযহাবের উসূল ও ফিক্‌'হের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

নবম অধ্যায়

হযরত শায়খ 'আবদুল কাদির জিলানী (র)

শিক্ষা ও পরিপূর্ণতা লাভ

সায়্যিদুনা হযরত 'আবদুল কাদির জিলানী (র)-এর জন্ম হয় ৪৭০ হিজরীতে[১] গীলান[২] নগরে। তাঁর বংশ-তালিকা ঊর্ধ্বতন ১০ম পুরুষে সায়্যিদুনা হযরত ইমাম হাসান (রা)-এ গিয়ে ঠেকেছে। তিনি ১৮ বছর বয়সে সম্ভবত ৪৮৮ হিজরীতে বাগদাদে আগমন করেন। ঐ একই সনে ইমাম গাযালী (র) সত্যানুসন্ধান ও দৃঢ় প্রত্যয় লাভের উদ্দেশ্যে বাগদাদ ত্যাগ করেছিলেন। এটা কি একটা বিস্ময়কর ঘটনা নয় যে, একজন জলীলুল-কদর ইমাম থেকে যখন বাগদাদ বঞ্চিত হয়, ঠিক তখনই অপর একজন জলীলুল-কদর সংস্কারক ও আল্লাহ্‌র দীনের দা'ঈ-র সেখানে আগমন ঘটে![৩] যা হোক, হযরত জিলানী দৃঢ় মনোবল ও অটুট হিম্মত নিয়ে 'ইল্‌ম হাসিলে মশগুল হয়ে পড়েন। 'ইবাদত-বন্দেগী ও মুজাহাদার প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও তিনি 'ইল্‌ম হাসিলের ক্ষেত্রে চেষ্টার কোন ত্রুটি করেন নি, বরং কঠোর সাধনা দ্বারা নিজেকে জ্ঞানের প্রতিটি শাখাতেই অভিজ্ঞ ও পারদর্শী করে তোলেন। তাঁর উস্তাদদের মধ্যে রয়েছেন আবুল-ওয়াফা ইবনে 'আকীল, মুহাম্মদ ইব্‌ন আল-হাসান আল-বাকি'ল্লানী ও আবূ যাকারিয়্যা তাবরীযীর মত নামকরা জ্ঞানী ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ। তিনি আবুল-খায়র হ'াম্মাদ ইব্‌ন মুসলিম[৪] আদ-দাব্বাস থেকে তরীকতের তা'লীম এবং কাজী আবূ সা'ঈদ[৫] মাখরামী থেকে এ ক্ষেত্রে কামালিয়াত ও এজাযত লাভ করেন।[৬]

---

১. জিলান কিংবা গীলানকে দায়লাম বলা হয়। এটি ইরানের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত একটি প্রদেশ। এর উত্তরে রুশীয় ভূখণ্ড তালীস অবস্থিত। দক্ষিণে বুর্য পর্বতশ্রেণী যা আযারবায়জান ও ইরাক-ই 'আজম-থেকে জিলানকে আলাদা করে দিয়েছে। দক্ষিণে মাযিন্দানের পূর্বাংশ এবং উত্তরে কুযভীন সাগরের পশ্চিমাংশ ইরানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত এলাকার মধ্যে পরিগণিত (দা.মা)।

২. ইবনে কাছীর; ১২তম খণ্ড, ১৪৯ পৃ.।

৩. বুস্তানীকৃত আল-বিদায়া ওয়ান্নিহায়া, দ্বাদশ খণ্ড, ১৪৯ পৃ.।

৪. শা'রানী লিখেছেন যে, মুরীদদের তরবিয়তের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অনন্য। বাগদাদের অধিকাংশ শায়খ ও সূফী তাঁরই সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। তিনি ৫২৫ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। –তাবাক 'াতু'ল-কুবরা, ১৩৪ পৃ.।

৫. আসল নাম মুবারক ইবনে 'আলী ইবনে আল-হুসায়ন। ইবনে কাছীর লিখেছেন যে, তিনি হাদীছ শ্রবণ ও হাম্বলী মযহাবশাস্ত্রে কামালিয়াত হাসিল করেন। তাঁর বেশির ভাগ সময়ই বিতর্ক, দরস ও ফতওয়া প্রদানের কাজে অতিবাহিত হত। তিনি সদগুণসম্পন্ন, মতাদর্শের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থী এবং সঠিক রায়দানের অধিকারী ছিলেন। ৫১১ হিজরীতে তাঁর ওফাত হয়।

৬. বিস্তারিত জানতে ইবনে রজব হাম্বলী প্রণীত তাবাক 'াতু'ল-হ 'ানাবিলা দ্র.।

ইসলাহ্ ও ইরশাদ ঃ তাঁর প্রতি জনগণের আকর্ষণ

জাহিরী ও বাতেনী 'ইলমে পরিপূর্ণতা লাভের পর তিনি শিক্ষা, সংস্কার ও সংশোধনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। একই সময়ে তিনি দর্স প্রদান ও ধর্মোপদেশমূলক কাজের প্রতিও মনোযোগী হন এবং স্বীয় উস্তাদ শায়খ মাখরামীর মাদরাসায় শিক্ষকতা ও নিয়মিত ওয়া'জ শুরু করেন। (ছাত্রাধিক্যের কারণে) সত্বরই ঐ মাদরাসা সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তখন তাঁর একনিষ্ঠ ভক্ত ও অনুরক্তবৃন্দ মাদরাসা গৃহটি সম্প্রসারিত করে তাঁর মজলিসের উপযোগী করে তোলেন। তাঁর মজলিসে লোকের ভীড় এমন পরিমাণে বাড়তে লাগল যে, অবশেষে মাদরাসায় তিল ধারণের স্থানও অবশিষ্ট থাকত না। তাঁর ওয়া'জ শুনতে গোটা বাগদাদ যেন ভেঙে পড়ত। আল্লাহপাক তাঁকে এমন প্রভাবমণ্ডিত ব্যক্তিত্ব ও জনপ্রিয়তা দান করেছিলেন যা বড় বড় রাজা-বাদশাহ্র ভাগ্যেও জোটেনি। 'মুগনী' প্রণেতা শায়খ মু'ফিক উদ্দীন ইব্নে কু'দামা বলেন, "কেবল ধর্মের কারণে তাঁর চেয়ে বেশি সম্মানের অধিকারী হতে আমি আর কাউকে দেখিনি। বাদশাহ ও উযীরবৃন্দ তাঁর মজলিসে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে হাযির হতেন এবং অত্যন্ত বিনয়ের সাথে উপবেশন করতেন। উপস্থিত 'উলামা ও ফকী'হ্দের সংখ্যা নিরূপণ করা ছিল একটি দুরূহ ব্যাপার। এক একটি মজলিসে চার-চার শ'র মত দোয়াতই দেখা যেত। এগুলো তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী লিপিবদ্ধ করবার জন্য লোকেরা নিয়ে আসত।

প্রশংসনীয় গুণাবলী ও চরিত্র

এত উন্নত ও উচ্চতর মর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি সীমাতিরিক্ত বিনয়ী ছিলেন। একটি শিশু কিংবা একটি বালিকাও তাঁর সাথে কথা বললে তিনি দাঁড়িয়ে তা শুনতেন এবং তাঁর ফরমায়েশ মুতাবিক কাজ করে দিতেন। অভাবী ও দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের নিকট তিনি বসতেন এবং তাদের কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করে দিতেন। অপরদিকে তথাকথিত কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কিংবা সাম্রাজ্যের কোন গুরুত্বপূর্ণ সদস্যের সম্মানার্থেও তিনি দাঁড়াতেন না।[১] খলীফার আগমন ঘটলে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবেই আপন গৃহে চলে যেতেন এবং খলীফা এসে উপবেশন করলে পর সেখান থেকে বেরিয়ে আসতেন যাতে করে খলীফার সম্মানার্থে দাঁড়াতে না হয়।[২] তিনি কখনও কোন উযীর কিংবা সুলতানের দরজায় গিয়ে দাঁড়ান নি।[৩]

---

১. শা'রানীর তাবাক'াতু'ল-কুবরা, ১ম খণ্ড, ১২৭ পৃ.।
২. ঐ, ১২৮ পৃ.; ৩. ঐ, ১ম খণ্ড, ১২৭ পৃ.।

তাঁকে যাঁরা দেখেছেন তাঁরা এবং তাঁর সমসাময়িক লোকেরা হযরত জিলানী (র)-এর উত্তম চরিত্র, উচ্চ মনোবল, বিনয়, নম্রতা, দানশীলতা তথা উন্নত মানের চারিত্রিক গুণাবলীর প্রশংসায় ছিলেন মুখর। জনৈক বুযুর্গ (হ'ারাদাঃ)– যিনি দীর্ঘজীবী ছিলেন, অনেক বুযুর্গ ও নামকরা ব্যক্তিকে দেখেছিলেন এবং তাঁদের সান্নিধ্যে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছিলেন, বলেন :

ما رأت عيناى احسن خلقا ولا اوسع صدراً ولا اكرم نفساً ولا الطف قلباً ولا احفظ عهداً و وداً من سيدنا الشيخ عبد القادر ولقد كان مع جلالة قدره وعلو منزلته وسعة علمه يقف مع الصغير ويوقر الكبير ويبداء بالسلام ويجالس الضعفاء ويتواضع للفقراء وما قام لاحد من العظماء ولا الاعيان ولا الم بباب وزير ولا سلطان .

সায়্যিদুনা শায়খ 'আবদুল কদির জিলানী অপেক্ষা অধিক উত্তম চরিত্রবিশিষ্ট, উদার মানসিকতাসম্পন্ন, দয়ালু, নম্র হৃদয় ও আত্মীয়তা রক্ষাকারী ব্যক্তি আমি আর দেখিনি। উচ্চ মর্যাদা ও ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছোটদের প্রতি ছিলেন অনুগ্রহপরায়ণ ও বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তিনিই সর্বাগ্রে অন্যকে সালাম দিতেন। তিনি দুর্বল ও কমযোর লোকদের সঙ্গে ওঠা-বসা করতেন এবং তাদের সঙ্গে বিনয় ও নম্র ব্যবহার করতেন। অপর দিকে তিনি কখনও কোন নেতৃস্থানীয় কিংবা শাসন কর্তৃত্বে আসীন ব্যক্তির সম্মানার্থে দাঁড়াননি কিংবা কোন উযীর ও শাসকের দরজায় ধরনা দেন নি।[1]

ইমাম হাফিজ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ আল-বারযালী আল-আশবেলী তাঁর প্রশংসায় বলেন ঃ

كان مجاب الدعوة سريع الدمعة دائم الذكر كثير الفكر رقيق القلب دائم البشر كريم النفس سخى اليد غزير العلم شريف الاخلاق طيب الاعراق مع قدم راسخ فى العبادة والاجتهاد .

তিনি যে দু'আ করতেন তা কবুল হ'ত অর্থাৎ তিনি মুস্তাজাবুদ্দা'ওয়াত ছিলেন। যার পরিণতি থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করা যায় এমন কোন ঘটনার কথা উঠলে তাঁর চোখ সহসাই অশ্রুসজল হয়ে উঠত। তিনি আল্লাহ্র যিক্র ও ফিক্রে মগ্ন থাকতেন। তাঁর অন্তঃকরণ ছিল খুবই কোমল। তিনি ছিলেন উদার, দানশীল, ব্যাপক ও বিস্তৃত জ্ঞানের অধিকারী, উচ্চ বংশজাত এবং 'ইবাদত-বন্দেগী ও রিয়াযত-মুজাহাদার ক্ষেত্রে অনন্য।[1]

১.শা'রানীর তাবাক'াতু'ল-কুবরা, ১ম খণ্ড, ১২৭ পৃ.; ২. ক'লাইদু'ল-জাওয়াহির, ৯ পৃ.।

ইরাকের মুফতী মুহ্'য়িউদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে হামেদ আল-বাগদাদী বলেন ঃ

ابعد الناس عن الفحش اقرب الناس الى الحق شديد البأس اذا انتهكت محارم الله عز وجل لايغضب لنفسه ولا ينتصر لغير ربه.

অসভ্য ও অশিষ্ট কথাবার্তা থেকে তিনি নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করতেন এবং সব সময়ই যুক্তিসঙ্গত ও হক-কথা বলতেন। খোদায়ী বিধান ও আল্লাহ্ নির্ধারিত সীমার মধ্যে থাকা সত্ত্বেও কারো ওপর জুলুম কিংবা বাড়াবাড়ি হতে দেখলে তাঁর মেযাজ বিগড়ে যেত। অপরদিকে নিজের ব্যাপারে তিনি কখনও ক্রোধান্বিত হতেন না। কোন প্রার্থীকে রিক্ত হস্তে ফিরিয়ে দেওয়া তো দূরের কথা, এজন্য যদি নিজের পরিহিত বস্ত্রটুকুও দেবার প্রয়োজন দেখা দিত তবে তিনি তাতেও পিছ পা হতেন না।

ক্ষুধার্তকে খাবার খাওয়াতে ও অভাবী লোকদের প্রয়োজন পূরণে তিনি দেদার অর্থ ব্যয় করতেন এবং এতে আনন্দ পেতেন। 'আল্লামা ইবনু'ন-নাজ্জার শায়খ জিলানী (র) থেকে বর্ণনা করেন :

গোটা দুনিয়ার সমস্ত সম্পদই যদি আমার হাতে চলে আসে তাহলে আমি সবটাই ক্ষুধার্তদের মধ্যে বিলিয়ে দেব। তিনি আরও বলতেন : মনে হয় আমার হাতে কোন ছিদ্র আছে। তাই কিছুই আমার হাতে থাকে না। যদি হাযার দীনার (স্বর্ণমুদ্রা)-ও আমার হাতে আসে তবু দেখা যায়, রাত পোহাবার আগেই তা শেষ হয়ে গেছে।[১]

ক'লাইদু'ল-জাওয়াহির প্রণেতা লিখেন :

শায়খ (র)-এর নির্দেশ ছিল, রাতের বেলা প্রশস্ত দস্তরখানা বিছানো হবে। তিনি নিজে মেহমানদের সাথে বসে খানা খেতেন, গরীব ও দুর্বল লোকদের সঙ্গ দিতেন এবং ছাত্রদের জিজ্ঞাসাসমূহ ধৈর্য সহকারে শুনতেন। প্রত্যেকেই মনে করত, সেই শায়খের সব চেয়ে কাছের লোক এবং সে-ই তাঁর কাছে সব চেয়ে বেশি সম্মানিত। তাঁর সঙ্গী-সাথীদের কেউ অনুপস্থিত থাকলে তিনি তার সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতেন এবং তাঁর জন্য চিন্তান্বিত হয়ে পড়তেন। সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে তিনি সজাগ ও সচেষ্ট ছিলেন। ছোটখাটো দোষ-ত্রুটি ও ভুল-চুক তিনি ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখতেন। যদি কেউ কোন বিষয়ে কসম

১. ক'লাইদু'ল-জাওয়াহির, ৯ পৃ.।

খেয়ে বসত তাহলে তিনি তার আরযূ মেনে নিতেন এবং তার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে যা কিছু জানতেন– তা গোপন করতেন।[১]

মুর্দা দিল জীবিতকরণ

সায়্যিদুনা 'আবদুল কাদির জিলানী (র) থেকে প্রকাশিত কারামতের আধিক্য সম্পর্কে অধিকাংশ ঐতিহাসিকই একমত। শায়খুল ইসলাম 'ইয্‌যুদ্দীন ইব্‌ন 'আবদুস সালাম[২] ও ইমাম ইব্‌নে তায়মিয়ার উক্তি ঃ শায়খ (র)-এর কারামত সংখ্যার গণ্ডী ছড়িয়ে গিয়েছিল। তন্মধ্যে তাঁর সর্বাপেক্ষা বড় কারামত হ'ল মুর্দা দিলকে জীবিতকরণ। আল্লাহ্‌তা'আলা তাঁর কলবের তাওয়াজ্জুহ ও মুখের তা'ছীরে লাখো মানুষকে ঈমানী যিন্দেগী দান করেছেন। তাঁর অস্তিত্ব ছিল ইসলামের জন্য বসন্ত সমীরণের ন্যায় যা মৃত দিলের মাঝে নবতর প্রাণ-স্পন্দন সৃষ্টি করেছে এবং মুসলিম জাহানে ঈমান ও আধ্যাত্মিকতার এক নতুন জোয়ার বইয়ে দিয়েছে।[৩] শায়খ 'উমর কিসানী বলেন ঃ শায়খের এমন কোন মজলিস বসত না যেখানে ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের কেউ না কেউ ইসলাম গ্রহণ না করত। ডাকাত, খুনী ও নানাবিধ পাপে লিপ্ত লোকেরা তওবাহ্‌র সৌভাগ্য লাভ করত এবং ভ্রান্ত 'আকীদা-বিশ্বাসের লোক তাদের ভ্রান্ত 'আকীদা-বিশ্বাস থেকে তওবাহ করত।[৪]

জুব্বাঈ বর্ণনা করেছেন, আমাকে একবার হযরত শায়খ (রা) বললেন ঃ আমার মন চায় আগের যুগের মত মাঠে-ময়দানে ও জঙ্গলে গিয়ে অবস্থান করি, আল্লাহ্‌র কোন মখলূক যেন আমাকে না দেখে আর আমিও যেন কাউকে না দেখি। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের কল্যাণ চান; আমার হাতে পাঁচ হাযারের বেশি ইয়াহূদী ও খৃস্টান মুসলমান হয়েছে। ধূর্ত, প্রতারক ও পেশাদার পাপীদের ভেতর থেকে এক লক্ষের অধিক লোক আমার হাতে তওবাহ করেছে। এও আল্লাহ্‌র এক বিরাট নিয়ামত।[৫]

ঐতিহাসিকদের মতে, বাগদাদে বসবাসকারীদের একটি বিরাট অংশ হযরত (র)-এর হাতে হাত রেখে তওবাহ করেছিল এবং বিরাট সংখ্যক ইয়াহূদী, খৃস্টান ও যিম্মী তাঁর হাতেই মুসলমান হয়েছিল।[৬]

শিক্ষা দান কার্যে কর্মব্যস্ততা ও অন্যান্য খিদমত

উচ্চ মরতবা ও বিলায়েতের মকামে অধিষ্ঠিত এবং সাধারণ মানুষ ও তাদের চরিত্রের সংস্কার, সংশোধন ও প্রশিক্ষণে নিয়োজিত থাকা সত্ত্বেও তিনি পঠন-

১. ক'লাইদু'ল-জাওয়াহির, ৯ পৃ.; ২. তাবাক'াতু'ল-হ'ানাবিলা, ইবনে রজব।
৩. জিলাউ'ল-'আয়নায়ন, ১৩০, পৃ.; ৪, ৫,৬. ক'লাইদু'ল-জাওয়াহির।

পাঠন, ফতওয়া প্রদান, লোকের 'আকীদা শুদ্ধিকরণ ও আহলে-সুন্নত ওয়া'ল-জামা'আতকে সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানের ক্ষেত্রে তিনি এতটুকু গাফিল ছিলেন না। 'আকাইদ ও উসূলের ক্ষেত্রে তিনি ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) ও মুহাদ্দিছীনে কিরামের মতানুসারী ছিলেন। আহলে-সুন্নত ওয়া'ল-জামা'আতের মযহাব ও প্রাচীন বুযুর্গদের অনুসৃত মত তাঁর সমর্থন ও সহযোগিতার ফলে আরও শক্তি লাভ করে। ফলে 'আকীদাগত ও কার্যকর বিদ'আতের বাজার হয়ে যায় নিস্তব্ধ। ইবনু'স-সাম'আনী বলেন : সুন্নাহ্ অনুসারীদের শান, মর্যাদা ও সংখ্যা তাঁরই কারণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

মাদরাসায় তিনি একটি পাঠ তফসীরের, একটি হাদীছের, একটি ফিক্'হের ও একটি ইমামদের মধ্যকার মতভেদ ও তাদের পেশকৃত প্রমাণাদি বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। সকাল-সন্ধ্যা তফসীর, হাদীছ, ফিক্'হ, ইমামদের মযহাব, উসূলে ফিক্'হ, ও আরবী ব্যাকরণ বিষয়ে শিক্ষা দান চলত। জোহরের পর 'ইল্‌মে তাজবীদের তা'লীম হ'ত। এছাড়া ফতওয়া প্রদানের ব্যস্ততাও ছিল। সাধারণত তিনি শাফি'ঈ ও হাম্বলী মযহাব অনুসারে ফতওয়া দিতেন। ইরাকের 'আলিমরা তাঁর ফতওয়ায় খুবই বিস্মিত হতেন এবং তাঁর অকুণ্ঠ প্রশংসা করতেন।[১]

একবার এই মর্মে একটি ফত'ওয়া চেয়ে পাঠানো হয় যে, এক ব্যক্তি কসম খেয়েছে সে এমন কোন 'ইবাদত করবে, যা সম্পাদন করার সময় অপর কেউ শরীক থাকবে না। যদি সে এই কসম পূরণে ব্যর্থ হয় তাহলে তার স্ত্রী তিন তালাক হয়ে যাবে। অপরাপর 'উলামাকে এই ফতওয়া কিছুটা অপ্রস্তুত করে ফেলে। কেননা এমন কী 'ইবাদত থাকতে পারে যেখানে কেবল একটি লোকই থাকবে এবং তখন পৃথিবীর অন্য কোন লোকই তাতে শরীক থাকবে না। হযরত শায়খ (র)-এর নিকট এ ফতওয়া এলে তিনি কোনরূপ চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই তাৎক্ষণিকভাবে জওয়াব দিলেন : মাতাফ (বায়তুল্লাহ্‌র চতুষ্পার্শ্বস্থ তওয়াফ করবার উন্মুক্ত স্থান) তার জন্য খালি করে দাও আর সে একাকী খানা-ই-কা'বা সাতবার প্রদক্ষিণ সম্পূর্ণ করুক। 'উলামা-ই-কিরাম এ জওয়াব শ্রবণে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় মেতে ওঠেন এবং বলেন ঃ এটাই একমাত্র পথ যেখানে সে একাকী কারুর অংশদারিত্ব ব্যতিরেকেই 'ইবাদত করতে পারে। কেননা তওয়াফের জন্য বায়তুল্লাহ্ শর্ত ও মাতাফকে ঐ ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট করে দেবার পর সেখানে তার 'ইবাদতে অপর কারোর শরীক হবার কোন সম্ভাবনাই বাকি রইল না।[১]

---

১. শা'রানীর ত'াবাক'াতুল-কুবরা, ১ম খণ্ড,১২৬ পৃ. ও ত'াবাক'াতু'ল-হ'ানাবিলা, ইবনে রজবকৃত।

দৃঢ়তা প্রদর্শন ও পর্যবেক্ষণ

হযরত শায়খ (র) দৃঢ়তা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে পর্বতসম ছিলেন। পরিপূর্ণ আনুগত্য, গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য এবং গায়বী মদদ তাঁকে এমন এক স্থানে পৌঁছে দিয়েছিল যে, হক ও বাতিল, আলো ও আঁধার এবং সঠিক ইলহাম ও শয়তানী অপকৌশলের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করবার মত শক্তির অধিকারী তিনি প্রকৃতই হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সামনে এ সত্য দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হয়ে গিয়েছিল যে, শরীয়তে মুহাম্মাদীর হুকুম-আহকাম (বিধি-বিধান) ও হালাল- হারামের মাঝে কিয়ামত পর্যন্ত পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের এতটুকু আশঙ্কাও নেই। যদি কেউ এর বিপরীত দাবি করে তবে সে শয়তান। তিনি বলেন ঃ একবার একটি বিরাট 'আজীমুশ্‌শান আলো প্রকাশিত হয়, যদ্দ্বারা আসমানের প্রান্তদেশ ভরে যায়। অতঃপর এর থেকে একটি আকৃতি প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত আকৃতি আমাকে সম্বোধন করে বলল ঃ হে 'আবদুল কাদির! আমি তোমার প্রভু- প্রতিপালক। আমি তোমার জন্য সকল হারাম ও অবৈধ বস্তু হালাল করে দিয়েছি। আমি বললাম : দূর হ' শয়তান মরদূদ! এই না বলতেই সে আলো অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেল এবং ধোঁয়ায় রূপান্তরিত হ'ল। তখন গায়বী আওয়াজ ধ্বনিত হ'ল ঃ 'আবদুল কাদির! আল্লাহ্ তোমাকে তোমার জ্ঞান ও গভীর ধর্মোপলব্ধির কারণে বাঁচিয়ে দিলেন। নতুবা এভাবে আমি সত্তরজন সূফীকে পথভ্রষ্ট করেছি।[২] আমি বললাম : আল্লাহ্‌র মেহেরবানী। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল : হযরত! আপনি কি করে বুঝলেন যে, এ শয়তান? উত্তরে তিনি বললেন : তার ঐ কথা থেকে যে, আমি হারাম বস্তুকে তোমার জন্য হালাল করে দিয়েছি।

হযরত শায়খ (র) এও বলেছেন :

> যদি আল্লাহ্‌র নির্দেশিত সীমারেখার (শরীয়তের বিধানসমূহের) ভেতর থেকে কোন একটি সীমাও লংঘিত হয় তাহলে জেনে নাও, তুমি ফেতনার মধ্যে পড়ে গেছ এবং শয়তান তোমাকে নিয়ে খেলছে। এমতাবস্থায় তুমি তাৎক্ষণিকভাবে শর'ঈ বিধানের দিকে প্রত্যাবর্তন কর, তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর এবং প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনার জওয়াব দাও। আর তা এজন্য যে, প্রতিটি হাকীকত- যার পেছনে শরীয়তের কোন সমর্থন নেই- তা বাতিল ও পরিত্যক্ত।[১]

---

১. শা'রানীর ত'বাক'াতু'ল-কুবরা, ১ম খণ্ড, ১২৬ পৃ. ও ত'বাক'াতু'ল-হ'ানাবিলা, ইবনে রজবকৃত।

তাফবীদ* ও তওহীদ

তসলীম (আল্লাহ্র প্রতি শর্তহীন আত্মসমর্পণ), তাফবীদ* (সোপর্দের স্তরভেদ) ও তওহীদ-ই-কামিল ছিল হযরত শায়খ (র)-এর বিশিষ্ট অবস্থা। কখনো কখনো তা'লীম দিতে গিয়ে তিনি এ অবস্থা ও অবস্থানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতেন। আর তা বস্তুতপক্ষে তাঁর নিজেরই অবস্থা ছিল।

خوشتراں باشد که سر دلبراں + گفته آید در حدیث دیگراں

একবার তিনি ইরশাদ করেন ঃ

> যখন বান্দাকে কোন বিপদ ও কঠিন দুর্যোগের মাঝে নিক্ষেপ করা হয় তখন প্রথমে সে নিজেই তা থেকে বের হবার আপ্রাণ চেষ্টা করে। যদি পরিত্রাণ না পায় তবে আল্লাহ্র সৃষ্ট জগতের কারোর নিকট, যেমন বাদশাহ কিংবা শাসকমণ্ডলী কিংবা দুনিয়াদার কোন ব্যক্তি বা কোন আমীরের সাহায্যপ্রার্থী হয়। আর রোগ, শোক ও ব্যথা-বেদনার ক্ষেত্রে সে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়। যখন এদের কেউই তার কাজে আসে না তখনই সে দু'আ, কান্নাকাটি ও প্রশংসা-গীতিসহ পরওয়ারদিগার-ই-'আলমের দিকে ফিরে যায় অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের থেকেই সমস্যার সুরাহা হয়ে যায়, ততক্ষণ সে অন্যের নিকট প্রার্থী হবার কথা চিন্তা করে না। আর যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য কারোর নিকট থেকে মদদ লাভের সম্ভাবনা থাকে ততক্ষণ আল্লাহ্র দিকে ফিরেও তাকায় না। কিন্তু অন্য কারো নিকট থেকেও যখন কোন সাহায্য দৃষ্টিগোচর হয় না তখনই (অনন্যোপায় হয়ে) সে আল্লাহ্র হাতে গিয়ে ধরা দেয় এবং সর্বদাই দু'আ প্রার্থনা ও কান্নাকাটিতে মশগুল থাকে।
>
> অতঃপর আল্লাহ তা'আলা দু'আরত অবস্থায় তার মধ্যে ক্লান্তি এনে দেন, কিন্তু তার দু'আ কবূল করেন না। শেষ পর্যন্ত যখন সমস্ত কার্যকারণ শেষ হয়ে যায় এবং সবার থেকে সে বিচ্ছিন্ন ও আলাদা হয়ে পড়ে, তখনই আল্লাহ্র বিধানে তকদীর ও ফয়সালা কার্যকর হয় এবং তার ভেতর (আল্লাহ্ নিজের) কাজ সম্পাদন করেন। ঠিক তখনই বান্দা সমস্ত উপকরণ ও কার্যকারণ এবং সমগ্র ক্রিয়া-কর্ম থেকে বেপরোয়া হয়ে ওঠে এবং শুধু রূহ্'ই তার মধ্যে কার্যকর থাকে। তার চোখে সত্যের প্রকাশ ঘটে। সে তখন অতি অবশ্যই দৃঢ় বিশ্বাসী তওহীদবাদীতে পরিণত হয়। অকাট্যভাবে সে অবহিত হয় যে, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ছাড়া আর কেউই কিছু করতে পারে না এবং আল্লাহ ছাড়া কর্মশক্তি ও আরাম প্রদানকারীও আর কেউ নেই। সেই মহান সত্তা ব্যতিরেকে আর

কারোর হাতে ভাল-মন্দ, লাভ-ক্ষতি, দান-বঞ্চনা, জীবন-মরণ, 'ইয্যত-বেইয্যতী ও অভাব-প্রাচুর্য প্রদানের শক্তি নেই। সে সময় (তকদীর ও ফয়সালায়) বান্দাহ্র অবস্থা হয়, যেমন ধাত্রীর হাতে দুধের শিশু, গোসলকারীর হাতে মৃত ব্যক্তি, খেলোয়াড়ের হাতে পলো খেলার বল। দুধের শিশু, মৃত ব্যক্তি ও বলের যেমন নিজের নড়াচড়ার কোন ক্ষমতা যেমন নেই, সে নিজে নড়তে পারে না, অন্যকে নাড়াতেও পারে না, তেমনি এই বান্দারও নিজের করবার মত কিছুই থাকে না। সে স্বীয় মালিকের কর্মে নিজ সত্তার মধ্যে গায়েব হয়ে যায়। সে তার মালিক ও তার কর্ম ছাড়া আর কিছুই দেখে না, কিছুই শোনে না, কিছুই চিন্তা করে না, কিছুই বোঝে না। তখন বান্দা যদি কিছু দেখে তো তাঁর শিল্প, যদি কিছু শোনে তো তাঁরই কালাম (কথা ও বাণী)। তাঁরই জ্ঞানের সাহায্যে সে জ্ঞান লাভ করে এবং তাঁরই নিয়ামত সে আস্বাদন করে। তাঁর ওয়াদাতে সে খুশি হয়, তৃপ্তি পায় এবং সান্ত্বনা লাভ করে। তাঁর মহান সত্তা ভিন্ন অপরাপর সত্তার প্রতি সে ঘৃণা প্রকাশ করে। তাঁরই স্মরণে সে মস্তক অবনত করে এবং তাঁরই ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছাকে একাত্ম করে নেয়। সে একমাত্র তাঁর মহান সত্তার ওপরই আস্থা ও ভরসা রাখে। সে তাঁর মা'রিফতের নূর দ্বারা হিদায়াতপ্রাপ্ত এবং তাঁর কুদরতের রহস্য দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। সে তাঁর পবিত্র সত্তা থেকেই (প্রতিটি কথা) শোনে এবং তা স্মরণও রাখে। অতঃপর সে শুধু তাঁর নিয়ামতের ওপর হ'ামদ, ছানা, শুকরিয়া ও অভিনন্দন পেশ করে।[১]

আল্লাহ্র সৃষ্ট জগতের প্রতি স্নেহ

সাধারণভাবে সকল মানুষ, বিশেষ করে উম্মতে মুহাম্মাদিয়া (সা)-এর সঙ্গে তাঁর যে সম্পর্ক, তাদের সম্পর্কে তাঁর যে চিন্তা-ভাবনা ও তাদের অবস্থার প্রতি তাঁর যে স্নেহদৃষ্টি ছিল তা একমাত্র নায়েবে রসূল (রসূলের প্রতিনিধি স্থানীয়) এবং আল্লাহ্র মকবুল বান্দাদেরই 'আলামত। এটা পরিষ্কার প্রতিভাত হয় তাঁর সেই বক্তৃতা থেকে যেখানে তিনি বাজারে গমনকারী লোকদের অবস্থা ও মরতবা বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি অন্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে প্রকৃতপক্ষে নিজেরই অবস্থার (হাল) বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন :

এবং পঞ্চম ঐ ব্যক্তি যে বাজারে যখন প্রবেশ করে তখন আল্লাহ সম্পর্কে তার দিল ভরে যায়। বাজারের লোকদের ওপর তার দয়া হয়। সে প্রত্যক্ষ করে

১. ফতূহ 'ল-গায়ব, তরজমা মওলবী মুহ'াম্মাদ 'আল সাহেব কাকুরভী- (রমূযু'ল-গায়ব) ১১,১২,১৩ পৃ.।

আল্লাহ্‌র রহমত আর এই রহমতই তাকে দেখতে দেয় না, ঐ সমস্ত লোকের নিকট কি আছে। সে বাজারে প্রবেশের সময় থেকে বের হওয়া পর্যন্ত বাজারে সমবেত লোকদের জন্য দু'আ, ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) ও সুপারিশে মশগুল থাকে এবং তাদের প্রতি স্নেহ ও দয়া প্রদর্শন করে। তার দিল ঐ সব লোকের অবস্থাদৃষ্টে জ্বালা অনুভব করে। তার চোখে অশ্রু ঝরতে থাকে আর আল্লাহ পাক ঐ সব লোককে স্বীয় মহানুভবতা ও বদান্যতার কারণে যেসব নিয়ামত দান করেছেন তার জন্য আল্লাহ্‌র শুকরিয়া, হ'ামদ ও ছানায় মশগুল থাকে।[১]

হযরত শায়খ-এর যুগ ও পরিবেশ

হযরত শায়খ 'আবদুল কাদির জিলানী (র) ৭৩ বছর বাগদাদে অতিবাহিত করেন এবং এ সময়ের মধ্যে পাঁচজন 'আব্বাসী খলীফা তাঁর চোখের সামনেই একের পর এক খিলাফতের আসনে সমাসীন হন। যখন তিনি বাগদাদে আগমন করেন তখন ছিল খলীফা মুস্তাজহির বিল্লাহ আবুল 'আব্বাসের যুগ (৫১২ হি.)। তারপর মুস্তারশিদ, রাশেদ, আল-মুক'তাদী লি আমরিল্লাহ্ ও আল-মুস্তানজিদ বিল্লাহ যথাক্রমে খলীফার আসনে সমাসীন হন।

শায়খ (র)-এর এই যুগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনাবলীতে ভরপুর। সালজূক বংশীয় সুলতান ও 'আব্বাসী খলীফাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সে যুগে সর্বোচ্চ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে। সালজূকী সুলতানরা কখনো খলীফার সন্তুষ্টি ও রিযামন্দীসহ, আবার তাঁর বিরোধিতা ও অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও 'আব্বাসী হুকূমতের ওপর নিজেদের ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জানে-প্রাণে সচেষ্ট ছিলেন। কখনো কখনো খলীফা ও সুলতানের সেনাবাহিনীর মধ্যে দস্তুরমত যুদ্ধ সংঘটিত হ'ত। পরিণামে মুসলমানদেরই পরস্পরের খুন ঝরত।

এ ধরনের ঘটনা মুস্তারশিদের খিলাফত আমলে কয়েকবারই সংঘটিত হয়। ইনি 'আব্বাসী যুগের সর্বাধিক শক্তিশালী ও যোগ্য খলীফা[২] ছিলেন। তিনি অধিকাংশ যুদ্ধেই জয় লাভ করতেন। কিন্তু ১০ই রমযান, ৫১৯ হিজরীতে সুলতান মাস'উদ্ ও খলীফার মধ্যে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাতে খলীফার পরাজয় ঘটে। ইবনে কাছীর লিখেন :

---

১. ফতূহু'ল-গায়ব,—নিবন্ধ ৭১, পৃ. ১৭৫।

২. ইবনে কাছীর তাঁর প্রশংসায় লিখেছেন যে, মুস্তারশিদ বীর পুরুষ, দৃঢ় মনোবলসম্পন্ন, বাগ্মী, মিষ্টভাষী ও খুবই 'ইবাদত-গুযার খলীফা ছিলেন। বিশিষ্ট-অবিশিষ্ট নির্বিশেষে সকলের নিকটই তিনি প্রিয় ছিলেন। তিনিই 'আব্বাসী শেষ খলীফা যিনি জুম'আর দিনে খুতবা দানের রসম অব্যাহত রাখেন। ৪৫ বছর তিন মাস বয়সে তাঁকে হত্যা করা হয়। তাঁর খিলাফত কাল ছিল ১ বছর ২০ দিন (আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, দ্বাদশ খণ্ড, ২০৮ পৃ.)।

সুলতানের সেনাবাহিনী জয় লাভ করে। খলীফাকে বন্দী করা হয়। বাগদাদবাসীদের ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন করা হয়। এ সংবাদ অন্য প্রদেশগুলোতেও ছড়িয়ে পড়ে। বাগদাদ এই দুঃখজনক সংবাদে খুবই প্রভাবিত হয়। সেখানকার বাসিন্দাদের ভেতরও মানসিক বিপর্যয় দেখা দেয়। জনসাধারণ ক্ষোভে-দুঃখে মসজিদের মিম্বর পর্যন্ত ভেঙে ফেলে। তারা সালাতের জামা'আতে যোগদান থেকেই বিরত থাকে। মহিলারা তাদের মাথা থেকে দোপাট্টা খুলে ফেলে এবং শোক প্রকাশ করতে করতে বাইরে বেরিয়ে আসে। তারা খলীফার বন্দীদশা, তাঁর পেরেশানী ও বিপদ মুসীবতের জন্য মাতম করতে থাকে। অন্যান্য এলাকাও এ ব্যাপারে বাগদাদকে অনুসরণ করে। ফলে এ ফেতনা এতটা বেড়ে যায় যে, কম বেশি গোটা রাষ্ট্রই এর দ্বারা প্রভাবিত হয়। মালিক সন্‌জর স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রকে এই ঘটনার স্পর্শকাতর দিক সম্পর্কে অবহিত করেন এবং এর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কেও সতর্ক করে দেন। তিনি তাকে নির্দেশ দেন, যেন খলীফাকে তাঁর স্বপদে বহাল করা হয়। মালিক মাস'উদ এ আদেশ পালন করেন, কিন্তু বাতেনীরা (মুসলিম সমাজের বিভ্রান্ত একটি গুপ্তঘাতক সম্প্রদায় –অনুবাদক) খলীফাকে বাগদাদে নিয়ে আসার পথে নির্মমভাবে হত্যা করে।

এসব মর্মান্তিক ও দুঃখজনক ঘটনা শায়খ 'আবদুল কাদির জিলানী (র)-এর চোখের সামনেই সংঘটিত হয়। মুসলমানদের এ পরস্পর বিচ্ছিন্নতা, গৃহযুদ্ধ ও শত্রুতাকে তিনি স্বচক্ষে অবলোকন করেন। তিনি এও অবলোকন করেন যে, দুনিয়ার প্রতি ভালবাসার খাতিরে এবং দেশ, সাম্রাজ্য, সম্মান ও পদমর্যাদা লাভের জন্য মানুষ সব কিছুই করতে পারে। তাদের অন্তরে কেবল রাজদরবারের শান-শওকতরে প্রতি মোহই অবশিষ্ট আছে। তারা ক্ষমতাসীন ও সাম্রাজ্যের বড় বড় পদাধিকারী ব্যক্তিকে সম্মানের চোখে দেখে। প্রদেশ ও শহরগুলোর ক্ষমতা ও শাসনদণ্ডের অধিকারী হওয়ার জন্য তারা নিজেদের মস্তক বন্ধক রাখতেও রাযী।

শায়খ 'আবদুল কাদির জিলানী (র) প্রত্যক্ষভাবে ঐ সব ঘটনা থেকে দূরে থাকলেও ঐগুলোর কারণেই স্বীয় বিবেকের দংশন অনুভূতির জ্বালায় ছিলেন জর্জরিত। ঐ জ্বালা ও উত্তাপই তাঁকে অফুরন্ত হিম্মত, শক্তি ও ইখলাসের সঙ্গে ওয়া'জ-নসীহত, দা'ওয়াত, তরবিয়ত, আত্মার পরিশুদ্ধি ও নফসের সংস্কারের কাজে অনুপ্রাণিত করে। তিনি দুনিয়ার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে ঈমানী চেতনার পুনরুজ্জীবন, পারলৌকিক জীবনের গুরুত্ব, অনুপম চরিত্র, নির্ভেজাল তওহীদ ও পরিপূর্ণ ইখলাসের সাথে দা'ওয়াত প্রদানের ওপর তাঁর সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করেন।

ওয়া'জ ও খুতবা

হযরত শায়খ (র)-এর ওয়া'জ শ্রোতাদের অন্তরের বিদ্যুতের ন্যায় ক্রিয়া করত। তাঁর কথায় আজও এই তা'ছীর বিদ্যমান। 'ফতূহু'ল-গ'ায়ব' ও 'আল-ফাতহু'র-রাব্বানী'-এর নিবন্ধ এবং তাঁর মজলিসের ওয়া'জের শব্দরাজি আজও মানুষের অন্তরকে উত্তপ্ত করে। দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কথামালার সজীবতা ও প্রাণ স্পন্দন এখনো অটুট রয়েছে।

আম্বিয়া-ই-কিরাম ('আ)-এর প্রতিনিধিবৃন্দ ও কামিল 'আরিফদের বাণীর ন্যায় তাঁর এই সব বাণীও সমীচীন মুহূর্তে এবং শ্রোতার অবস্থা ও প্রয়োজন মুতাবিক উচ্চারিত হ'ত। মানুষ যে সব ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিল এবং যে সব ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ছিল সাধারণত সেগুলোর প্রতিবিধানের জন্যই তিনি ঐ সব বাণী প্রদান করতেন। সেজন্যই তাঁর খিদমতে উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁর ধর্মোপদেশ ও মুখনিঃসৃত বাণী থেকে নিজে নিজ ক্ষতস্থানের ওষুধ এবং নিজ নিজ প্রশ্ন ও সন্দেহের জওয়াব পেত। সাধারণের ওপর তাঁর ওয়া'জের প্রভাব পড়ার এবং জনগণের জন্য তা কল্যাণকর হবার এটিও ছিল একটি বড় কারণ। তাঁর যবান মুবারক থেকে যা কিছু বের হ'ত তা তার অন্তর থেকেই উৎসারিত হ'ত। আর এজন্যই তা শ্রোতার দিলের ওপর আছর করত। সিদ্দীকদের কথার এই তো শান!

নির্ভেজাল তওহীদ ও আল্লাহ্ ভিন্ন সকল শক্তির অস্তিত্বহীনতা

সে সময় জ্ঞানীদের জগত যেন ক্ষমতাসীন ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের আঁচলে বাঁধা ছিল। লোকেরা বিভিন্ন মানুষ ও বিভিন্ন ব্যক্তিত্বকে (هستی) তাদের লাভ-ক্ষতির মালিক ভাবতে শুরু করে দিল। যে সব উপকরণ মানুষের জন্য তৈরি করা হয়েছে সেগুলোকেই মানুষ নিজেদের প্রতিপালকের মর্যাদা দান করছিল। তকদীর ও ফয়সালাও মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে তারা ধরে নিয়েছিল। এমনি এক পরিবেশে হযরত শায়খ (র) বলেন :

> গোটা সৃষ্টি জগতকে এভাবে মনে কর, যেন এক মহাপরাক্রমশালী বাদশাহ, যাঁর দেশ বিরাট এবং আদেশ অত্যন্ত কঠোর, এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে তার গলদেশে বেড়ি এবং পায়ে শেকল পরিয়ে এক নদীর ধারে, যার ঢেউ ভয়াবহ, গভীরতা অপরিমেয় ও স্রোত তীব্র– এক দেবদারু জাতীয় বৃক্ষে ঝুলিয়ে রেখেছেন এবং নিজে সুন্দর ও উঁচু একটি চেয়ারে, যেখানে পৌঁছা মুশকিলের ব্যাপার, উপবেশন করেন। তাঁর পাশে তীর, ধনুক, নেযা,

কামানসহ সব ধরনের অস্ত্রশস্ত্রের পাহাড় জমে আছে যার পরিমাণ ও পরিসংখ্যান একমাত্র বাদশাহ্ ভিন্ন আর কেউ জানে না। এরপর তিনি ঐসব অস্ত্রশস্ত্রের ভেতর যেটি তার ইচ্ছা– ঝুলন্ত বন্দীর দিকে নিক্ষেপ করছেন। তাহলে এই তামাশা দেখবার দর্শকের জন্য এটা কি সমীচীন হবে যে, তারা সুলতানের দিক থেকে তাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবে এবং তার থেকে ভয় ও আশা ছেড়ে দেবে এবং গাছে ঝোলানো কয়েদীর কাছেই আশা করবে এবং তার প্রতিই ভয়ভীতি রাখবে? যে ব্যক্তি এমনটি করবে সে কি বুদ্ধিহীন ও নিছক পাগল বলে বিবেচিত হবে না? অতএব, জেনে রেখো, দৃষ্টির পর অন্ধত্ব, মিলনের পর বিচ্ছিন্নতা, উন্নতির পর অবনতি, হিদায়াতের পর গোমরাহী এবং ঈমানের পর কুফর থেকে আল্লাহ্র আশ্রয়ই শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম অবলম্বন।[১]

অন্য এক মজলিসে তওহীদ ও আখলাক এবং আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য সমস্ত কিছুর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের তা'লীম তিনি এভাবে দেন ঃ

তাঁর ওপরই নজর রাখো যিনি তোমার ওপর নজর রাখেন। তাঁর সামনেই থাকো যিনি তোমার সামনে থাকেন। তাঁর সঙ্গে মুহব্বত করো যিনি তোমাকে মুহব্বত করেন। তাঁর কথা মেনে চলো যিনি তোমাকে ডাকেন। নিজের হাত তাঁকেই দাও যিনি তোমাকে পতনের হাত থেকে রক্ষা করবেন, মূর্খতার অন্ধকার থেকে টেনে বের করবেন, ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবেন, ময়লা আবর্জনা ধুয়ে তোমাকে অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করবেন। তিনিই তোমাকে পচা-আবর্জনা, হীনতা-দীনতা এবং বদকার নফ্স ও পথভ্রষ্ট সাথী-সঙ্গীদের থেকে নাজাত দেবেন, নাজাত দেবেন ঐ সব প্রবৃত্তিজাত শয়তান, জাহিল দোস্ত, আল্লাহ্র পথের লুটেরা এবং সুন্দর, পবিত্র, উত্তম ও পছন্দনীয় বস্তু থেকে, বঞ্চনাকারীদের হাত থেকে। অভ্যাস আর কতক্ষণ? স্বভাব ও প্রকৃতির এই বিকৃতি আর কতদিন? কামনা-বাসনা আর কত? গর্ব ও ঔদ্ধত্যই বা আর কতদিন? দুনিয়া আর কতক্ষণ? সামনেই তো আখিরাত। সত্য ব্যতিরেকে আর কতদিন থাকবে? কোথায় চলেছো তোমরা (সেই মহান আল্লাহ্কে ছেড়ে যিনি) সকল বস্তুর স্রষ্টা ও নির্মাণকারী? যিনি আদি ও অন্ত, যিনি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য হৃদয়ের ভালবাসা, আত্মার প্রশান্তি, অভাব থেকে মুক্তি, দয়া-দাক্ষিণ্য সব কিছুই সেই মহান সত্তার পক্ষ থেকে এবং তাঁরই দিকে সব কিছুর প্রত্যাবর্তন।[২]

---

১. রমুযু'ল-গায়ব তরজমা ফতূহু'ল-গায়ব, নিবন্ধ ১৭, পৃ. ৪৯।
২. রমুযু'ল-গায়ব–নিবন্ধ ৬২. ১৫৭ পৃ.।

অপর এক মজলিসে তওহীদ সম্পর্কে তিনি খোলাখুলিভাবে বলেন :

গোটা সৃষ্টি জগত অক্ষম ও দুর্বল। কেউ তোমাকে লাভবান করতে পারে না, ক্ষতিগ্রস্তও করতে পারে না। লাভ-ক্ষতি সব কিছুই আল্লাহ্ তা'আলা কোন না কোন সৃষ্টির হাত দিয়ে করিয়ে থাকেন। যা কিছু তোমার জন্য উপকারী অথবা অপকারী, আল্লাহ্র জ্ঞান মুতাবিক সে সব কিছুই তোমার ভাগ্যে লেখা হয়ে গেছে। এর অন্যথা হবার নয়। যারা তওহীদবাদী ও নেককার— তারা অবশিষ্ট সৃষ্টি জগতের ওপর আল্লাহ্র নিদর্শন। এঁদের ভেতর কেউ কেউ এমন আছেন যাঁরা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য উভয় দিক দিয়েই দুনিয়া থেকে অনাবৃত উন্মুক্ত, যদিও তারা ধনাঢ্য। এই কলব যার পরিষ্কার, যে ব্যক্তি একে করায়ত্ত করতে পেরেছে, গোটা সৃষ্টি জগতের সে বাদশাহী পেয়ে গেছে। পাহলোয়ান সেই, বাহাদুর সেই, যে তার কলবকে আল্লাহ ভিন্ন অপর সব কিছু থেকে পাক রেখেছে এবং কলবের দরজার ওঁপর তওহীদের তলোয়ার ও শরীয়তের তরবারি নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে এই সংকল্প নিয়ে যে, সৃষ্টি জগতের কাউকেই সে তার কলবের ভেতরে প্রবেশ করতে দেবে না। সে তার কলবকে— যিনি মুক'াল্লিবা'ল-কু'লূব, (অন্তর-মনের গতিপথ পরিবর্তনকারী) তাঁর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে। সে এমন ব্যক্তি যার বাহ্যিক দিককে শরীয়ত ভদ্রতা শেখায় এবং অভ্যন্তর ভাগকে তওহীদ ও মা'রিফত শালীন রাখে।[১]

তিনি বাতিল মা'বূদের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন ঃ

আজ তুমি আস্থা স্থাপন করছ নিজের নফসের ওপর, সৃষ্টি জগতের ওপর, টাকা-পয়সার ওপর, ক্রয়-বিক্রয়ের ওপর এবং নিজ শহরের শাসকের ওপর। প্রকৃতপক্ষে এমন প্রতিটি বস্তু যার ওপর তুমি আস্থা স্থাপন করবে সেই তোমার মা'বূদ। এমন প্রত্যেক ব্যক্তি যাকে তুমি ভয় করবে কিংবা যার সম্পর্কে কিছু আশা পোষণ করবে, সেই তোমার মা'বূদ। এমন প্রত্যেক ব্যক্তি যার সম্পর্কে তুমি মনে কর যে, আল্লাহ তা'আলাই তার হাতে তোমার ভাল-মন্দ কিংবা লাভ-ক্ষতির দায়িত্ব দিয়েছেন— সেই তোমার মা'বূদ।[২]

আল্লাহ্র মর্যাদাবোধ, (কল্পিত) অংশীদারদের প্রতি ঘৃণা পোষণ এবং মানুষের প্রিয় বস্তুগুলোর ছিনতাই ও নষ্ট হয়ে যাবার গূঢ় রহস্য সম্পর্কে তিনি বলেন :

---

১. ফুয়ূয-ই-য়াযদানী, তরজমা-আল ফাতহু ''র-রব্বানী, মজলিস ১৩, পৃ. ৮৯।

২. ফুয়ূয-ই-য়াযদানী, তরজমা আল-আল-ফাতহু ''র-রব্বানী-মজলিস ২০, ১৩৭ পৃ.।

তোমরা অনেক সময় বলে থাক, "আমি যাকে ভালবাসি তার সাথে আমার ভালবাসা থাকে না, সে ভালবাসায় ফাটল ধরে কিংবা বিচ্ছিন্নতা দেখা দেয় অথবা যাকে ভালবাসি সে মারা যায় অথবা তার প্রতি বিরক্তি ও অসন্তুষ্টির কারণ ঘটে। যদি সম্পদ ভালবাসি তাহলে তা নষ্ট হয়ে যায় অথবা হস্তচ্যুত হয়।" তাহলে শোনো, হে আল্লাহ্‌র প্রিয়ভাজন! হে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহপ্রাপ্ত! হে আল্লাহ্‌র চোখের মণি! হে ঐ ব্যক্তি যার জন্য আল্লাহ্‌র মর্যাদাবোধ জাগ্রত হয়! তোমরা কি জান না যে, আল্লাহ্‌র মর্যাদাবোধ তীব্র! তিনি তোমাদেরকে তাঁর জন্যই পয়দা করেছেন, অথচ তোমরা অন্যের হয়ে থাকতে চাও। তোমরা কি আল্লাহ্‌র এ বাণী শোননি যে, আল্লাহ ঐ সমস্ত লোকের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট? তোমরা কি আল্লাহ্‌র এ বাণীও শোননি, "আমি জিন ও মানব জাতিকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যেন তারা আমার 'ইবাদত করে!" তোমরা কি রসূল (সা)-এর এ বাণী শোননি, "আল্লাহ্ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন তাকে পরীক্ষার মাঝে নিক্ষেপ করেন? যদি সে সবর করে তাহলে তিনি তাকে একাকীত্বের মাঝে ছেড়ে দেন।" জিজ্ঞাসা করা হ'ল, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! একাকীত্বের মাঝে ছেড়ে দেবার অর্থ কি?" বলা হ'ল, "তার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি অবশিষ্ট রাখা হয় না। এটা এজন্য যে, সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি থাকলে স্বভাবতই সে ঐগুলোর প্রতি মোহাবিষ্ট থাকবে এবং আল্লাহ্‌র সঙ্গে তার যে মুহব্বত তা বিভিন্ন পর্যায়ে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হয়ে হক ও বে-হকের মধ্যে ভাগাভাগির সৃষ্টি হবে। আর আল্লাহ্ এই ভাগাভাগি বা অংশীদারিত্ব কবূল করেন না।" তিনি সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধসম্পন্ন। প্রতিটি বস্তুর ওপরই তিনি প্রবল ও শক্তিমান, এমন কি তখন তিনি তার শরীরকে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে দেন যাতে তাঁর বান্দাহ্‌র দিল খালেস ও নির্ভেজাল থাকে যে কোন শরীক হতে। সে মুহূর্তে তাঁর বাণী, "তিনি ঐ সমস্ত লোককে ভালবাসেন এবং তারাও ভালবাসে তাঁকে"–এর সত্যতা প্রকাশিত হয়, এমন কি দিল্ যখন (আল্লাহ্‌র ঐ সব কৃত্রিম) শরীক ও দাবিদার থেকে, পরিবার-পরিজন, স্বাদ, সম্পদ, বিলায়েত, রিয়াযত, কারামত, মর্যাদা, জান্নাত, নৈকট্য, এ সব কিছুর কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত ও পবিত্র হয়ে যায়– তখন তার ভেতর কোন ইচ্ছা কিংবা আকাঙ্ক্ষাই আর অবশিষ্ট থাকে না। তখন তা ঐ ছিদ্রযুক্ত পাত্রের মত হয়ে যায় যার ভেতর কোন জিনিসই দাঁড়ায় না। যখন তার ভেতর কোন ইচ্ছা ও অভিপ্রায় জাগে তখন আল্লাহ্‌র কর্ম ও মর্যাদাবোধ তাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়, তার দিলের চতুষ্পার্শ্বে মর্যাদা, মাহাত্ম্য ও ভীতির পর্দা ফেলে দেওয়া হয় এবং

তার ধার ঘেঁষে অহঙ্কার ও প্রভাবের পরিখা খনন করা হয়। এতে তার দিলে কোন জিনিসের আকাঙ্ক্ষাই প্রবেশ করতে পারে না। তখন দিল, আসবাব অর্থাৎ সম্পদ, পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, কারামত, হিকমত, বর্ণনাশক্তি কোন কিছুই তার জন্য ক্ষতির কারণ হয় না। কেননা ঐ সব তার দিলের বাইরে থাকে। আল্লাহ তা'আলা তখন মর্যাদাবোধের ক্ষেত্রে এসংবকে আর প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবেন না, বরং এসব জিনিসই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বান্দার জন্য আনন্দের উপকরণ, কারামত, রিয্ক ও নিয়ামত হিসাবে প্রতিভাত হয়। তখন যে লোকই তার নিকট আসে তিনি তার উপকারার্থে কাজ করেন।[১]

পরাভূত ও পর্যুদস্ত দিলের সান্ত্বনা

হযরত শায়খ (র)-এর যমানায় একটি শ্রেণী এমন ছিল যারা নিজেদের 'আমল, আখলাক ও ঈমানী অবস্থার দিক দিয়ে দরিদ্র ও পশ্চাৎপদ ছিল, কিন্তু পার্থিব ও জাগতিক দিক দিয়ে ছিল উন্নত ও সৌভাগ্যবান। এর বিপরীতে অপর শ্রেণী ছিল জীবিকার দিক দিয়ে দরিদ্র, পার্থিব ও জাগতিক দিক দিয়ে বঞ্চিত, অসহায় ও নিঃস্ব, কিন্তু 'আমল ও আখলাকের দিক দিয়ে উন্নত এবং ঈমানী অবস্থার দিক দিয়ে ভাগ্যবান ও ঐশ্বর্যশালী। তারা প্রথম শ্রেণীর কামিয়াবী, সাফল্য ও উন্নতিকে কতক সময় ঈর্ষার চোখে দেখত এবং নিজেদেরকে কোন কোন সময় বঞ্চিত ও ব্যর্থ মনে করত। হযরত শায়খ (র) মানসিক দিক দিয়ে সেই পরাজিত ও পর্যুদস্ত শ্রেণীর লোকদের মনকে প্রবোধ দেন, তাদের ওপর আল্লাহ্র যে সব দান ও অনুগ্রহ রয়েছে তার উল্লেখ করে সেই বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্যের পেছনে যে গূঢ় কারণ তাও অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন:

> ওহে শূন্য হস্তের অধিকারী ফকীর! ওহে সেই ব্যক্তি যার সম্পর্কে তামাম দুনিয়া বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে! ওহে নাম-নিশানাশূন্য অখ্যাত অজ্ঞাত ব্যক্তি! ওহে ক্ষুধার্ত, পিপাসার্ত, নগ্ন ও ভগ্ন হৃদয় মানব সন্তান! ওহে মসজিদ ও শুঁড়ীখানা থেকে বহিষ্কৃত ব্যক্তি! ওহে প্রতিটি দরওয়াজা থেকে বিতাড়িত বনী আদম! ওহে মনোরথ পূরণে বঞ্চিত, মাটির ওপর পতিত ব্যক্তি! ওহে সেই ব্যক্তি যার দিলে সমাহিত (দাফনকৃত) আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কামনা-বাসনার ঘর-বাড়ি পুরুষানুক্রমে আবাদ রয়েছে! .... তুমি এটা ব'ল না যে, 'আল্লাহ আমাকে পরমুখাপেক্ষী বানিয়েছেন, দুনিয়াকে আমার থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন, আমাকে ধ্বংস ও পয়মাল করে দিয়েছেন, আমাকে পরিত্যাগ করেছেন, আমার

১. রমুযু'ল-গায়ব, ৩২নং নিবন্ধ, ৮৪-৮৬ পৃ.।

সঙ্গে শত্রুতা করেছেন, আমাকে পর্যুদস্ত করেছেন, আমার দিকে এতটুকু তাকান নি, আমাকে অবনমিত করেছেন, দুনিয়াতে আমাকে এতটুকু প্রাচুর্য দেননি, আমাকে নাম-নিশানাহীন ও অজ্ঞাত বানিয়ে রেখেছেন– সৃষ্টি জগতে ও আমার ভাইদের মাঝে, অথচ অন্যের ওপর তাঁর সমস্ত নিয়ামত বর্ষণ করেছেন। ঐ সমস্ত নেয়ামতের ভেতর সে রাত-দিন অতিবাহিত করে, তাকে আমার ও আমার দেশবাসীর ওপর ফযীলত ও মর্যাদা দিয়েছেন, অথচ সেও যেমন মুসলিম, আমিও তেমনি মুসলিম। একই পিতা মাতা–আদম ও হাওয়ার সন্তান আমরা উভয়েই।' (ওহে ফকীর)! আল্লাহ তোমার সঙ্গে এরূপ আচরণ তোমার উপকরার্থেই করেছেন। এই আচরণের ফলেই তোমার প্রকৃতি ও স্বভাব এটেল মাটির মত বালুশূন্য এবং রহমতের বারিধারা বর্ষিত হচ্ছে, তোমার ওপর অব্যাহত ধারায় ধৈর্য, তুষ্টি, আনুকূল্য ও ইয়াকীন,জ্ঞান ('ইল্‌ম), ঈমান ও তওহীদের মত মূল্যবান আলোকরশ্মি তোমার আশেপাশে প্রজ্জ্বলিত। তোমার ঈমানের বৃক্ষ স্বস্থানে সুদৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। তাতে কলি হচ্ছে, ফল হচ্ছে, বৃদ্ধি ঘটছে, ডালপালা বিস্তার লাভ করছে। বৃক্ষটি ছায়া দিচ্ছে এবং দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। তাকে বাড়বার, লালন-পালন করবার জন্য সার দেবার দরকার নেই। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা তোমার হুকুম থেকে মুক্ত এজন্য যে, তিনি নিজেই তোমার প্রয়োজন সম্পর্কে ভালভাবে জ্ঞাত আছেন। তিনি ইহকালীন জীবনে তোমাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন এবং শান্তি-মঙ্গলের অধিকারী বানিয়েছেন। আর পরলোকে তোমার জন্য এত বেশি অনুগ্রহ রেখেছেন, যা কারো চোখ দেখেনি, কারো কান শোনেনি এবং কারো অন্তর তার কল্পনাও করতে পারেনি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "কেউই জানে না তার জন্য তার কৃতকর্মের বিনিময় হিসাবে নয়ন প্রীতিকর কী পুরস্কার রক্ষিত আছে।"

অপরদিকে যে সমস্ত লোককে আল্লাহ পাক অনুগৃহীত করেছেন, দুনিয়ায় বিত্ত-সম্পদের অধিকারী করেছেন এবং জাগতিক ও পার্থিব নিয়ামত দান করেছেন, তাদের প্রতি এ আচরণ ও এ অনুগ্রহ করেছেন এজন্য যে, তাদের ঈমানের জায়গাটি এমন বালুকাময় ও প্রস্তর-সংকুল যে, সেখানে পানি আটকিয়ে রাখা এবং উদ্ভিদ, শস্য ও ফলবান বৃক্ষ জন্মানো কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তবে তেমন যমীনেও গোবর ও সার প্রয়োগ করে চারা ও বৃক্ষের প্রতিপালন সম্ভব। আর দুনিয়ার সার হচ্ছে ঐ সমস্ত পার্থিব সামান (সাজ-সরঞ্জাম ও উপকরণ), যা দ্বারা ঈমানী বৃক্ষ ও চারারূপী 'আমল যা ঐ ব্যক্তির ভূ-খণ্ডে

গজিয়েছে– তার রক্ষণাবেক্ষণ হতে পারে। যদি ঐ সব উপকরণ তার থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয় তাহলে চারা গাছ ও বৃক্ষ শুকিয়ে যাবে, তাতে ফল ধরবে না, গোটা সংসারটাই বিরান হয়ে যাবে, অথচ আল্লাহ তা টিকিয়ে রাখার ইচ্ছা রাখেন। অতএব, ওহে ফকীর! জেনে রেখ, ধনবান ব্যক্তির ঈমানী বৃক্ষের ভিত্তিমূল দুর্বল ও কমযোর, আর তোমার ঈমানী বৃক্ষ সজীব ও ফলে-ফুলে সুশোভিত। ধনবান ব্যক্তির ঈমানকে ঐসব জিনিস দ্বারা মযবুত রাখা হয়েছে যা তার আশেপাশে নানা নিয়ামতরূপে তোমার দৃষ্টিগোচর হয়। বৃক্ষের দুর্বলতার সুযোগে যদি এসব বস্তু তার থেকে পৃথক করে দেওয়া হয় তাহলে তার ঈমানী বৃক্ষ শুকিয়ে গিয়ে কুফর ও অস্বীকৃতির বৃক্ষে পরিণত হবে এবং সে মুনাফিক ও ধর্মত্যাগী (মুরতাদ)-দের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এ পরিস্থিতিতে অবশ্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর খাস মেহেরবানীতে ধনবানদের প্রতিও সবর ও তুষ্টি, ইয়াকীন ও 'ইলম এবং বিভিন্ন রকমের সেনাবাহিনী পাঠান যার ফলে তার ঈমান শক্তিশালী হয়ে যায় এবং তার থেকে ধনাঢ্যতা ও নিয়ামত আলাদা হয়ে গেলেও সে ওসবের কোন পরওয়া করে না।[১]

দুনিয়ার সত্যিকার মর্যাদা ও অবস্থান

হযরত শায়খ (র) বৈরাগ্যবাদের শিক্ষা দিতেন না। দুনিয়ার ব্যবহার এবং তার থেকে প্রয়োজনানুপাতে উপকার ও কল্যাণ লাভ করতে তিনি কাউকে নিষেধ করতেন না। তিনি শুধু এর পূজা ও দাসত্ব এবং এর প্রতি আত্মিক ভালবাসার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে নিষেধ করতেন। তাঁর ওয়া'জ বস্তুতপক্ষে নবী করীম (সা)-এর হাদীছ– ان الدنيا خلقت لكم وانكم خلقتم للاخرة (তোমাদের জন্য দুনিয়া সৃষ্টি করা হয়েছে আর আখিরাতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তোমাদেরকে) অর্থাৎ দুনিয়া তোমাদের জন্য বাঁদী– অনুযায়ী ছিল।

একবার তিনি বলেন :

দুনিয়ার মধ্য থেকে নিজ বণ্টিত দ্রব্য এমনভাবে খেয়ো না যাতে দুনিয়া বসে থাকে আর তুমি থাক দাঁড়িয়ে; বরং তুমি তার থেকে এমনভাবে খাও যাতে তুমি বসে থাক এবং সে পাত্র মাথায় তোমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। দুনিয়া তারই খিদমত করে যে আল্লাহ তা'আলার অপার রহমতের দরওয়াজায় গিয়ে

১. ফুযূয-ই-য়াযদানী, ২১তম মজলিস, ১৪৫ পৃ.।

(হাত পেতে) দাঁড়ায়, আল্লাহ তাকে অবমানিত করেন। খাও, আল্লাহ্র সঙ্গে; সম্মান ও ধনাঢ্যতার কদমের ওপর।[১]

অন্য একবার বলেন :

দুনিয়া হাতে রাখা জায়েয, পকেটে রাখা জায়েয, ভাল কোন নিয়তে তাকে জমা রাখাও জায়েয; কিন্তু হৃদয়ে রাখা জায়েয নয় (যাতে করে অন্তর থেকে তুমি তাকে প্রিয় জ্ঞান করতে শুরু কর)।[২]

খলীফা ও সমসাময়িক শাসকদের সমালোচনা

হযরত শায়খ (র) কেবল ওয়া'জ-নসীহত ও ধর্মের প্রতি মৌখিক অনুপ্রেরণা দানকেই যথেষ্ট মনে করতেন না, বরং যেখানেই প্রয়োজন বোধ করতেন অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় নির্ভীকভাবে আমরু বি'ল-মা'রূফ ওয়া নাহী 'আনি'ল-মুনকার তথা সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করাকে অপরিহার্য মনে করতেন। শাসক, সুলতান ও তৎকালীন খলীফারও তিনি কঠোর সমালোচনা করতেন এবং তাঁদের অন্যায় কর্ম ও ভুল সিদ্ধান্তের নিন্দা জ্ঞাপন থেকে পরাঙমুখ থাকতেন না। এ ক্ষেত্রে তিনি কঠোর প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ভীতিকর ব্যক্তিত্বেরও কোন পরওয়া করতেন না। হাফিজ 'ইমাদুদ্দীন ইবনে কাছীর তাঁর বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন :

كان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر للخلفاء والوزراء والسلاطين
والقضاة والخاصة والعامة يصدعهم بذالك على رؤس الاشهاد ورؤس المنابر
وفى المحافل وينكر على من يولى الظلمة ولا تاخذه فى الله لومة لائم .

তিনি খলীফা, উযীর, সুলতান, বিচারের দায়িত্বে সমাসীন ব্যক্তিবর্গ এবং বিশিষ্ট ও সর্বসাধারণ সবাইকেই আমরু বি'ল-মা'রুফ ওয়া নাহী 'আ-নি'ল মুনকার তথা সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতেন এবং অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় ও সাহসিকতার সঙ্গে প্রকাশ্য জনসমাবেশে ও মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যে তাঁদের ত্রুটি ধরতেন। যিনি কোন জালিমকে শাসক হিসাবে নিযুক্তি দিতেন তিনি তাঁর নিযুক্তির ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করতেন এবং আল্লাহ্র ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দা বাক্যের পরওয়া করতেন না।[৩]

'ক'লাইদু'ল-জাওয়াহির' প্রণেতা লিখেছেন : খলীফা মুক'তাফী লি-আমরিল্লাহ কাযী আবু'ল-ওয়াফা ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সা'ঈদ ইবন ইয়াইইয়া ইবনু'ল-

---

১. ফুয়ূয-ই-য়াযদানী, ২১তম মজলিস. ১৪৫ পৃ.।
২. ফুয়ূয-ই-য়াযদানী, ১৫তম মজলিস, ৩৬৩ পৃ.।
৩. ক'লাইদু'ল-জাওয়াহির, পৃ. ৮।

মুজাফ্ফারকে, যিনি 'ইবনু'ল-মুরজাম আজ-জালিম' উপাধিতে কুখ্যাত ছিলেন, কাযী নিযুক্ত করলে হযরত শায়খ (র) প্রকাশ্য মিম্বরে দাঁড়িয়ে খলীফাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন :

وليت على المسلمين اظلم الظالمين ما جوابك غداً عند رب العلمين ارحم الراحمين

তুমি মুসলমানদের ওপর এমন এক ব্যক্তিকে শাসক নিযুক্ত করেছ যার চাইতে বড় জালিম আর নেই। কাল কিয়ামতের ময়দানে তুমি আল্লাহ্ রাব্বু'ল-'আলামীন, যিনি আরহ'মু'র-রাহি'মীনও বটেন-এর সামনে এর কী জওয়াব দেবে?

উক্ত ঐতিহাসিক আরো বলেন, খলীফা একথা শুনে শিউরে উঠে কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং তখনই উক্ত কাযীকে তার পদ থেকে অপসারিত করেন।[১]

হযরত শায়খ (র) সেই সব "দরবারী ও সরকারী" 'আলিম-'উলামা ও মাশায়েখদের কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করতেন এবং নির্ভীকভাবে তাদের স্বরূপও উদ্ঘাটন করতেন যারা তাক'ওয়া ও আল্লাহ্-ভীতি ছেড়ে ক্ষমতাসীনদের মোসাহেবী অবলম্বন করেছিল এবং ওদের সুরে সুর মেলানো যাদের স্বভাবে পরিণত হয়েছিল, যাদের কারণেই আল্লাহ্র অবাধ্যতার ক্ষেত্রে ঐ সব সুলতান ও শাসকদের দুঃসাহস আরো বেড়ে গিয়েছিল। একবার এই শ্রেণীর লোকদের সম্বোধন করতে গিয়ে বলেন :

ওহে 'ইল্ম ও 'আমলে খেয়ানতকারী ব্যক্তিগণ! তোমাদের সাথে তার কী সম্পর্ক? ওহে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দুশমন দল! ওহে আল্লাহ্র বান্দাদের লুণ্ঠনকারী দুর্বৃত্তের দল! তোমরা প্রকাশ্য জুলুম ও মুনাফিকীতে লিপ্ত রয়েছ। তোমাদের এই মুনাফিকী আর কতদিন থাকবে? ওহে 'আলিমগণ! ওহে বুযুর্গের দল! আর কত দিন তোমরা মুনাফিকী করে বাদশাহ ও সুলতানদের পার্থিব অর্থ-বিত্ত, ধন-সম্পদ এবং তাদের স্ফূর্তি ও কামনা-বাসনার সঙ্গী হয়ে থাকবে? তোমরা ও অধিকাংশ বাদশাহ্ এ যুগে আল্লাহ্র অবদান ও তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে জালিম ও খেয়ানতকারীতে পরিণত হয়েছ। হে আল্লাহ! এই মুনাফিকদের শান-শওকত তুমি ভেঙে গুঁড়িয়ে দাও এবং তাদেরকে হেয় ও অপমানিত কর অথবা তাদের তুমি তওবাহ করবার তওফীক দাও। জালিমদের দুর্গ তুমি ধ্বসিয়ে দাও এবং তোমার যমীনকে তুমি তাদের থেকে পবিত্র কর অথবা তাদের সংশোধন কর।[২]

১. ক'লাইদু'ল-জাওয়াহির, পৃ. ৮।
২. ফুয়ূয-ই-য়াযদানী, মজলিস ৫১, পৃ. ৩৬৩।

অন্য একবার এ শ্রেণীরই লোকদের সম্বোধন করতে গিয়ে তিনি বলেন :

তোমাদের কি লজ্জা হয় না যে, তোমাদের লোভ-লালসাই জালিমের খেদমত ও হারামখোরীতে তোমাদের উৎসাহিত করছে! আর কতদিন তোমরা হারাম খাবে এবং কতদিন ঐ সব (জালিম) বাদশাহ্র খিদমতগার হিসাবে থাকবে? যাদের খিদমতে তোমরা নিয়োজিত রয়েছ তাদের বাদশাহী শীঘ্রই খতম হয়ে যাবে এবং তোমাদের শেষ পর্যন্ত সেই আল্লাহ্র খিদমতে হাযির হতে হবে, যাঁর সত্তা অবিনশ্বর, যিনি ধ্বংস ও পতনের হাত থেকে চির মুক্ত।[১]

দীন (ইসলাম)-এর জন্য অন্তর্জ্বালা ও উৎকণ্ঠা

হযরত শায়খ (র) মুসলমানদের ধর্মীয়, নৈতিক ও চারিত্রিক অধঃপতন (যার সবচেয়ে বড় কেন্দ্র ছিল তখনকার বাগদাদ) প্রত্যক্ষ করে দারুণ যাতনা অনুভব করতেন। তাঁর এই মানসিক অনুভূতি ও বেদনাকে তিনি কতক মুহূর্তে লুকিয়ে রাখতে পারতেন না, তাঁর প্রদত্ত খুতবা ও ওয়া'জে তা উদ্বেল হয়ে উঠত।

একবার তিনি বলেন :

জনাব রসূলুল্লাহ (সা)-এর (আনীত) ধর্মের প্রাচীর ক্রমে ক্রমে খসে পড়ছে এবং তার ভিত্তি ধ্বসে যাচ্ছে। ওহে যমীনের অধিবাসীবৃন্দ! এস, যা পড়ে গেছে আমরা তা মযবুত করে (টেনে) তুলি এবং যা ধ্বসে গেছে তাকে ঠিক-ঠাক করি। একের দ্বারা এ কাজ হবার নয়। আমাদের সবাইকে মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। ওহে চাঁদ ও সুরুজ! ওহে দিন! তোমরা সবাই এস।[২]

আর একবার তিনি বলেন ঃ

ইসলাম কাঁদছে এবং পরিত্রাণ চাচ্ছে ফাসিক, বিদ'আতী, গোমরাহ (পথভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট), ধোঁকাবাজ ও ষড়যন্ত্রের পোশাক পরিহিত মুনাফিকদের বাড়াবাড়ি থেকে। নিজেদের পূর্ববর্তী ও সম্মুখবর্তী লোকদের দিকে তাকিয়ে গভীরভাবে ভেবে দেখ, যারা সৎ কাজে আদেশ দিতেন, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতেন, যারা খানাপিনা করতেন এবং পৃথিবীর বুকে চলাফেরা করতেন তারা আকস্মিকভাবে ইনতিকাল করে আজ এমনই হয়ে গেছেন যে, মনে হচ্ছে, পৃথিবীর বুকে কোনদিন তাদের অস্তিত্বই ছিল না। কী কঠিন তোমার অন্তর! কুকুরও শিকার করা, ক্ষেত-খামার ও পশুপালের পাহারা দেওয়া এবং সম্পদের হেফাজত করার ক্ষেত্রে আপন মালিকের অনুগত থাকে এবং তাকে দেখে

১. ফুয়ূয-ই-য়াযদানী, মজলিস ৫২, পৃ. ৩৭২; ২. মলফূজাত, ৬৪৯ পৃ.।

খুশীতে লেজ ও মাথা নেড়ে আনন্দ প্রকাশ করে, অথচ মালিক তাকে সন্ধ্যা বেলা কেবল এক-দুই লুকমা (গ্রাস) খাবারই দেয়। আর তুমি সব সময় আল্লাহ্‌র দেয়া নানা ধরনের নেয়ামত দ্বারা পরিতৃপ্তি সহকারে উদর পূর্তি করছো। কিন্তু সে সব নেয়ামত দেবার পেছনে দানকারীর যে উদ্দেশ্য ক্রিয়াশীল-না তুমি তা পূরণ করছো, আর না তুমি তার হক আদায় করছো; (বরং এর বিপরীতে) তুমি তাঁর নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করছো এবং শরীয়তের নির্দেশিত সীমারেখার হেফাজত করছো না।[১]

বায়'আত ও তরবিয়ত

তাঁর এসব প্রভাবমণ্ডিত ও বিপ্লবাত্মক ওয়া'জ দ্বারা বাগদাদবাসীদের বিরাট আধ্যাত্মিক (রূহ'ানী), নৈতিক ও চারিত্রিক কল্যাণ সাধিত হয় এবং হাযার হাযার মানুষের জীবন ও যিন্দেগীতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে বটে, তবে জীবনের গভীর পরিবর্তন, সামগ্রিক সংস্কার-সংশোধন ও স্থায়ী প্রশিক্ষণের জন্য দা'ওয়াতের যিনি দা'ঈ-তাঁর সঙ্গে স্থায়ী ও গভীর সম্পর্ক এবং অব্যাহত ও পর্যায়ক্রমিক সংস্কার-সংশোধন ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন বাকী থেকে যায়। ধর্মোপদেশ ও দা'ওয়াতী মজলিস প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে মাদ্‌রাসার মত সুশৃঙ্খল ও স্থায়ী হয় না। একমাত্র মাদ্‌রাসার ছাত্র ও শিষ্যদেরকেই ধারাবাহিক ও সুশৃঙ্খলভাবে তা'লীম ও তরবিয়ত দেওয়া এবং তাদের নিয়মিত দেখাশোনা করা সম্ভব। অপরদিকে মজলিসে অংশগ্রহণকারী শ্রোতৃবর্গ স্বাধীন হয়ে থাকেন। এমনও হয় যে, শ্রোতা একবার মাত্র মজলিসে আসেন, দ্বিতীয়বার আর আসেন না কিংবা সর্বদা আসেন, কিন্তু তার অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় না, বরং তার জীবনে শূন্যতা এবং ধর্মীয় ও চারিত্রিক ফাটল বহালই থেকে যায়।

মুসলিম জনবসতির বিস্তার, জীবন যাপনের দায়িত্ব বৃদ্ধি এবং রুটি-রূযীর ভাবনা তখন এতখানি বেড়ে গিয়েছিল যে, মাদরাসার মাধ্যমে (যেগুলোকে অনেক রসম-রেওয়াজ ও বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হয়) সাধারণ ও ব্যাপক সংস্কার-সংশোধন ও প্রশিক্ষণের কাজ নেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই বড় ধরনের কোন ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক বিপ্লবও তখন আশা করা যেত না। এমতাবস্থায় মুসলমানদের বিরাট জনসংখ্যার ঈমানী পুনর্জাগরণের এমন কোন্ পথটি খোলা ছিল, যার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ ধর্মীয় বিধি-নিষেধগুলো পরিপূর্ণ উপলব্ধি ও দায়িত্বানুভূতির সঙ্গে মেনে চলার অনুপ্রেরণা পেতে পারে, তাদের মধ্যে পুনরায় ঈমানী চেতনা ও

১. ঐ, ৬৬১ পৃ. (ফুয়ূয-ই-য়াযদানী);

ধর্মীয় উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হতে পারে, তাদের মুর্দা দিল ও বিমর্ষ চিত্তে পুনরায় প্রেমের উত্তাপ সঞ্চারিত হতে পারে, তাদের নিঃশেষিত ও ক্ষয়প্রাপ্ত গ্রন্থি ও অস্থিমজ্জায় আবার চলৎশক্তি ও যৌবনের আমেজ, নফসানী (প্রবৃত্তিজাত) ও রূহ'নী (আধ্যাত্মিক) রোগ-বাধির চিকিৎসা, ধর্মের ক্ষেত্রে সঠিক আলো ও বিশুদ্ধ হিদায়াত লাভ করতে পারে? পাঠক ইতোমধ্যে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে, এই মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল খিলাফতের এবং এটা এজন্য যে, যে নবীর প্রতিনিধিত্ব ও নিসবতের (সম্পর্কের) ওপর এই খিলাফত কায়েম ছিল, সায়্যিদুনা হযরত ওমর ইব্ন 'আবদুল 'আযীয (র)-এর ভাষায়: বিশ্ববাসীকে হিদায়াত করবার জন্যই তাঁকে পাঠানো হয়েছিল-রাজস্ব আদায়কারী হিসাবে নয়; কিন্তু তখনকার খলীফারা এই দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে শুধু গাফিল ছিলেন বা দূরে সরে গিয়েছিলেন তাই নয়, বরং স্বীয় 'আমল ও কৃতকর্মের দিক দিয়েও তাঁরা এর জন্য ক্ষতিকর এবং এ পথের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। উপরন্তু তারা এতখানি বদগুমান, কল্পনাপ্রবণ ও সন্দেহপরায়ণ ছিলেন যে, তাঁরা নতুন কোন সংগঠন ও দা'ওয়াতকে– যার ভেতর নেতৃত্ব ও রাজনীতির সামান্যতম গন্ধও পাওয়া যেত, বরাদাশ্ত করতে পারতেন না এবং সেটাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে প্রয়াসী হতেন।

এমতাবস্থায় মুসলমানদের মধ্যে নবতর ধর্মীয় চেতনা সৃষ্টি ও নতুন নিয়ম-শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য একটি মাত্র রাস্তাই খোলা ছিল এবং তা হ'ল, আল্লাহ্র কোন একনিষ্ঠ (মুখলিস) বান্দা মহানবী (সা)-এর প্রবর্তিত তরীকার ওপর ঈমান, 'আমল ও শরীয়তের আনুগত্যের জন্য বায়'আত নেবেন। মুসলমানগণ তাঁর হাতের ওপর স্বীয় সাবেক গাফিলতী ও জাহেলিয়াতী যিন্দেগী থেকে তওবা করবে এবং ঈমানের পুনরুজ্জীবন ঘটাবে। পয়গম্বরের সেই প্রতিনিধি তাঁদের ধর্মীয় তত্ত্বাবধান ও প্রশিক্ষণ দান করবেন, আপন সাহচর্যের মায়াবী প্রভাব, প্রেমের স্ফুলিঙ্গ ও নফসের উত্তাপ দ্বারা পুনরায় মুসলমানদের ঈমানের মধ্যে উত্তাপ, মুহব্বত, খুলূসিয়াত, আল্লাহ্র জন্য সবকিছু বিলিয়ে দেওয়ার মানসিকতা, সুন্নাহ অনুসরণের আবেগ-উৎসাহ এবং পারলৌকিক জীবনের মঙ্গল কামনার উদ্দীপনা সৃষ্টি করে দেবেন। তাঁর সাথে গড়ে ওঠা নতুন সম্পর্ক থেকে তারা অনুভব করবে যে, তারা একটি জীবন থেকে তওবাহ্ করে অপর একটি নতুন জীবনে পা রেখেছে এবং আল্লাহ্র সত্যিকার একজন বান্দাহ্র হাতে হাত দিয়ে দিয়েছে। আর ঐ আল্লাহ্র বান্দাও মনে করবেন যে, ঐ সব বায়'আতকারীর সংস্কার-সংশোধন ও প্রশিক্ষণ এবং তাদের দীনী ও ধর্মীয় খিদমত আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ওপরই সোপর্দ করেছেন। অতঃপর স্বীয় অভিজ্ঞতা, ইজতিহাদ এবং আল্লাহ্র কিতাব ও

রসূল (সা)-এর সুন্নাহ্র মূলনীতি ও শিক্ষা মুতাবিক তিনি তাদের ভেতর সঠিক আধ্যাত্মিকতা, তাক'ওয়া, ঈমান, ইখলাস, ভক্তিপূর্ণ বিশ্বাস, 'আমল ও 'ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে একটি নব জীবন সৃষ্টির কোশেশ করবেন। উল্লিখিত বায়'আত ও তরবিয়তের মাধ্যমেই দীন ধর্মের একনিষ্ঠ দা'ঈগণ স্ব স্ব যুগে ধর্মের পুনরুজ্জীবন ও পুনর্জাগরণ এবং মুসলমানদের সংস্কার-সংশোধনের কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন এবং আল্লাহ্র লাখ-লাখ বান্দাকে ঈমানের হাকীকত ইহসানের দরজা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। এই সোনালী কর্মধারার মস্তিষ্ক ও মধ্যমণি ছিলেন হযরত শায়খ মুহ'য়ি উদ্দীন 'আবদুল কাদির জিলানী (র), যাঁর নাম ও কাম রূহ'ানী সংস্কারের ইতিহাসে সর্বাধিক আলোকোজ্জ্বল। শব্দ, পরিভাষা ও জ্ঞানগত বিতর্ক ছেড়ে দিয়ে যদি সংঘটিত ঘটনা ও প্রকৃত বাস্তবতার ওপর নির্ভর করা হয় তাহলে এটা স্বীকার করতেই হবে যে, সেই বিশৃঙ্খল ও গোলযোগপূর্ণ যুগে (যা অদ্যাবধি বিরাজ করছে) সংস্কার, সংশোধন ও (ধর্মীয়) প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এর চাইতে অধিক সহজ, প্রভাবমণ্ডিত ও কার্যকর মাধ্যম আর কিছুই ছিল না।

হযরত শায়খ (র)-এর আগে দীন ও ধর্মের দা'ঈ ও একনিষ্ঠ সেবকগণ এ পথেই কাজ করেছেন এবং তাঁদের ইতিহাস এখনও সুরক্ষিত আছে। কিন্তু হযরত শায়খ (র) তাঁর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, আল্লাহ্প্রদত্ত রূহ'ানী কামালিয়াত, প্রকৃতিগত উন্নততর যোগ্যতা, দক্ষতা ও ইজতিহাদী শক্তি দ্বারা এ তরীকাকে নবজীবন দান করেছিলেন। তিনি সিলসিলার একজন নামকরা ইমাম ও একজন মশহূর প্রবর্তক ও প্রতিষ্ঠাতাই কেবল ছিলেন না, বরং এ শাস্ত্রের নতুনতর প্রয়োগ ও বিন্যস্তকরণের কৃতিত্বও তাঁরই। তাঁর পূর্বে এ শাস্ত্র এতটা বিন্যস্ত, সুশৃঙ্খল ও সুপ্রণীত ছিল না। আর এর ভেতর এতটা ব্যাপকতা ও বিস্তৃতিও সাধিত হয়নি যতটা তাঁর জনপ্রিয়তা ও বিরাট মর্যাদার কারণে হয়েছিল। তাঁর জীবনে লাখো মানুষ এ তরীকা থেকে ফায়দা পেয়ে ঈমানের মাধুর্যের সঙ্গে পরিচিত হয় এবং ইসলামী জীবন ও চরিত্র দ্বারা নিজেদের সুসজ্জিত করে। তাঁর (ওফাতের) পরও তাঁর একনিষ্ঠ খলীফা ও তাঁর মর্যাদাবান তরীকার অনুসারীবৃন্দ গোটা মুসলিম জাহানে আল্লাহ্র প্রতি দা'ওয়াত এবং ঈমানী চেতনা ও পুনর্জাগরণের এই সিলসিলা জারী রাখেন যদ্দ্বারা উপকৃত ব্যক্তির সংখ্যা নিরূপণ করা একমাত্র আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁরই রূহ'ানী শিক্ষা য়ামন, হাদরামাউত ও ভারতবর্ষ, জাভা, সুমাত্রা ও আফ্রিকা মহাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের ঈমানের পরিপূর্ণতা এবং লক্ষ লক্ষ অমুসলিমের ইসলাম কবুলের মাধ্যমে পরিণত হয়।

رضى الله تعالى عنه وارضاه وجزاه عن الاسلام خير الجزاء .

যুগের ওপর প্রভাব

হযরত শায়খ (র)-এর অস্তিত্ব ছিল সেই বস্তুবাদী যুগে ইসলামের একটি জীবন্ত মু'জিযা এবং এক বিরাট গায়বী মদদ। তাঁর ব্যক্তিসত্তা, তাঁর কামালিয়াত, তাঁর প্রভাব, আল্লাহ পাকের দরবারে তাঁর মকবুল বান্দা হিসাবে গৃহীত হবার চিহ্নাদি, আল্লাহ্র মখলূকাতের মধ্যে তাঁর মাহাত্ম্য ও সম্মানজনক মর্যাদার স্বীকৃতি, তাঁর ছাত্র ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সাথীদের নৈতিক চরিত্র এবং তাদের জীবন ও চরিত্র সবই ইসলামের সত্যতার দলীল ও তাঁর জীবন্ত কামালিয়াতের প্রমাণ। এটি সেই হাকীকত ও বাস্তব সত্যেরও প্রমাণ ছিল যে, তাঁর মধ্যে (ইসলামে) সত্যিকারের রূহানিয়ত তথা আধ্যাত্মিকতা, আত্মার পবিত্রতা ও আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্ক সৃষ্টির সর্বাধিক যোগ্যতা রয়েছে এবং তার শাহী-ভাণ্ডার কখনো হীরা-জওয়াহেরাত ও দুর্লভ সামগ্রীশূন্য নয়।

ওফাত

দীর্ঘকালব্যাপী বিশ্বকে স্বীয় জাহিরী ও বাতেনী কামালিয়াত দ্বারা উপকৃত করে এবং মুসলিম জাহানে আধ্যাত্মিকতা ও আল্লাহ্র দিকে ফিরে যাবার বিশ্বজয়ী আনন্দ, সুখ ও স্বাদ সৃষ্টি করে তিনি ৫৬১ হিজরীতে ৯০ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। তাঁর পুত্র হযরত শরফুদ্দীন 'ঈসা (র) তাঁর পিতা হযরত শায়খ (র)-এর ওফাতের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন :

> যখন তিনি সেই রোগে আক্রান্ত হন যে রোগে শেষাবধি তাঁর ইনতিকাল হয়েছিল, তখন সাহেবযাদা শায়খ 'আবদুল ওয়াহহাব তাঁকে (শায়খকে) আরয করেন : আপনি আমাকে কিছু ওসিয়্যত করুন যা আপনার পরে আমি আমল করতে পারি। তিনি বললেন : আল্লাহ্কে সদা-সর্বদা ভয় করতে থাকবে এবং আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে ভয় করবে না। তিনি ভিন্ন আর কারো কাছে কোন কিছু প্রত্যাশা করবে না। নিজের যাবতীয় প্রয়োজন আল্লাহ্র হাতে সমর্পণ করবে, কেবল তাঁরই ওপর ভরসা রাখবে সব কিছু তাঁর নিকটই চাইবে, আল্লাহ্ ভিন্ন আর কারোর ওপর আস্থা রাখবে না। তওহীদকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে এবং তাকেই প্রধান অবলম্বন করবে। কেননা তওহীদের বিষয় কারো কোন মতভেদ নেই, বরং এতে সবার ঐকমত্য রয়েছে। তিনি আরো বললেন: যখন মানুষের দিল আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায় তখন কোন জিনিসই তার থেকে ছুটে যায় না। তিনি আরো বললেন : আমি আবরণহীন মগজ। স্বীয়

সন্তানদেরকে তিনি বললেন : আমার নিকট থেকে সরে যাও। আমি বাহ্যত তোমাদের সাথে থাকলেও অপ্রকাশ্যে অন্যের সাথে রয়েছি। আমার কাছে তোমরা ছাড়াও আরো বহু লোক (ফিরিশ্তা) রয়েছে। তাদের জন্য জায়গা খালি করে দাও এবং তাদের সঙ্গে আদব রক্ষা কর। এখানে বিরাট রহমত নাযিল হচ্ছে। তার জন্য জায়গা সংকীর্ণ করো না। তিনি বারবার বলছিলেন : তোমাদের ওপর আল্লাহ্র শান্তি, রহমত ও বরকত (নাযিল) হোক! আল্লাহ্ আমাকে ও তোমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমার ও তোমাদের তওবাহ্ কবূল করুন। বিস্মিল্লাহ্! এস, ফিরে যেও না। এক রাত ও একদিন সমানভাবে তিনি একথা বলতে থাকেন এবং বলেন ঃ তোমাদের ওপর আফসোস! আমার কোন জিনিসের পরওয়া নেই, না ফিরিশতার, না মালাকু'ল-মওতের। ওহে মালাকু'ল-মওত! আমাদের মহাপ্রভু তোমার চেয়ে অনেক বেশী জিনিস আমাদেরকে দিয়ে রেখেছেন।

যেদিন রাত্রে তিনি ইনতিকাল করেন সেদিন ভীষণ এক চীৎকার দিয়ে উঠেছিলেন। তাঁর দুই পুত্র শায়খ 'আবদুর রাযযাক ও শায়খ মূসা বলেন : তিনি বারবার দু'হাত ঊর্ধ্ব দিকে প্রসারিত করছিলেন এবং বলছিলেন : তোমাদের ওপর সালাম এবং আল্লাহ্র রহমত ও বরকত (নাযিল হোক)। মহাসত্যের দিকে ফিরে যাও এবং কাতারে শামিল হও। আমি এখনই তোমাদের কাছে আসছি। তিনি এও বলছিলেন : কোমল ও নম্র আচরণ করো। এরপর আবার মৃত্যুর পূর্ব লক্ষণ তাঁর মধ্যে ফুটে উঠল এবং তিনি বেহুঁশপ্রায় হলেন। তিনি বললেন : আমার ও তোমাদের এবং তামাম সৃষ্টিজগতের মধ্যে আসমান-যমীনের ফারাক রয়েছে। আমাকে অন্যের সঙ্গে ও অন্যকে আমার সঙ্গে তুলনা করো না। এরপর তাঁর সাহেবযাদা শায়খ 'আবদুল 'আযীয তাঁর কষ্ট-তকলীফ ও অবস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বলেন : আমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করো না, আমি আল্লাহ্র 'ইলম-এ আবর্তিত হচ্ছি। আমার রোগ কেউ জানে না, কেউ বোঝে না, -না মানুষ, না জিন, না ফিরিশতা। আল্লাহ যা চান পৃথিবীর বুক থেকে মিটিয়ে দেন এবং যা চান পৃথিবীতে বাকী রাখেন। যা কিছু তিনি করেন সে সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসিত হতে হয় না, কিন্তু সৃষ্টিকে তাঁর কাছে জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হতে হয়।

এরপর তাঁর সাহেবযাদা শায়খ 'আবদুল জাব্বার তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন : আপনার শরীরে কোথায় তকলীফ দিচ্ছে? তিনি বললেন : আমার শরীরের

প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আমাকে তকলীফ দিচ্ছে। কিন্তু আমার দিলের কোন তকলীফ নেই এবং তা আল্লাহ্র সঙ্গে সহীহ্-শুদ্ধ আছে। এরপর তাঁর শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে এলে তিনি বললেন : আমি সেই আল্লাহ্র সাহায্য ভিক্ষা করছি যিনি ভিন্ন অন্য কোন মা'বূদ নেই। তিনি পবিত্র, উচ্চতর ও জীবিত; তাঁর ধ্বংসের কোন আশংকা নেই। তিনি পবিত্র! তিনি স্বীয় অপার কুদরত থেকে 'ইযযতের ক্ষমতা প্রদর্শন করেছেন। আল্লাহ্ ভিন্ন কোন মা'বূদ নেই; মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র রসূল। শায়খ (র)-এর সাহেবযাদা শায়খ মূসা বলতেন যে, তিনি تعزز (তা'আয্যাযা) শব্দ উচ্চারণ করছিলেন। কিন্তু এ শব্দটি শুদ্ধ ও সুস্থভাবে তাঁর মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়নি। তিনি বারবার তার পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন, এমন কি তিনি সজোরে ও শক্তভাবে শব্দটি নিজের মুখ দিয়ে ঠিক ঠিকভাবে উচ্চারণ করেন। এরপর তিনবার আল্লাহ! আল্লাহ! আল্লাহ! বললেন। এরপর তাঁর আওয়াজ মিইয়ে যায়, জিহ্বা তালুর সঙ্গে লেগে যায় এবং তাঁর রূহ মুবারক মহালোকে যাত্রা করে। رضی الله عنه وارضاه .

হযরত শায়খ (র) এ দুনিয়া থেকে বিদায় নেন, কিন্তু পশ্চাতে ছেড়ে যান দীন (ইসলাম)-এর বিরাট আহ্বায়ক (দা'ঈ) দল এবং নফ্স ও আখলাকের মুরুব্বীদের একটি সংঘবদ্ধ জামা'আত যারা তাঁর মিশনকে অব্যাহত রাখেন এবং অগ্রসরমান বস্তুবাদের মুকাবিলা করতে থাকেন।[১]

১. হযরত শায়খ (র)-এর পর যে সব 'আরিফ ও সংস্কারক দল দাওয়াত, উপদেশ প্রদান ও মানুষকে প্রশিক্ষণ দানের কাজ অত্যন্ত জোরেশোরে ও ব্যাপকভাবে জারী রাখেন এবং আলস্য ও পার্থিব মগ্নতার মুকাবিলা এবং চারিত্রিক ও প্রবৃত্তিজাত রোগ-ব্যাধির চিকিৎসা করেন, তাঁদের মধ্যে শায়খ (র)-এর ফয়েযপ্রাপ্ত এবং বাগদাদের শায়খ আবু'ন-নজীব সুহরাওয়ার্দীর ভ্রাতুষ্পুত্র ও খলীফা শায়খু'শ-শুয়ূখ আবূ হাফ্স শিহাবুদ্দীন সুহরাওয়ার্দী ছিলেন (৫৯৩-৬৩২ হি.) সর্বাধিক খ্যাতির অধিকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব যিনি সুহরাওয়ার্দীয়া তরীকার প্রতিষ্ঠাতা এবং তাসাওউফের জনপ্রিয় কিতাব 'আওয়ারিফু'ল-মা'আরিফ'-এর লেখক।

ইবনে খাল্লিকান লিখছেন : لم يكن فى اخر عمره فى عصوره مثله وكان شيخ شيوخ ببغداد -

শেষ বয়সে তাঁর যুগে তিনি ছিলেন নজীরবিহীন। তিনি ছিলেন বাগদাদের সর্বশ্রেষ্ঠ শায়খ।[১]

ইবনু'ন-নাজ্জার বলেন : انتهت اليه الرياسة فى تربية المريدين ودعاه الخلق الى الله .

(মুরীদদের তরবিয়ত ও আল্লাহ্র দিকে দা'ওয়াত জানাবার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সৃষ্টি জগতের লক্ষ্য ও প্রত্যাবর্তন-স্থল)।[২] ইবনে খাল্লিকান বলেন : তাঁর যুগের মাশায়েখগণ দূর-দূরান্ত থেকে তাঁর দিকে ছুটে আসত এবং উপকার ও কল্যাণ লাভ করত।[৩] শায়খ (র)-এর ওয়া'জ থেকে আল্লাহ্র মখলূকাত খুবই কল্যাণপ্রাপ্ত হয়। (পূর্ব পৃ. পর) ইবনে খাল্লিকানের ভাষায় : وكان له مجلس وعظ وعلى وعظه قبول كثير وله نفس

১. ওয়াফায়াতু'ল-আ'য়ান, ৩য় খণ্ড, ১১৯ পৃ. (আন্নাহ্দাতু'ল-মিসরিয়্যা)।
২. মির'আতু'ল-জিনান লি'ল-য়াফি'ঈ, ৪র্থ খণ্ড, ৮১ পৃ.।
৩. ওয়াফায়াতু'ল-আ'য়ান, ৩য় খণ্ড, ১২০ পৃ.।

দশম অধ্যায়

‘আল্লামা ইব্‌ন জওযী (র)

‘আবদুর রহমান ইবনে জওযী (র) ছিলেন ইসলামের দা‘ওয়াত ও সংস্কার-সংশোধনের ক্ষেত্রে আর একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি ছিলেন তাঁর যুগের অপ্রতিদ্বন্দ্বী মুফাস্‌সির, মুহাদ্দিছ, ঐতিহাসিক, সমালোচক, গ্রন্থকার ও বাগ্মী। উল্লিখিত প্রতিটি বিষয়ের ওপর তাঁর বিরাট বিরাট গ্রন্থ ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনা রয়েছে।

প্রাথমিক অবস্থা ও ‘ইল্‌ম হাসিল

তিনি ৫০৮ হিজরীতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। এ হিসাবে হযরত শায়খ[১] (র)-এর চেয়ে বয়সে তিনি ২৭ বছরের কনিষ্ঠ ছিলেন। শৈশবেই তিনি পিতার স্নেহছায়া থেকে বঞ্চিত হন। পড়াশোনার বয়স হতেই তাঁকে তাঁর মামা মশহূর মুহাদ্দিছ ইবনে নাসিরের মসজিদে রেখে আসেন। তাঁর কাছ থেকেই তিনি হাদীছের পাঠ গ্রহণ করেন, কুরআন মজীদ হিফ্‌জ করেন এবং তাজবীদশাস্ত্রেও ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি হাদীছের শায়খগণ থেকে হাদীছ শ্রবণ ও তা লিপিবদ্ধ করেন এবং কঠোর পরিশ্রম, নিবিষ্টচিত্ততা ও সাধনার সাথে জ্ঞানার্জনে মনোনিবেশ করেন। স্বীয় পুত্রের কাছে আপন জীবনের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন:

مبارك (তাঁর ওয়া‘জের মজলিস বসত এবং আলাহ্‌তা‘আলা তাঁর ওয়া‘জের বিরাট ও ব্যাপক জনপ্রিয়তা দান করেছিলেন। আর তাঁর ছিল একটি পবিত্র মঙ্গলময় সত্তা)।

তাসওউফকে বিদ‘আতের হাত থেকে পবিত্রকরণ এবং কু‘রআন ও সুন্নাহ্‌কে তাঁর উৎসে পরিণত করার ক্ষেত্রে হযরত শায়খ (র)-এর মুজাদ্দিদসুলভ ভূমিকা রয়েছে। তৎ প্রণীত “আওয়ারিফু‘ল-মা‘আরিফ” শীর্ষক গ্রন্থটিকে এ শাস্ত্রের প্রাচীন কিতাবগুলোর সাথে তুলনামুলকভাবে বিচার-বিবেচনা করে দেখলে তাঁর মুজাদ্দিদসুলভ কর্মের পরিমাপ করা যাবে।[১] আল্লাহ্ তা‘আলা শায়খ শিহাবুদ্দীন (র)-কে উন্নতমানের ও উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রতিনিধি (খলীফা) দান করেছিলেন যাঁরা দা‘ওয়াত ও তরবিয়তের কাজ অত্যন্ত জোরেশোরে ও ব্যাপকভাবে আঞ্জাম দেন। তাঁর একজন খলীফা শায়খু‘ল-ইসলাম শায়খ বাহাউদ্দীন যাকারিয়া মুলতানী (র) দ্বারা ভারতবর্ষে যে প্রচুর ফয়েয পৌঁছেছে এবং আল্লাহ্‌র মখলূকাত তাঁর থেকে যে ব্যাপক হেদায়েত ও বিরাট উপকার পেয়েছে তার দৃষ্টান্ত বিরল।

১. নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান মরহুম লিখেছেন ঃ

---

১. হযরত ‘আবদুল কাদির জিলানী (র)

আমার খুব মনে আছে যে, আমি ছ' বছর বয়সে মকতবে প্রবেশ করি। আমার চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি বয়সের ছাত্ররা ছিল আমার সহপাঠী। আমি রাস্তায় কখনো ছেলেপেলেদের সাথে খেলা করেছি কিংবা উচ্চৈঃস্বরে হেসেছি– এমন কথা আমার মনে পড়ে না। সাত বছর বয়সেই আমি জামে মসজিদের সামনের ময়দানে চলে যেতাম। সেখানে কোন বাজিকর কিংবা কলা-কৌশল প্রদর্শনকারীর কাছে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখবার পরিবর্তে আমি কোন মুহাদ্দিছের দরসে হাদীছের মহ্ফিলে শরীক হতাম এবং সেখানে হাদীছ ও সীরাত বিষয়ক যে সব কথাবার্তা শুনতাম তা মুখস্থ করতাম। এরপর ঘরে গিয়ে তা লিখে নিতাম। অন্যান্য ছেলে যখন দজলা (টাইগ্রীস) নদীর ধারে খেলা করত, তখন আমি একটি কিতাব নিয়ে অন্য কোন দিকে চলে যেতাম এবং সবার অগোচরে কোথাও বসে নিবিষ্ট মনে তা অধ্যয়ন করতাম। আমি উস্তাদ ও শায়খগণের মাহফিলে হাযিরা দেবার জন্য এতটা তাড়াহুড়া করতাম যে, দৌড়াবার কারণে আমার শ্বাস-প্রশ্বাস ফুলে উঠত। সকাল-সন্ধ্যা এমনভাবে অতিবাহিত হ'ত যে, খাবারের কোন ব্যবস্থাই হ'ত না। আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে শুকরিয়া যে, তিনি সৃষ্টিজগতের উপকারিতার প্রত্যুপকারের হাত থেকে আমাকে বাঁচিয়েছেন।[১]

হাদীছ লিখবার ক্ষেত্রে গভীর আত্মনিবিষ্টতা

হাদীছ শ্রবণ ও লিপিবদ্ধকরণে তিনি এত আত্মনিবিষ্ট ছিলেন এবং নিজের হাত দিয়ে এত বেশি হাদীছ লিপিবদ্ধ করেন যে, কতক ঐতিহাসিকের মতে, ইনতিকালের সময় তিনি ওসিয়্যত করে যান যে, তাঁর লাশ গোসল দেবার পানি যেন কাঠ পেন্সিলের সেই কর্তিত অংশ ও টুকরো দিয়ে গরম করা হয় যেগুলো হাদীছ লিখবার জন্য কলম বানাতে গিয়ে তাঁর কাছে স্তূপীকৃত হয়ে পড়েছিল। অনন্তর তার পরিমাণ এত বেশি ছিল যে, পানি গরম করবার পরও তার কিছু অংশ বেঁচে যায়।[২]

অধ্যয়নের আগ্রহ

অধ্যয়নের প্রতি শৈশব থেকেই তাঁর সীমাহীন আগ্রহ ও লিপ্সা ছিল। বাগদাদের বিশাল বিস্তৃত কুতুবখানা (লাইব্রেরী) ছিল রাশি রাশি পুস্তক দ্বারা ভর্তি আর

---

১. লাফতাতু'ল-কাবাদ ফী নাস'হি'াতি'ল-ওয়ালাদ, ৮১-৮২ পৃ.।
২. ইবনে খাল্লিকান, ৩য় খণ্ড ৩২১ পৃ.।

কিতাব অধ্যয়ন ছিল ইবনে জওযী (র)-এর প্রিয় নেশা। তাঁর এই অধ্যয়ন বিশেষ কোন শাস্ত্র কিংবা বিষয়ের সঙ্গে নির্দিষ্ট ছিল না। তিনি যে কোন বিষয়বস্তুর ওপর লিখিত কিতাবস পড়তেন। কিছুতেই যেন তাঁর তৃপ্তি আসত না। صيد الخاطر নামক গ্রন্থে যা তাঁর চিন্তা-ভাবনা ও মানসিক প্রতিক্রিয়ার প্রতিচ্ছবি, তিনি বলেন :

> আমি আমার নিজের অবস্থা বর্ণনা করছি। কিতাব অধ্যয়ন দ্বারা কিছুতেই আমার তৃষ্ণা মেটে না। যখনই নতুন কোন গ্রন্থের ওপর চোখ পড়ে তখনই আমার মনে হয় যেন আমি কোন গুপ্তধন পেয়ে গেছি। যদি আমি বলি যে, আমি বিশ সহস্র কিতাব অধ্যয়ন করেছি তাহলে এটা কারো কাছে খুব বেশি মনে হতে পারে। কিন্তু এটা প্রকৃতই আমার ছাত্রজীবনের ঘটনা। ঐসব কিতাব অধ্যয়ন করে আমি প্রাচীন বুযুর্গদের অবস্থা, তাঁদের উন্নত মনোবল, স্মৃতিশক্তি, 'ইবাদতের প্রতি আগ্রহ ও দুর্লভ জ্ঞানের এমন সব কথা জানতে পেরেছি যা ঐসব কিতাব অধ্যয়ন ব্যতিরেকে জানা সম্ভব ছিল না। এই অধ্যয়নের মধ্যে আমার কাছে আমার যুগের লোকদের সাধারণ মান এবং এ যুগের ছাত্রদের মানসিক দুর্বলতার দিকটি পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে।[১]

গ্রন্থ প্রণয়ন ও গভীর পাণ্ডিত্য

'আল্লাম ইবনে জওযী (র) জীবনের প্রথম থেকেই পুস্তক রচনা ও গ্রন্থ প্রণয়নে মনোনিবেশ করেন। দৈনিক চার জুয (১৬ পৃষ্ঠার একটি ফর্মা) লেখা ছিল তাঁর আজীবনের অভ্যাস। হাফিজ ইবনে তায়মিয়া বলেন, "আমি তাঁর রচনাসমূহের সংখ্যা নিরূপণের চেষ্টা করি এবং দেখতে পাই যে, তা হাযার পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।" হাদীছ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান এত বিস্তৃত ছিল যে, তিনি দাবি করে বলতেন ঃ প্রতিটি হাদীছ সম্পর্কেই বলতে পারি তা সহীহ্ কিংবা আদৌ হাদীছই নয়.। সাহিত্য রচনা ও বাগ্মিতার দিক দিয়ে বাগদাদে তিনি ছিলেন অতুলনীয়।

তাক্ওয়া ও 'ইবাদতের প্রতি আগ্রহ

এসব জ্ঞানগত পাণ্ডিত্যের সাথে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সততা, সাধুতা, আল্লাহ্-ভীতি ও 'ইবাদত প্রীতির ন্যায় মহামূল্য গুণাবলী দান করেছিলেন। তাঁর দৌহিত্র আবুল মুজাফফার বলেন ঃ ইবনে জওযী প্রতি সপ্তাহে একবার কুরআন শরীফ খতম করতেন এবং কখনো কারো সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশা করতেন না। শৈশবে

---

১. স'য়দু'ল-খাতি'র, ৩য় খণ্ড, ৬০৭-৮ পৃ.।

তিনি কোন শিশু কিংবা বালকের সঙ্গে খেলা করেননি। তিনি কখনো সন্দেহযুক্ত কোন জিনিস খাননি। জীবনভর তাঁর এই অভ্যাসই ছিল। ইবনু'ন-নাজ্জার বলেন : তিনি ছিলেন সুরুচির অধিকারী এবং মুনাজাতের মিষ্টতা ও দু'আর স্বাদ সম্পর্কে অবহিত। ইবনু'ল-হারিসী বলেন, "তিনি সারা রাত জেগে 'ইবাদত করতেন এবং কখনো আল্লাহ্র যিক্র (স্মরণ) হতে গাফিল হতেন না। তাঁর রচিত গ্রন্থ, অবস্থা ও হালচাল থেকে জানা যায় যে, তিনি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন চোখ ও জাগ্রত দিলের অধিকারী ছিলেন। তিনি গোটা সৃষ্টিকে ও আল্লাহ্র সংগে সম্পর্ককে জীবনের মহামূল্যবান পুঁজি মনে করতেন। এ ক্ষেত্রে এতটুকু কমতি পরিলক্ষিত হলেই তিনি অস্থির ও চঞ্চল হয়ে উঠতেন। صيد الخاطر নামক গ্রন্থে তিনি তাঁর একটি অবস্থার কথা আলোচনা করতে গিয়ে বলেন :

জীবনের শুরুতেই আমার ভেতর 'যুহ্দ' (সাধনা) এখতিয়ার করবার একটা প্রেরণা ও অভ্যন্তরীণ দাবি ক্রিয়াশীল ছিল। সিয়াম পালন ও নফল 'আমল খুব যত্ন ও আন্তরিকতার সঙ্গেই করতাম। নিঃসঙ্গ ও একাকী থাকাই আমার কাছে বেশি পছন্দনীয় ছিল। তখন আমার দিলের অবস্থা ছিল খুব ভাল। আমি উজ্জ্বল দূরদৃষ্টি ও তীব্র অনুভূতির অধিকারী ছিলাম। দৈনন্দিন জীবনের কোন মুহূর্ত আল্লাহ্র আনুগত্যের বাইরে অতিবাহিত হলে সেজন্য আফসোস হ'ত। প্রতিটি সেকেন্ডই আমার কাছে মূল্যবান মনে হ'ত এবং তাতে অধিক থেকে অধিকতর 'আমল ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনার প্রেরণা জাগ্রত হ'ত। আল্লাহ্র সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্ক এবং দু'আর মধ্যে মিষ্টতা ও স্বাদ অনুভূত হ'ত। এরপর আমার মনে হ'ল যে, কতক শাসক ও ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে সমাসীন ব্যক্তিবর্গ আমার ওয়া'জ ও বক্তৃতা-মাধুর্য দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন এবং তাঁরা আমাকে তাঁদের দিকে আকৃষ্ট করছেন আর আমার প্রকৃতিও সেদিকে ঝুঁকে গেছে। ফল দাঁড়াল এই যে, দু'আ ও মুনাজাতে এককালে যে স্বাদ পেতাম তা আমা থেকে বিদায় নিতে থাকল। এরপর অপরাপর শাসকও আমাকে তাঁদের দিকে টানতে থাকে। আমি (সন্দেহযুক্ত জিনিসের ভয়ে) তাঁদের ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্ব এবং তাঁদের খানাপিনা থেকে গা বাঁচিয়ে চলতাম। আমার অবস্থা তখন মন্দ কিছু ছিল না। এরপর ক্রমান্বয়ে আমার ভেতর তা'বীল (ভিন্ন অর্থ ও ভিন্ন ব্যাখ্যা)-এর দ্বার উন্মুক্ত হতে লাগল। আমি মুবাহ বস্তুর ক্ষেত্রভূমিতে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে শুরু করলাম। তখন আমা থেকে সেসব বিশেষ অবস্থা বিদায় নিতে থাকল। যতই আমি ঐসব শাসকের সঙ্গে মিশতাম এবং ওঠা-বসা করতাম আমার আত্মার (কলবের) অন্ধকার ততই বৃদ্ধি পেত, এমন কি আমি অনুভব

করলাম যে, আমার সেই আলো নিভে গেছে এবং কলব অন্ধকার ডুবে গেছে। এ রকম অবস্থায় পতিত হওয়ায় আমার স্বভাব ও প্রকৃতির মাঝে এক ধরনের অস্থিরতা সৃষ্টি হ'ল এবং এই অস্থিরতার প্রভাব ওয়া'জ-মাহফিলের শ্রোতৃবর্গের ওপর এমনভাবে পড়ল যে, তারাও অস্থির হয়ে উঠত। আর এই অস্থিরতার কারণে তাদের বেশির ভাগ লোকের তওবাহ্ করার ও সংশোধিত হবার তওফীক জুটত। কিন্তু আমি যে খালি হাত ছিলাম সেই খালি হাতই থেকে যেতাম। নিজের এই দারিদ্র্য ও দুর্ভাগ্য দৃষ্টে আমার অস্থিরতা আরও বেড়ে গেল কিন্তু চিকিৎসার কোন ব্যবস্থাই চোখে পড়ল না। এরপর আমি সালিহীন (আল্লাহ্‌র সৎ বান্দাহ্)-দের কবর যিয়ারত শুরু করি এবং আল্লাহ্‌র নিকট আমার নিজের দিলের ইসলাহের জন্য দু'আ করতে থাকি। শেষাবধি আল্লাহ্‌র অশেষ মেহেরবানী আমাকে সহায়তা করল এবং আমাকে আস্তে আস্তে নির্জনতার দিকে টেনে নিল। সেই দিল্ যা আমার আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছিল তা পুনরায় আমার আয়ত্তে ফিরে এল। যে অবস্থা আমার খুব ভাল মনে হ'ত– তার দোষ-ত্রুটি আমার সামনে প্রকাশ পেল। আমি আলস্যের সেই নিদ্রা থেকে জাগরিত হলাম এবং আমি আমার মেহেরবান ও সদয় প্রভুর (আল্লাহ্‌র) দিল্ খুলে শুকরিয়া আদায় করলাম।[১]

বাহ্যিক সৌন্দর্য ও গুণাবলী

ইবনে জওযী এই অফুরন্ত ও অবিনশ্বর সম্পদ লাভের সাথে সাথে পার্থিব সম্পদ, স্বাস্থ্য সম্পদ ও সৌন্দর্য সম্পদেও ধনী ছিলেন। মুওফিক 'আবদুল লতীফ বলেন : তিনি খুবই উত্তম পোশাক-পরিচ্ছদ, উত্তম খাদ্য ও সুরুচিপ্রিয় ছিলেন। ইবনু'দ্দীনী বলেন : তিনি মধুর বাচনভঙ্গী, খোশ ইলহা'ন (সুন্দর স্বর), মধ্যম আকৃতি ও সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সর্বদাই উদার হস্তের অধিকারী ও সম্মানিত করে রেখেছিলেন। তিনি তাঁর স্বাস্থ্য ও মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখতে খুবই সচেষ্ট ছিলেন। তিনি এমন সব জিনিস ব্যবহার করতেন যা মেধা ও মেযাজের সূক্ষ্মতা রক্ষার্থে সহায়ক। صيد الخاطر এ স্থানে স্বাস্থ্য রক্ষা, মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখা এবং খারাপ ও মন্দের হাত থেকে বেঁচে থাকার বিষয়ে তিনি উপদেশ দিয়েছেন। 'তাল্‌বীসু'ল-ইবলীস' নামক গ্রন্থে যুহ্‌দ-এর ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ও কঠোর কঠিন অনারবীয় প্রবণতার তিনি সমালোচনা করেছেন।

---

১. صيد الخاطر -১ম খণ্ড, ১২১, ১২২।

উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী হবার প্রতি আগ্রহ

তাঁর বিশেষ গুণ হ'ল, উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন, কামালিয়াত অর্জন ও ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী হবার প্রতি তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল, যা তিনি তাঁর অবস্থাসমূহের ভেতর দিয়ে নানা স্থানে প্রকাশ করেছেন। আবার তিনি কখনো কখনো অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির সমালোচনাও করেছেন যখন তাদের উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষা নিজ আশা-আকাঙ্ক্ষার সামনে খাটো ও সীমাবদ্ধ দেখতে চেয়েছেন। 'সায়দু'ল-খাতির' গ্রন্থে এক স্থানে বিস্তারিতভাবে লিখেছেন :

> মানুষের জন্য মহাপরীক্ষা তাঁর উচ্চাশা ও উন্নত আকাঙ্ক্ষা। কেননা যার আকাঙ্ক্ষা উঁচু হয় সে উচ্চ থেকে উচ্চতর মরতবাকে নির্বাচিত করে। এরপর কখনো যুগ প্রতিকূল হয়, কখনো উপায়-উপকরণ হারিয়ে যায়। ফলে এ সব লোক হামেশা দুঃখ-যন্ত্রণার মাঝে কাল কাটায়। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকেও উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষা দান করেছেন। এর কারণে আমিও কষ্টের মাঝে আছি। কিন্তু আমি এও বলি না, হায়! আমাকে, যদি এই উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষা না দান করা হ'ত। এর কারণ এই যে, জীবনের পূর্ণ স্বাদ ও আনন্দ লাভ চিন্তা-বুদ্ধি ও অনুভূতিশূন্য হওয়া ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। আর একজন বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী মানুষ এটা কখনো সইতে পারে না যে, তার বুদ্ধির পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া হোক এবং জীবনের স্বাদ-আনন্দ বাড়িয়ে দেওয়া হোক। আমি কোন কোন ব্যক্তিকে এমন দেখেছি যারা নিজেদের উচ্চাশা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার আলোচনা বেশ গুরুত্বের সঙ্গে করছেন। কিন্ত গভীরভাবে লক্ষ করে আমি জানতে পারি যে, তাদের সমস্ত উচ্চাশা একই ধরনের এবং তা একটি মাত্র শাখাতেই সীমিত; অন্যান্য শাখায় (যা কতক মুহূর্তে তার মূল শাখা থেকেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে) স্বল্পতা কিংবা ঘাটতির ব্যাপারে তাদের তেমন কোন আক্ষেপ নেই। শরীফ রাদী তাঁর কবিতায় বলেন : প্রতিটি শারীরিক কৃশতার পেছনে একটি কারণ রয়েছে। আমার শরীরের মুসীবত আমার উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু আমি যখন তার অবস্থা পর্যালোচনা করলাম, দেখতে পেলাম হুকুমত ছাড়া তার অন্য কোন লক্ষ্য কিংবা কাম্য ছিল না। আবূ মুসলিম খুরাসানী তার যৌবনকালে বিছানায় শয়ন করত না। কেউ এর কারণ জিজ্ঞেস করলে সে উত্তরে বলেছিল ঃ আমার মস্তিষ্ক আলোকোজ্জ্বল। উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষা, আত্মোন্নতির প্রতি লোভ ইত্যাদি থাকতে অবনত ও সীমাবদ্ধ যিন্দেগী তথা

বিছানায় শয়ন করা কি আমার পক্ষে সম্ভব? কেউ বলল, তোমার তৃপ্তি কী করে হতে পারে? উত্তর ছিলঃ কেবলা সাম্রাজ্য লাভের ভেতর দিয়ে। লোকেরা বলল ঃ তবে তুমি তার জন্য কোশেশ কর। সে বলল ঃ বিপদের মুখে নিজের প্রাণ নিক্ষেপ না করলে এবং জীবনের বাজি না ধরলে তা সম্ভব নয়। লোকে বলল ঃ এতে বাধা কোথায়? সে জানায় ঃ বুদ্ধি বাধা দেয়। জিজ্ঞেস করা হল ঃ এরপর কি করতে চাও? বলল ঃ বুদ্ধির পরামর্শ কবুল করব না, নির্বুদ্ধিতার হাতে জীবনের বাগডোর ছেড়ে দেব, নাদানীর বিপদ খরিদ করব এবং যেখানে বুদ্ধি ব্যতিরেকে আর অগ্রসর হওয়া যায় না শুধু সেখানেই বুদ্ধির সাহায্য গ্রহণ করব। আর তা এজন্য যে, নাম-নিশানাহীন জীবন ও দারিদ্র্যের জীবন– এ দু'টো জিনিস পরস্পরের সাথে ওঁৎপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। আমি এই প্রতারিত উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবকের (আবূ মুসলিম) অবস্থার ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে জানতে পারলাম, সে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটিকে জড়ে মূলে উৎপাটন করে ফেলেছে– আর সে সমস্যা হ'ল পারলৌকিক জীবনের সমস্যা। সে হুকূমত লাভের জন্য পাগল ছিল। এর খাতিরে সে কত রক্তই না ঝরিয়েছে, কত নিরপরাধ আল্লাহর বান্দাকেই না সে হত্যা করেছে। এত কিছুর বিনিময়ে জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাদ-আনন্দের– যা সে চেয়েছিল, অল্পই সে লাভ করেছে। আট বছরের অধিককাল তার ভাগ্যে এই পার্থিব জগতের স্বাদ-আহ্লাদ উপভোগ করবার মওকা মেলেনি। তাকে ধোঁকা দিয়ে হত্যা করা হয়। সে স্বীয় বুদ্ধির সাহায্যে নিজের জন্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কোন বন্দোবস্তই করতে পারেনি, (সাফফাহ্র হাতে[১]) নিহত হয়ে দুনিয়া থেকে অত্যন্ত করুণ অবস্থায় বিদায় নেয়। এমনিভাবে মুতানাব্বী তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও উচ্চাশার বিরাট গীত গেয়েছেন। কিন্তু আমি দেখেছি যে, কেবল জাগতিক স্বার্থ হাসিল ও দুনিয়া প্রাপ্তিই ছিল তার একমাত্র লক্ষ্য।

কিন্তু আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষার ব্যাপারটা আশ্চর্য ধরনের। আমি জ্ঞানের সেই উচ্চমার্গ হাসিল করতে চাই, যতদূর পর্যন্ত– আমার বিশ্বাস, আমি পৌঁছুতে পারব না। কেননা আমি সব জ্ঞান– চাই তা যে কোন বিষয়বস্তু সম্পর্কিতই হোক– হাসিল করতে চাই। অতঃপর নিজেকে প্রতিটি জ্ঞানে পরিপূর্ণ তথা সেসব জ্ঞানকে নিজের আয়ত্তাধীন দেখতে চাই। আর এ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের একটি অংশও হাসিল করা এই স্বল্পায়ু জীবনে সম্ভব নয়। অতঃপর আমার

১. ইতিহাস বলে, আবুল 'আব্বাস সাফফাহ নয়, খলীফা আবু জাফর মনসুরই আবূ মুসলিম খুরাসানীকে হত্যা করেন। –অনুবাদক।

অবস্থা এই যে, যদি কেউ একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে বা শাস্ত্রে কামালিয়াত হাসিল করে আর অন্য শাস্ত্রে তার জ্ঞান ত্রুটিপূর্ণ হয়, তাহলে সে ত্রুটি সহজেই আমার নজরে পড়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা চলে যে, মুহাদ্দিছ ফিক্‌'হ্ সম্পর্কে অজ্ঞ আর ফক'ীহ্ হাদীছ সম্পর্কে বেখবর। আমার মতে, জ্ঞানের ক্ষেত্রে ত্রুটি হীনবল হবার কারণেই হয়ে থাকে। অতঃপর 'ইল্‌ম দ্বারা আমি বুঝতে চাই পরিপূর্ণ 'আমল। আমার মন চায় যে, আমার ভেতর বাশার হাফীর সতর্কতা এবং মা'রূফ কারখীর যুহ্‌দ (এঁরা মুসলিম ইতিহাসের প্রখ্যাত দু'জন সূফী–অনুবাদক।) একত্র হোক। কিন্তু গ্রন্থ রচনার জন্য প্রয়োজনীয় অধ্যয়ন, সাধারণ গণ-মানুষ ও আল্লাহ্‌র বান্দাদের তা'লীম ও কল্যাণ সাধন এবং তাদের সঙ্গে অবস্থানজনিত কর্মব্যস্ততার কারণে তা সম্ভব নয়। এরপর আমি এটাও চাই যে, আমি যেন আল্লাহ্‌র সৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল না হই এবং তাদের থেকে উপকার ও কল্যাণ গ্রহণের পরিবর্তে আমিই যেন তাদের উপকার ও কল্যাণ সাধন করবার উপযুক্ত হই। অথচ প্রকৃত অবস্থা এই যে, জীবিকার্জনের জন্য গৃহীত পেশা 'ইল্‌ম-এর প্রতিবন্ধক। অপরের নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া এবং তাদের উপহার-উপঢৌকন কবূল করতে আমার মন চায় না। আমি সন্তান-সন্ততিও চাই, আবার উন্নতমানের পুস্তক রচনাও করতে চাই– যাতে করে এসব স্মৃতিচিহ্ন দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার পর আমার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে গেলে আমার দিলের পছন্দনীয় ও প্রিয় পেশা একাকিত্ব ও নিঃসঙ্গতার মধ্যে পার্থক্য ও স্বভাব-প্রকৃতিতে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। অতঃপর পবিত্র উত্তম বস্ত্রসামগ্রী থেকে বৈধ আনন্দ ও স্বাদ–আহ্‌লাদ গ্রহণের প্রতিও আমার আগ্রহ রয়েছে। কিন্তু অর্থবিত্তের স্বল্পতাও এ ক্ষেত্রে বড় অন্তরায়। এমনিভাবে আমি ঐসব খাদ্যসামগ্রীর প্রতিও আগ্রহী যা স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল, উপযোগী ও কল্যাণকর। এটা এজন্য যে, আমার শরীর পবিত্রতা-প্রিয় ও তৎপ্রতি আগ্রহী। কিন্তু বিত্ত-সম্পদের ঘাটতি এ ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধক হয়ে দেখা দেয়। বস্তুতপক্ষে এ সবই পরস্পরবিরোধী দু'টি বস্তুকে একত্র করবার অপচেষ্টা মাত্র। ঐসব লোক আমার উচ্চাকাঙক্ষার মুকাবিলা কী করে করতে পারে যারা কেবল দুনিয়ার প্রত্যাশী? অতঃপর আমি এও চাই যে, আমি যেন এভাবে দুনিয়া লাভ করি যাতে করে আমার দীনে এতটুকু আঁচও না লাগে, তা নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকে এবং আমার 'ইল্‌ম ও 'আমলের ওপর কোন বিরূপ প্রভাব ফেলতে না পারে। আমার অস্থিরতার পরিমাপ অন্যে কিভাবে করবে? একদিকে রাত্রি জাগরণ, সতর্কতা ও তাক'ওয়া অবলম্বন আমার

প্রিয়, অন্যদিকে 'ইল্‌ম-এর প্রচার ও প্রসার, সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধন, গ্রন্থ প্রণয়ন ও সংকলন এবং শরীর-স্বাস্থ্যের উপযোগী খাদ্য আমার কাম্য। আর এসব কলব (আত্মা)-এর ব্যস্ততা ছাড়া সম্ভব নয়। একদিকে লোকের সঙ্গে মেলামেশা ও তাদের শিক্ষা দান করা জরুরী, অপরদিকে নির্জনতা ও একাকিত্বের অবস্থায় দু'আ ও মুনাজাতের মিষ্টতার মাঝে যদি কমতি পরিলক্ষিত হয় তাহলে তার জন্যও অত্যন্ত দুঃখ ও আফসোস হয়। আমার সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের জন্য যদি এমন শক্তি— যা মরে না— তার ব্যবস্থা করা যায় তাহলে যুহ্‌দ ও সতর্কতার মানদণ্ডে পার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু আমি ঐ সমস্ত তকলীফ ও দুঃখ-যন্ত্রণা সহ্য করে নিয়েছি এবং সন্তুষ্ট চিত্তে তা মেনে নিয়েছি। সম্ভবত আমার সংস্কার-সংশোধন ও উন্নতি এই তকলীফ ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মাঝেই নিহিত। আর তা এ জন্য যে, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও উচ্চাশা ঐ সব আমলের চিন্তা-ভাবনায় থাকে যা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের কারণ। আমি আমার নফসের হেফাজত করি এবং তার থেকে সতর্কতা অবলম্বন করি। এর থেকেও আমি সতর্কতা অবলম্বন করি যাতে আমার একটি নিঃশ্বাসও অনর্থক ও বেহুদা কাজে ব্যয়িত না হয়। যদি আমার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জিত হয়ে যায় তাহলে সুবহ়ানাল্লাহ্, অন্যথায় نية المؤمن خير من عمله (মু'মিনের নিয়ত তার কর্মের চেয়ে উত্তম)।[১]

ওয়া'জ-মাহ্‌ফিল ও তার প্রভাব

তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব তাঁর বিপ্লবাত্মক ওয়া'জ ও দরস মাহফিল। তাঁর এসব ওয়া'জ-মাহফিল গোটা বাগদাদকে অভিভূত ও মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল। খলীফা, সুলতান, উযীর, বড় বড় 'আলিম সে সব ওয়া'জ-মাহফিলে অত্যন্ত উৎসাহ ও গভীর আগ্রহ সহকারে যোগদান করতেন। লোকের এত ভীড় হ'ত যে, এক একটি ওয়া'জ-মাহফিলে লক্ষ পর্যন্ত লোক হ'ত। দশ-পনের হাযার লোকের কম কোন মাহফিলেই দেখা যেত না।[২] বক্তৃতার প্রভাব এত গভীর ছিল যে, তা শুনে কোন কোন শ্রোতা বেহুঁশ হয়ে পড়ে যেত, উন্মত্ত অবস্থায় পরিহিত জামা-কাপড় ছিঁড়ে ফেলত, উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার দিয়ে উঠত এবং তাদের চোখ দিয়ে অশ্রুর প্লাবন বয়ে যেত। তওবাকারীদের কোন সীমা-সরহদ ছিল না। পরিমাপ করে দেখা গেছে, বিশ হাযার ইয়াহূদী ও খৃস্টান তাঁর হাতে মুসলমান হয়েছিল এবং এক লক্ষের মত লোক তওবাহ্ করেছিল।[৩]

১. স'য়দু'ল-খাতি'র—২য় খণ্ড, ৩৩৪-৩৭ পৃষ্ঠা।
২. স'য়দু'ল-খাতি'র—১ম খণ্ড, ২১ পৃ।
৩. প্রাগুক্ত।

ইবনে জওযী তাঁর ওয়া'জের মজলিসে বিদ'আত, নিষিদ্ধ ও গর্হিত বস্তুকে খোলাখুলিভাবে প্রত্যাখ্যান করতেন এবং বিশুদ্ধ 'আকীদা ও সুন্নাহ্র প্রকাশ ঘটাতেন। তুলনাহীন বাগ্মিতা, জ্ঞানবত্তা ও তাঁর প্রতি জনতার আকর্ষণ দৃষ্টে বিদ'আতীরা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করবার মত সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারেনি। ওয়া'জ ও দর্স মাহফিল ও তৎপ্রণীত কিতাবাদির মাধ্যমে সুন্নাহ্র ব্যাপক প্রসার ঘটে এবং সমসাময়িক খলীফা ও আমীর-উমারা ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র)-এর (যাঁকে সে যুগে প্রকৃত বুযুর্গ ও তরীকা-ই-সুন্নাহ্র প্রতীক হিসাবে মনে করা হ'ত) ভক্তে ও অনুরক্তে পরিণত হয় এবং তাঁর মাযহাবের প্রতি ঝুঁকে পড়ে।

তাঁর সমালোচনামূলক গ্রন্থ

ইবনে জওযী কেবল মৌখিক ওয়া'জ ও বক্তৃতার ভেতর দিয়েই তাঁর কর্তব্য-কর্ম সম্পাদন করেন নি, বরং তিনি এমন কিছু গ্রন্থও রচনা করেন যেগুলো শিক্ষিত ও পণ্ডিত মহলে প্রভাব ফেলে এবং অনেক ভুল প্রবণতার সংস্কার সাধন করে।

কিতাবু'ল-মাওযু'আত

এটা মাওযূ'আতে হাদীছের ওপর লেখা তাঁর একটি কিতাব। এতে তিনি সে সব হাদীছের হাকীকত (যথার্থতা, মূল তত্ত্ব) বর্ণনা করেছেন যে সব দ্বারা সে যুগের কল্পনাবিলাসী ও প্রবৃত্তি-পূজারীরা শত রকমের গোমরাহী ও ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব ঘটাত। এর দ্বারা তিনি সেই শাখার ওপরই কুঠারাঘাত করেন যার ওপর বিদ'আতীরা বাসা বেঁধেছিল। যদিও এ ক্ষেত্রে স্বয়ং তাঁর দ্বারা কোথাও কোথাও সীমা লঙ্ঘন হয়েছিল এবং কোথাও কোথাও তিনি কঠোর ফয়সালাও প্রদান করেছিলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে এতটুকু সন্দেহের অবকাশ নেই যে, এই কিতাব একটি উপকারী ও কল্যাণকর খিদমত আঞ্জাম দিয়েছিল।

তালবীসে ইবলীস

তাঁর দ্বিতীয় সমালোচনামূলক রচনা 'তালবীসে ইবলীস' যা তাঁর সমালোচক-সুলভ স্বভাব-প্রকৃতি ও প্রাচীন বুযুর্গ (সলফে সালেহীন)-সুলভ স্বাদের আসল নমুনা বহন করছে। উক্ত গ্রন্থে তিনি তাঁর যুগের গোটা মুসলিম সমাজের খতিয়ান টেনেছেন এবং মুসলমানদের প্রতিটি শ্রেণী ও জামা'আতকে সুন্নাহ্ ও শরীয়তের

মাপকাঠিতে বিচার করেছেন, তাদের দুর্বলতা, ভারসাম্যহীনতা ও ভ্রান্ত ধারণাসমূহ চিহ্নিত করেছেন এবং প্রমাণ করে দেখিয়েছেন, শয়তান কিভাবে এই উম্মতকে ধোঁকা দিয়েছে এবং কোন্ কোন্ পথ দিয়ে তাদের 'আকীদা, 'আমল ও আখলাকের মধ্যে ছিদ্র ও ধাঁধার সৃষ্টি করেছে। তিনি এই গ্রন্থে কোন শ্রেণী বা কোন ব্যক্তিকেই খাতির করেন নি এবং কাউকে ক্ষমাও করেন নি। এতে তিনি 'উলামা-ই কিরাম, মুহাদ্দিছীন, ফুক'াহা, ওয়ায়েজীন, সাহিত্যিক, কবি, সুলতান, শাসকবৃন্দ, আহলে দীনের সুফিয়া-ই-কিরাম ও জনসাধারণের স্বতন্ত্র দুর্বলতা, ভ্রান্ত প্রথা-পদ্ধতি ও আচার-অভ্যাস সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। এ গ্রন্থ তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টি, জীবন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ও দূরদর্শিতার সফল ও সার্থক নমুনা। এ থেকে পরিমাপ করা যায় যে, তিনি শয়তানের কামনা-বাসনা ও রাজনৈতিক কলাকৌশলাদি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন এবং বিভিন্ন ধর্মের ইতিহাস ও ভ্রান্ত ফির্কাগুলোর 'আকীদা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখতেন।

বিভিন্ন শ্রেণীর সমালোচনা

এই গ্রন্থে যদিও কোথাও কোথাও তাঁর সমালোচনা সীমা ছাড়িয়ে গেছে এবং ফয়সালা প্রদান করবার ক্ষেত্রে তিনি তাড়াহুড়া ও কঠোরতার আশ্রয় নিয়েছেন, কিন্তু এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, এই গ্রন্থে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়, মূল্যবান উদ্ধৃতি ও অনেকগুলো সঠিক ও যথার্থ সমালোচনা পাওয়া যায় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেনে নিতে হয় যে, তাঁর বজ্র কঠোর আঘাত সঠিক এবং তাঁর সমালোচনা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। এখানে তাঁর কতিপয় নমুনা পেশ করা গেল।

স্বীয় যুগের সে সব 'আলিম-'উলামার, যাঁরা ফিক'হী মসলা-মাসাইলের ছোটখাটো ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় নিয়েই মগ্ন থাকেন, সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন :

> ঐ ফক'ীহদের একটা দুর্বলতা হ'ল এই যে, তাঁদের গোটা মগ্নতা উল্লিখিত চিন্তা-ভাবনার মধ্যেই সীমিত। তাঁরা তাঁদের শাস্ত্রে সে সব বিষয়বস্তু শামিল করেননি, যদ্দ্বারা হৃদয়ে ভাবাবেগ ও বিনয়ের অবস্থা সৃষ্টি হয়, সৃষ্টি হয় স্নেহ-মমতা ও কোমল সহানুভূতির। যেমন– কুরআন মজীদ তিলাওয়াত, হাদীছ ও সীরাত সম্পর্কে আলোচনা শ্রবণ এবং সাহাবা-ই-কিরাম-এর অবস্থা সম্পর্কে অধ্যয়ন ও বর্ণনা। সবাই জানে যে, নাজাসাত ও নাপাকী অপসারণ ও পরিবর্তনশীল মসলার বারবার পুনরাবৃত্তি দ্বারা আত্মায় কোমলতা ও ভীতি সৃষ্টি হতে পারে না। আত্মার জন্য চাই যিক্‌র-আযকার ও ওয়া'জ-নসীহত, যাতে

পারলৌকিক জীবনের প্রতিও ভীতিহীন আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ইখতিলাফী মসলা-মাসাইল যদিও 'ইলমে শরীয়তবহির্ভূত নয়, কিন্তু তা মানব জীবনের উদ্দেশ্য হাসিল ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য যথেষ্ট নয়। যিনি প্রাচীন বুযুর্গদের অবস্থা এবং তাঁদের হাকীকত ও গোপন রহস্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নন, তাঁদের মাযহাব যারা অবলম্বন করেছেন তাঁদের অবস্থা সম্পর্কেও বেখবর রয়েছেন, তিনি তাঁদের রাস্তায় কিভাবে চলতে পারেন? যদি মুতাক'াদ্দিমীন (প্রথম যুগের লোক)-এর অবস্থা ও তরীকা সম্পর্কে অধ্যয়ন করা যায় তাহলে তাদের সঙ্গে চলার আগ্রহ সৃষ্টি হবে, তাদের রঙে রঞ্জিত ও আখলাক-চরিত্র গঠনের আগ্রহ সৃষ্টি হবে। প্রাচীন বুযুর্গদের মধ্যে জনৈক বুযুর্গের উক্তি এই যে, "একটি হাদীছ– যদ্দ্বারা আমার অন্তরে ভাবাবেগের সৃষ্টি হয়, মন দ্রবীভূত হয়, কোমলতা ও স্নেহরসে সিক্ত হয়– তা কাযী শুরায়হ'-এর এক শত ফয়সালা অপেক্ষাও আমার কাছে বেশি প্রিয়।" [১]

ওয়ায়েজীনদের সম্পর্কে সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ

তাদের (ওয়া'জকারীদের) ভেতর অধিকাংশ লোকই খুবই সাজানো-গোছানো এবং খুবই লৌকিকতাপূর্ণ ও আকর্ষণীয় বাক্য ব্যাবহার করে, যার অধিকাংশই অর্থহীন। এ যুগে ওয়া'জ-নসীহতের বিরাট অংশই হযরত মূসা ('আ) ও তূর পর্বত এবং হযরত ইউসুফ ('আ) ও যুলায়খা সম্পর্কিত কিসসা-কাহিনী দ্বারা ভরপুর। এসব ওয়া'জ-নসীহতে ইসলামের অপরিহার্য বিধান (ফরয) সম্পর্কে আলোচনা খুব কমই থাকে। কি করে গোনাহ্‌র হাত থেকে বেঁচে থাকা যায়, সে সম্পর্কেও এতে কোন আলোচনা থাকে না। এমন ওয়া'জ-নসীহত দ্বারা একজন ব্যভিচারী, একজন সুদখোর ব্যক্তির তওবাহ করার উৎসাহ ও শক্তি কিভাবে সৃষ্টি হবে? স্বামীর হক আদায় ও পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারে একজন মহিলার আগ্রহ অনুপ্রেরণা কিভাবে সৃষ্টি হবে? এটা এজন্য যে, এসব বিষয় ওয়া'জকারীদের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত থাকে না। ওয়া'জকারীরা শরীয়তকে পেছনে ঠেলে দিয়েছে বলেই তাদের আয়ের বাজার গরম হয়েছে। কেননা হক সর্বদাই মানবীয় প্রকৃতির ওপর বোঝাস্বরূপ এবং বাতিলকে হাল্কা ও মনোরম দেখায়। [২]

তিনি আরো বলেন ঃ

১. তালবীসে ইবলীস, ১১৯–২০ পৃ.।

২. প্রাগুক্ত, ১২৫ পৃ.।

অবশ্য কখনো এমনও হয় যে, ওয়া'জকারী সাচ্চা পথের সৈনিক এবং আম মানুষের কল্যাণকামী হন, কিন্তু সম্মান, প্রতিপত্তি ও পদমর্যাদার প্রতি আকর্ষণ তার অস্থি-মজ্জায় এমনভাবে প্রবাহিত হয় যে, তিনি মনেপ্রাণে কামনা করেন, লোকে তাকে ভক্তি-সম্মান করুক। এটা তখনই বোঝা যায় যখন দেখা যায় যে, অন্য কোন ওয়ায়েজ যদি তারই মত ওয়া'জ-নসীহতে এগিয়ে যেতে থাকেন কিংবা তারই মত ওয়া'জে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন অথবা মানুষের মন-মগজ ও 'আমল-আখলাক সংশোধনের ক্ষেত্রে কেউ তার সাহায্যে এগিয়ে আসেন তাহলে তার কাছে তা অসহনীয় ও অপছন্দনীয় হয়ে ওঠে। যদি তিনি আল্লাহ্র প্রতি একনিষ্ঠ হতেন তাহলে উল্লিখিত বিষয়াদি অপছন্দ করবার তার কোন কারণই থাকত না।[১]

তিনি বলেন ঃ

যদি ছাত্ররা কোন 'আলিম কিংবা মাদরাসার কোন মুদার্রিসের নিকট গমন করে যিনি জ্ঞানের ক্ষেত্রে তার অগ্রবর্তী, তাহলে (দুনিয়াপূজারী) উক্ত 'আলিমের তা কষ্টকর বলে মনে হয়। আল্লাহ্র একনিষ্ঠ বান্দাহ্র পরিচয় এ নয়। কেননা আল্লাহ্র মুখলিস (একনিষ্ঠ) 'আলিম ও মুদার্রিসের উদাহরণ তো সেই চিকিৎসকের মত যিনি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে তাঁরই সন্তুষ্টির খাতিরে সৃষ্টি জগতের চিকিৎসা করে থাকেন। কোন রোগীর যখন অপর কোন চিকিৎসকের হাতেও আরোগ্য লাভ ঘটে তখন এ ধরনের চিকিৎসক খুশিই হয়ে থাকেন।[২]

সুলতান ও শাসকবর্গের সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি লিখেন ঃ

এঁরা শরীয়তের মুকাবিলায় নিজেদের রায় ও মতামত মাফিকই কাজ করেন। তাঁরা কখনো এমন ব্যক্তিরও হাত কেটে থাকেন, যার হাত কাটা জায়েয নয়। কখনো এমন ব্যক্তিকে হত্যা করেন, যাকে হত্যা করা বৈধ নয়। তারা এ ধরনের ধোঁকায় নিপতিত যে, এতো রাজনীতি (অর্থাৎ যেন রাজনীতিতে সব কিছুই বৈধ) যার অন্য অর্থ এই, "শরীয়ত অসম্পূর্ণ, তার পরিপূর্ণতা ও পরিশিষ্টের প্রয়োজন; আর আমরা (শাসকরা) আমাদের মতামত ও অভিমত দ্বারা সেই পরিপূর্ণতা দান করছি"।

শয়তানের এ একটা বিরাট ধোঁকা ও প্রতারণা। প্রকৃতপক্ষে শরীয়ত হ'ল একটি ঐশী রাষ্ট্রনীতি। আর ঐশী রাষ্ট্রনীতিতে এমন কোন বিচ্যুতি কিংবা ঘাটতি থাকতে পারে না, যার জন্য জাগতিক রাজনীতির প্রয়োজন দেখা

১. তালবীসে ইবলীস।
২. প্রাগুক্ত, ১৩১ পৃ. (نقد مسالك العلماء الكاملين)

দেবে। আল্লাহপাক বলেন : مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتَابِ مِنْ شَيْئٍ (আমরা কিতাবে কোন কিছুই কম বলি নি)। তিনি আরও বলেন : لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ (তাঁর হুকুম রদ করবার কেউ নেই)। অতএব, এ ধরনের (মানবীয়) রাজনীতির যিনি বা যারা দাবিদার তিনি বা তারা প্রকৃতপক্ষে শরীয়তে বিচ্যুতি ও অসম্পূর্ণতার দাবিই করেন। আর এ জাতীয় দাবি কুফরীর শামিল।[১]

ঐ সব শাসক ও মুসলমানের আর একটি দুর্বলতা ও ভ্রান্তি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ

> পাপ ও অবাধ্যতামূলক কার্যকলাপের ব্যাপারে জিদ করার সঙ্গে সঙ্গে নেককার লোকদের সঙ্গে মোলাকাতের আগ্রহও তাদের মধ্যে দেখা যায়। তারা তাঁদের থেকে নিজেদের জন্য দু'আ করিয়ে থাকেন। শয়তান তাদের বোঝায়, এর দ্বারা তোমার গুনাহ্র পাল্লা হাল্কা হয়ে যাবে। অথচ এই নেক কাজের দ্বারা ঐ মন্দ কাজের অপনোদন হতে পারে না।
>
> একবার এক ব্যবসায়ী এক রাজস্ব আদায়কারীর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। রাজস্ব আদায়কারী ব্যবসায়ীর নৌকা থামিয়ে দেয়। ব্যবসায়ী লোকটি সে যুগের বিখ্যাত বুযুর্গ মালিক ইবনে দীনারের নিকট গমন করেন এবং তাঁকে সকল ঘটনা খুলে বলেন। মালিক ইবনে দীনার রাজস্ব আদায়কারীর কাছে যান এবং ব্যবসায়ী লোকটির জন্য সুপারিশ করেন। লোকটি ইব্ন দীনারকে যথেষ্ট তা'জীম করেন এবং বলেন ঃ আপনি কেন কষ্ট করতে এলেন! আপনি তো সেখান থেকেই বলে দিতে পারতেন। আপনার নির্দেশ আমি পালন করতাম। এরপর লোকটি তার জন্য দু'আর দরখাস্ত পেশ করে। এতে তিনি লোকটিকে তার সেই পাত্রের দিকে ইশারা করে (যেখানে সে অবৈধভাবে সংগৃহীত রাজস্ব জমা রাখত) বলেন ঃ এই পাত্রকে বল, সে তোমার জন্য দু'আ করুক। এরপর তিনি বললেন ঃ আমি আর তোমার জন্য কি দু'আ করব যেখানে হাযার হাযার মানুষ তোমার জন্য বদ-দু'আ করছে। এখন তুমিই বল, একজন মানুষের দু'আ শোনা হবে– নাকি হাযার হাযার মানুষের বদ-দু'আ।[২]

এক জায়গায় তাদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

ঐ সব আমীর-উমারা ও দুনিয়াদার লোক 'আলিম-'উলামার ও ফকীহদের তুলনায় বেশরা (শরীয়তবিরোধী) পীর-ফকীর ও গান-বাদ্যরত সূফীদেররই

১. نقد مسالك الولاة والسلاطين ১৩২ পৃ.।
২. نقد مسالك الولاة والسلاطين ১৩৪ পৃ.।

অধিক ভক্ত ও অনুরক্ত। তাদের জন্য তারা উদার ও মুক্ত হস্তে খরচ করে থাকেন। পক্ষান্তরে প্রকৃত 'আলিম-'উলামা ও গুণী পণ্ডিতদের জন্য একটি পয়সা খরচ করাকেও তারা বোঝাস্বরূপ মনে করেন। তাঁদের জন্য খরচ করতে তাদের কষ্ট হয় এজন্যে যে, 'আলিম-'উলামা চিকিৎসকের ন্যায় আর চিকিৎসার জন্য খরচ করা মানুষের নিকট বিরাট বোঝা বলে মনে হয়। কিন্তু ঐ সব বেশরা পীর ও কাওয়ালদের জন্য টাকা-পয়সা খরচ করা গায়িকাদের জন্য খরচ করার ন্যায় আনন্দের বিষয় এবং এ ব্যয় তাদের কাছে গায়ক ও বাজীকরদের গানবাদ্য ও বাজির ন্যায় খেল-তামাশারূপ আনন্দদানকারী বস্তু এবং এগুলোকে পার্থিব সাম্রাজ্যের অপরিহার্য বিষয় বলেই তারা গণ্য করেন।[১]

এ কারণেই তারা এসব নকল সূফী ও ভণ্ড সংসারবিরাগী ফকীর-দরবেশের ভক্তে পরিণত হয় এবং তাদেরকে 'আলিম-'উলামার ওপর অগ্রাধিকার প্রদান করে। এরা যদি নিরেট মূর্খ জাহিলের শরীরেও দরবেশী পোষাক দেখতে পায় তাহলে তক্ষুণি তার ভক্ত মুরীদে পরিণত হয়। আর উক্ত ভণ্ড পীর-দরবেশ যদি তাদের কাছে মাথা নুইয়ে দেয় এবং বিনয় ও ভীতিমিশ্রিত আবেগ প্রকাশ করে তাহলে তার জন্য উন্মাদ হতেও তাদের এতটুকু দেরী হয় না। তারা বলে, "এ দরবেশের সাথে অমুক 'আলিমের কি তুলনা চলে? ইনি একজন সংসারবিরাগী মানুষ আর উনি দুনিয়াদার, পার্থিব বিষয়সম্পন্ন মানুষ! একজন ভাল ভাল খাবার খান, বিয়ে-শাদী করে সংসার-ধর্ম পালন করেন, আর অপরজন সাধারণ আহার্য গ্রহণ করেন, চিরকুমার থাকেন।" অথচ এটা পরিষ্কার মূর্খতা এবং শরীয়তে মুহাম্মাদীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন ছাড়া কিছু নয়। আল্লাহ্‌র এ এক বিরাট অনুগ্রহ যে, এ সব লোক আঁ-হযরত (সা)-এর যুগে ছিল না। অন্যথায় এরা তাঁকে বিয়ে-শাদী করতে দেখে, পাক-পবিত্র বস্তু ভক্ষণ করতে এবং মিষ্টি ও মধুর প্রতি আকৃষ্ট হতে দেখে তাঁর প্রতিও সম্ভবত মন্দ ধারণা পোষণ করত।[২]

সাধারণ মানুষের সমালোচনা করতে গিয়ে লিখেন :

শয়তান অনেক সাধারণ মানুষকে এই ধোঁকায় নিক্ষিপ্ত করে রেখেছে যে, ওয়া'জ-নসীহতের মাহফিল ও যিক্‌র-আযকারের মজলিসে শরীক হওয়া এবং এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কান্নাকাটি ও অশ্রু বর্ষণ করাই আসল কাজ। তারা মনে করে যে, নেক মাহফিলে অংশ গ্রহণ ও কান্নাকাটিই আসল উদ্দেশ্য। সে

---

১. نقد مسالك الولاة والسلاطين ৩৭৩ পৃ.।
২. تلبيس ابليس على العوام ৩৮৮-৮৯পৃ.।

জন্য তারা ওয়ায়েজীনের নিকট থেকে ফযীলতের ওয়া'জ শোনে। যদি তারা জানতে পারত যে, আসলে আমলই সব কিছুর লক্ষ্য, তাহলে তারা উপরিউক্ত মনোবৃত্তি নিশ্চয়ই পরিত্যাগ করত। আমি ব্যক্তিগতভাবে অনেক লোককেই জানি– যারা বছরের পর বছর ধরে ওয়া'জ মাহফিলে শরীক হয়ে আসছে, কাঁদছে, প্রভাবিত হচ্ছে, তথাপি না তারা সূদ গ্রহণ পরিত্যাগ করছে, আর না ব্যবসা-বাণিজ্যে ধোঁকা দেওয়া থেকে বিরত হচ্ছে। সালাতের আরকান-আহকাম সম্পর্কে আগেও যেমন তারা অজ্ঞ ও বেখবর ছিল, আজও তেমন অজ্ঞ ও বেখবর রয়েছে। মুসলমানদের গীবত গাওয়া ও পিতামাতার অবাধ্য থাকার ব্যাপারে তারা আগেও যেমন বাড়াবাড়ি করত, এখনো তেমনি বাড়াবাড়ি করে। শয়তান তাদের এই প্রতারণা দিয়ে রেখেছে যে, ওয়া'জ মাহফিলে হাযির থেকে শুধু অশ্রু বর্ষণ করলেই সব গুনাহ মাফ হয়ে যায়। কিছু লোককে শয়তান এই ধারণারও বশবর্তী করে রেখেছে যে, 'আলিম-'উলামা ও নেককার লোকদের সাহচর্যই আল্লাহ্র দরবারে ক্ষমা লাভের (মাগফিরাত) মাধ্যম ও উপকরণ।[১]

ধনিকদের সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন :

তাদের ভেতর বহু লোক মসজিদ ও পুল নির্মাণে অনেক অর্থ ব্যয় করে। লোক দেখানো খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি লাভই তাদের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তারা কামনা করে, এগুলোর মাধ্যমেই তাদের নাম ও স্মৃতি জাগরূক থাকুক। অনন্তর এই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূরণের জন্য তারা তাদের নির্মিত মসজিদ, পুল প্রভৃতিতে নাম-ফলক স্থাপন করে। আল্লাহ্র সন্তুষ্টিই যদি তাদের লক্ষ্য হ'ত তাহলে সে সবের ওপর তারা তাদের নাম উৎকীর্ণ করত না। আল্লাহ্ দেখছেন, তিনি সবই জানেন– এটাকেই তারা তাদের কাজের শ্রেষ্ঠ বিনিময় বলে মনে করত। এ ধরনের লোকদের যদি কেবল একটি দেওয়াল নির্মাণের জন্যই বলা হয় যার ওপর তাদের নাম খোদিত থাকবে না– তাহলে তারা তাতে রাযী হবে না।

এভাবে তারা খ্যাতি ও শোহরত লাভের জন্য মাহে রমযানু'ল-মুবারকে বিভিন্ন মসজিদ ও দরগায় মোমবাতি পাঠিয়ে থাকে, অথচ তার মহল্লার মসজিদ সারা বছরই অন্ধকারে ডুবে থাকে। এটা তারা এজন্য করে যে, দৈনিক অল্প অল্প করে সারা বছরব্যাপী মসজিদে তেল সরবরাহ করলেও সেই নাম ও খ্যাতি আসে না যা রমযানে একটি মাত্র মোমবাতি পাঠিয়ে দিলেই আসে।[১]

১. তালবীসে ইবলীস 'আলা'ল-'আওয়াম, ৩৯৩-৯৪ পৃ.।

সায়দু'ল-খাতির

সায়দু'ল-খাতির তাঁর একটি চয়িত ও সংকলিত গ্রন্থ। এতে গ্রন্থকার তাঁর অন্তর-মানসের প্রতিক্রিয়া, লৌকিকতামুক্ত ধ্যান-ধারণা, জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে লব্ধ অভিজ্ঞতা, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত চিন্তা-ভাবনা এবং আকস্মিক ঘটনা ও দুর্ঘটনাসমূহ লিপিবদ্ধ করেছেন। নিজের বহু দুর্বলতা ও ভুলের কথা অসংকোচে এবং কোনরূপ রাখ-ঢাক ছাড়াই তিনি স্বীকার করেছেন এ বইয়ে। নফসের সঙ্গে কথোপকথন, প্রশ্নোত্তর, মানসিক দ্বন্দ্বের রোয়েদাদ, সামাজিক জীবনের অভিজ্ঞতা, নারী, চাকর-বাকর ও বন্ধু-বান্ধবদের সম্পর্কে অভিজ্ঞতা, উপকারী ও কল্যাণকর পথ-নির্দেশনা, দৈনন্দিন ঘটনাবলী, প্রবৃত্তিজাত ব্যাধি, বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের পর্যালোচনা, আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মবিশ্লেষণ প্রভৃতি বিষয়ের বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন তিনি উক্ত বইয়ের জায়গায় জায়গায়। এ গ্রন্থের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হ'ল– এর সত্যতা, অনাড়ম্বরতা ও লৌকিকতামুক্ত বর্ণনাভঙ্গি। সে যুগের সাহিত্যিক ও লেখকদের অনুসৃত পন্থার বিরুদ্ধে সহজ সরল, প্রাঞ্জল ও সাবলীল ভাষায় গোটা গ্রন্থটাই লেখা হয়েছে। কোন আরব 'আলিম ও লেখকের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যে প্রোজ্জ্বল এটাই সম্ভবত প্রথম গ্রন্থ।

সাধারণ ঘটনা থেকে বিরাট ফলাফল

ইবনে জওযী এ গ্রন্থের ছোট ছোট ঘটনা ও দৈনন্দিন পর্যবেক্ষণ থেকে বিরাট অর্থ ও ফলাফল বের করেছেন, আর এখানেই একজন সাধারণ মানুষ ও একজন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন মানুষের মধ্যকার পার্থক্য ধরা পড়ে। এক স্থানে তিনি লিখেছেন :

> আমি দু'জন মজুরকে দেখলাম, একটি ভারী কড়িকাঠ উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। দু'জনই কিছু একটা গাইছিল। তবে একজন গানের একটি পংক্তি গাইছে তো অপরজন গানের মাধ্যমেই সুর-মূর্ছনার সঙ্গে তার জওয়াব দিচ্ছে। একজন যখন কিছু একটা পড়ছে তো অপর জন কান লাগিয়ে তা শুনছে। অতঃপর তার পুনরাবৃত্তি করছে অথবা সে ধরনেরই গানের পংক্তি দ্বারা তার জওয়াব দিচ্ছে। আমার খেয়াল হ'ল যে, যদি তারা এমনটি না করে তাহলে তাদের পরিশ্রম ও বোঝার অনুভূতি বেশি হবে। কিন্তু এই পন্থায় তাদের কাজ সহজ হয়ে যাচ্ছে। আমি বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলাম এবং বুঝতে পারলাম যে, এতে করে মস্তিষ্ককে কিছু সময় অন্য কাজে মগ্ন রেখে সেই

---

১. تلبيس ابليس على اصحاب الاموال ৩৯৫ পৃ.।

অবসরে তারা কিছু বিশ্রাম নিয়ে নেয়, কিছুটা আনন্দ লাভ করে এবং এভাবে তাদের মনে কিছু সজীবতার সৃষ্টি হয়। আর এমনি করে সহজেই তারা পথ অতিক্রম করে এবং বোঝার কষ্ট থেকে অন্যমনস্ক থাকার চেষ্টা করে। এই ঘটনা থেকে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম যে, মানুষ শর'ঈ বাধ্যবাধকতা, ধর্মীয় দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিরাট বোঝা মাথায় উঠিয়ে রেখেছে এবং সবচেয়ে বড় বোঝা হ'ল তার নফসজাত বোঝা। এ ক্ষেত্রে বড় কাজ হ'ল, তাকে তার আনন্দদায়ক ও বাঞ্ছিত বিষয়াদি থেকে ফিরিয়ে রাখা এবং যেসব জিনিসের প্রতি তার দেহমন ততটা আকৃষ্ট নয়, সেসবের ওপর তাকে ধরে রাখা। আমি এর থেকে যে ফলাফল বের করলাম তা হ'ল এই যে, সবরের (ধৈর্য) রাস্তাকে সান্ত্বনা দিয়ে এবং নফ্‌সকে অনুমোদিত প্রিয় বস্তুর সাহায্যে বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে। যেমন কোন কবি বলেছেন ঃ

"রাতভর চলার কারণে সওয়ারী যখন ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়ে এবং আর চলতে পারবে না বলে ফরিয়াদ জানায়, তখন ভোরের উজ্জ্বল আলোক-রেখা সত্বরই ফুটে উঠবে, এই আশার বাণী তাকে শোনাও। আর দিন হতেই তাকে আরামের প্রতিশ্রুতি দাও।"

এ ধরনেরই কাহিনী বাশার হাফী (র) থেকে বর্ণিত আছে। একবার তিনি ও তাঁর সঙ্গী কোথাও যাচ্ছিলেন। সঙ্গীর তেষ্টা পেল এবং বলল ঃ ক্ষণিক দাঁড়ান, আমি এই কুয়া থেকে পানি পান করে নিই। বাশার হাফী (র) তাকে বললেন ঃ একটু সবর কর, সামনের কুয়া থেকে পান করলেই হবে। এরপর যখন পরবর্তী কুয়া এসে গেল তখন তিনি এর পরবর্তী কুয়ার দিকে ইঙ্গিত করে তাকে পুনরায় সবর করতে বললেন। এভাবে বাশার হাফী (র) তার সঙ্গীকে সান্ত্বনা দান করতে করতে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে এলেন। এরপর তাকে বললেন ঃ এভাবেই দুনিয়ার সফর এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। প্রকৃত ঘটনা এই যে, যিনি এই রহস্যটি বুঝতে পারবেন তিনি তার নফসকে ভুলিয়ে রাখতে সক্ষম হবেন এবং নিজের মনকে প্রবোধ দেবেন, যাতে করে সে তার বোঝা সামলে নিতে পারে এবং এ ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করতে পারে। প্রাচীন যুগের কতক বুযুর্গ বলতেন, "হে আমার নফস! আমি যে বাঞ্ছিত সুখ-শান্তি ও আনন্দদায়ক বস্তু থেকে তোমাকে বাঁধা দিচ্ছি এবং ফিরিয়ে রাখছি সে তো কেবল স্নেহ-মমতা ও ভয়ের কারণে।" বায়েযীদ বিস্তামী (র)-এর উক্তি, "প্রথম দিকে আমি যখন আমার নফ্‌সকে আল্লাহ্‌র দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতাম

তখন সে বড় কান্নাকাটি করত। অতঃপর হাসি-খুশির মধ্য দিয়েই সে আল্লাহ্‌র দিকে অগসর হতে লাগল।" মনে রাখতে হবে, নফসকেও যত্ন-আত্তি করতে হবে, করতে হবে তার সাথেও স্নেহপূর্ণ ব্যবহার। এটা একটা জরুরী বিষয়। এভাবেই এগিয়ে যেতে হয় এবং এভাবেই রাস্তা একদিন ফুরিয়ে যায়।[১]

অন্যত্র লিখেছেন :

আমি দেখেছি যে, শিকারী কুকুর যখন মহল্লার অ-শিকারী কুকুরের পাশ দিয়ে যায় তখন অ-শিকারী কুকুর ঘেউ ঘেউ চিৎকার জুড়ে দেয় এবং শিকারী কুকুরের পেছনে লাগে। কেননা সে দেখে যে, কৃশকায় হওয়া সত্ত্বেও শিকারী কুকুরের বেশ সম্মান। এ কারণেই সে তার ওপর ঈর্ষান্বিত হয়। অপর দিকে শিকারী কুকুর অকর্মণ্য অ-শিকারী কুকুরের দিকে ফিরেও তাকায় না। তাকে সে আদৌ গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না। তার ঘেউ ঘেউ চিৎকারের সে আদৌ পরওয়া করে না। এথেকে মনে হয়, শিকারী কুকুর যেন ভাবতে শিখেছে, সে তার জাতিগোষ্ঠীর কেউ নয়। কেননা স্থানীয় কুকুরগুলো মোটাসোটা হলেও তাদের হাত-পাগুলো কোন কাজের নয়, তাদের ভেতর বিশ্বস্ততাও নেই। কিন্তু শিকারী কুকুর কৃশকায় হলেও দারুণ ফুর্তিবাজ। তার দেহ হালকা-পাতলা, কিন্তু স্বভাব ও আচার-আচরণ শিষ্ট ও সভ্য-শান্ত। সে যখন শিকার করে তখন শিকারকৃত বস্তুতে মুখ লাগাবার কথা চিন্তাই করে না। মালিকের প্রতি অনুগত থাকার কারণে হোক কিংবা তার প্রতি মালিকের অনুগ্রহের কথা স্মরণ করেই হোক, সে শিকারকে অক্ষত অবস্থায় মালিকের হাতে তুলে দেয়। এর থেকে একটি কথা তো আমি বুঝলাম যে, দেহ ও চরিত্রের মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক আছে। শরীর যদি হয় সূক্ষ্ম তাহলে চরিত্রও হবে সূক্ষ্ম। দ্বিতীয় যেটি জানলাম তা হ'ল এই যে, মানুষ ঐ ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষান্বিত হয় না যাকে সে তার সমশ্রেণীর কিংবা সমপর্যায়ের মনে করে না। ঠিক তেমনি আল্লাহ্ যাকে ঈমান ও 'আক'ল (বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা) দান করেছেন সে এমন ঈর্ষাকারীর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয় না যে ঈমান ও 'আক'ল থেকে বঞ্চিত। তাকে সে ভ্রূক্ষেপের যোগ্যই মনে করে না। কেননা সে এক জগতের অধিবাসী, আর এ আর এক জগতের অধিবাসী। একজন দুনিয়ার কারণে ঈর্ষাপরায়ণ এবং অন্যজনের দৃষ্টি সুদূর আখিরাতের প্রতি নিবদ্ধ। আর এ দু'জনের মধ্যে আসমান-যমীনের পার্থক্য বিদ্যমান।[১]

---

১. সয়্যায়দু'ল-খাতিয়্যর, ১ম খণ্ড, ১৪৬-৪৭ পৃ.।

জীবনের ঘটনাবলী ও নফ্সের সঙ্গে কথোপকথন

তিনি তাঁর জীবনের ঘটনাবলীর ভেতর নিজের নফ্সের সঙ্গে বিস্ফোরিত কথাবার্তা বলেন। একবার তিনি দু'আ করেন। অপর একজন নেককার বুযুর্গ ঐ দু'আর ভেতর শরীক ছিলেন। দু'আ কবূল হ'ল। কিন্তু কার দু'আ কবূল হল? এ ব্যাপারে নিজের নফসের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা হয় ঃ

একবার এমন একটি ব্যাপার দেখা দিল যে, তখন আল্লাহ্র নিকট আমার চাইবার ও দু'আ করবার প্রয়োজন অনুভূত হ'ল। আমি দু'আ করলাম এবং আল্লাহ্র নিকট চাইলাম। একজন নেককার বুযুর্গ এই দু'আয় আমার সঙ্গে শরীক হন। দু'আ কবূল হবার কিছু 'আলামত আমি দেখতে পেলাম। আমার নফ্স আমাকে বলল ঃ এটা এ বুযুর্গের দু'আর ফল, তোমার দু'আর ফল নয়। আমি বললাম : আমি আমার এমন অনেক গুনাহ ও ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা জানি যার জন্য আসলেই আমার এ অধিকার নেই যে, আমার দু'আ কবূল হবে। কিন্তু আমার দু'আ কবূল হলেও তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কেননা এই নেককার লোকটি সম্ভবত আমার সে সব গুনাহ ও দোষ-ত্রুটি থেকে নিরাপদ আছেন যেগুলো সম্পর্কে আমি অবহিত। কিন্তু তাঁর ও আমার মাঝে একটি বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে আর তা হ'ল, আমি আমার নিজের দোষ-ত্রুটির জন্য লজ্জিত এবং এজন্য আমার অন্তর-মানসও ভীত-সন্ত্রস্ত। পক্ষান্তরে তিনি তাঁর নিজের ব্যাপারে প্রফুল্লচিত্ত ও আনন্দিত। আর দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে নিজের স্বীকৃতি এ ধরনের প্রয়োজনের মুহূর্তে অধিক কার্যকর ও প্রয়োজনীয় বস্তু হিসাবে প্রমাণিত হয়। অবশ্য একটি বিষয়ে আমি ও তিনি সমান আর তা হ'ল এই যে, আমাদের উভয়ের ভেতর কেউই স্বীয় আমলের ভিত্তিতে আল্লাহ্র অনুগ্রহপ্রার্থী নই। এখন আমি যদি আমার ভাঙা অন্তর নিয়ে লজ্জায় মাথা নুইয়ে আমার গুনাহর স্বীকৃতি জানিয়ে বলি, "ইয়া আল্লাহ্! তুমি কেবল তোমার অনুগ্রহে আমাকে দান কর, কেননা আমি একেবারে রিক্ত হস্ত", এমতাবস্থায় আমার আশা ও বিশ্বাস যে, আমার আবেদন গৃহীত হবে। পক্ষান্তরে এও সম্ভব যে, তাঁর (নেককার ব্যক্তির) দৃষ্টি তাঁর উত্তম আমলের ও আখলাকের ওপর পড়বে এবং এটাই তাঁর দু'আ কবূল হবার পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে। অতএব, হে আমার নফ্স! আমার মন একেবারে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিও না। সে তো আগে থেকেই ভেঙে-চুরে একাকার হয়ে আছে। আমি আমার আচরণ সম্পর্কে জানি, আর তা হ'ল শিষ্টাচার (আদব), বিনয়, অতঃপর

১. সা'য়দু'ল-খাতি'র, ৩য় খণ্ড, ৬৩৯-৪০ পৃ.।

নিজের দোষ-ত্রুটির মৌখিক স্বীকৃতি। যে বস্তু আমি চেয়েছি আমি তার ভীষণ মুখাপেক্ষী এবং যাঁর কাছে চেয়েছি তাঁর অনুগ্রহ অপরিসীম। আর এসব বস্তু উক্ত বুযুর্গ সাধকের অর্জিত নয় যে, আল্লাহ তাঁর 'ইবাদতে বরকত দেবেন। আমার স্বীকৃতিটাই তো বিরাট কাজের জিনিস।[১]

তিনি অন্যত্র লিখছেন ঃ

একবার আমি একটি ব্যাপারে– যা ছিল শরীয়তের দৃষ্টিতে মাকরূহ– দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে ছিলাম। আমার নফ্স আমার সামনে এর ভিন্নতর ব্যাখ্যা পেশ করছিল এবং তার মাকরূহ হবার বিষয়টিকে আমার দৃষ্টি থেকে সরিয়ে দিচ্ছিল। আসলে ঐ ভিন্নতর ব্যাখ্যা ছিল বিকৃত ও ভ্রান্ত এবং জিনিসটি মাকরূহ হবার পেছনে প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট দলীল বর্তমান ছিল। আমি আল্লাহ্র দিকে রুজু করলাম এবং দু'আ করলাম, হে আল্লাহ্! আমার এই দ্বিধান্বিত মানসিকতা দূর করে দাও। আমি কুরআন মজীদ তিলাওয়াত শুরু করলাম। তিলাওয়াতের ধারাবাহিকতায় সূরা ইউসূফ শুরু হতে যাচ্ছিল। আমি সেখান থেকেই শুরু করলাম। আমার মনের ওপর আগের ধারণাই বিরাজ করছিল। আমি জানতেই পারিনি যে, আমি কি পড়ছিলাম। যখন এই আয়াতে গিয়ে পৌঁছুলাম قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهٗ رَبِّىْ اَحْسَنَ مَثْوَاىَ, তখন আমি চমকে উঠলাম। আমার মনে হল, আমিই যেন এই আয়াতের লক্ষ্য। তৎক্ষণাৎই আমি সম্বিত ফিরে পেলাম। চোখ থেকে অন্যমনস্কতার পর্দা দূরীভূত হ'ল। আমি আমার নফসকে বললাম, "তুমি কি লক্ষ্য করেছ, হযরত ইউসূফ ('আ) ছিলেন মুক্ত ও আযাদ। তাঁকে জোর-যবরদস্তি করে এবং অন্যায়ভাবে গোলাম বানিয়ে বিক্রি করা হয়েছিল। এতদ্সত্ত্বেও তিনি সেই ব্যক্তির অধিকারের প্রতি যিনি তাঁকে কিনে নিয়েছিলেন, সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন এবং অকপটে তাঁর সদাচরণের স্বীকৃতিও দিয়েছিলেন। তিনি (হযরত ইউসুফ) তাকে 'প্রভু' সম্বোধন করেছিলেন, অথচ সেও ছিল গোলাম। আল্লাহ্ ছাড়া তাঁর কোন প্রভু ছিল না। প্রকৃতপক্ষে তাঁর প্রতি কৃত অনুগ্রহের কারণে কৃতজ্ঞতাস্বরূপই তিনি তাঁকে (মনিবকে) উপরিউক্ত সম্বোধন করেছিলেন এবং বলেছিলেন, اَحْسَنَ مَثْوَاىَ তিনি (ইউসূফের মনিব) আমাকে যত্নের সঙ্গে আশ্রয় দিয়েছিলেন। এখন একটু নিজের সম্পর্কে ভেবে দেখ! তুমি প্রকৃতই এমন একজন প্রভুর গোলাম যিনি তোমাকে তোমার অস্তিত্বের সূচনা থেকে তোমার প্রতি অনুগ্রহ দেখিয়ে আসছেন এবং এতবার তোমার গোপনীয়তা রক্ষা করেছেন যার কোন

---

১. সায়দু'ল-খাতি'র (صيد الخاطر), ১৫৭--৫৮, পৃ.।

সীমা-সংখ্যা নেই। তিনি তোমাকে প্রতিপালন করেছেন, শিখিয়েছেন, পড়িয়েছেন, রূযী দিয়েছেন, হেফাজত করেছেন, কল্যাণের উপকরণ সরবরাহ করেছেন,সর্বোত্তম পথে দাঁড় করিয়েছেন, প্রতিটি প্রতারণা ও শত্রুতার হাত থেকে বাঁচিয়েছেন, উত্তম বাহ্যিক সৌন্দর্য প্রদানের সঙ্গে অভ্যন্তরীণ মেধা ও স্বভাবজাত প্রতিভা দান করেছেন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা তোমার জন্য সহজ করে দিয়েছেন, এমন কি স্বল্পতম সময়ে তুমি সেই সব 'ইল্‌ম (জ্ঞান) লাভ করেছ, যা অন্যেরা দীর্ঘদিনেও লাভ করতে পারেনি। তিনি তোমার মুখে, তোমার ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সহজ ও সাবলীল করে দিয়েছেন এবং অলঙ্কার ও ছন্দ প্রকরণের সঙ্গে সে সবের ব্যাখ্যা করবার শক্তি দান করেছেন। তিনি গোটা সৃষ্টি জগতের কাছে তোমার দোষ-ত্রুটি প্রচ্ছন্ন রেখেছেন। তোমার সঙ্গে তাঁর কায়-কারবার ভাল ধারণার ওপরই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। কোনরূপ আড়ম্বরতা ও লৌকিকতা ব্যতিরেকেই তিনি তোমার রিয্‌ক তোমার কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, তোমাকে তিনি কারোর অনুগ্রহ-প্রত্যাশী বানান নি। আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি, আমার উপলব্ধিতেই আসে না, তাঁর অনুগ্রহের কোন দিকটি নিয়ে আলোচনা করব ঃ আমাকে প্রদত্ত সুন্দর মুখাকৃতির, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের, স্বাস্থ্যের, মস্তিষ্কের সুস্থতার, গঠন-বিন্যাসে ভারসাম্যের, স্বভাব-প্রকৃতির নমনীয়তা ও পবিত্রতার, হীনতা ও নীচতা থেকে মুক্ত থাকার, শৈশব থেকেই সোজা-সরল ও মধ্যম পথে চলার তওফীক দানের, নির্লজ্জতা ও পদস্খলন থেকে হেফাজতের, আল্লাহ্‌প্রদত্ত গ্রন্থ ও সুন্নাহ্‌ অনুসরণের শক্তিদানের, অন্ধ ও জড় অনুকরণ থেকে মুক্তির অথবা বিদ'আতী লোকের অনুসরণ থেকে রক্ষা পাবার? কোন্‌টা রেখে কোন্‌টার কথা বলব? কোন্‌ অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করব? وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَاتُحْصُوْهَا (যদি তোমরা আল্লাহ্‌প্রদত্ত নে'মত গণনা করতে চাও—তাহলে তা গণনা করতে পারবে না)। কত দুশমন তোমাকে ধরবার জন্য জাল বিছিয়েছে, আল্লাহ্‌ পাক তার হাত থেকে তোমাকে বাঁচিয়েছেন। তোমার কত বিরোধী তোমাকে অবনমিত করতে চেয়েছে, আল্লাহ্ তোমার মস্তিষ্ক উন্নত রেখেছেন। কত নে'মত থেকে অন্যরা বঞ্চিত রয়েছে, অথচ তোমাকে সে সব নে'মত দ্বারা প্রাচুর্যমণ্ডিত করা হয়েছে। দুনিয়া থেকে কত মানুষই না ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে বিদায় নিয়েছে, অথচ তুমি এখানে সাফল্যের অধিকারী। এমনভাবে তোমার দিন অতিবাহিত হচ্ছে যে, তোমার শরীর সহি-সালামত, তোমাদের দীন ও ধর্ম নিরাপদ, তোমার জ্ঞান ('ইলম) ক্রমবর্ধমান এবং তোমার অন্তরের বাসনা পূর্ণতাপ্রাপ্ত। যদি কোন উদ্দেশ্য

বাস্তবায়িত না হয় তাহলে তাঁর পক্ষ থেকে তোমার ধৈর্য ধারণের উপায় করে দেওয়া হয়। ফলে তুমি জানতে পার, উক্ত উদ্দেশ্য পূরণ না হবার মধ্যে আল্লাহ্‌র কোন্ হিকমত নিহিত ছিল, এমন কি তোমার নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে যে, এটাই তোমার পক্ষে ভাল ছিল। বিগত দিনগুলোতে আমি যে সব অনুগ্রহ পেয়ে ধন্য হয়েছিলাম, সে সব যদি আমি গণনা করতে শুরু করি, তাহলে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখে শেষ করা যাবে না। আর তুমি জান যে, যেসব অনুগ্রহের কথা আমি উল্লেখ করিনি সেগুলো উল্লিখিত অনুগ্রহের চেয়ে অনেক বেশি। সেগুলোর দিকে আমি কেবল ইঙ্গিত করেছি। ঐ সবের সঙ্গে তোমার এমন কর্ম কি করে শোভা পায় যা তাঁর মর্জির খেলাফ? مَعَاذَ اللّٰه اِنَّهُ رَبِّى اَحْسَنَ مَثْوَاىَ اِنَّه لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُوْنَ (আমি আল্লাহ্‌র শরণ নিচ্ছি, তিনি আমার প্রভু, তিনি আমাকে সম্মানজনকভাবে থাকতে দিয়েছেন; সীমা লঙ্ঘনকারিগণ সফলকাম হয় না)।[১]

অন্যত্র লিখেছেন ঃ

একবার আমি এমন একটি মসলার ওপর আমল করলাম, যা কতক মযহাবে অনুমোদিত থাকলেও অন্যান্য মযহাবে জায়েয ছিল না। এর ওপর আমল করবার কারণে আমি আমার অন্তরে বিরাট আঘাত অনুভব করলাম। মনে হ'ল, আমি যেন স্রষ্টার দরবার থেকে বিতাড়িত এবং তাঁর ক্রোধের পাত্রে পরিণত হলাম। আমি আমার ভেতর কিঞ্চিৎ বঞ্চনা ও গাঢ় অন্ধকার অনুভব করলাম। আমার নফ্‌স আমাকে বলল ঃ কী ব্যাপার! তুমি তো ফকীহদের গণ্ডী অতিক্রম কর নি। আমি বললাম ঃ হে আমার মন্দ নফ্‌স! তোমার প্রশ্নের উত্তর দু'ভাবে দেওয়া যেতে পারে। প্রথমত, তুমি তোমার নিজের 'আকীদা-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ভিন্নতর ব্যাখ্যার আশ্রয় নিলে। যদি স্বয়ং তোমার নিকট এ বিষয়ে ফতওয়া চাওয়া হ'ত তাহলে তুমি কখনও এ ফতওয়া দিতে না। সে বলল : আমি যদি তা জায়েয বলে স্বীকারই না করতাম তাহলে তা করতামই বা কেন? আমি বললাম : তুমি তোমার এই ধারণা অন্যের জন্যও ফতওয়া হিসাবে পছন্দ করতে না। দ্বিতীয়ত, তোমার অন্ধকারের এই অনুভূতির ব্যাপারে খুশি হওয়ার দরকার এজন্য যে, যদি তোমার অন্তরে (সত্যের) নূর না থাকত তাহলে তোমার ওপর এর আছরই (প্রতিক্রিয়া) পড়ত না। সে বলল: সে যা-ই হোক, আমি সেই অন্ধকারের ভয়ে ভীত যা বারবার ঘুরে ফিরে

১. صيد الخاطر ২৮৩–৮৫ পৃ.।

আসে। আমি বললাম: এরপর তুমি সে কাজ ছেড়ে দেবার সংকল্প গ্রহণ কর এবং ধরে নাও যে, তুমি যা ছেড়ে দিয়েছ তা সর্বসম্মতভাবে জায়েয, এতদ্‌সত্ত্বেও তাক্‌ওয়া ও পরহেযগারীর কারণে তা ছেড়ে দেবার ওয়া'দা কর। অনন্তর এই পথ অবলম্বনের মাধ্যমে সে (নফ্‌স) মানসিক দ্বন্দ্বের হাত থেকে মুক্তি পেল।[১]

প্রাচীন বুযুর্গদের (সল্‌ফ-ই-সালিহীন) জীবনী অধ্যয়নের আবশ্যকতা

মুহাদ্দিছ ও ফকীহ্‌ হওয়া সত্ত্বেও তিনি এই বাস্তব সত্য সম্পর্কে বেখবর ছিলেন না যে, আত্মার (কল্‌ব-এর) সংস্কার ও সংশোধন এবং (সত্যের প্রতি) প্রেরণা ও আগ্রহ সৃষ্টি করবার জন্য প্রভাবমণ্ডিত ঘটনা ও প্রাচীন বুযুর্গদের জীবনী অধ্যয়ন করা অপরিহার্য। 'তালবীসে ইবলীস' ও 'স'ায়দু'ল-খাতি'র' এই উভয় গ্রন্থেই তিনি ফকীহ্‌, মুহাদ্দিছ, ছাত্র-ছাত্রী ও 'আলিম-'উলামাকে এই পরামর্শ দিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। 'স'ায়দু'ল-খাতি'র'-এর এক স্থানে তিনি লিখেছেন :

> আমি দেখেছি যে, ফিক্‌'হ ও হাদীছ শ্রবণের ভেতর তন্ময়তা ও নিবিষ্ট-চিত্ততা আত্মার মধ্যে যোগ্যতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। ফিক্‌'হ ও হাদীছ শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে প্রভাবমণ্ডিত ঘটনাবলী ও সল্‌ফ-ই-সালিহীনের জীবনী গ্রন্থও অধ্যয়ন করতে হবে। কেবল হারাম-হালালের 'ইল্‌ম (জ্ঞান) মনের ভেতর স্নেহ-কোমল ও কান্না-ভারাক্রান্ত অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে না, তা পারে একমাত্র প্রভাবমণ্ডিত হাদীছ, কাহিনী ও প্রাচীন বুযুর্গদের জীবনী গ্রন্থ অধ্যয়ন। কেননা কুরআন, হাদীছ ও বর্ণিত কাহিনীর যে মূল উদ্দেশ্য তা প্রাচীন বুযুর্গগণ হাসিল করেছিলেন। আল্লাহ্‌প্রদত্ত বিধানের ওপর তাঁদের যে 'আমল তা কাঠামোগত ও বাহ্যিক ছিল না, বরং তাঁরা এসবের আসল স্বাদ ও সার-বস্তু হাসিল করেছিলেন। আর আমি তোমাদের এখন যা বলছি তাও বাস্তব অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান থেকেই বলছি। আমি দেখেছি যে, সাধারণ মুহাদ্দিছগণ ও হাদীছশাস্ত্রের ছাত্রবৃন্দের গোটা মনোযোগ হাদীছের ক্ষেত্রে উচ্চতর সনদ লাভ এবং অধিক সংখ্যক হাদীছ কণ্ঠস্থ করবার দিকেই নিবদ্ধ থাকে। ঠিক তেমনি সাধারণ ফকীহদের তামাম মনোনিবেশ তর্ক-বিতর্ক, আলোচনা-সমালোচনা এবং প্রতিপক্ষকে কিভাবে ঘায়েল ও পরাভূত করা যাবে সে ধরনের 'ইল্‌ম-এর প্রতিই থাকে। অতএব, এ ধরনের আচরণ

১. স'ায়দু'ল-খাতি'র, ২৮৩-৮৫ পৃ.।

দ্বারা অন্তর মানসে কি করে কোমল ও কান্নাভারাক্রান্ত অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে? প্রাচীন বুযুর্গদের একটি দল নেক্‌কার ও বুযুর্গ ব্যক্তিদের আচরণ ও কর্মপদ্ধতি দেখবার জন্যই তাঁদের সাথে সাক্ষাত করতেন, তাঁদের কাছ থেকে বাহ্যিক 'ইল্‌ম শিখবার জন্য নয়। কেননা তাঁদের আচার-আচরণ ও কর্মপদ্ধতিই তাঁদের জ্ঞানের প্রকৃত ফসল ছিল। এই রহস্যটি বেশ ভালভাবে অনুধাবনের চেষ্টা কর এবং হাদীছ শিক্ষার সাথে সাথে সল্‌ফ-ই-সালিহীন ও মুসলিম ফক'ীহ ও উম্মাহ্‌র যাহিদ (আধ্যাত্মিক সাধক)-দের জীবন-চরিতও অধ্যয়ন কর যাতে এর দ্বারা তোমার অন্তঃকরণে কোমল ও দ্রবীভূত অবস্থা সৃষ্টি হয়।[১]

মুসলিম উম্মার নেককার ও সালিহ্ লোকদের জীবন-চরিত

ইবনে জওযী (র) এ কারণেই সল্‌ফ-ই সালিহীন ও উম্মাহ্‌র নেককার লোকদের অনেকেরই জীবন-চরিত লিখে গেছেন। উদাহরণস্বরূপ, হযরত হাসান বসরী, সায়্যিদুনা ওমর ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীয, হযরত সুফিয়ান ছওরী, হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম, হযরত বাশার হাফী, ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল, হযরত মা'রূফ কারখী (র)-এর[২] নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এঁদের ওপর স্থায়ী আলোচনা গ্রন্থ ছাড়াও একটি সামগ্রিক জীবনী-সংকলন "সিফাতু'স-সফওয়া" (صفه الصفوة)-ও তিনি লেখেন। চার খণ্ডে সমাপ্ত এ গ্রন্থ আসলে আবূ ন'ঈম ইস্পাহানীর বিখ্যাত গ্রন্থ "হি'লয়াতু'ল-আওলিয়া"-র মার্জিত ও শোভন সংস্করণ যাকে ইবনে জওযী (র) প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন শেষে সংক্ষিপ্তাকারে মুহাদ্দিছসুলভ ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সংকলিত করেছেন। এই সব গ্রন্থে যে সব জীবনী ও ঘটনা এসেছে তা প্রভাবমণ্ডিত ও চিত্তদ্রবীভূতকারী হবার সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের নিরিখে নির্ভরযোগ্য ও অতিরঞ্জন তথা বাহুল্য বর্ণনা থেকে মুক্ত।

ইতিহাসের গুরুত্ব

ইবনে জওযী (র) দীনী 'ইল্‌ম (ধর্মীয় জ্ঞান) তথা ফিক্'হ ও হাদীছশাস্ত্রে পণ্ডিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসশাস্ত্রেরও একজন বড় প্রবক্তা ও প্রচারক ছিলেন। তাঁর মতে, ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই 'উলামাই-কিরাম ও ফক'ীহগণ তাঁদের গ্রন্থে এমন কিছু দুঃখজনক ভুলত্রুটি করেছেন যা তাঁদের 'ইল্‌মে

---

১. সা'য়দু'ল-খাতি'র, ২য় খণ্ড, ৩০২-৩ পৃ.।

২. তিনি নিজে এ সম্পর্কে তাঁর সা'য়দু'ল-খাতি'র গ্রন্থে আলোচনা করেছেন, ১ম খণ্ড দ্র. ১৩৭, ১৪৪, ১৭৫ পৃ.; ২য় খণ্ড, ৩৬৩ পৃ.; ৩য় খণ্ড, ৫৬২ ও ৬০৬ পৃ.।

ও পদমর্যাদার অনুকূলে মোটেই যায়নি। এজন্য তিনি শিক্ষার্থীদের পরামর্শ দিচ্ছেন, তারা যেন সকল বিষয়ে মোটামুটি অবহিত থাকে, বিশেষ করে ইতিহাসে যেন এতটা জ্ঞান অর্জন করে যাতে তারা এমন কোন বড় ধরনের ঐতিহাসিক ভুল না করে বসে যা তাদের অপমানের কারণ হয়। 'স'ায়দু'ল-খাতি'র'-এ তিনি লিখছেন :

> ফক'ীহ্‌র উচিত প্রতিটি বিষয়ের প্রয়োজনীয় অংশ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকা। ইতিহাস, হাদীছশাস্ত্র, অভিধান তথা যে কোন বিষয় সম্পর্কেই ফক'ীহ্‌র দরকারী জ্ঞান থাকতে হবে। আর তা এজন্য যে, ফিক্'হশাস্ত্র তার পরিপূর্ণতার জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখার মুখাপেক্ষী। কোন কোন ফক'ীহকে আমি বলতে শুনেছি, 'শায়খ শিবলী (র) ও কাযী শরীফ এক মজলিসে একত্র হয়েছেন'। এ কথা শুনে আমি অবাক হই এজন্য যে, উল্লিখিত দু'জন বুযুর্গের মধ্যকার ব্যবধানটুকু পর্যন্ত এ ফক'ীহদের জানা নেই। এ কথা জানা থাকলে তাঁরা বুঝতে পারতেন যে, এমতাবস্থায় উভয়ের পারস্পরিক সাক্ষাত লাভ আদৌ সম্ভব নয়। একবার একজন 'আলিম কোন এক বিতর্ক চলাকালে বলেন যে, হযরত 'আলী (রা) ও সায়্যিদা ফাতিমা (রা)-এর ভেতর (মৃত্যু পরবর্তীতেও) স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হয় নাই। কেননা হযরত 'আলী হযরত সায়্যিদা ফাতিমা (রা)-কে গোসল দিয়েছিলেন। আমি তাঁকে বললাম ঃ আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল করুন! (আপনি যা বললেন তা যদি সত্যি হয়) তাহলে হযরত 'আলী (রা) হযরত ফাতিমা (রা)-এর ইনতিকাল-পরবর্তীতে তাঁর বোন-ঝি উমামা বিনতে যয়নব (রা)-কে কিভাবে বিয়ে করলেন? ইমাম গাযালী (র)-এর ইহ্'য়াউ'ল-'উলূম গ্রন্থেও আমি এ ধরনের ঐতিহাসিক ভুলভ্রান্তি লক্ষ্য করেছি আমি বিস্মিত হয়েছি, তিনি কিভাবে বিভিন্ন ঘটনা ও ইতিহাসকে এক সঙ্গে মিশিয়ে ফেললেন! আমি সে সব ঐতিহাসিক ভ্রান্তিগুলোকে একটি গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছি। তিনি তাঁর গ্রন্থ "মুস্তাজহিরী"-তেও এ জাতীয় ভুল করেছেন। গ্রন্থটি তিনি খলীফা মুস্তাজহির বিল্লাহ্‌র খিদমতে পেশ করেছিলেন। এতে তিনি বলেছিলেন যে, খলীফা সুলায়মান ইবনে 'আবদুল মালিক সুফী আবূ হাযেমকে বলে পাঠান যে, তিনি যেন তাঁর নাশতার কিছু অংশ তাবাররুক হিসাবে পাঠিয়ে দেন। তিনি খলীফাকে কিছু গমের তপ্ত ভুসি পাঠান। সুলায়মান এর দ্বারা নাশতা করেন। অতঃপর তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হন এবং এই মিলনের ফসল হিসাবে 'আবদুল 'আযীয জন্মগ্রহণ করেন। প্রকৃতপক্ষে 'আবদুল 'আযীযের ঘরেই ওমর ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীয জন্মগ্রহণ করেন।

ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীয (র)-কে সুলায়মান ইব্‌নে 'আবদুল মালিকের পৌত্র বানিয়েছেন, অথচ তিনি তাঁর পিতৃব্য-পুত্র ছিলেন। শায়খ আবুল মা'আলী জুওয়ায়নী তাঁর 'আশ-শামিল' নামক উসূলে ফিক্‌'হের একটি গ্রন্থের শেষে লিখেছেন ঃ বাতেনী সূফীদের একটি দল বর্ণনা করেছেন যে, হাল্লাজ, জনাবী কারামতী ও ইবনু'ল-মিকনা' রাষ্ট্রবিরোধী ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের মাধ্যমে বিপ্লব সংগঠনের প্রয়াস চালায় এবং জনসাধারণকে তাদের দলে টানবার চেষ্টা করে। তারা এক একজন এক একটি দেশের দায়িত্ব গ্রহণ করে। জনাবী ইহ্‌সাতে ও ইবনু'ল-মিকনা' তুর্কিস্তান সীমান্তে বসতি স্থাপন করে এবং হাল্লাজ বাগদাদকে তার বিপ্লবের ঘাঁটি হিসাবে বেছে নেয়। এতে প্রথমোক্ত দু'জন তাদের শেষোক্ত সাথী সম্পর্কে ফয়সালা শুনিয়ে দেয় যে, সে উদ্দেশ্য হাসিলে ব্যর্থ হবে এবং শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হবে। কেননা বাগদাদের লোকেরা প্রতারিত হয় না। তারা বুদ্ধিমান এবং লোক সম্পর্কে তাদের জ্ঞান খুবই প্রখর। আমি বলি, এটা উক্ত বর্ণনাকারীর একটি মারাত্মক ভুল। কেননা হাল্লাজ ইবনু'ল-মিকনা'র যুগই পাননি। ইবনু'ল-মিকনা'কে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন খলীফা মনসূর, আর এ ঘটনা ১৪৪ হিজরীর। আর আবূ সা'ঈদ আল-জনাবীর আবির্ভাব ঘটেছে ২৮৬ হিজরীতে এবং হাল্লাজ নিহত হয়েছেন ৩০৯ হিজরীতে। এতে দেখা যায় যে, কারামতী ও হাল্লাজের যুগ অনেকটা কাছাকাছি। ইবু'ল-মিকনা'র যুগ তো বহু পূর্বের। অতএব, তার পক্ষে বাকী দু'জনের সঙ্গে মিলিত হয়ে ষড়যন্ত্রে অংশ গ্রহণ করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। এর থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তিরই উচিত, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা সম্পর্কেও কিছু কিছু পড়াশুনা করা। কেননা জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে কোন শাখাই অপর শাখার সঙ্গে ওঁতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। একজন মুহাদ্দিছের জন্য এটা কতখানি দোষের যে, কোন ঘটনা সম্পর্কে তাঁর নিকট ফতওয়া চাওয়া হলে তিনি তাঁর জওয়াব দিতে পারেন না! এর কারণ নিশ্চয়ই এই যে, তিনি طريق حديث জমা করতেই রাতদিন মশগুল, মসলা-মাসাইল ও খুঁটিনাটি 'ইল্‌মের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করার ফুরসৎই তাঁর নেই। ঠিক তেমনি একজ ফক'ীহ্‌র জন্য কতখানি অসমীচীন যে, তাঁর নিকট একটি হাদীছের মর্মার্থ জিজ্ঞাসা করা হবে আর তিনি সে সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ থাকবেন। আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করি, তিনি যেন আমাকে বুলন্দ হিম্মত দান করেন যাতে আমি হীনমন্যতা ও ভীরুতাকে বরদাশ্‌ত না করি।[১]

১. সা'য়দু'ল-খাতি'র, ৩য় খণ্ড, ৬০৪-৬ পৃ.।

ঐতিহাসিক রচনাবলী

তিনি কেবল এই সমালোচনা ও পরামর্শ দানের মধ্যেই নিজের প্রয়াসকে সীমাবদ্ধ রাখেননি, বরং المنتظم فى تاريخ الملوك والامم নামক দশ খণ্ডে সমাপ্ত একটি বিরাট জীবনী গ্রন্থও প্রণয়ন করেন যার বিস্তৃতি ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে শুরু করে ৫৭৪ হিজরী পর্যন্ত। গ্রন্থকার প্রথমে সন উল্লেখ করেছেন, এরপর উক্ত সনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ বর্ণনা করেছেন, অতঃপর উক্ত সনে যে সব বিশিষ্ট ও উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির ইনতিকাল হয়েছে তাঁদের জীবনী আলোচনা করেছেন। এভাবে এই গ্রন্থ জীবনী ও আলোচনার এক সামগ্রিক ইতিহাসে পরিণত হয়েছে।[১]

তাঁর تلقيح فهوم اهل الاثر فى عيون التاريخ والسير নামক গ্রন্থটি একটি সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক স্মারকলিপি হিসাবে খ্যাত। এর ভেতর ঐতিহাসিক তথ্যাবলীর অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছে।[২]

সম্বোধন, সম্ভাষণ ও বাগ্মিতা

'আল্লামা ইবনে জওযী (রা)-এর বাকপটুতা, ভাষার অলংকরণ ও প্রখর বাগ্মিতার ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কোন প্রকার দ্বিমত নেই। তাঁর ওয়াজ-মাহফিলের জনপ্রিয়তা এবং তাতে লোকের প্রচণ্ড ভীড় হবার এটা ছিল অন্যতম প্রধান কারণ। صيد الخاطر নামক গ্রন্থে তিনি তাঁর মানসিক দ্বন্দ্বের কথা তুলে ধরেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর নফ্স তাঁকে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছিল যেন তিনি শব্দের দিকে মোটেই মনোযোগ না দেন। তার মতে, ভাষার অলংকরণ, বাকপটুতা ও বাগ্মিতা সবই কৃত্রিম ও লৌকিক। কিন্তু তিনি জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে এ ধারণার নিরসন ঘটান এবং নফ্সকে এই বলে বোঝান যে, উত্তম বাক-নৈপুণ্য আল্লাহ্প্রদত্ত প্রতিভা, যোগ্যতা ও হাতিয়ার বিশেষ। ইসলামের দা'ওয়াত ও তবলীগের ক্ষেত্রে এর সাহায্য অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। একে অসম্মান করা ঠিক হবে না। এ ধারণাও তাঁর মনে কয়েকবার উদিত হয় যে, তিনি যেন বক্তৃতা দান এবং দা'ওয়াত ও তবলীগের কাজ ছেড়ে দিয়ে শুধু যুহ্দের জন্য লোক সংস্রববর্জিত ঝামেলামুক্ত জীবন অবলম্বন করেন। কিন্তু তিনি দলীল-প্রমাণ দ্বারা ও নফসের সঙ্গে বিস্তারিত-আলোচনা ও তর্কবিতর্ক করে এ ধারণার

---

১. এই গ্রন্থের শেষ পাঁচ খণ্ড দাইরাতু'ল-মা'আরিফ, হায়দরাবাদ থেকে প্রকাশিত হয়েছে।
২. ভারতে মওলভী সায়্যিদ মুহাম্মদ ইউসুফ টুংকী মরহুম-এর ব্যবস্থাপনায় প্রকাশিত হয়েছে।

অপনোদন ঘটান এবং নফ্‌সকে স্বীকার করতে বাধ্য করেন যে, এমত ধারণা শয়তান কর্তৃক নিক্ষিপ্ত। শয়তান এ দৃশ্য দেখতে পারে না যে, হাযার হাযার মানুষ তার ভ্রান্তিজাল ছিন্ন করে হিদায়াতের রাস্তা এখতিয়ার করুক। আম্বিয়ায়ে কিরাম ('আ)-এর রাস্তাই ছিল দা'ওয়াত ও তবলীগের রাস্তা, অথচ তাঁদের জীবনই ছিল সর্বাধিক জনসমাবেশপূর্ণ ও লোক সংস্রবযুক্ত। এ ক্ষেত্রে নফ্‌স যে চৌর্যবৃত্তির আশ্রয় নিচ্ছে তা' হল এই যে, সে বেকার ও ঝঞ্ঝাটমুক্ত জীবন পছন্দ করে এবং সাধনামুখর ও সংগ্রামী জীবন থেকে পালিয়ে বেড়ায়। দ্বিতীয়ত, তাঁর ভেতর পদমর্যাদার প্রতি লোভ ও জাঁকজমকপ্রিয়তা বাসা বেঁধে রয়েছে এবং এর মাধ্যমেই সে তা হাসিল করতে চায়। কেননা নিঃসঙ্গতা, নির্জনতা অবলম্বন, যুহ্‌দ ও লোক সংস্রবমুক্ত জীবন জনসাধারণের নিকট অধিক আকর্ষণীয় এবং তাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করবার উৎকৃষ্ট পন্থা।

মোট কথা, শয়তান তাঁকে জনকল্যাণ ও সাধারণ্যে দা'ওয়াতের কাজ থেকে বিরত রাখতে পারেনি। তিনি তাঁর গোটা মেধাগত যোগ্যতা ও আল্লাহ্‌প্রদত্ত শক্তিকে অর্ধশতাব্দীরও অধিক কাল ধরে পরিপূর্ণ নিবিষ্টচিত্ততা ও একাগ্রতার সাথে সংস্কার ও জনকল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত রাখেন।

ওফাত

৫৯৭ হিজরীর জুমু'আর রাত্রে আল্লাহ্‌র এই দা'ঈ ইনতিকাল করেন। তাঁর ইন্‌তিকালের সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে বিলাপ ও কান্নায় গোটা বাগদাদ ভেঙে পড়ে এবং দোকান-পাট বন্ধ হয়ে যায়। জামে মনসূরাতে তাঁর সালাত-ই জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। ব্যাপক ও বিপুল জনসমাগমের কারণে বিরাট বিস্তৃত মসজিদেও তিল ধারণের জায়গা ছিল না। ফলে স্থান সংকুলানের সমস্যা দেখা দেয়। বাগদাদের ইতিহাসে এ ছিল এক স্মরণীয় দিন। চতুর্দিক থেকেই স্পষ্ট বিলাপ ও কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছিল। সবাই ছিল শোকাভিভূত। তাঁর প্রতি মানুষের টান এত নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ ছিল যে, তারা গোটা রমযান মাসব্যাপী রাত-দিনের সমস্ত সময়টাই তাঁর কবর পাশে কাটিয়ে দেয় এবং কুরআন খতম করে।

একাদশ অধ্যায়

নূরুদ্দীন যঙ্গী ও সালাহউদ্দীন আয়্যুবী

ক্রুসেড যুদ্ধ ঃ মুসলিম জাহানের ওপর নয়া দুর্যোগ

একদিকে মুসলিম রাষ্ট্রের রাজধানীতে পূর্ণ শক্তিতে গ্রন্থ রচনা ও শিক্ষা দানমূলক কাজ এগিয়ে চলছিল এবং কতক মহান ব্যক্তিত্ব সংস্কার ও প্রশিক্ষণমূলক কর্মে ব্যাপৃত ছিলেন; অপরদিকে গোটা মুসলিম জাহানের ভাগ্যাকাশে দুর্যোগের কাল মেঘ ঘনীভূত হচ্ছিল। মুসলমানদের অস্তিত্বই শুধু নয়, ইসলামের অস্তিত্বও ছিল মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন। খৃস্টান য়ূরোপ শতাব্দীকাল থেকে ইসলামের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে আসছিল। কেননা মুসলমানরা তাদের গোটা প্রাচ্য সাম্রাজ্যের ওপর কব্জা জমিয়ে বসেছিল। তাদের পবিত্র স্থানগুলো, এমন কি স্বয়ং মসীহ (’আ)-এর জন্মস্থানও মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণ ও অভিভাবকত্বে এসে গিয়েছিল। য়ূরোপকে উত্তেজিত করতে এবং তাদের প্রতিশোধস্পৃহা উদ্দীপ্ত করতে এগুলোই ছিল যথেষ্ট। কিন্তু শক্তিশালী মুসলিম সাম্রাজ্যের উপস্থিতিতে ও প্রতিবেশী খৃস্টান রাজ্যগুলোর ওপর উপর্যুপরি অগ্রাভিযানের কারণে তাদের এ সাহস হ’ত না যে, তারা সিরিয়া, ফিলিস্তীন কিংবা কোন মুসলিম রাষ্ট্রের দিকে চোখ উঁচিয়ে চাইবে। সালজূক সাম্রাজ্যের পতন ও মুসলিম সাম্রাজ্যের উত্তর সীমান্তের দুর্বলতার কারণে য়ূরোপবাসীদের মনে একবার নিজেদের ভাগ্য পরীক্ষার খেয়াল জাগে। ঠিক সে মুহূর্তে সাধু পিটারের বেশে তারা এমন একজন বাগ্মী ও ধর্মীয় নেতা পেয়ে যায়, যেন তার অগ্নি উদ্গীরণকারী জ্বালাময়ী বক্তৃতা দ্বারা সারা খৃস্টান জগতে আগুন ধরিয়ে দেয়। য়ূরোপ মহাদেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ধর্মীয় উদ্দীপনার এক স্রোত বয়ে যায়। এ ছাড়া তখন আরও কিছু রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণ ছিল যা খৃস্টানদের মনে বিস্তৃত ও উর্বর মুসলিম বিশ্বের ওপর হামলা পরিচালনা এবং ক্রুসেড যুদ্ধের প্রতি ধর্মীয় ও পার্থিব আকর্ষণ ও অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করে।[১]

যা-ই হোক, ৪৯০ হিজরীতে ক্রুসেডারদের প্রথম বাহিনী সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হয় এবং দু’বছরের মধ্যেই তারা আর-রিহা (এডেসা), আন্তাকিয়া (এন্টিয়ক)-সহ বড় বড় শহর, বহু দুর্গ ও হলব (আলেপ্পো) দখল করে নেয়। ৪৯২ হিজরী মুতাবিক ১০৯৯ ’ঈসায়ীতে ক্রুসেডাররা জেরুযালেম (বায়তু’ল-মুকাদ্দাস)

---

১. বিস্তারিত জানতে দ্র. ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, ৬ষ্ট খণ্ড, (crusades)।

জয় করে। কয়েক বছরের মধ্যেই ফিলিস্তীনের বিরাট অংশ অর্থাৎ সিরিয়া উপকূলের এনতারতুস, এককা (একর), পূর্ব তারাবলিস (ত্রিপোলী) ও সায়দও তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। প্রসিদ্ধ ইংরেজ ঐতিহাসিক স্টানলি লেনপুল-এর মতে, ক্রুসেডাররা এসব দেশে এমন সহজে ঢুকে পড়েছিল যেমন সহজে পেরেক ঢুকানো হয় পুরনো কাষ্ঠখণ্ডের ভেতর। স্বল্পক্ষণের জন্য এরূপও মনে হচ্ছিল যে, তারা মুসলমানকে ধুনিত তুলার মত উড়িয়ে দেবে। ক্রুসেডাররা বায়তু'ল-মুকাদ্দাসে প্রবেশের সময় বিজয়ের নেশায় উন্মত্ত হয়ে অসহায় মুসলমানদের সঙ্গে যে আচরণ করেছিল তার উল্লেখ একজন দায়িত্বশীল খৃস্টান ঐতিহাসিক নিম্নোক্তভাবে করেছেন:

বায়তু'ল-মুকাদ্দাসে বিজয়ী বেশে প্রবেশ করার পর ক্রুসেড যোদ্ধারা এভাবে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল যে, যেসব ক্রুসেড যোদ্ধা ঘোড়ায় চড়ে মসজিদ-ই-'ওমর (রা) গিয়েছিল তাদের ঘোড়ার হাঁটু পর্যন্ত রক্তের বন্যায় ডুবে গিয়েছিল। বাচ্চা শিশুদেরকে ঠ্যাং ধরে দেওয়াল গাত্রে আছড়ে মারা হয় অথবা প্রাচীরের ওপর থেকে চক্রাকারে বাইরে নিক্ষেপ করা হয়। ইয়াহূদীদের তাদের উপাসনালয়ের ভেতরেই জীবন্ত দগ্ধ করা হয়।

দ্বিতীয় দিন জ্ঞাতসারে সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে এর চেয়েও ভয়াবহ ও হৃৎকম্প সৃষ্টিকারী নির্যাতনের পুনরাবৃত্তি ঘটানো হয়। ট্যাংকার্ড তিন শ' বন্দীর জীবনের নিরাপত্তা দানের জামানত দিয়েছিল। ক্রুসেডাররা চিৎকার করতে করতে অগ্রসর হয় এবং তাদের সবাইকে বাইরে টেনে বের করে নির্মমভাবে হত্যা করে। অতঃপর ব্যাপক গণহত্যা শুরু হয়। নারী-পুরুষ-শিশু সবাইকে হত্যা করার পর তাদের দেহ কেটে টুকরো টুকরো করা হয়। নিহত মানুষের লাশ এবং সে সব লাশের কর্তিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিরাট স্তূপ জমে ওঠে এখানে সেখানে। অবশেষে এই নির্মম গণহত্যার পরিসমাপ্তি ঘটলে শহরের রক্তাপ্লুত সড়কগুলো আরব বন্দীদের দিয়েই ধৌত করা হয়।[১]

বায়তু'ল-মুকাদ্দাস বিজয় ছিল মুসলিম জাহানের দুর্বলতা ও পতন এবং খৃস্টান বিশ্বের উত্থান ও ক্রমবর্ধমান শক্তির পরিচায়ক। এ ছিল মুসলিম বিশ্বের জন্য একটি মহাবিপদ। সিরিয়া ও ফিলিস্তীনে চারটি স্থায়ী খৃস্টান রাজ্য (কুদ্‌স, আন্তাকিয়া, ত্রিপোলী ও য়াফা) গড়ে উঠেছিল যা ছিল ইসলামের কেন্দ্রভূমি হিজাযের আযাদী ও সম্মান-সম্ভ্রমের প্রতি একটি স্থায়ী হুমকি। খৃস্টানদের দুঃসাহস

১. ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, ৬ষ্ঠ খণ্ড (ক্রুসেড্‌স), ৬২৭ পৃ.।

ও ধৃষ্টতা এতখানি বেড়ে গিয়েছিল যে, কির্ক-এর শাসনকর্তা রেজিনাল্ড মক্কা মু'আজ্জমা ও মদীনা মুনাওয়ারার ওপর আক্রমণ পরিচালনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে।[১] রওযা মুবারক সম্পর্কেও সে ধৃষ্টতাপূর্ণ ও অবজ্ঞাসূচক উক্তি করে। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, রিদ্দার ঘটনার পর ইসলামের ইতিহাসে এর চাইতে নাযুক মুহূর্ত ও বিপজ্জনক সময় আর আসেনি। ইসলামের অস্তিত্ব এই দ্বিতীয়বারের মত সঙ্গীনতরো অবস্থার মুখোমুখি হয়। একটি চূড়ান্ত যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া মুসলিম জাহানের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রাথমিক যুগে মুসলিম জগতে বিরাট অরাজকতা ও বিশৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। মালিক শাহ্ সাল্জূকীর উত্তরাধিকারীরা পরস্পর গৃহযুদ্ধে মত্ত ছিল। 'আব্বাসী খলীফাগণ অনেক আগে থেকেই তাদের ক্ষমতা তুর্কীদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। মুসলিম জগতে এমন কোন শক্তিশালী সুলতান কিংবা নেতা ছিলেন না যিনি সাংগঠনিক যোগ্যতার অধিকারী এবং যিনি ক্রুসেডারদের হাত থেকে বেঁচে যাওয়া অবশিষ্ট শক্তিটুকু একটি পতাকাতলে সংঘবদ্ধ করে উত্তর ও পশ্চিম দিক থেকে অগ্রসরমান বিপদের মুকাবিলা করতে পারেন। স্টানলি লেনপুল যথার্থই বলেছেন, "এ যুগটা ছিল এত অনিশ্চয়তা ও জটিলতাপূর্ণ যে, এত বড় বিস্তৃত ও বিশাল (সালজূক) সাম্রাজ্যকে মৃত্যু যন্ত্রণায় হাত-পা ছুঁড়তে দেখে ব্যক্তিমাত্রই বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়েছিল। এই মধ্যবর্তী যুগে ততদিন পর্যন্ত অরাজকতা বিরাজ করছিল যতদিন পর্যন্ত না কোন নতুন শক্তি পরিপূর্ণরূপে একাত্ম ও সংঘবদ্ধ হয়ে একই লক্ষ্যের পানে ধাবিত হচ্ছিল। সংক্ষেপে বলা চলে, এটাই ছিল মোক্ষম মুহূর্ত যখন য়ুরোপীয়রা সৈন্য পরিচালনা করে মুসলমানদের ওপর নিজেদের জয়কে সুনিশ্চিত করতে পারত।"[২]

আতাবেক 'ইমাদুদ্দীন যঙ্গী

এমনি-ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও বর্ধিত হতাশার মাঝে মুসলিম জগতের ভাগ্যাকাশে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব ঘটে। মুসলিম বিশ্ব তাদের ঠিক জরুরী মুহূর্তে একজন নতুন নেতা ও প্রাণবন্ত মুজাহিদ পেয়ে যায়। যেখানে আশার ক্ষীণ আলোকরেখাও দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না, সেখান থেকেই এমন এক নতুন শক্তির আবির্ভাব ঘটে যার কল্পনাও কারো মনে ঠাঁই পায়নি।
লেনপুল বলেন :

১. সুলতান সালাহুদ্দীন আয়্যূবী, স্টানলি লেনপুলকৃত, ১৮৮ পৃ.।
২. প্রাগুক্ত (লেনপুল কৃত), ২১ পৃ.।

মুসলমানদের জিহাদ ঘোষণার প্রয়োজন দেখা দিল, প্রয়োজন দেখা দিল এমন একজন নেতার যাঁর বীরত্ব, সাহসিকতা ও সামরিক যোগ্যতার কথা সবাই একবাক্যে স্বীকার করবে। উপরন্তু তুর্কমেন সর্দার ও তাদের অধীনস্থ বিভিন্ন রাজ্যের শাসকদের এমন একদল যুদ্ধবাজ দীনদার নওজোয়ান সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল যারা ক্রুসেডারদের কৃত জুলুম ও বাড়াবাড়ির হিসাব নেবে এবং তার দাঁতভাঙ্গা জবাব দেবে। যা হোক, 'ইমাদুদ্দীন যঙ্গীর ব্যক্তিসত্তার মধ্যেই মুসলমানদের উল্লিখিত নেতার আবির্ভাব ঘটে।[১]

'ইমাদুদ্দীন যঙ্গী ছিলেন সালজূকীদের অনুগ্রহে লালিত-পালিত ও তাদেরই আশ্রিত। তিনি ছিলেন সুলতান মাহমূদ সালজূকীর শাহযাদাদের 'আতালীক' (গৃহশিক্ষক) এবং সুলতানের পক্ষ থেকে মাওসিলের শাসনকর্তা। তিনি ইরাক ও সিরিয়ায় স্বীয় ক্ষমতা সুদৃঢ় ও সুসংহত করবার পর আর-রিহা (এডেসা)-র ওপর হামলা করেন। এটি ছিল খৃস্টান রাজ্যগুলোর মধ্যে সর্বাধিক মযবুত ও সুদৃঢ়। এর সামরিক গুরুত্বও ছিল অত্যধিক। ৫৩৯ হিজরীর জুমাদিউ'ল-উখরা মুতাবিক ১১৪৪ 'ঈসায়ীর ২৩শে ডিসেম্বর তিনি আর-রিহা (এডেসা) দখল করেন। আরব ঐতিহাসিকদের ভাষায় এটি ছিল "ফতহু'ল-ফুতূহ" তথা সর্ববৃহৎ বিজয়। এ শহরটি ছিল ল্যাটিন সাম্রাজ্যের বিরাট আশা-ভরসার কেন্দ্রভূমি। এভাবে ফুরাত উপত্যকা ক্রুসেডারদের বিপদ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। এই বিজয়ের কিছুকাল পর ৫৪১ হিজরী মুতাবিক ১১৪৬ 'ঈসায়ীতে তিনি তাঁর এক ক্রীতদাসের হাতে শাহাদত লাভ করেন। শাহাদতের আগে তিনি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদের এমন এক শানদার ধারার সূচনা করে দিয়েছিলেন যা তাঁর খ্যাতনামা পুত্র আল-মালিকু'ল-'আদিল নূরুদ্দীন যঙ্গী অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যান।

আল-মালিকু'ল-'আদিল নূরুদ্দীন যঙ্গী

নূরুদ্দীন মাহ্মূদ এখন সিরিয়ার সুলতান। গোটা মুসলিম সমাজের পক্ষ থেকে ক্রুসেডারদের বহিষ্কার এবং বায়তু'ল-মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্দেশপ্রাপ্ত বলে মনে করতেন। এই মহান খিদমতকে তিনি সবচেয়ে বড় 'ইবাদত এবং আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য ও নৈকট্য লাভের বিরাট মাধ্যম বলে মনে করতেন। তিনি তাঁর আক্রমণ দ্বারা খৃস্টান রাজ্যগুলোর ওপর ভীতির সঞ্চার করেছিলেন। ৫৫৯ হি./১১৬৪ 'ঈসায়ীতে হারিম দুর্গ দখল করেন। এটি ছিল উত্তর সীমান্তবর্তী একটি মযবুত দুর্গ। আন্তাকিয়া ও ত্রিপোলীর রাজন্যদ্বয়সমেত

---

১. সুলতান সালাহুদ্দীন আয়্যুবী (লেনপুল কৃত), ২৯ পৃ.।

বহু বিখ্যাত নাইট এতে বন্দী হন। যুদ্ধে দশ হাযার খৃস্টান নিহত এবং অসংখ্য সৈনিক বন্দী হয়। হারিম দুর্গের পরই তিনি বানিয়াস দুর্গ জয় করেন।[১] ওদিকে মিসরও জয় করে তিনি খৃস্টানদের দু'দিক থেকে ঘেরাও করে ফেলেন। লেনপুল বলেন ঃ

> সিরিয়ার সুলতান নূরুদ্দীন যঙ্গীর সেনাপতি (সালাহুদ্দীন) কর্তৃক নীলনদের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার অর্থই হ'ল, জেরুযালেমের খৃস্টান রাজ্য ইঁদুর কলে নিপতিত হয়েছে। দু'দিক থেকেই যাদের দ্বারা সে পিষ্ট হচ্ছিল তারা ছিল একই ব্যক্তি ও একই শক্তির দু'টি বাহিনী। সালাহুদ্দীন দিময়াত ও আলেকজান্দ্রিয়া নৌ-বন্দরের ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভের মাধ্যমে একটি নৌবহরেরও নিয়ন্ত্রণ লাভ করেন। এর দ্বারাই তিনি য়ুরোপের সঙ্গে মিসরের ক্রুসেডারদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন।[২]

সুলতান নূরুদ্দীন ফিলিস্তীনের প্রায় পুরো এলাকাটাই ক্রুসেডারদের হাত থেকে মুক্ত করে নেন। কিন্তু বায়তু'ল-মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধারের মহাসৌভাগ্য তাঁরই সেনাপতি সুলতান সালাহুদ্দীন আয়্যুবীর জন্য অপেক্ষা করছিল, যা স্বয়ং নূরুদ্দীন যঙ্গীর পুণ্যকর্মের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবার যোগ্য। হিজরী ৫৬৯ মুতাবিক ১১৭৪ 'ঈসায়ীতে ৫৬ বছর বয়সে কণ্ঠনালীর প্রদাহে (خناق) তিনি ইনতিকাল করেন। ইংরেজ ঐতিহাসিকের ভাষায় সিরিয়ার সুলতান নূরুদ্দীন-এর মৃত্যু সংবাদ মুসলমানদের কাছে বজ্রাঘাততুল্য মনে হয়।[৩]

নূরুদ্দীন যঙ্গীর প্রশংসনীয় গুণাবলী

মুসলিম ঐতিহাসিক সুলতান নূরুদ্দীনের ন্যায়বিচার, বিশ্বস্ততা, আল্লাহ-ভীতি, উত্তম ব্যবস্থাপনা, সৌজন্য, জিহাদী প্রেরণা প্রভৃতি চারিত্রিক গুণের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তিনি তাঁর নামের মতই (নূরুদ্দীন অর্থ ধর্মের জ্যোতি বা আলো) উদ্ভাসিত ও সর্বত্র প্রশংসিত।

সুলতানের সমসাময়িক ইবনে জওযী (র) তাঁর সুবিখ্যাত 'আল-মুনতাজাম' নামক ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

جاهد الثغور وانتزع من ايدى الكفار نيفا وخمسين مدينة. وكانت سيرته اصلح من كثير من الولاة والطرق فى ايامه امنة والمحامد له كثيرة وكان

১. ইবনু'ল-আছীরকৃত 'আল-কামিল, ১১শ খণ্ড, ১২৪ পৃ.।
২. সুলতান সালাহুদ্দীন আয়্যুবী, ৮৯ পৃ.।
৩. সুলতান সালাহুদ্দীন, ১১৫ পৃ.।

يتدين بطاعة الخلافة وترك المكوس قبل موته وكان يميل الى التواضع ومحبة العلماء واهل الدين .

নূরুদ্দীন সীমান্তে জিহাদ করেন এবং কাফিরদের কব্জা থেকে পঞ্চাশটিরও বেশী শহর মুক্ত করেন। অধিকাংশ শাসক ও সুলতানের চেয়ে তাঁর জীবন ছিল উত্তম। তাঁর আমলে রাস্তাঘাট ছিল নিরাপদ। সর্বত্রই নিরাপত্তার আবহাওয়া বিরাজ করত। বাগদাদের খলীফার আনুগত্য ও অধীনতা স্বীকারকে তিনি নিজের জন্য বাধ্যতামূলক মনে করতেন। ইনতিকালের পূর্বে তিনি অবৈধ রাজস্ব ও ট্যাক্স মাফ করে দিয়েছিলেন। বিনয় ও অনাড়ম্বরতা ছিল তাঁর প্রকৃতির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। 'উলামায়ে কিরাম ও দীনদার লোকদের তিনি ভালবাসতেন।[১]

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিকান–যিনি তাঁর ঐতিহাসিকসুলভ সতর্কতায়, শব্দের সতর্কতামূলক ব্যবহারে ও পরিমিত প্রশংসার ক্ষেত্রে মশহূর–লেখেন :

وكان ملكا عادلا زاهدا عابدا ورعا متمسكا بالشريعة مائلا الى الخير مجاهدا فى سبيل الله تعالى كثير الصدقات بنى المدارس بجميع بلاد الشام الكبار وله من المناقب والمأثر والمفاخر ما يستغرق الوصف.

তিনি একজন সুবিচারক, যাহিদ, 'আবিদ, মুত্তাকী ও শরীয়তের পূর্ণ পাবন্দ সুলতান ছিলেন। নেককার লোকদের প্রতি তিনি আকৃষ্ট ছিলেন। জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্র প্রতি ছিল তাঁর প্রবল ঝোঁক। অকাতরে তিনি দান-খয়রাত করতেন। সিরিয়ার সমস্ত বড় শহরেই তিনি মাদরাসা তৈরি করেছিলেন। তাঁর মর্যাদা, তাঁর স্মৃতি ও তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডের পরিমাপ করা খুবই কঠিন।[২]

'তারীখু'ল-কামিল'-এর রচয়িতা খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ইবনু'ল-আছীর জাযারী তাঁর সম্পর্কে এত দূর পর্যন্ত বলেছেন :

وقد طالعت سير الملوك المتقدمين فلم ار فيها بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز رضـ احسن من سيرة ولا اكثر تحريا منه العدل .

আমি বিগত সুলতানদের জীবন ও সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে গভীরভাবে পড়াশুনা করেছি। খুলাফায়ে রাশিদীন ও ওমর ইব্ন 'আবদুল 'আযীযের পরে নূরুদ্দীনের চাইতে অনুপম চরিত্রের অধিকারী এত বড় ন্যায়বিচারক সুলতান আমি আর দেখিনি।[৩]

---

১. আল-মুনতাজাম–১০ম খণ্ড, ২৪৮-৪৯, পৃ.।
২. ইব্নে খাল্লিকান, "মাহমূদ নূরুদ্দীন যঙ্গী", ৪র্থ খণ্ড, ২৭২ পৃ.; ৩. আল-কামিল, ৯ম খণ্ড, ১৬৩ পৃ.।

সুলতান নূরুদ্দীনের ইনতিকালের সময় ইবনু'ল-আছীরের বয়স ছিল ১৪ বছর। এজন্য তাঁর সাক্ষ্য ও বর্ণনা বিশেষ মর্যাদা পাবার দাবিদার। তিনি মরহুম সুলতানের জীবন-চরিত ও আখলাক-চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

তিনি কেবল তাঁর স্থাবর সম্পত্তির আয়-আমদানী দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে তিনি আপন অংশ হিসাবে যা পেয়েছিলেন তা বিক্রি করেই উক্ত স্থাবর সম্পত্তি খরিদ করেছিলেন। একবার তাঁর বেগম সংসারের টানাপোড়েনের অভিযোগ পেশ করেন। তখন তিনি তাঁর তিনটি দোকানের যাবতীয় আয় তার ব্যয় নির্বাহের জন্য দান করেন। দোকান তিনটি ছিল হিমসে তাঁর মালিকানাধীন। দোকান তিনটির বার্ষিক আয় ছিল বিশ দীনারের কাছাকাছি। সুলতানের বেগম যখন একেও প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল বলে মন্তব্য করলেন, তখন তিনি বলেছিলেন ঃ এর বেশী আমার কাছে আর কিছুই নেই। আমার নিকট বাকি যা কিছু দেখছ তা আমার নয়, সাধারণ মুসলমানের। আমি এগুলোর খাজাঞ্চীমাত্র। তোমার খাতিরে আমি আমার কাছে রক্ষিত আমানতের খেয়ানত করে জাহান্নামে যেতে রাযী নই।

রাতের বেলা দীর্ঘ সময় 'ইবাদতে কাটাতেন। তাঁর ওজীফা ও যিক্র-আযকার ছিল নির্ধারিত। তিনি ছিলেন হানাফী ফিক্'হের একজন 'আলেম। কিন্তু তাঁর মধ্যে অন্য কোন মাযহাবের প্রতি বিদ্বেষ ছিল না কিংবা ছিল না কোন পক্ষপাতিত্ব। তিনি হাদীছ শিক্ষা করেছিলেন, ছওয়াব লাভের আশায়ই অন্যের কাছে হাদীছ বর্ণনা করতেন এবং অন্যকেও তা বর্ণনা করার এজাযত দিতেন।

ন্যায় ও সুবিচারের ক্ষেত্রে তাঁর অবস্থা ছিল এই যে, স্বীয় বিস্তৃত সাম্রাজ্যের কোথাও কোন শুল্ক কিংবা ট্যাক্স অবশিষ্ট রাখেন নি। মিসর, শাম, জযীরা, মাওসিল সর্বত্রই তিনি তা মওকুফ করে দেন। শরীয়ত তথা শর'ঈ বিধানকে তিনি খুবই সমীহ ও সম্মান করতেন। শরীয়তের হুকুম-আহকাম তিনি তামিল করতেন। এক ব্যক্তি তাঁকে বিবাদী করে আদালতে তলব করেছিল। তিনি আদালতে হাযির হন এবং কাযী সাহেবকে বলে পাঠান, "আমি আদালতে হাযির হচ্ছি। আমার প্রতি পক্ষপাতমূলক কোন আচরণ যেন না করা হয়।" শেষ পর্যন্ত মুকদ্দমায় তাঁরই জয় হয়। কিন্তু তিনি বাদীর ওপর তাঁর যে হক ছিল তা মাফ করে দেন এবং বলেন : প্রথম থেকেই আমার এমন ইচ্ছাই ছিল। কিন্তু আমার আশংকা ছিল, আদালতে হাযির না হলে সম্ভবত আমার অন্তরে গর্বের সঞ্চার হবে, তাই আমি হাযির হয়েছি। এক্ষণে আমি আমার হক মাফ

করে দিলাম। তিনি দারু'ল-'আদল (বিচার ভবন) নির্মাণ করেছিলেন। তিনি সব সময় নির্যাতিত মজলুমের পক্ষে থাকতেন, চাই সে তাঁর পুত্র হোক অথবা বিরাট অফিসার ও প্রশাসক। বীরত্ব প্রদর্শনে তিনি ছিলেন তুলনাহীন। যুদ্ধে তিনি দু'টি ধনুক ও দু'টি তূণীর সঙ্গে রাখতেন। একবার এক ব্যক্তি তাঁকে বলেন, "আপনাকে আল্লাহ্র কসম দিয়ে বলছি, আপনি আপনার জীবনকে বিপদের মাঝে নিক্ষেপ করে ইসলামকে সংকটের মধ্যে ফেলবেন না।" উত্তরে তিনি বলেছিলেন : মাহ্মূদ এমন কি বস্তু যে, তার সম্পর্কে একথা বলা হবে? আমার পূর্বে এদেশকে ও ইসলামকে কে হেফাজত করেছেন? তিনি নিশ্চয়ই মা'বূদ-ই-বরহক যিনি ব্যতিরেকে আর কোন ইলাহ্ নেই।

'উলামায়ে কিরাম ও ধার্মিক ব্যক্তিদেরকে তিনি তা'জীম করতেন। তাঁদের সম্মানার্থে তিনি উঠে দাঁড়াতেন, নিজের কাছে তাঁদের ডেকে বসাতেন, অসংকোচে তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন এবং তাঁদের কোন আবেদনই অপূর্ণ রাখতেন না। তিনি নিজ হাতে তাঁদের কাছে চিঠি লিখতেন। এত বিনয় ও নম্রতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ। জনসাধারণ মাত্রেই ছিল তাঁর দ্বারা প্রভাবান্বিত। তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করার জন্য এই গ্রন্থ যথেষ্ট নয়, এর জন্য দরকার আরো বিরাট বিরাট গ্রন্থের।[১]

জিহাদের প্রতি আগ্রহ এবং তাঁর ঈমান ও ইয়াকীন

নূরুদ্দীনের সমস্ত মনোযোগ ও অন্তরের আকর্ষণ নিবদ্ধ ছিল জিহাদ এবং খৃস্টানদের মুকাবিলার প্রতি। এ ব্যাপারে তাঁর সংকল্প, আস্থা, নির্ভরতা, ঈমান ও ইয়াকীন ছিল অটুট।

খৃস্টানদের অতর্কিত হামলার কারণে ৫৮৮ হিজরীতে নূরুদ্দীন হিসনু'ল-আকরাদ যুদ্ধে (যা বাকী'আর যুদ্ধ নামে মশহুর) পরাজয় বরণ করেন।[২] শত্রুদের থেকে কয়েক মাইল দূরে হিম্স্-এর নিকট তিনি অবস্থান করছিলেন। তখন জনৈক শুভাকাঙ্ক্ষী তাঁকে এই মর্মে পরামর্শ দেন যে, বিজয়ী দুশমনদের এত কাছে অবস্থান করা মুসলমানদের জন্য ঠিক হবে না। তখন তিনি ঐ ব্যক্তিকে থামিয়ে দিয়ে বলেন :

আমার নিকট স্রেফ এক হাযার অশ্বারোহী সৈনিক থাকলেও আমি শত্রুকে পরওয়া করি না। আল্লাহ্র কসম খেয়ে বলছি, যতক্ষণ না আমি আমার এবং ইসলামের এই পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারছি, ততক্ষণ পর্যন্ত ছাদের তলায় আশ্রয় নেব না।

১. আল-কামিল, ১১শ খণ্ড, ১৬৩-৬৪ পৃ.;
২. বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য আল-কামিল. ১১শ খণ্ড, ১১৯ পৃ.।

নূরুদ্দীন অত্যন্ত উদার হস্তে সেনাবাহিনীকে উপহার-উপঢৌকন ও নগদ অর্থ প্রদান করেন। একবার কেউ তাঁকে এই পরামর্শ দেয় যে, ফকীহ, ফকীর, সূফী ও কুরআনের ক ারীদের জন্য যে পরিমাণ ভাতা ও অর্থ রাজকোষ থেকে নির্ধারিত করা হয়েছে তা দেশ ও জাতির এই সংকটজনক মুহূর্তে জিহাদের কাজে লাগানো হোক (অর্থাৎ এবারের জন্য উল্লিখিত ব্যক্তিদের ভাতা বন্ধ রেখে তা জাতীয় প্রয়োজনে ব্যয় করা হোক)। সুলতান নূরুদ্দীন তখন অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে জবাব দেন :

> আমি তো এসব ফকীর ও দুর্বল লোকদের দু'আ ও সন্তুষ্টির মাধ্যমেই আল্লাহ্র সাহায্য প্রত্যাশা করি। হাদীছ পাকে বলা হয়েছে : আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যে রিযিক ও সাহায্য আসে তা আসে আল্লাহ্র ঐসব দুর্বল ও অসহায় বান্দাদের বদৌলতেই। অতএব, আমি কীভাবে তাদের সাহায্য বন্ধ করে দেব যারা আমার পক্ষে যুদ্ধ চালিয়ে যায় এমন সংকট সন্ধিক্ষণে যখন আমি বিছানায় ঘুমিয়ে থাকি। এতদ্সত্ত্বেও তাদের তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। আর তোমরা যাদের পক্ষে কথা বলছ তারা তো কেবল তখনই যুদ্ধ করে যখন আমাকে তাদের পাশে দেখতে পায়। তাদের নিক্ষিপ্ত তীর কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, আবার কখনো ঠিক লক্ষ্যে গিয়ে আঘাত হানে। আর ওসব গরীবদের তো বায়তু'ল-মালে 'হক' রয়ে গেছে। আমি তাদের হক ছিনিয়ে নিয়ে অন্যদের কী করে তা দান করি?[১]

খৃস্টানদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্ত সুলতান নূরুদ্দীন পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। সেনাবাহিনীর সদস্যদেরকে তিনি প্রচুর পরিমাণে পুরস্কৃত করেন, সীমান্তবর্তী শহর ও জনপদ ও মুসলিম রাজ্যগুলোর আমীর-উমারা ও প্রশাসকদের প্রভাবমণ্ডিত ভাষায় পত্র লেখেন এবং তাদেরকে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্র জন্য উৎসাহ প্রদান করেন। ঐসব স্থানের সূফী-দরবেশ, ফকীর ও নেককার লোকদের কাছেও তিনি চিঠি লেখেন। ঐসব চিঠিতে তিনি ফিরিঙ্গীদের বাড়াবাড়ি ও জুলুম-অত্যাচারের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেন এবং তাঁদের নিকট দু'আর দরখাস্ত করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ অভিলাষও ব্যক্ত করেন যে, তাঁরা যেন অন্য মুসলমানদেরকেও জিহাদে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করেন। তাঁর এ উদ্যোগ খুবই ফলপ্রসূ হয়। উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ সাধারণ লোকদেরকে কান্নাজড়িত কণ্ঠে ঐসব চিঠি পাঠ করে শোনান এবং সুলতানের জন্য দু'আ করেন। জনসাধারণের মধ্যে প্রবল জিহাদী জোশ পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন রাজ্যের শাসনকর্তাগণ নিজ নিজ সেনাবাহিনীসহ তাঁর আহ্বানে সাড়া দেন। অপরদিকে খৃস্টানেরাও তাদের পরিপূর্ণ

১. আল-কামিল, ১১শ খণ্ড, ১১৯ পৃ.।

শক্তি এবং চারদিককার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বাহিনীকে মুসলমানদের মুকাবিলায় সংগঠিত করে। শেষ পর্যন্ত সুলতানেরই মানস পূর্ণ হয়। তিনি খৃস্টানদের সম্মিলিত শক্তির ওপর জয় লাভ করে হারিম দখল করেন।[১]

নিম্নোক্ত ঘটনা থেকে নূরুদ্দীন যঙ্গীর ঈমান ও য়াকীন-এর মোটামুটি পরিমাপ করা যায়।

বানিয়াস-দুর্গ অবরোধকালে তাঁর ভ্রাতা নুসরাত উদ্দীন আমীর-ই আমীরান-এর একটি চক্ষু চিরতরে বিনষ্ট হবার উপক্রম হয়। তখন নূরুদ্দীন আপন ভাইকে লক্ষ্য করে বলেন, "যদি তুমি সেই পুরস্কার ও ছওয়াব দেখতে পেতে যা আল্লাহ্ তোমার জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, তাহলে তুমি তোমার অপর চক্ষুটাও আল্লাহ্র পথে বিলিয়ে দেবার কামনা পোষণ করতে।"[২]

সুলতান সালাহুদ্দীন আয়্যুবী[৩]

সালাহুদ্দীন আয়্যুবীর ব্যক্তিসত্তা আঁ-হযরত (সা)-এর চিরন্তন মু'জিযা ও ইসলামে সত্যতার এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

অভিজাত মধ্যবিত্ত কুর্দ পরিবারের সন্তান খান্দানী সৈনিক হিসাবে তিনি লালিত-পালিত হন।[৪] মিসর বিজয় ও ক্রুসেডারদের মুকাবিলায় ময়দানে অবতরণ করবার পূর্বে কেউই অনুমান করতে পারে নি যে, এই কুর্দী নওজোয়ানই বায়তু'ল-মুকাদ্দাস বিজয়ী বীর এবং মুসলিম জগতের রক্ষকরূপে প্রতিভাত হবেন এবং ইতিহাসের বুকে সেই কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখবেন যার কথা কেউ কোনদিন কল্পনাও করতে পারেনি।

---

১. আল-কামিল, ১১শ খণ্ড, ১২২-১২৩ পৃ.।

২. আল-কামিল, ১১শ খণ্ড, ১২৩ পৃ.।

৩. সুলতান সালাহুদ্দীনের পিতার নাম ছিল আয়্যুব ; সেজন্যই তাঁকে আয়্যুবী বলা হয়। এর দ্বারা কেউ যেন মনে না করেন যে, হযরত আবূ আয়্যুব আনসারীর সঙ্গে তাঁর রক্তের সম্পর্ক আছে। সুলতান ও তাঁর গোটা খান্দান উত্তরাধিকারসূত্রেই কুর্দ। এই জাতিগোষ্ঠী আজও ইরাক, সিরিয়া, তুরস্ক ও ইরানে বসবাস করছে।

৪. সুলতান সালাহুদ্দীনের পিতা-মাতা গোটা খান্দান পূর্ব আযারবায়জান-এর দুওয়ায়ন নামক গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। কুর্দ কওমের অন্তর্গত 'হুযানিয়া' গোত্রের একটি বিরাট শাখাগোত্র রিওয়াদিয়ার সঙ্গে তিনি সম্পর্কিত। মনে হয় তাঁর দাদা শা'বী তাঁর দুই পুত্র নজমুদ্দীন আয়্যুব ও আসাদুদ্দীন শেরকুহকে নিয়ে বাগদাদে এসেছিলেন। অতঃপর তিনি তিকরীত গিয়ে বসতি স্থাপন করেন এবং সেখানেই ইনতিকাল করেন। কিছুদিন পর তাঁর দুই পুত্র মুজাহিদ উদ্দীন বাহ্রূয শহর কোতওয়ালের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। ইনি ছিলেন সুলতান মাস'উদ ইবনে গিয়াছউদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে মালিক শাহ্ সালজূকীর নিযুক্ত কর্মচারী। নজমুদ্দীন আয়্যুব এরপর 'ইমাদুদ্দীন যঙ্গীর অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন।

লেনপুল বলেন :

সালাহুদ্দীন থেকে এমন কোন ‘আলামত জাহির হয়নি, যদ্দারা বোঝা যায় যে, তিনি ভবিষ্যতে একজন বিরাট ব্যক্তি হবেন, বরং তিনি সব সময়ই নিশ্চুপ ও শান্তিপ্রিয় ভাল মানুষের মত জীবন যাপন করতেন। তিনি ছিলেন শরীফ স্বভাবের এবং সমস্ত চারিত্রিক দুর্বলতা থেকে দূরে।[১]

আল্লাহ্ পাক যখন এই নিরীহ শান্তিপ্রিয় লোকটির মাধ্যমে আপন কাজ করিয়ে নিতে চাইলেন তখন তাঁর জন্য গায়বী উপকরণেরও ব্যবস্থা করা হ'ল। তাঁকে তাঁর অনুগ্রহকর্তা নূরুদ্দীন যঙ্গী পীড়াপীড়ি করে এবং জরুরী নির্দেশের মাধ্যমে মিসর ভূমিতে পাঠিয়ে দেন। কাযী বাহাউদ্দীন ইবনে শাদ্দাদ ছিলেন সুলতান সালাহুদ্দীনের বিশেষ আস্থাভাজন ব্যক্তি। তিনি বলেন ঃ আমাকে সালাহুদ্দীন নিজেই বলেছেন, “নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও কতকটা বাধ্য হয়েই আমি মিসর ভূমিতে আসি, আমার মর্জি মাফিক আমি মিসরে আসি নাই। আমার ব্যাপারটা ছিল ঠিক সেই-রকম যেমনটি কুরআন মজীদে বলা হয়েছে :

وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ .

“সম্ভবত তোমরা এমন বস্তু অপসন্দ করবে যা তোমাদের জন্য কল্যাণকর।”[২]

জীবনের পট পরিবর্তন

মিসর পৌঁছার পর সুলতান সালাহুদ্দীনে জন্য যখন ময়দান পরিষ্কার হয়ে গেল এবং মিসরের ক্ষমতার চাবিকাঠি তাঁর হাতে এল তখন তাঁর জীবনের গতিধারাও একদম পাল্টে গেল। তাঁর অন্তরে এ ধারণা বদ্ধমূল হ'ল যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দ্বারা বড় কোন কাজ করাতে চান। আর তা এমন কাজ যার সাথে আরাম-আয়েশের কোন সম্পর্ক নেই।

কাযী বাহাউদ্দীন ইব্‌ন শাদ্দাদ বলেন :

দেশের (মিসরের) শাসন-ক্ষমতার বাগডোর হাতে আসার পর তাঁর দৃষ্টিতে এ দুনিয়া গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রেরণা তাঁর অন্তর-মানসে বদ্ধমূল হয়। মদ্য পান থেকে তিনি তওবা করেন এবং বিলাসী জীবন যাপন ও খেলাধূলা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে একজন সংযত ও পরিশ্রমী মানুষের জীবন এখতিয়ার করেন। এক্ষেত্রে তিনি দিন দিন তরক্কী করতে থাকেন।[৩]

---

১. সুলতান সালাহুদ্দীন, ৬৩ পৃ.।
২. আন-নাওয়াদিরু'স-সুলতানিয়া, পৃ.।
৩. আন-নাওয়াদিরু'স-সুলতানিয়া ও আল-মাহাসিনু'ল-য়ূসুফিয়া, ৩২-৩৩ পৃ.।

লেনপুলও লিখেছেন :

আপন সত্তার সাথে সুলতান সালাহুদ্দীনের এত নিবিড় সম্পর্ক ছিল যে, তিনি কায়মনে ত্যাগ ও কুরবানীর রুটিন কষে ধরেন। তিনি নিখুঁত তাক'ওয়া ও পরহেযগারী এখতিয়ার করেন এবং দুনিয়ার আরাম-আয়েশ ও স্বাদ-আহ্লাদের ইচ্ছা মন থেকে একেবারেই মুছে ফেলেন। তিনি নিজের কাজ-কর্মের ওপরও কঠিন বাধা-নিষেধ আরোপ করেন। এক্ষেত্রে সঙ্গী-সাথীদের জন্য তিনি একটি দৃষ্টান্তস্থলে পরিণত হন। তিনি তাঁর সামগ্রিক চেষ্টা-সাধনা এমন একটি ইসলামী সাম্রাজ্য কায়েমের পেছনে ব্যয় করেন, যে সাম্রাজ্য কাফিরদেরকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে পুরোপুরি সক্ষম। একবার তিনি বলেছিলেন ঃ আল্লাহ্ যখন আমাকে মিসর ভূমি দান করেছেন তখন আমি মনে করি, ফিলিস্তীন ভূ-খণ্ডও তিনি আমাকে দান করবেন। সেদিন থেকে জীবনের শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত সালাহুদ্দীনের লক্ষ্য ছিল ইসলামের সাহায্য ও সমর্থন। তিনি সারাটি জীবন কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদে অতিবাহিত করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেন।[১]

জিহাদের প্রতি অনুরাগ

জিহাদের প্রতি সুলতানের ছিল গভীর অনুরাগ। জিহাদই ছিল তাঁর 'ইবাদত, তাঁর বিলাস ও তাঁর আত্মার খোরাক।

কাযী ইব্ন শাদ্দাদ বলেন :

জিহাদের প্রতি প্রেম ও ভালবাসা তাঁর শিরা-উপশিরা ও অস্থি-মজ্জায় মিশে গিয়েছিল, গেঁথে গিয়েছিল তাঁর মন-মস্তিষ্কে। এটাই ছিল তাঁর আলোচনার বিষয়বস্তু। তিনি জিহাদের সাজ-সামান তৈরিতে ব্যস্ত থাকতেন এবং এই সব উপায়-উপকরণ নিয়েই চিন্তা-ভাবনা করতেন। জিহাদে কাজে লাগবে তিনি সর্বদা এ ধরনের লোকেরই তালাশে থাকতেন। যারা জিহাদ সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করত এবং এ বিষয়ে তাঁকে উৎসাহ দিত তিনি তাদের দিকেই মনোযোগ দিতেন। এই জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্র খাতিরেই তিনি আপন সন্তান-সন্ততি, বংশের লোকজন, পরিবার-পরিজন, দেশ ও দেশবাসীকে বিদায় সালাম জানান এবং সব ধরনের বিচ্ছেদ যন্ত্রণা সহ্য করেন। তিনি তাঁবু-জীবন যাপনেই তৃপ্ত থাকেন, প্রাসাদ-জীবনের আয়েশ-আরাম তাঁকে আকৃষ্ট করতে

১. সুলতান সালাহুদ্দীন, ৮৬ পৃ.।

পারেনি। তাঁর সান্নিধ্য লাভের একমাত্র কৌশল ছিল, সাক্ষাত হলেই তাঁকে জিহাদের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা। এভাবে অনেকেই তাঁর (সুলতানের) কাছে মর্যাদার অধিকারী হয়েছিল। একথা হলফ করে বলা যেতে পারে যে, জিহাদের সিলসিলা শুরু হওয়ার পর থেকে তিনি একটি পয়সাও জিহাদ ও মুজাহিদদের কাজ ছাড়া অন্য কাজে ব্যয় করেন নি।[১]

সুলতানের এই প্রেমমত্ত অবস্থা ও বেদনাকাতর ছবি ইবনে শাদ্দাদ নিম্নোক্ত ভাষায় অংকন করেছেন :

যুদ্ধক্ষেত্রে সুলতানের অবস্থা হ'ত সেই শোকাহতা মায়ের মত যাকে তার একমাত্র সন্তানের মৃত্যু শোক সইতে হয়েছে। তিনি এক কাতার থেকে অন্য কাতারে ঘোড়া ছুটিয়ে নিয়ে যেতেন এবং সৈন্যদেরকে জিহাদের ব্যাপারে আহ্বান জানিয়ে বলতেন, يا للاسلام 'সৈন্যগণ! ইসলামের সাহায্যে এগিয়ে যাও।' এসময় তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে থাকত।[২]

একবার যুদ্ধে তাঁর অবস্থা ছিল নিম্নরূপ :

সারা দিন তিনি (সুলতান) একবারও খাবার মুখে দেননি, এমন কি একটি দানাও না; কেবল চিকিৎসকের পরামর্শে ও অনুরোধ-উপরোধে সামান্য পানীয় গ্রহণ করেছিলেন।[৩] শাহী চিকিৎসকের বর্ণনানুযায়ী- একবার জুম'আর দিন থেকে রোববার পর্যন্ত সুলতান কয়েক লুকমা মাত্র খাবার গ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়া আর কোন দিকেই তাঁর মন ছিল না।[৪]

হিত্তীনের চূড়ান্ত যুদ্ধ

বিভিন্ন সামরিক কার্যক্রম ও মুখোমুখি সংঘর্ষের পর অবশেষে ইতিহাসের সেই বহু প্রতীক্ষিত হিত্তীন যুদ্ধ আসে যা পরিসমাপ্তি ঘটায় ফিলিস্তীনে খৃস্টান রাজত্বের এবং চূড়ান্ত ফয়সালা করে ক্রুসেডারদের ভাগ্যের। ৫৮৩ হিজরীর ২৪শে[৫] রবী'উ'ছ- ছানী মুতাবিক ১১৮৭ 'ঈসায়ী রোজ শনিবার তারিখে এই ঐতিহাসিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে মুসলমানরা নিরংকুশ বিজয় (ফতহু'ম-মুবীন) লাভ করে। যুদ্ধক্ষেত্রের চিত্র অংকন করতে গিয়ে ঐতিহাসিক লেনপুল বলেন :

---

১. আন-নাওয়াদিরু'স-সুলতানিয়া, ১৬ পৃ.।
২. ঐ।
৩. ঐ, ১৫৫ পৃ.।
৪. ঐ, ৯৭ পৃ.।
৫. ১১৮৭ সনের ৪ঠা জুলাই।

খৃস্টান সেনাবাহিনীর নির্বাচিত ও বাছাইকৃত জওয়ানেরা বন্দী হয়। জেরুযালেমের বাদশাহ্ গাঈ, তার ভাই চ্যাটিলোন (হুনায়ন)-এর রেজিনাল্ড, তেনিন-এর হামফ্রে, তাবাকাত দাবিয়া ও ইসবেতার-এর প্রধানদ্বয় এবং বড় বড় খৃস্টান নাইটকে গ্রেফতার করা হয়। খৃস্টান বাহিনীর অশ্বারোহী ও সাধারণ পদাতিক সৈন্য, যারা জীবিত ছিল, সকলেই মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়ে গিয়েছিল। সবাই অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করল যে, এক একজন মুসলিম সৈনিক ত্রিশ জনের মত খৃস্টান সৈন্যের প্লাটুনকে, যাদেরকে সে স্বহস্তে বন্দী করেছিল, তাঁবুর দড়ি দিয়ে বেঁধে, টেনে নিয়ে যাচ্ছে। নিহত ক্রুসেডারদের লাশ ও তাদের কর্তিত হাত-পা এমনভাবে স্তূপাকারে পড়েছিল যেমনভাবে পাথরের পর পাথর স্তূপাকারে পড়ে থাকে। কর্তিত ও খণ্ড-বিখণ্ড লাশ এরূপ বিক্ষিপ্তভাবে মাটিতে পড়েছিল যেরূপ তরমুজের ক্ষেতে তরমুজ বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকে।[১] দীর্ঘকাল যাবত যুদ্ধের এই ময়দানে, যেখানে এই রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল এবং যেখানে তিরিশ হাযার লোক মারা গিয়েছিল বলে প্রকাশ—এক বছর পরেও সাদা সাদা হাড্ডির রাশিকৃত স্তূপ দূর থেকে দৃষ্টিগোচর হ'ত। পশু-পক্ষীর ভক্ষণের পরও লাশের যে সব টুকরো অবশিষ্ট ছিল, অনেকদিন পর্যন্ত সেগুলো বিভিন্ন স্থানে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গেছে।[২]

সুলতানের ধর্মীয় আবেগ ও মর্যাদাবোধ

এই বিজয়ের সঙ্গে এ ঘটনাও ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে যা থেকে সুলতানের ধর্মীয় মর্যাদাবোধ ও ঈমানী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এই ঘটনাও একজন ইংরেজ ঐতিহাসিকের মুখেই শুনুন ঃ

সুলতান সালাহুদ্দীন যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর তাঁবু স্থাপন করেন। যখন তাঁবু স্থাপিত হ'ল তখন তিনি হুকুম দিলেন সমস্ত যুদ্ধবন্দীকে তাঁর সামনে হাযির করতে। সম্রাট গাঈ ও তদীয় ভ্রাতা রেজিনাল্ড চ্যাটিলন (হুনায়ন)-কে ভেতরে নিয়ে আসা হ'ল। সুলতান জেরুযালেমের বাদশাহকে তাঁর পাশে বসান এবং তাঁকে পিপাসার্ত দেখে বরফ মিশ্রিত ঠাণ্ডা পানি ভরতি পাত্র তাঁর দিকে এগিয়ে দেন। সম্রাট গাঈ পানি পান করেন। অতঃপর পানির পাত্রটি কির্ক-এর শাসনকর্তা রেজিনাল্ডকে দেন। সুলতান এতদ্দৃষ্টে নাখোশ হন এবং দো-ভাষীকে বলেন ঃ বাদশাহকে বল, আমি ঐ ব্যক্তিকে পানি দেইনি, বাদশাহ্ গাঈ নিজে দিয়েছেন। লবণ ও রুটি যাকে দেওয়া হয় তাকে দাতার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ

১. সুলতান সালাহুদ্দীন, ১৮৭-৮৮।
২. প্রাগুক্ত, ১৮৯ পৃ.।

ভাবা হয়। কিন্তু এই ব্যক্তি আমার প্রতিশোধের জ্বলন্ত আগুন থেকে রেহাই পেতে পারে না। সালাহুদ্দীন এই বলেই রেজিনাল্ডের সামনে গিয়ে দাঁড়ান। রেজিনাল্ড তাঁবুতে প্রবেশ করবার পর থেকেই দাঁড়ানো অবস্থায় ছিল। সুলতান তাকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ শুনে রাখ, আমি তোকে হত্যা করবার জন্য দু'দু'বার কসম খেয়েছি। প্রথমবার কসম খেয়েছি, যখন তুই পবিত্র মক্কা ও মদীনা নগরীর ওপর হামলা করতে চেয়েছিলি। দ্বিতীয়বার কসম খেয়েছি যখন তুই ধোঁকা ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে হাজীদের কাফেলার ওপর হামলা করেছিলি।[১] এবার দেখ, কিভাবে আমি তোর বেয়াদবী ও ঘৃণিত আচরণের প্রতিশোধ নিচ্ছি। —এই বলেই সালাহুদ্দীন খাপ থেকে তলোয়ার টেনে বের করেন এবং নিজের কৃত প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী স্বহস্তে রেজিনাল্ডকে হত্যা করেন।

সম্রাট গাঈ এই হত্যা দৃশ্য দেখে কেঁপে ওঠেন এবং ভাবতে থাকেন, এবার বুঝি তাঁরই পালা! কিন্তু সালাহুদ্দীন তাঁকে এই বলে সান্ত্বনা দেন যে, বাদশাহ্‌র রীতি নয় অপর বাদশাহ্‌কে হত্যা করা। ঐ লোকটি বার বার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছিল বলে তার ব্যাপারে যা করার তাই করা হয়েছে (অর্থাৎ সে তার অপকর্মের উচিত শাস্তিই পেয়েছে)।[২]

ইবনে শাদ্দাদ লিখেছেন, সুলতান রেজিনাল্ডকে ডেকে পাঠান এবং বলেন ঃ ها انا انتصر لمحمد عليه الصلوة والسلام [এই দেখ, আমি মুহাম্মদ (সা)-এর পক্ষে প্রতিশোধ নিচ্ছি]। ইবনে শাদ্দাদ এও লিখেছেন যে, সুলতান তাকে ইসলামের দা'ওয়াত দিয়েছিলেন। কিন্তু সে তা কবুল করেনি।[৩]

বায়তু'ল-মুকাদ্দাস জয়

হিত্তীন বিজয়ের পর সত্বর সেই পবিত্রতম মুহূর্তটিও এগিয়ে এল, সুলতান অধীর আগ্রহে যার অপেক্ষা করছিলেন এবং প্রাণপণে যা কামনা করছিলেন। সেই মুহূর্তটি হ'ল বায়তু'ল-মুকাদ্দাস বিজয়ের মুহূর্ত। কাযী ইবনে শাদ্দাদ লিখেছেন, "সুলতান বায়তু'ল-মুকাদ্দাসের ব্যাপারে খুবই চিন্তিত ছিলেন এবং তা তাঁর মনের ওপর এমন এক দুর্বহ বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছিল যার ভার বহনে বোধ করি পাহাড়ও সক্ষম ছিল না।"[৪]

১. কাযী ইবনে শাদ্দাদের বর্ণনায় এতটুকু বেশী আছে যে, যখন ঐসব অসহায় হাজী মানবতা ও শরাফতীর নামে তাদের নিকট প্রাণ ভিক্ষার আবেদন জানিয়েছিল তখন সে ধৃষ্টতাপূর্ণ ভাষায় বলেছিল : তোদের মুহাম্মাদকে বল তোদের রেহাই দিতে। এই কথা সালাহুদ্দীনের কানে গিয়ে পৌছে। এতে তিনি মানত করেছিলেন, বেয়াদবটাকে হাতে পেলে তাকে স্বহস্তে হত্যা করবেন।

২. সুলতান সালাহুদ্দীন, ১৮৮ পৃ.।

৩. আন-নাওয়াদিরু'স-সুলতানিয়া, পৃ. ৬৪; ৪. প্রাগুক্ত।

এ বছরেই অর্থাৎ ৫৮৩ হিজরীর ২৭শে রজব/১১৮৭ খৃস্টাব্দে সুলতান বায়তু'ল-মুকাদ্দাসে প্রবেশ করলেন এবং দীর্ঘ ৯০ বছর পর ইসলামের এই প্রথম কিবলা মুসলমানদের অধিকারে এল। হুযুর আকরাম (সা)-মি'রাজের রাত্রিতে এই বায়তু'ল-মুকাদ্দাসেই আম্বিয়া-ই-কিরাম ('আ)-গণের ইমামতি করেছিলেন। আর এটি ছিল একটি বিস্ময়কর ও অভাবনীয় শুভ সংযোগ যে, সুলতান বায়তু'ল-মুকাদ্দাসে সেই তারিখেই প্রবেশ করেন যে তারিখে আঁ-হযরত (সা)-এর মি'রাজ হয়েছিল। কাযী ইবনে শাদ্দাদ বলেন ঃ

> এ ছিল এক বিরাট বিজয়। এই পবিত্র মুহূর্তে বায়তু'ল-মুকাদ্দাসে 'আলিম-'উলামা, কামিল-ফাযিল ও মুসাফির পর্যটকদের এক বিরাট সমাবেশ ঘটে। লোকেরা যখন জানতে পারল যে, সমুদ্রোপকূলবর্তী এলাকাসমূহ মুসলমানরা জয় করে ফেলেছে, তখন মিসর ও সিরিয়া থেকে 'উলামায়ে কিরাম দলে দলে বায়তু'ল-মুকাদ্দাস অভিমুখে রওয়ানা হন। তকবীর ও তাহলীল সজোরে ধ্বনিত হতে থাকে। অবশেষে বায়তু'ল-মুকাদ্দাসে প্রায় নব্বই বছর পর জুমু'আর সালাত আদায় করা হ'ল এবং কু'ব্বাতু'স-স'খরার ওপর যে ক্রস-কাষ্ঠ স্থাপন করা হয়েছিল তা নামিয়ে দেওয়া হ'ল। সে এক আশ্চর্য দৃশ্য! ইসলামের বিজয় ও আল্লাহ্র সাহায্য খোলা চোখে সবার দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল।[১]

মরহুম নূরুদ্দীন যঙ্গী বায়তু'ল-মুকাদ্দাসের জন্য বহু অর্থ ব্যয়ে জাঁকজমকপূর্ণ একটি মিম্বর তৈরি করেছিলেন এই আশায় যে, আল্লাহ পাক যদি কখনো বায়তু'ল-মুকাদ্দাস মুসলমানদের হাতে ফিরিয়ে দেন তাহলে সেখানে তা স্থাপন করা হবে। সালাহুদ্দীন হলব (আলেপ্পো) থেকে মিম্বরটি নিয়ে আসেন এবং মসজিদে আকসায় তা স্থাপন করেন।[২]

ইসলামী চরিত্রের প্রদর্শনী

এ সময় সুলতান সালাহুদ্দীন সর্বসমক্ষে যে সদাশয়তা, উদারতা ও ইসলামী আখলাক-চরিত্র প্রদর্শন করেন তা একজন খৃস্টান ঐতিহাসিকের মুখেই শুনুন :

> সালাহুদ্দীন এর আগে আর কখনো এতটা উদারমনা ও উন্নত মনোবলসম্পন্ন ব্যক্তি হিসাবে নিজেকে পেশ করেন নি, যতটা সেবার করেছিলেন। জেরুযালেম মুসলমানদের হাতে সোপর্দ করার মুহূর্তে সালাহুদ্দীনের অধীনস্থ

১. আন-নাওয়াদিরু'স-সুলতানিয়া, ৬৬ পৃ.।
২. তারীখ-ই-আবি'ল-ফিদা ইসমা'ঈল, ৩য় খণ্ড, ৭৭ পৃষ্ঠা।

সৈনিক ও দায়িত্বশীল অফিসারবর্গ শহরের অলি-গলির শৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন। তাঁরা ছিলেন যে কোন ধরনের জুলুম ও বাড়াবাড়ি প্রতিরোধে সংকল্পবদ্ধ। ফলে সে মুহূর্তে কোন খৃস্টানকেই কোনরূপ দুর্যোগের সম্মুখীন হতে হয়নি। অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য একজন আমীরকে বাব-ই-দাউদ-এ মোতায়েন করা হয়েছিল। তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যেন তিনি এমন প্রত্যেক নাগরিককে বাইরে যাবার অনুমতি দেন যে ফিদ্য়া (মুক্তিপণ) পরিশোধ করেছে।

অতঃপর সুলতানের ভাই আল-'আদিল, বাতরীক (প্যাট্রিয়র্ক) ও বালিয়ান কর্তৃক হাযার হাযার গোলাম আযাদ করার ঘটনা বিবৃত করে বলেছেন ঃ

অতঃপর সালাহুদ্দীন তাঁর আমীরদেরকে বললেন ঃ আমার ভাই তার নিজের পক্ষ থেকে এবং বালিয়ান ও প্যাট্রিয়র্ক (বাতরীক) তাদের নিজেদের পক্ষ থেকে যথেষ্ট দান-খয়রাত করেছেন। এবার আমার বদান্যতা প্রদর্শনের পালা– এই বলে তিনি তাঁর সৈনিককে শহরের অলিগলিতে এই মর্মে ঘোষণা দিতে বলেন যে, যে সমস্ত বৃদ্ধের ফিদ্য়া (মুক্তিপণ) পরিশোধের সামর্থ্য নেই তারাও মুক্ত; তারা যেখানে ইচ্ছা চলে যেতে পারে। এই ঘোষণার পর বাবু'ল-বা'যার হতে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আযাদকৃত লোকের দলে দলে বের হতে থাকে। এ ধরনের দয়া ও বদান্যতা প্রদর্শন একমাত্র সুলতান সালাহুদ্দীনের পক্ষেই ছিল সম্ভব।

মোট কথা, এভাবেই সুলতান সালাহুদ্দীন পরাজিত ও বিজিত শত্রুদের প্রতি ঐকান্তিক উদারতা ও বদান্যতা প্রদর্শন করেন। সুলতানের এই উদারতার বিপরীতে তাঁর শত্রুদের পশুসুলভ বর্বর আচরণের কথাও মনে পড়ে। ক্রুসেডারগণের ১০৯৯ সালে জেরুসালেম বিজয়ের পর গডফ্রে ট্যাংকার্ড যখন সেখানকার গলি-ঘুপচিগুলো অতিক্রম করেছিল তখন মুসলমানদের ওপর তারা কী জুলুমই না করেছিল! চতুর্দিকে শত শত লাশ পড়ে ছিল এবং আহতদের কাতর আর্তনাদে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল আকাশ-বাতাস। এমতাবস্থায় ক্রুসেডারা ঐসব নিরাপরাধ অসহায় মুসলমানদের ভীষণ যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করেছিল এবং জীবিত লোকদেরকে পুড়িয়ে মেরেছিল। কু'দ্স-এর ছাদে বুরুজে যে সব মুসলমান আশ্রয় নিয়েছিল ক্রুসেডাররা তাদের সেখানেই তীরের সাহায্যে এফোঁড়-ওফোঁড় করে নীচে নিক্ষেপ করেছিল। এই পাশবিক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল ঠিক সেই জায়গায় যেখানে 'ঈসা মসীহ একা

দাঁড়িয়ে দয়া-মায়া ও প্রেমের ওয়া'জ শুনিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ তারাই কল্যাণ ও প্রাচুর্যের অধিকারী এবং তাদের ওপরই আল্লাহ্‌র রহমত নাযিল হয় যারা দয়া প্রদর্শন করে। খৃস্টানরা এই পাক ও পবিত্র শহর মুসলমানদের রক্তে হোলি খেলবার সময় একদম ভুলে গিয়েছিল তাদের রসূলের ঐ পবিত্র বাণী। ঐসব নির্দয় ও নির্মম খৃস্টানদের পরম সৌভাগ্যই বলতে হবে যে, তারা পরাজিত হয়ে সুলতান সালাহুদ্দীনের মত উদার হৃদয় সেনাপতির হাতে পড়েছিল যিনি অত্যন্ত সহৃদয়তার সাথে তাদের ভাগ্যের ফয়সালা করেছিলেন।

আল্লাহ্‌র যতগুলো গুণবাচক নাম আছে তাঁর ভেতর সবচেয়ে বড় নাম রাহ্'মান ও রাহ'ীম রহম (رحم) শব্দ থেকে উদ্ভূত। রহম (দয়া) ন্যায়বিচারের শিরোভূষণ এবং আল্লাহ্‌র জালালস্বরূপ। যেখানে 'আদল তথা ন্যায়-বিচার স্বীয় এখতিয়ার ও অধিকারের দাবিতে কাউকে হত্যার নির্দেশ দিতে পারে সেখানে একমাত্র রহমই তার প্রাণ বাঁচাতে পারে।

সুলতান সালাহুদ্দীনের সমস্ত গুণের ভেতর কেবল এই একটি গুণ সম্পর্কে যদি দুনিয়া অবহিত হ'ত, যদি জানতে পারত তিনি কিভাবে জেরুযালেমকে অনুগৃহীত করেছিলেন তাহলে তারা এক বাক্যে স্বীকার করত যে, সুলতান সালাহুদ্দীন কেবল তাঁর যুগেরই নন, বরং সর্বযুগের সর্বাপেক্ষা উন্নত মনোবলসম্পন্ন হৃদয়বান মানুষ এবং বীরত্ব ও ঔদার্যের জীবন্ত প্রতীক ছিলেন।[১]

ক্রুসেডারদের সয়লাব

মুসলমানদের হাতে বায়তু'ল-মুকাদ্দাস বিজয় এবং হিত্তীন রণক্ষেত্রে খৃস্টানদের অবমাননাকর পরাজয়ের কারণে গোটা য়ূরোপে পুনরায় ক্রোধানল জ্বলে ওঠে। তারা আছড়ে পড়ে সিরিয়ার (শামের) এই ছোট্ট দেশটির ওপর যেখানে য়ূরোপের প্রায় সকল নামকরা সেনাপতি ও বিখ্যাত সম্রাট যুদ্ধরত ছিলেন। রোম সম্রাট কায়সার ফ্রেডারিক, ইংল্যান্ডের সিংহহৃদয় রিচার্ড, ফ্রান্স, সিসিলী ও অস্ট্রিয়ার সম্রাটবর্গ, ফ্লান্ডার্‌স-এর ডিউক ও নাইটগণ তাঁদের লৌহবর্ম পরিহিত সেনাদল নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এদের সকলের মুকাবিলায় ছিলেন একাকী সুলতান সালাহুদ্দীন এবং তাঁর কতিপয় আত্মীয়-বান্ধব ও মিত্র শক্তি যারা গোটা মুসলিম বিশ্বের পক্ষ থেকে খৃস্টান শক্তিকে প্রতিহত করে যাচ্ছিলেন।

১. সুলতান সালাহুদ্দীন—২০২, ২০৫ পৃ.।

সন্ধি ও সুলতানের মিশনের পূর্ণতা সাধন

অবশেষে পাঁচ বছরের অব্যাহত রক্তাক্ত যুদ্ধের পর ১১৯২ 'ঈসায়ীতে রমলা নামক স্থানে ক্লান্ত ও অবসন্ন উভয় পক্ষ সন্ধি স্থাপনে সম্মত হয়। বায়তু'ল-মুকাদ্দাসসহ মুসলমানদের বিজিত শহর ও দুর্গগুলো আগের মতই মুসলমানদের হাতে থাকে। সমুদ্রোপকূলবর্তী ক্ষুদ্র রাজ্য একরের নিয়ন্ত্রণ খৃস্টানদের হাতে চলে যায়। বাদ বাকি গোটা দেশই থাকে সুলতান সালাহুদ্দীনের অধিকারে। সুলতান সালাহুদ্দীন যে দায়িত্ব ও খিদমত নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন এবং সত্যি বলতে কি, আল্লাহ্ পাক যে কর্মভার তাঁর কাঁধে ন্যস্ত করেছিলেন, তাঁর হাতে তা পরিপূর্ণতা লাভ করে। খৃস্টান ঐতিহাসিকের ভাষায় :

> পাঁচ বছরের অব্যাহত রক্তারক্তির পর পবিত্র যুদ্ধ (?) শেষ হ'ল। ১১৮৭ 'ঈসায়ীর জুলাই মাসে হিত্তীনে মুসলমানদের বিজয়ের পূর্বে জর্দান নদীর পশ্চিমে তাদের অধিকারে এক ইঞ্চি জায়গাও ছিল না। ১১৯২ 'ঈসায়ীর সেপ্টেম্বরে যখন রমলার সন্ধি স্থাপিত হয় তখন সূর থেকে শুরু করে য়াফা পর্যন্ত সমুদ্রোপকূল এলাকায় এক চিলতে ভূখণ্ড ছাড়া গোটা দেশটাই চলে গেল মুসলমানদের অধিকারে। এই সন্ধি স্থাপনের কারণে সালাহুদ্দীনের এতটুকু লজ্জিত হবার প্রয়োজন ছিল না। ক্রুসেডাররা যা কিছু জয় করেছিল তার বড় অংশটাই ছিল ফিরিঙ্গীদের দখলে। কিন্তু যদি কেবল জান ও মালের দিকটাই দেখা হয় তাহলে এ পরিণতি ও ফলাফল ছিল নিতান্তই নগণ্য। রোমের পোপের ফরিয়াদ শুনতেই গোটা খৃস্টান জগত অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল। জার্মান সম্রাট ফ্রেডারিক, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও সিসিলীর সম্রাট, অস্ট্রিয়ার লিওপোল্ড, বার্গান্ডীর ডিউক, ফ্লান্ডার্স-এর কাউন্ট, শত শত খ্যাতনামা সুপরিচিত ব্যারন, সমগ্র খৃস্টান জাতিগোষ্ঠীর নাইটকুল, জেরুযালেমের খৃস্টান বাদশাহ এবং ফিলিস্তীনের অন্যান্য খৃস্টান রাজ্যপাল, দাবিয়া ও আল-বিতার শ্রেণীর বড় বড় অশ্বারোহী ব্যস্ত হয়ে পড়ে-কি করে বায়তু'ল-মুকাদ্দাস নিজেদের দখলে রাখা যায় এবং জেরুযালেমের নিবু নিবু খৃস্টান সাম্রাজ্যকে আবার সজীব ও তরতাজা করে তোলা যায়। কিন্তু তার পরিণতি কি হ'ল ? ইতোমধ্যেই জার্মান সম্রাট ফ্রেডারিক মৃত্যুমুখে যাত্রা করেন এবং তাদের স্বধর্মীয় অনেক বড় বড় অভিজাত ও সম্মানিত সাথী এশিয়া ভূ-খণ্ডেই চিরনিদ্রায় শায়িত থেকে যায়। পরিণামে জেরুযালেমের ওপর সুলতান সালাহুদ্দীনেরই অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। কেবল এককার সমুদ্রোপকূলবর্তী ছোট্ট ও সংক্ষিপ্ত একটি এলাকার ওপর নামেমাত্র খৃস্টান বাদশাহ্র কর্তৃত্ব বহাল

থাকে। তৃতীয় ক্রুসেড যুদ্ধে গোটা খৃস্টান জগতের মিলিত শক্তি মুসলমানদের মুকাবিলায় অবতরণ করে। কিন্তু সালাহুদ্দীনের শক্তিতে তারা এতটুকু চিড় ধরাতে পারেনি। সালাহুদ্দীনের সৈন্যরা মাসের পর মাস ধরে কঠিন পরিশ্রম এবং বর্ষাকালব্যাপী সংশয়ান্বিত ও বিপজ্জনক খিদমতে নিয়োজিত থাকার কারণে ক্লান্তি ও অবসাদে ভেঙে পড়ছিল বটে, কিন্তু তাদের কারো মুখে অভিযোগের লেশমাত্র ছিল না। ডাকা মাত্রই যুদ্ধ শেষে হাযির হতে এবং একটি নেক কাজে নিজেদের জীবন কুরবানী দিতে তাদের কেউই পিছপা হয়নি। সুলতানের অধীনস্থ দজলা (টাইগ্রীস) নদীর দূর-দরাজ রাজ্যগুলোর শাসনকর্তাদের মনে এই সার্বক্ষণিক ডাকাডাকির কারণে কিছু না কিছু বিরক্তি বা দুর্বলতা আসাটা অসম্ভব কিছু ছিল না, এতদসত্ত্বেও তারা নিজ নিজ সেনাবাহিনী নিয়ে সুলতানের খিদমতে রীতিমত হাযিরা দিতে থাকেন বিরাট আত্মপ্রত্যয় ও কামনা সহকারে। জওয়ার-ই-সূফ নামক স্থানে শেষ যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় তাতে মাওসিল-এর সেনাবাহিনী অত্যন্ত বীরত্ব সহকারে লড়াই করে। এসব যুদ্ধে সুলতান সর্বদাই মিসর ও ইরাকের সৈন্যদের সাহায্যের আশা করেছিলেন। সিরিয়ার উত্তর ও কেন্দ্রীয় ফৌজের নিকট থেকেও একইরূপ সাহায্য-সমর্থনের আশা করেছিলেন এবং সে আশা পূর্ণও হয়েছিল। কূর্দ, তুর্কমেন, আরব, মিসরীয় সমস্ত মুসলমানই ছিল সুলতানের খাদেম, ডাকা মাত্রই তারা খাদেমের মতই সুলতানের খিদমতে এসে হাযির হ'ত। কে কোন্ বংশের কিংবা কে কোন্ জাতিগোষ্ঠীর–সেদিকে তাদের লক্ষ্য ছিল না। জাতিগত বৈপরীত্য সত্ত্বেও সুলতান তাদেরকে এমন একটি অখণ্ড ও ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে পরিণত করেছিলেন যে, গোটা বাহিনী যেন এক আত্মায় লীন হয়ে গিয়েছিল। মনে হ'ত সবাই যেন একই জাতিগোষ্ঠীর সদস্য। সন্দেহ নেই যে, দু' একবার তাদেরকে একতাবদ্ধ ও অখণ্ড রাখতে সুলতানকে বেশ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং কতক নাযুক মুহূর্ত এমনও গেছে, যখন তাদের স্বভাব-প্রকৃতিতে কিছুটা বিচ্ছিন্নতাও লক্ষ্য করা গেছে। এ সব ছোটখাটো ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, বিভিন্ন বংশ ও জাতিগোষ্ঠীর এই মুসলিম সৈন্যরা ১১৯২ ঈসায়ীর হেমন্ত কাল পর্যন্ত সামগ্রিকভাবে সুলতানের নির্দেশাধীন থাকে এবং ১১৮৭ ঈসায়ীতে যে অনুপ্রেরণা নিয়ে তারা আল্লাহ্র পথে কাজ করবার জন্য সুলতানের আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল– শেষাবধি তাদের সে অনুপ্রেরণা বহাল থাকে। এই গোটা সময়টাতে সুলতানের অধীনস্থ কোন প্রদেশ যেমন তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে

যায়নি, তেমনি সুযোগ পায়নি কোন সর্দার কিংবা করদ রাজ্য তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার। তাঁর শুভ ইচ্ছা ও প্রাণান্তকর প্রয়াসের প্রতিচ্ছবি ছিল এই যে, তিনি মযবুত থেকে মযবুততরো প্রত্যয় ও নেতৃত্বের শক্তিকেও অনায়াসে পরীক্ষায় হারিয়ে দিতেন। কেবল ইরাকে সুলতানের একজন প্রিয়ভাজন বিদ্রোহ করেছিল। সুলতান তাকে ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ দিয়ে তার সংশোধনের ব্যবস্থা করেন। জনগণের ওপর সুলতানের যে অপরিসীম প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল, তার প্রমাণ হ'ল, পাঁচ বছরব্যাপী রক্তাক্ত যুদ্ধের অবসানকালীন মুহূর্তেও সুলতান কূর্দিস্তানের পাহাড়ী এলাকা থেকে শুরু করে নওবা প্রান্তর পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকার একক অধীশ্বর ছিলেন। শুধু তাই নয়, সুর্দর কূর্দিস্তানের বাদশাহ, আর্মেনিয়ার কাছেলীন (তৎকালীন শাসক), কাওনিয়ার সুলতান ও কনস্টান্টি-নোপলের সম্রাটও সুলতান সালাহুদ্দীনের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনে গভীরভাবে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু সালাহুদ্দীন ঐ সব দোস্ত ও মিত্রবর্গের কোন বদান্যতা বা মহত্ত্বের কাছে বন্দী হননি। বিপদের দিনে ওদের কেউ তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসেনি। অবশ্য সাফল্য লাভের পর অনেকেই তাঁকে মুবারকবাদ জানাতে এসেছিল। যুদ্ধ ঘোষণা, শত্রুর মুকাবিলা সব কিছুই সুলতান সালাহুদ্দীন নিজের একার দায়িত্বে করেছিলেন। সুলতানের ভাই আল-'আদিল ভিন্ন (তাঁর আবির্ভাবও হয়েছিল একেবারে শেষের দিকে) অন্য কোন লোক, কোন সিপাহসালার কিংবা পরামর্শদাতা সম্পর্কে কেউ বলতে পারবে না যে, তিনি সুলতানের পরামর্শদাতা কিংবা শুভাকাঙ্ক্ষী হিসাবে তাঁকে আপন প্রভাববলয়ে বন্দী করতে পেরেছিলেন। একটি সামরিক উপদেষ্টা পরিষদ অবশ্য ছিল, তবে উক্ত পরিষদের কোন একজন সদস্যও সুলতানের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলতে পারত না যে, তার মতই সুলতানকে অপর সদস্যের তুলনায় বেশি প্রভাবিত করেছে। ভাই, ভাতিজা, পুত্র, পুরনো বন্ধু-বান্ধব, অধীনস্থ নতুন কর্মচারী, সাবধানী কাযী, সতর্ক, বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য উযীর, গোঁড়া ওয়ায়েজীন ও মোল্লা সবাই একটা বিষয়ে একমত ছিলেন যে, যুদ্ধ করতে হবে, করতে হবে জিহাদ। শুধু মুখের কথায় নয়, কাজে-কর্মেও তাঁরা এ জিহাদে শরীক ছিলেন। রক্তাক্ত যুদ্ধের সঙ্গীন ও নাযুক মুহূর্তেও সবাই ছিলেন একই কণ্ঠে উচ্চকিত, একই দেহ ও একই প্রাণে লীন। সুলতান সালাহুদ্দীনের মন-মানস ও তাঁর অভিপ্রায়ই এভাবে সকলকে একই লক্ষ্যাভিসারী করে তুলতে পেরেছিল।[১]

১. সুলতান সালাহুদ্দীন–৩১০-৩১২ পৃ.।

ওফাত

আপন দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে এবং মুসলিম জাহানকে ক্রুসেডারদের গোলামীর ভয়াবহ বিপদ থেকে উদ্ধার করে ৫৮৯ হিজরীর ২৭শে সফর ইসলামের এই বিশ্বস্ত সন্তান দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৫৭ বছর।[১] কাযী বাহাউদ্দীন ইব্ন শাদ্দাদ সুলতানের ওফাতকালীন অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন :

২৭শে সফর ছিল সুলতানের রোগাক্রান্ত হবার দ্বাদশ দিবস। এ দিন তাঁর অসুস্থতা কঠিন আকার ধারণ করে, দেহের শক্তি হ্রাস পায়। ইমামু'ল-কিলাসা শায়খ আবূ জা'ফরকে, যিনি খুবই নেককার ও বুযুর্গ লোক ছিলেন, সুলতানের অবস্থাদৃষ্টে দুর্গের ভেতরেই রাত কাটাবার অনুরোধ জানানো হয়। না জানি, রাতের বেলা যদি সুলতানের অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়েই আসে তাহলে তিনি যেন সুলতানকে শেষ তালকীন দিতে পারেন, সুলতান যেন অন্তিম মুহূর্তে আল্লাহ্‌র নাম নিতে পারেন। রাতের বেলার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল, সুলতান তাঁর শেষ সফরে রওয়ানা হবার সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছেন। এমতাবস্থায় শায়খ আবূ জা'ফর তাঁর নিকট বসে কুরআন তিলাওয়াত ও যিকর-আযকারে মশগুল হয়ে পড়েন। তিন দিন আগে থেকেই সুলতানের মধ্যে এক ধরনের স্মৃতিবিভ্রম ও অসতর্কাবস্থা লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। কখনো-সখনো তিনি সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠছিলেন। শায়খ আবূ জা'ফর তিলাওয়াত করতে করতে যখন (সূরা হাশরের) هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ هُوَ - عٰلِمُ الْغَيْبِ তে গিয়ে পৌঁছেন তখন সুলতান শেষবারের মত হুঁশ ফিরে পান। তাঁর ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসি ভেসে ওঠে। দু'চোখ মেলে ধরেন তিনি এবং বলেন ঃ ঠিক কথা। এই বলেই তিনি চিরতরে চোখ বন্ধ করে ফেলেন। সেদিন ছিল ২৭শে সফর বুধবার ফজরের ওয়াক্ত। মনে হচ্ছিল, খুলাফা-ই-রাশিদীনের ইনতিকালের পর এমন কঠিন দিন মুসলিম ইতিহাসে আর আসেনি। শহর দুর্গ সর্বত্র এক ভয়াবহ অবস্থা বিরাজ করতে থাকে। গোটা পরিবেশটাই থম থমে হয়ে ওঠে। আমি আগে যখন শুনতাম যে, লোকে অপরের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারে তখন মনে করতাম, এটা একটা কথার কথা। কিন্তু সেদিন বুঝতে পারলাম, খোদ আমি ও আমার মত আরও অনেকেই ছিলেন যারা সুলতানের জীবনের বিনিময়ে নিজেদের জীবনকে কুরবানী দিতে তৈরি ছিলেন যদি এ কুরবানী দিয়ে সুলতানকে বাঁচানো সম্ভব হ'ত।[১]

---

১. সুলতানের জন্ম ৫৩২ হিজরীতে (আবু'ল-ফিদা—৩য় খণ্ড, ৯০ পৃ.)।

কাযী ইবনে শাদ্দাদ বলেন ঃ সুলতান তাঁর ইনতিকালের সময় পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসাবে একটি মাত্র দীনার (স্বর্ণ মুদ্রা) এবং ৪৭টি দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) রেখে গিয়েছিলেন। নিজের বলতে তাঁর কোন জায়গা-জমি, বাগ-বাগিচা, কৃষি ভূমি কিংবা বসতবাটি কিছু ছিল না। জানাযা ও দাফন-কাফনে তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে একটি পয়সাও ব্যয়িত হয়নি, সব কিছুই ধার করে করা হয়েছিল, এমন কি কবরের ওপর বিছাবার জন্য দরকারী ঘাসটুকুও কর্জের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছিল। কাফনের কাপড়টুকুর ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁর উযীর ও সচিব কাযী ফাযেল আপন বৈধ ও হালাল উপার্জন থেকে[১]।

দরবেশ চরিত্রের সুলতান

কাযী ইবনে শাদ্দাদ সুলতানের জীবন-চরিত্র, আচার-ব্যবহার ও বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে বলেছেন :

সুলতান খুবই কট্টর ও বিশুদ্ধ 'আকীদার মুসলমান ছিলেন। 'আকীদার দিক দিয়ে তিনি আহলে সুন্নাত ওয়া'ল-জামা'আতের পরিপূর্ণ অনুসারী ছিলেন। ফরয সালাত ও ওয়াজিব আদায়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত পাবন্দ ছিলেন তিনি। একবার তিনি বলেছিলেন ঃ বছরের পর বছর গুজরে গেছে, এক ওয়াক্ত সালাতও বিনা জামা'আতে আমি আদায় করিনি। রোগাক্রান্ত অবস্থায়ও তিনি ইমামকে ডেকে পাঠাতেন এবং স্বাভাবিকভাবে দাঁড়িয়ে তার পেছনে সালাত আদায় করতেন। নির্ধারিত সুন্নতগুলো তিনি হামেশা পালন করতেন। রাতের বেলা যথাসম্ভব নফল পড়তেন, আর রাতের নফল যদি কোন দিন কাযা হয়ে যেত তাহলে (শাফি'ঈ মযহাব অনুযায়ী)[২] ফজরের সালাতের পূর্বেই তা আদায় করে নিতেন। দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নেওয়ার পূর্ব মুহূর্তে রোগাক্রান্ত অবস্থায়ও তাঁকে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে দেখা গেছে। বেহুঁশ থাকা অবস্থায় কেবল তিন দিন তিনি সালাত আদায় করতে পারেননি। সারা জীবনে তাঁর ওপর যাকাত ফরয হবার সুযোগ আসেনি। কারণ কোন সময়ই তাঁর নিকট এমত পরিমাণ সম্পদই জমা হয়নি যার ওপর যাকাত ফরয হতে পারে। তাঁর সমস্ত ধন-সম্পদ দান-খয়রাতে ব্যয় হয়েছে। মৃত্যুকালে তিনি কেবল ১টি দীনার ও ৪৭টি দিরহাম রেখে যান। এ ছাড়া আর কোন স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি

---

১. আন-নাওয়াদিরু'স-সুলতানিয়া–২৪৯-৫০।

২. সুলতান শাফি'ঈ মযহাবের অনুসারী ছিলেন।

তিনি রেখে যাননি। রমযানে কঠোরতার সঙ্গে সিয়াম পালন করতেন; এ ক্ষেত্রে এতটুকু শৈথিল্যও তিনি দেখান নি। কয়েকটি রোযা তাঁর যিম্মায় বাকি ছিল এবং তা কাযী ফাযেলের ডাইরীতে লিপিবদ্ধ ছিল। ওফাতের আগে খুবই সুচারুরূপে তিনি সেগুলোর কাযা আদায় করেন। কঠিন রোগাক্রান্ত অবস্থায় চিকিৎসকেরা তাঁকে এ থেকে নিবৃত্ত রাখতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তিনি জওয়াবে বলেন ঃ আগামীকালের অবস্থা সম্পর্কে আমি আদৌ অবহিত নই। শেষ পর্যন্ত কাযা আদায়ের পর পরই তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

হজ্জ করতে খুবই আগ্রহী ছিলেন, কিন্তু একবারের তরেও সে সুযোগ তিনি পাননি। যে বছর সুলতানের ওফাত ঘটে, সে বছর এ আগ্রহ তাঁর প্রবল আকার ধারণ করেছিল; কিন্তু মৃত্যু তাঁকে সে সুযোগ দেয়নি। কুরআন মজীদ শোনার আগ্রহ ছিল তাঁর প্রবল। কখনো কখনো তিনি বুরুজে পাহারাদারদের থেকে দু'-তিন পারা কিংবা চার পারার মত তিলাওয়াত শুনে নিতেন। অত্যন্ত বিনম্র, ভীত ও দ্রবীভূত অন্তঃকরণের অধিকারী ছিলেন তিনি। কুরআন মজীদ-এর তিলাওয়াত শ্রবণে অধিকাংশ সময় তাঁর চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠত। হাদীছ শ্রবণেও তিনি সমান আগ্রহী ছিলেন। হাদীছের পাঠ চলাকালে তিনি লোকদেরকে ভক্তিভরে উপবেশন করবার নির্দেশ দিতেন। হাদীছের ক্ষেত্রে উচ্চ মরতবার অধিকারী কোন শায়খের সন্ধান পেলে তিনি নিজেই তাঁর মজলিসে গিয়ে হাদীছ শ্রবণ করতেন। তিনি হাদীছের দর্‌স দিতেও আগ্রহী ছিলেন। কোন হাদীছ যদি উপদেশাত্মক ও শিক্ষামূলক হ'ত তাহলে তাঁর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠত। একেবারে যুদ্ধের ময়দানেও তিনি কয়েকবার দু'সারির মাঝে দাঁড়িয়ে হাদীছ শুনেছেন, কেননা এটি বিশেষ ফযীলতের মুহূর্ত। ধর্মীয় প্রথা-পদ্ধতি ও রীতিনীতিকে তিনি বেশ তা'জীম করতেন। মুলহিদ (ধর্মবিরোধী) সুহরাওয়ার্দী-কে তাঁর ইঙ্গিতে তৎপুত্র আল-মালিকু'জ-জাহির হত্যা করে। আল্লাহ্‌র ওপর ছিল তাঁর অগাধ বিশ্বাস। অত্যন্ত নাযুক মুহূর্তগুলোতে তিনি আল্লাহ্‌র দিকেই ফিরে যেতেন এবং একমাত্র তাঁরই সাহায্য কামনা করতেন।

একবার বায়তু'ল-মুকাদ্দাসের নিরাপত্তা নিয়ে কঠিন বিপদ দেখা দেয়। বিপদটা এসেছিল নিকটেই অবস্থানরত ক্রুসেডারদের পক্ষ থেকে। বায়তু'ল-মুকাদ্দাস নিয়ে সুলতান গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। জুমু'আর রাত্রি। শীতের প্রকোপপূর্ণ রাতে আমি একা তাঁর খিদমতে হাযির। আমরা দু'জনে রাতভর যিক্‌র-আযকার ও দু'আর মধ্যেই কাটিয়ে দিলাম। সুলতানের মেযাজে

অধিকাংশ সময়ই অস্থিরতা পরিলক্ষিত হচ্ছিল। সারা রাত জেগে কাটাবার কারণে আমি আশঙ্কা করছিলাম, না জানি, সুলতান তাঁর মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন! সুলতানকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার জন্য বললাম। সুলতান বললেন ঃ ঘুমের অভাব তোমাকে বেশ পীড়া দিচ্ছে দেখতে পাচ্ছি, আর সে জন্যই তুমি আমাকে ঘুমোবার পরামর্শ দিচ্ছ? এই বলে তিনি উঠে পড়লেন। অল্পক্ষণ পরেই মুওয়াযযিন ভোরের আযান হাঁকল। সাধারণত ফজর আমরা এক সঙ্গেই পড়তাম। হাযির হয়ে দেখতে পেলাম, তিনি সেখানে ওযু করছেন। আমাকে দেখে বলে উঠলেন ঃ মুহূর্তের জন্যও আমি দু'চোখের পাতা এক করিনি। এরপর আমরা সালাতে মশগুল হয়ে গেলাম। হঠাৎ আমার মনে একটা ভাবের উদয় হ'ল। আমি আরয করলাম : আমার মস্তিষ্কে একটা কথার উদয় হয়েছে। আমার বিশ্বাস তা উপকারী প্রমাণিত হবে। আপনি আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করুন এবং তাঁরই সমীপে কান্নাভেজা কণ্ঠে দু'আ করতে থাকুন। বিশ্বাস করুন, একমাত্র আল্লাহ্ই পারেন এই মুশকিল আসান করতে। "কি ভাবে তা সম্ভব?" সুলতান প্রশ্ন করলেন। আমি বললাম : আজ শুক্রবার, জুমুআর দিন। মসজিদে যাবার আগে গোসল সের নিন। মসজিদে আকসার সেই জায়গায় গিয়ে সালাত আদায় করুন যেখান থেকে হুযূর (সা) মি'রাজে তশরীফ নিয়ে গিয়েছিলেন, আর কোন বিশ্বস্ত লোকের মারফত এমনভাবে সাদকা করুন, যেন কেউ তা জানতে না পারে। এরপর আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তীতে দু' রাকাত সালাত আদায় করুন। হাদীছে এর বিরাট ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর সিজদায় গিয়ে আল্লাহ্র নিকট আরয করুন : আল্লাহ রাব্বু'ল-'আলামীন! বস্তুগত সকল উপায়-উপকরণ ও পার্থিব সকল আশ্রয় আমার ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। তোমার দীনের সাহায্য ও বিজয়ের কেবল একটাই অবলম্বন রয়ে গেছে। আর তা হ'ল, আমি শুধু তোমারই আস্তানায় মাথা ঝুঁকাব এবং তোমারই আশ্রয়কে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরব। এখন কেবল তুমিই ভরসা, তুমিই আশ্রয়দাতা ও মদদগার। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আল্লাহ্ পাক আপনার দু'আ কবুল করবেন।

সুলতান তাই করলেন। আমি আমার চিরদিনের অভ্যাস মাফিক তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলাম। আমি দেখতে পেলাম, তিনি সিজদায় পড়ে আছেন। চোখের পানিতে তাঁর দাঁড়ি ভিজে গেছে এবং জায়নামাযের ওপর টপটপ করে তা ঝরে পড়ছে। তিনি কি দু'আ করলেন আমি শুনিনি। কিন্তু সেদিনই তাঁর দু'আ কবুল হবার আলামত দেখতে পেলাম। ক্রুসেডারদের

মধ্যে অনৈক্য, বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতার প্রকাশ ঘটতে দেখা গেল। উপর্যুপরি সান্ত্বনাদায়ক খবর পেতে লাগলাম আমরা। সোমবার ভোরবেলা পর্যন্ত ময়দান একেবারে সাফ হয়ে গেল। আক্রমণকারী ফৌজ বায়তু'ল-মুকাদ্দাস বিজয়ের খেয়াল ছেড়ে রমলার দিকে চলে যায়।[১]

সর্বোত্তম চরিত্র-আখলাক

'ইবাদত-বন্দেগী ও উত্তম আমলের সাথে তাঁর মধ্যে উত্তম শাসকসুলভ গুণ, ন্যায়বিচার, ক্ষমাশীলতা, সহিষ্ণুতা, দানশীলতা, মানবতাবোধ, আভিজাত্য, ধৈর্য, শৌর্য-বীর্য, ঔদার্য ও উন্নত মনোবলের ন্যায় মহান গুণাবলীও ছিল।

কাযী ইবনে শাদ্দাদ বলেন :

সপ্তাহে দু'বার–সোমবার ও বৃহস্পতিবার সুলতানের দরবারে সাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল। ফকীহ (আইনজ্ঞ ও ব্যবহারজীবী), কাযী (বিচারক), 'আলিম-'উলামা ও মোকদ্দমার বাদী-বিবাদীরা ঐ দিন তাঁর দরবারে হাযির হ'ত। ছোট-বড় ও আমীর-গরীবদেরও তাঁর দরবারে আসবার ঢালাও অনুমতি ছিল। দেশে অবস্থানকালে কিংবা সফরে কোন অবস্থাতেই এই সাধারণ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটত না। রাত্রি দিনে অন্তত একবার তিনি মামলা সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে বসতেন এবং রাষ্ট্রীয় কার্যাদিও দেখাশোনা করতেন। রাষ্ট্রীয় ফরমান ও চিঠি-পত্রাদির ওপর স্বয়ং দস্তখত করতেন। অভাবী কিংবা বিপন্ন কোন লোককে তিনি তাঁর দরবার থেকে কখনই ব্যর্থ ও নিরাশ হয়ে ফিরে যেতে দিতেন না। এত দায়িত্ব পালন সত্ত্বেও তিনি যিকর-আযকার ও কুরআন তিলাওয়াত থেকে গাফিল থাকতেন না।

কেউ কোন ফরিয়াদ কিংবা শেকায়েত (অভিযোগ) পেশ করলে তিনি নিজে দাঁড়িয়ে তা শুনতেন, ফরিয়াদীকে সান্ত্বনা দিতেন এবং তার মামলার ব্যাপারে পরিপূর্ণ আগ্রহ ও উৎসাহ প্রদর্শন করতেন। একবার একজন সাধারণ গোছের লোক সুলতানের ভ্রাতুষ্পুত্র তকীউদ্দীনের বিরুদ্ধে (যিনি সুলতানের খুবই প্রিয়ভাজন ছিলেন) মামলা দায়ের করে। সুলতান তক্ষুণি তাঁকে তলব করেন এবং নিজেই মামলার শুনানি নেন। একবার একটি লোক তো স্বয়ং সুলতানের বিরুদ্ধেই মামলা দায়ের করে বসে। সুলতান নিজেই ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখেন। যদিও দাবিদারের হক তাতে প্রমাণিত হয়নি, কিন্তু তথাপিও সুলতান

১. আন-নাওয়াদিরু'স-সুলতানিয়া–৫, ১০ পৃ.।

তাকে একেবারে ব্যর্থ ফিরে যেতে দেননি। তাকে খেলাত ও অন্যান্য মালামাল দিয়ে বিদায় করেন।

তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণু মেযাজের ছিলেন। ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিকান বলেন :

তিনি তাঁর বন্ধু-বান্ধব ও খাদেমদের ছোটখাট দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করতেন। তিনি এমন কোন কথা যদি শুনতেন যা তাঁকে কষ্ট দিত তাহলে তক্ষুণি তা হযম করে ফেলতেন, অন্য কাউকে তা বুঝতেই দিতেন না। একবার তিনি পানি চাইলেন। পানি এল না। তিনি আবারও পানি চাইলেন। এবারও এল না। পরপর পাঁচবার এ ধরনের ঘটনা ঘটল। শেষাবধি তিনি বললেন ঃ বন্ধুরা! আমি তো পিপাসায় মারা যেতে চললাম। ইতোমধ্যেই পানি এল। তিনি পান করলেন। কিন্তু বিলম্বের কারণে কাউকেই কিছু বললেন না।[১] একবার তিনি কঠিন অসুখ থেকে ওঠেন। গোসল করে পরিপূর্ণ স্বস্তি লাভ করবেন– এই আশায় হাম্মামে গেলেন। পানি ছিল গরম। ঠাণ্ডা পানি চেয়ে পাঠালেন। খাদেম পানি এনে হাযির করল। ঢালতে গিয়ে কিছু পানি টল্‌কে সুলতানের শরীরে গিয়ে পড়ে। দুর্বলতা হেতু তিনি এতে বেশ কষ্ট পান। তিনি পুনরায় ঠাণ্ডা পানি চাইলেন। এবার ঠাণ্ডা পানির পুরো পাত্রটাই পড়ে যায় এবং সমস্ত পানি সুলতানের ওপর গিয়ে পড়ে। সুলতান মরতে মরতে বেঁচে যান। এত কিছুর পরও তিনি কেবল এতটুকু বললেন ঃ আমাকে যদি মেরে ফেলার ইচ্ছাই করে থাক তাহলে তা পরিষ্কার বলে ফেল। খাদেম তার এই অসাবধানতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। সুলতান নিশ্চুপ হয়ে যান। এজন্য তাকে আর কৈফিয়তের কাঠগড়ায় দাঁড় করান নি।[২]

কাযী ইবনে শাদ্দাদ ফৌজের সেনানায়কদের ভুল-ভ্রান্তি এবং সুলতানের ক্ষমাশীলতা ও সহিষ্ণুতার কতিপয় বাস্তব ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন।[৩]

সুলতানের বদান্যতার অবস্থা ছিল এমন যে, (ইবনে শাদ্দাদের ভাষায়) তা কোন সময় বিজিত প্রদেশ অন্যকে দান করে দেওয়া পর্যন্ত পৌঁছে যেত। তিনি আমেদ জয় করেন। ইবনে কুরা আরসালান নামক জনৈক সর্দার তা চেয়ে বসে। তিনি তাকে তা দিয়ে দেন। এমন মুহূর্তও দেখা গেছে যে, নিজের সামান-আসবাব বিক্রি করেও আগত প্রতিনিধি দলকে উপহার-উপঢৌকনাদি

১. তারীখ-ই-ইবন খাল্লিকান, তরজমা–সুলতান সালাহুদ্দীন।
২. তারীখ-ই-ইবনে খাল্লিকান, তরজমা–সুলতান সালাহুদ্দীন।
৩. আন-নাওয়াদিরু'স-সুলতানিয়া–২১, ২৪ পৃ.।

দিয়ে তিনি তুষ্ট করছেন। রাজকোষের কর্মচারীবৃন্দ তাঁর নাযুক মুহূর্তে যাতে কাজে আসে সেজন্য কিছু কিছু অর্থ লুকিয়ে রাখত। তাদের ভয় ছিল, সুলতান যদি জেনে ফেলেন যে, রাজকোষে অর্থ জমা আছে তাহলে তিনি তা অবিলম্বে খরচ করে ফেলবেন। একবার তিনি অন্যের উদাহরণ টেনে বলেছিলেন ঃ কিছু লোক এমনও হতে পারে যাদের কাছে অর্থ ও মাটির মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই; দুটোকেই তারা একই দৃষ্টিতে দেখে। আমি জানি, এ কথা বলে তিনি তাঁর নিজের অবস্থাই বুঝিয়েছেন।[১]

তাঁর মানবতা ও ভদ্রতাবোধ এতই প্রকট ছিল যে, কোন আগন্তুক ও দর্শনার্থীকেই তিনি রিক্ত হস্তে বিদায় করতেন না– চাই সে কাফির, মুশরিক অথবা য়াহূদী হোক। সায়দার শাসনকর্তা একবার তাঁর সাথে সাক্ষাত করেন। তিনি তাকে খুবই খাতির-যত্ন করেন, নিজরে সাথে বসিয়ে খানা খাওয়ান এবং সেই সাথে তাকে ইসলামের দা'ওয়াতও দেন। অন্য কোনভাবে নয়, বরং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্য বর্ণনা করে তিনি তাকে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁর মনুষ্যত্ব ও শরাফতীর শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন এই যে, তাঁর সর্বাপেক্ষা বড় প্রতিপক্ষ রিচার্ড অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি তাঁর জন্য পথ্যস্বরূপ বরফ ও ফল-ফলারি প্রেরণ করেন।[২]

সুলতান খুবই উদারহৃদয় ও দরদী চিত্তের মানুষ ছিলেন। জুলুম-অত্যাচার তিনি বরদাশ্ত করতে পারতেন না, বিশেষ করে দুর্দশাপীড়িত দুর্বল মানুষের কষ্ট তাঁর কাছে ছিল একেবারে অসহ্য। ইবনে শাদ্দাদ বলেন ঃ একবার এক বৃদ্ধা খৃস্টান মহিলা তাঁর নিকট এল। সে বুক চাপড়ে কাঁদছিল। সুলতান তার কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করেন। জওয়াবে বৃদ্ধা জানায় ঃ আমার ছোট্ট বাচ্চাটিকে এক ডাকু এসে তাঁবু থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। সারা রাত আমি কেঁদে কাটিয়েছি। সুলতানের জনৈক লোক আমাকে বলল ঃ সুলতান খুবই মেহেরবান ও স্নেহপরায়ণ। আমি তোমাকে তাঁর কাছে পৌঁছে দিচ্ছি। তুমি গিয়ে ফরিয়াদ জানাও। সে-ই আমাকে আপনার খেদমতে পৌঁছে দিয়েছে। আমি আমার বাচ্চা আপনার কাছ থেকেই নিতে চাই। সুলতান তার এই অবস্থাদৃষ্টে খুবই ব্যথিত হন। তাঁর চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটি লোককে সৈনিকদের বাজারে পাঠিয়ে দেন, কে এই মহিলার বাচ্চাটিকে খরিদ করেছে তা খুঁজে বের করতে এবং যে কোন মূল্য দিয়ে

১. আন-নাওয়াদিরু'স-সুলতানিয়া, ১৩–১৪ পৃ.।
২. আল-ফাতহু'ল-কাসী ফি'ল-ফাৎহি'ল-কুদসী, ইমামুদ্দীন আল-কাতিব।

হোক বাচ্চাটিকে ফেরত নিয়ে আসতে। অল্পক্ষণ পরেই দেখা গেল, লোকটি অশ্বপৃষ্ঠে করে বাচ্চাটিকে কাঁধে বয়ে নিয়ে আসছে। বাচ্চাটিকে দেখা মাত্রই বৃদ্ধা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল এবং কপাল ঠেকিয়ে অনেকক্ষণ ধরে কি যেন বিড়বিড় করে বলল। অতঃপর হৃষ্ট চিত্তে আপন বাচ্চাটিকে কোলে নিয়ে ফিরে গেল।[১]

কাযী ইবনে শাদ্দাদ বলেন ঃ সুলতান যখন কোন ইয়াতীম (পিতৃমাতৃহীন) শিশু দেখতেন অমনি তার সঙ্গে স্নেহ কোমল কণ্ঠে আলাপ জুড়ে দিতেন, তার অন্তর জয়ের চেষ্টা করতেন, তাকে কিছু উপহার-সামগ্রী দিতেন এবং তার লালন-পালনের কেউ না থাকলে নিজের পক্ষ থেকে তার লালন-পালনের ব্যবস্থা করতেন। বয়োবৃদ্ধ কোন লোক দেখলে তাকে তিনি খুব সমীহ করতেন এবং তার সঙ্গে সৌজন্যমূলক আচরণ করতেন।[২]

পুরুষোচিত গুণাবলী

সুলতানের ধৈর্য ও দৃঢ়তা ছিল অপরিসীম। কাযী ইবনে শাদ্দাদের বর্ণনা অনুযায়ী :

একবার তিনি কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত এত বেশী ঘা ও ফোঁড়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন যে, ওঠাবসা করা তাঁর জন্য অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছিল, এমন কি দস্তরখানে বসে তিনি খানাও গ্রহণ করতে পারছিলেন না। এতদসত্ত্বেও শত্রুর মুকাবিলায় তিনি ছিলেন বাঁধা কোমরে খাড়া। আমি তাঁকে সকাল থেকে মাগরিব অবধি অশ্বপৃষ্ঠে রণক্ষেত্রে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বরাবর চক্কর লাগিয়ে সেনাদলের সঠিক ব্যবস্থাপনা পরিদর্শন করতে দেখেছি। ফোঁড়ার কষ্ট তিনি ধৈর্য সহকারে সহ্য করছিলেন। আমি বিস্ময় প্রকাশ করলে তিনি বলতেন ঃ অশ্বপৃষ্ঠে সওয়ার হবার পর ব্যথা-বেদনার আর কোন অনুভূতি আমার থাকে না।[৩]

এক যুদ্ধে অসুস্থাবস্থায়ও তিনি শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন অব্যাহত রাখেন। এক রাত্রে আমি ও চিকিৎসক সুলতানের সেবায় নিয়োজিত ছিলাম এবং তাঁর মন প্রফুল্ল রাখতে চেষ্টা করছিলাম। সুলতান কখনো শয়ন করছিলেন, আবার কখনো জেগে উঠছিলেন। এভাবেই ভোর হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সুলতান অশ্বপৃষ্ঠে চড়ে বসলেন এবং আপন সন্তানদেরকে সর্বাগ্রে আল্লাহ্র পথে জিহাদের ময়দানে পাঠিয়ে দিলেন। একে একে তিনি বাকি সবাইকেও আল্লাহ্র নামে

১. আন-নাওয়াদিরু'স-সুলতানিয়া, ২৬ পৃ.; ২. প্রাগুক্ত, ২৮ পৃ.; ৩. প্রাগুক্ত, ১৮ পৃ.।

উৎসর্গ করে সমরক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিলেন। কেবল আমি ও চিকিৎসক থেকে গেলাম। সন্ধ্যা অবধি সুলতান যুদ্ধের তত্ত্বাবধানেই ব্যস্ত রইলেন। রাত্রি বেলা সেনাবাহিনীকে সশস্ত্র সতর্কাবস্থায় অতিবাহিত করবার অনুমতি দেওয়া হ'ল। অতঃপর আমরা সুলতানসহ তাঁবুতে প্রত্যাবর্তন করলাম।[১]

সুলতানের বীরত্বও ছিল তুলনাহীন। কাযী ইবনে শাদ্দাদের বর্ণনা মতে :

সুলতান দিনে দু'একবার শত্রুর আশেপাশে টহল দিয়ে ফিরতেন। প্রচণ্ড যুদ্ধ চলাকালে সুলতান একাকী অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে সৈন্যব্যূহের মাঝখানে টহল দিয়ে বেড়াতেন। আরোহীশূন্য ও অস্ত্রসজ্জিত একটি অশ্ব সহিসের সঙ্গে থাকত। তিনি তাঁবু থেকে বের হয়ে বাম পার্শ্বের ব্যূহ পর্যন্ত সৈন্যদলের ভেতর ঢুকে পড়তেন, অতঃপর কাতার ভেদ করে বেরিয়ে যেতেন। বিভিন্ন ফৌজী প্লাটুনকে ডেকে তিনি তাদেরকে উপযুক্ত স্থানে অবস্থান নেবার কিংবা সম্মুখে অগ্রসর হবার নির্দেশ দিতেন৷ তিনি কতটা নিরুদ্বেগ, প্রশান্ত ও ভয়শূন্য ছিলেন তা নিম্নের ঘটনা থেকে অনায়াসে অনুমান করা যাবে। একবার আমি তাঁকে বললাম ঃ সুলতান বিভিন্ন সময় হাদীছ শুনেছেন, কিন্তু কখনো ঠিক যুদ্ধ চলাকালে সেনাকাতারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাদীছ শোনার সুযোগ তাঁর ঘটেনি। এ সৌভাগ্যও যদি হয়ে যায় তাহলে খুব ভাল হয়। অনন্তর সুলতান কাতারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাদীছ শ্রবণ করলেন।[২] শত্রুর সংখ্যাশক্তিকে কখনই তিনি গ্রাহ্যের মধ্যে আনতেন না এবং এটা তাঁর মন-মানসেও কোন প্রভাব ফেলতে পারত না। কখনো কখনো পাঁচ-ছয় লক্ষের বিরাট শত্রু বাহিনীরও তিনি মুকাবিলা করেছেন, কিন্তু মোটেই ভীতিগ্রস্ত হননি, বরং আল্লাহ্র মেহেরবানীতে জয় লাভই করেছেন। তাঁর ক্ষুদ্র বাহিনীর কাছে বিরাট শত্রুবাহিনী হতাহত হয়েছে, বন্দী হয়েছে।[৩]

একবার সত্তরেরও কিছু বেশী শত্রু জাহাজ এককায় (একরে) আগমন করে। আমি 'আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত জাহাজগুলো গণনা করলাম। কিন্তু সুলতানের চেহারায় উদ্বেগের কোন চিহ্নই ছিল না। একবার সবচেয়ে বড় যুদ্ধে মুসলমানদের পদস্খলন ঘটে। মধ্যবর্তী ব্যূহ পর্যন্ত তারা নিজেদের স্থান পরিত্যাগ করে। মুসলমানদের পতাকা পর্যন্ত ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়ে। এত কিছুর পরেও সুলতান কতিপয় সঙ্গী-সাথীসহ স্বস্থানে অটল থাকেন। তিনি পাহাড়

---

১. আন-নাওদিরু'স-সুলতানিয়া, ১৯ পৃ.।
২. প্রগুক্ত, ১৫ পৃ.;
৩. ঐ;

পেছনে ফেলে দাঁড়িয়ে যান, মুসলমানদের চীৎকার দিয়ে ডাকেন, তাদের পৌরুষে আঘাত করেন, লজ্জা দেন। ফলে তারা পুনরায় রণক্ষেত্রে ফিরে আসে এবং ভীষণ বেগে হামলা চালায়। এ যুদ্ধে শত্রুপক্ষের সাত হাজার সৈনিক মারা যায়। মুসলমানরা জয় লাভ করে।[১]

সুলতানের উচ্চ মনোবল ও উন্নত মানের নির্ভীকতার পরিমাপ নিম্নোক্ত উক্তি থেকেও করা যাবে। কাযী ইবনে শাদ্দাদ বলেন :

একবার সুলতান বললেন ঃ আমি তোমাদেরকে আমার মনের কথা বলছি। আমার ইচ্ছা যে, সমুদ্রোপকূলবর্তী এলাকা ক্রুসেডারদের হাত থেকে মুক্ত করি, এরপর গোটা রাজ্য মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দেই। এরপর অন্তিম উপদেশ ও দরকারী নির্দেশ দিয়ে এখান থেকে বিদায় নিয়ে চলি এবং সমুদ্র পার হয়ে য়ূরোপের দ্বীপগুলোতে গিয়ে হাযির হই এবং অবিশ্বাসীদের পশ্চাদ্ধাবন করি যাতে করে দুনিয়ার বুকে আর একটি অবিশ্বাসীও অবশিষ্ট না থাকে। এ উদ্দেশে আমার জীবনপাত হলেও আপত্তির কিছু নেই।[২]

'ইলম ও ফযীলত

সুলতান নিজেই ছিলেন একজন 'আলিম ও ফাযেল (জ্ঞানী ও গুণী) ব্যক্তি। আরবের বিভিন্ন বংশ ও জাতিগোষ্ঠীর, এমন কি তাদের বিখ্যাত ঘোড়াগুলোর নসবনামা (বংশ-তালিকা)-ও তাঁর জানা ছিল। আরবদের বিভিন্ন ঘটনা ও অবস্থাসমূহ তিনি তাঁর স্মৃতিতে গেঁথে রেখেছিলেন। বিশ্বের যাদুঘরগুলো ও সেখানে রক্ষিত প্রাচীন চিহ্নাদি সম্পর্কেও তিনি ছিলেন ওয়াকিফহাল। তিনি বিভিন্নমুখী জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাঁর সমসাময়িক বন্ধু-বান্ধবেরা তাঁর থেকে অনেক নতুন কথা জানতে পারতেন।[৩] কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে প্রসিদ্ধ আরবী কাব্য-গ্রন্থ 'হামাসা' তাঁর সম্পূর্ণ মুখস্থ ছিল।[৪] ঐতিহাসিক লেনপুল তাঁর প্রথম জীবনের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন :

তাঁর মূল প্রবণতা ছিল ধর্মের দিকে। তিনি 'আলিম-'উলামা থেকে হাদীছ শ্রবণ করতেন এবং তাদের পেশকৃত দলীল-প্রমাণ, হাদীছ বর্ণনাকারীদের বিশ্লেষণ-ধারা, ফিকহী মসলা-মাসাইলের ওপর আলোচনা ও বিতর্ক, কুরআনের আয়াতসমূহের তফসীর ইত্যাদি নিয়ে গভীরভাবে নিমগ্ন থাকতেন। সবচেয়ে বেশী আনন্দ ও তৃপ্তি পেতেন তিনি তখনই যখন কেউ তাঁর সামনে

---

১. আন-নাওয়াদিরু'স-সুলতানিয়া, ১৫ পৃ.; ২. ঐ, ১ পৃ.; ৩. ঐ, ২ পৃ.; ৪. ঐ।

আহলে সুন্নাত ওয়া'ল-জামা'আতের সমর্থনে শক্তিশালী দলীল-প্রমাণ পেশ করত।[১]

ফাতিমী হুকূমতের অবসান ঃ সুলতান সালাহুদ্দীনের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব

সুলতান সালাহুদ্দীনের উল্লেখযোগ্য দ্বিতীয় কৃতিত্ব হ'ল, মিসরের ক্ষমতাসীন 'উবায়দী সালতানাতের[২] (সাধারণভাবে ফাতিমী রাজত্ব নামে খ্যাত) অবসান ঘটানো। ২৯৯ হিজরী থেকে শুরু করে ৫৬৭ হিজরী অবধি পুরো ২৬৮ বছর অত্যন্ত দোর্দণ্ড প্রতাপে ফাতিমীরা রাজত্ব করেছিল এবং মুসলিম জাহানের একটি বিরাট অংশের 'আকীদা, আমল, আখলাক ও সংস্কৃতির ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। ঐ শাসনকালটা ছিল অদ্ভুত 'আকীদা, বিস্ময়কর নির্দেশ ও হাস্যকর বিধানাদি দ্বারা পূর্ণ। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মাকরিযীর 'আল-খিতাত ওয়া'ল-আছার' নামক গ্রন্থ থেকে এর কিছুটা নমুনা এখানে পেশ করা হচ্ছে ঃ

> ৩৬২ হিজরীতে উত্তরাধিকার আইনের সংস্কার করা হ'ল। আইন জারী করা হ'ল, মৃত ব্যক্তি যদি কন্যা রেখে মারা যায় তাহলে পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র, চাচা প্রমুখ পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হবে না। এই আইনের লঙ্ঘনকে হযরত ফাতিমা (রা)-এর সঙ্গে শত্রুতার সমার্থক গণ্য করা হয়। গোটা মিসরব্যাপী চন্দ্র দর্শনকে স্থগিত ঘোষণা করা হয় এবং সিয়াম, 'ঈদ ইত্যাদির সময় অংক কষে নির্ধারণ করা হতে থাকে। ৩২ হিজরীতে সারা মিসরে রমযানের তারাবীহ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। মুওয়াত্তা-ই-ইমাম মালিক-এর একটি কপি জনৈক ব্যক্তির কাছে থাকার দরুন তাকে প্রকাশ্যে অপমানিত করা হয়।
>
> ৩৯৩ হিজরীতে ঐ একই অপরাধে তেরো ব্যক্তিকে মারধোর করা হয় এবং তাদেরকে এই বলে প্রকাশ্যে অপমানিত করা হয় যে, তারা সালাতু'য-যোহা (চাশতের নামায) আদায় করেছে। ৩৯৫ হিজরীতে 'মুলুখিয়া' (মিসরবাসীদের এক ধরনের প্রিয় তরকারি) এই অজুহাতে নিষিদ্ধ করা হয় যে, হযরত মু'আবিয়া (রা) এটা খুবই পসন্দ করতেন। ঐ একই বছরে মসজিদ, প্রাচীর,

---

১. সুলতান সালাহুদ্দীন।

২. বংশ-তালিকা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের প্রায় সবাই এ বিষয়ে একমত যে, বনী 'উবায়দ-এর নবী বংশের সঙ্গে দূরতম সম্পর্কও ছিল না। তাদের উর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ 'উবায়দ অগ্নি-উপাসক কিংবা ইয়াহূদী ছিল। কাযী আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে খতীব তাঁর "আল-০কাশফ 'আন-আসরারি'ল-বাতনিয়্যা", কাযী 'আবদুল জাব্বার "তাছবীতুন'ন-নুবূওয়া" ও মাকদিসী তাঁর كشف ما كان عليه بنو عبيد নামক গ্রন্থে এর ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

কবরস্থান, মাঠ-ঘাট, পথ-প্রান্তর সর্বত্রই প্রাচীন বুযুর্গদের উদ্দেশে গালিগালাজ ও অভিশাপ বাণী উৎকীর্ণ করা হয়। ৪১১ হিজরীতে 'আজ-জাহিরু লি ই'যায-দীনিল্লাহ' মদ্যপানের সাধারণ অনুমতি দান করেন। বিলাসী জীবন ও ক্রীড়া-কৌতুকের বাজার সরগরম করা হয়। ঐ যুগেই দেশে আকাল ও দুর্ভিক্ষ এবং রোগ-ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ঘটে। জনগণ শাহী মহলের চতুষ্পার্শ্বে এসে সমবেত হ'ত এবং الجوع الجوع (ক্ষুধা, ক্ষুধা) শব্দে চতুর্দিকে প্রকম্পিত করে তুলত। সে সময় ব্যাপক লুটতরাজও চলে।

৪২৪ হিজরীতে সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার ৪ বছরের এক যুবরাজের হাতে সোপর্দ করা হয় এবং তার সমর্থনে সুসজ্জিত মিছিল বের করা হলে লোকে অত্যাচারের ভয়ে আভূমি নত হয়ে তাকে অভিবাদন জানায়। ফাতিমী বংশের কিছু লোক খুবই অল্প বয়সে খলীফা নিযুক্ত হয়। মুসলমানদের জন্য তাদের আনুগত্য স্বীকারকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। মুস্তানসির বিল্লাহ্ যখন খলীফা হন তখন তাঁর বয়স ছিল সাত বছর। আমের বি-আহ্'কামিল্লাহ্ খিলাফতের আসনে যখন অধিষ্ঠিত হন তখন তাঁর বয়স ছিল পাঁচ বছর এক মাস কয়েক দিনমাত্র। আল-ফাইয বি-নাসরিল্লাহ্ মাত্র পাঁচ বছর বয়সে খলীফা হন। খিলাফত লাভের সময় 'আদিদ লে-দীনিল্লাহ্‌র বয়স ছিল ১১ বছর।[১]

সুলতান সালাহুদ্দীনের সালতানাত লাভের মাধ্যমে এ যুগের অবসান হয়ে নতুন যুগের সূচনা হয়। মিসর থেকে শী'আ ও রাফেযী মতবাদের চিহ্নাদি অবলুপ্ত হতে থাকে। কুরআন ও সুন্নাহর প্রসার লাভ ঘটে। স্থানে স্থানে মাদরাসা কায়েম হয়। এসব মাদরাসায় 'উলামায়ে কিরাম ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করতেন। ক্রমে ক্রমে 'উবায়দী হুকূমতের যাবতীয় আলামত একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। এর সঙ্গে ইসমা'ঈলীয় (কট্টর শী'আ) মতবাদ যা প্রায় তিন শতাব্দী যাবত মিসরের সরকারী ধর্ম ছিল-মিসর থেকে চিরতরে নির্বাসিত হয়। মিসরের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মাক'রিযী বলেন :

واختفى مذهب الشيعة والاسماعيليه والامامية حتى فقد من ارض مصر كلها

অর্থাৎ শী'আ, ইসমা'ঈলিয়া ও ইমামিয়া মতবাদের অস্তিত্ব মুছে যেতে থাকে, এমন কি শেষ পর্যন্ত মিসর ভূমির কোথাও এর অস্তিত্ব ছিল না।

কয়েক শ' বছরের 'উবায়দী হুকূমত ইসলামী হুকূমতের জন্য ছিল এক অগ্নি-পরীক্ষা। এই বছরগুলিতে ইসলামী শরীয়ত, সুন্নত, আখলাক ও 'আকাইদ নিয়ে

---

১. كتاب الخطط والاثار للمقريزى ৩৪০ ৩৫৫ পৃ.।

উপর্যুপরি হাসি-তামাশা করা হ'ত। আহলে সুন্নত ওয়া'ল-জামা'আত ও 'আলিম-'উলামা ছিলেন পরাজিত ও নিগৃহীত এবং শাসনদণ্ড ছিল নীচু চরিত্রের বদ স্বভাবের লোকদের হাতে। এ সম্পর্কে 'আল্লামা মাক'দিসী তাঁর অমর গ্রন্থ كتاب الروضتين فى اخبار الدولتي ও -এ বলেন :

وبقى هذا البلاء على الاسلام من اول دولتهم الى اخرها وذلك من ذى الحجة سنة تسع وتسعين ومائتن الى سنة سبع وستين وخمس مائة وفى ايامهم كثرت الرافضة واستحكم امرهم و وضعت المكوس على الناس واقتدى بهم غيرهم وافسدت عقائد طوائف من اهل الجبال الساكنين بثغور الشام كالنصيرية والدروزية والحشيشية نوع منهم ومكن دعاتهم منهم لضعف عقولهم وجهلهم ما يتمكنوا من غيرهم واخذت الفرنج اكثر البلاد الشام والجزيرة الى ان من الله على المسلمين بظهور البيت لاتابكى وتقدمه مثل صلاح الدين فاستردو البلاد وازالوا هذه الدولة عن ارقاب العباد .

'উবায়দী হুকূমতের সূচনাকাল থেকে শেষ অবধি ইসলামের ওপর এই বিপদ অব্যাহত থাকে। এর সূচনা হয় ২৯৯ হিজরীর যিলহজ্জ মাসে আর পরিসমাপ্তি ঘটে ৫৬৭ হিজরীতে। এই শাসনামলে রাফেযী (ধর্মবিরোধী ও বিকৃত চিন্তাধারার লোক)-দের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাদেরই রাজত্ব চলে। জনসাধারণের ওপর বিভিন্ন রকমের নিবর্তনমূলক ট্যাক্স ও কর আরোপ করা হয়। সিরীয় সীমান্তে বসবাসরত পার্বত্য এলাকার অধিবাসী নুসায়রী ও দ্রুযদের 'আকীদা (ধর্ম-বিশ্বাস) এদেরই কারণে খারাপ ও বিকৃত হয়ে পড়ে। হাশিশীন (ভাঙ ব্যবহারকারী) এদেরই ভেতরকার একটি ক্ষুদে সম্প্রদায়। ঐ সব পার্বত্য এলাকার অধিবাসীদের অজ্ঞতা ও মূর্খতার সুযোগ নিয়েই ইসমা'ঈলী প্রচারক দল তাদের মধ্যে বিকৃত ও ধর্মবিরোধী চিন্তাধারার অনুপ্রবেশ ঘটাতে সক্ষম হয়। এদেরই রাজত্বকালে ফিরিঙ্গীরা সিরিয়া ও জযীরার অধিকাংশ মুসলিম শহরের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করে। আতাবেক খান্দানের ক্ষমতাসীন না হওয়া অবধি এ সিলসিলা অব্যাহত থাকে এবং সুলতান সালাহুদ্দীন-এর ন্যায় মর্দে মুজাহিদ ক্ষমতার বাগডোর হাতে গ্রহণ না করা পর্যন্ত এর পরোপুরি অবসান হয়নি। এই মর্দে মুজাহিদ ইসলামী দেশগলোকে পুনরায় স্বীয় অধিকারে আনয়ন (بازياب) করেন এবং আল্লাহ্‌র বান্দাদের তাদেরই সমগোত্রীয়দের গোলামী থেকে নাজাত দেন।[১]

১. كتاب الروضتين فى اخبار الدولتين ১ম খণ্ড, ২০১ পৃ.।

সাম্রাজ্যের এই বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনে যা এক বিরাট ধর্মীয়, নৈতিক ও চারিত্রিক বিপ্লবের সূচনা করেছিল, সঠিক 'আকীদাসম্পন্ন ও সুন্নাহপ্রেমিক মুসলমানদের হর্ষোৎফুল্ল হয়ে ওঠা ছিল একান্ত স্বাভাবিক। 'আল্লামা মাকদিসী, যাঁর জন্মের মাত্র ২৯ বছর পূর্বে এই বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল এবং যিনি এই বিপ্লবের ফলে সৃষ্ট পরিবর্তন ও প্রভাব প্রত্যক্ষ করেছিলেন, স্বীয় হরষের প্রকাশ ঘটিয়েছেন নিম্নোক্তভাবে : - انقرضت تلك الدولة وزالت عن الإسلام بمصر بانقراضها الذلة

> ('উবায়দীদের) এই রাজত্বের অবসান হ'ল এবং তার সাথে পরিসমাপ্তি ঘটল মিসরের বুকে ইসলামের লাঞ্ছনা ও অবমাননার।[১]

হাফিজ ইবনে ক'য়্যিম তাঁর গ্রন্থে বাতেনী ফির্কার উত্থান, এর প্রভাব, অতঃপর নূরুদ্দীন ও সালাহুদ্দীনের হাতে সে সাম্রাজ্যের পতন সম্পর্কে আলোচনা নিম্নরূপ উদ্দীপনাময়ী ভাষায় করেছেন :

> ঐসব বাতেনীদের দা'ওয়াতের প্রভাব প্রাচ্য ভূ-খণ্ডে স্তিমিত হয়ে পাশ্চাত্য ভূ-খণ্ডে ক্রমশ বাড়তে লাগল, এমন কি তা এক বিরাট শক্তিশালী দা'ওয়াতে পরিণত হ'ল। সে তার শেকড় গভীরে প্রোথিত করল এবং তার পতাকাবাহীরা দূর পশ্চিমের অধিকাংশ শহরের ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করল। তাদের আওতা আরও সম্প্রসারিত হয়ে মিসর অবধি পৌঁছে গেল, এমন কি মিসরের ওপরও তারা জাঁকিয়ে বসল। তারা কায়রো শহরের বুনিয়াদ পত্তন করল। তারা ও তাদের শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের সদস্যরা খোলাখুলিভাবে তাদের দা'ওয়াত অব্যাহত রাখল। এদের যুগেই 'রাসাইল-ই ইখওয়ানু'স-সাফা' প্রণীত হয় এবং ইবন সীনা তাঁর 'ইশারাত', 'শিফা' ও অন্যান্য গ্রন্থ রচনা করেন। খোদ ইবনে সীনা বলেন, "আমার পিতা হাকিম বিল্লাহ্‌র (ফাতিমী খলীফা ও দা'ঈ) একজন প্রচারক ছিলেন।" এই ফাতিমীয়দের যুগে সুন্নাহ্‌র প্রচলন মওকুফ হয়ে গিয়েছিল এবং সুন্নাহর গ্রন্থসমূহ তাকে উঠিয়ে রাখা হয়েছিল। লুকিয়ে চুপিয়ে হয়ত কেউ তা পড়ে থাকবে এবং তদনুযায়ী আমলও করে থাকবে। এই দা'ওয়াতের প্রধান বৈশিষ্ট্য ও বুনিয়াদী নীতি ছিল এই যে, 'আক'ল (বুদ্ধিবৃত্তি) আম্বিয়াই-কিরাম ('আ)- এর প্রতি অবতীর্ণ ওয়াহী ও শিক্ষামালার ওপর অগ্রাধিকার রাখে।
>
> ক্রমান্বয়ে গোটা পশ্চিম ভূ-খণ্ড, মিসর, শাম (সিরিয়া) ও হেজাযের ওপর বাতেনীরা ক্ষমতা গেড়ে বসে। বছরব্যাপী ইরাকের ওপরও তাদের নিয়ন্ত্রণ

---

১. كتاب الروضتين فى اخبار الدولتين ১ম খণ্ড, ২০০ পৃ.।

প্রতিষ্ঠিত ছিল। আহলে সুন্নত ওয়া'ল-জামা'আত তাদের শাসনাধীন এলাকাগুলোতে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে জীবন যাপন করত। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা এই যে, ইসলামী রাষ্ট্রে একজন যিম্মী (আশ্রিত ব্যক্তি) নিরাপত্তা ও 'ইয্যত-আবরূর হেফাজতের ব্যাপারে যে সব অধিকার ভোগ করত– সুন্নত ওয়া'ল-জামা'আতের অনুসারীদের ভাগ্যে তাও ছিল না। কত 'উলামায়ে কিরামকে এই বাতেনীদের হাতে নিহত হতে হয়েছে, আম্বিয়া-ই-কিরাম ('আ)-এর কত উত্তরাধিকারীকে কয়েদখানায় ধুকে ধুকে দুনিয়ার বুক থেকে বিদায় নিতে হয়েছে– কে তার হিসাব রাখে!

শেষাবধি স্বীয় বান্দাদের এই দুরবস্থাদৃষ্টে বোধ করি আল্লাহ্র মর্যাদা ও সম্ভ্রমে আঘাত লাগল। তিনি নূরুদ্দীন ও সালাহুদ্দীনের মাধ্যমে মুসলমানদের বাতেনীদের জলুম-নির্যাতন থেকে মুক্তি দিলেন। বাতেনীদের শাসনাধীন এলাকায় যখন ইসলামের প্রাণবায়ু 'যাচ্ছি, যাই' করছিল তখন এ বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন তার মধ্যে নতুনভাবে প্রাণের সঞ্চার করল, রাহুমুক্ত হ'ল তার সৌভাগ্য-রবি। গোটা মুসলিম জাহান মনের আনন্দে নেচে উঠল। চতুর্দিকে কেবল একটি আওয়াজ গুঞ্জরিত হচ্ছিল, 'ইসলামের এই অগ্নি-পরীক্ষার মুহূর্তে কে আছে এর সাহায্যকারী, কে আছে এর মদদগার'? শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দা ও মুজাহিদ বাহিনী দ্বারা বায়তু'ল-মুকাদ্দাসকে ক্রস পূজারীদের হাত থেকে মুক্ত করান এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা)-এর সাহায্যকারীরা স্ব স্ব হিম্মত ও তওফীক মুতাবিক দীনে হক-কে সাহায্য করার দায়িত্ব সম্পাদন করেন।[১]

ইতিহাস থেকে এটাও জানা যায় যে, মুসলিম জাহান সাধারণভাবে এবং শাম (অধুনা সিরিয়া, লেবানন, জর্দান ও ফিলিস্তীন এলাকা) ও ইরাক বিশেষভাবে এই সংবাদকে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে স্বাগত জানায় এবং সর্বস্তরের জনগণ এতে উল্লাস প্রকাশ করে।[২]

এভাবে সালাহুদ্দীন ক্রুসেডারদের ছুটে আসা উত্তাল তরঙ্গের সামনে প্রতিরোধের পাহাড় সৃষ্টি করে মুসলিম জাহানকে একদিকে যেমন রাজনৈতিক গোলামী, নৈতিক, চারিত্রিক ও সাংস্কৃতিক উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে পরবর্তী কয়েক শতাব্দীর জন্য রক্ষা করেন, অপর দিকে তেমনি 'উবায়দী (ফাতিমী নামে পরিচিত)

---

১. الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ১ম খণ্ড, ২৩৩-৩৪ পৃ.।
২. كتاب الروضتين فى اخبار الدولتين ১ম খণ্ড, ১৯৮-৯৯ পৃ.।

হুকূমতের অবসান ঘটিয়ে এমন একটি ভয়ংকর ফিৎনার উৎস মুখ বন্ধ করে দেন, যা মিসর ভূমি থেকে বহির্গত হয়ে সমগ্র মুসলিম জাহানে বাতেনী ও ইসমা'ঈলী চিন্তাধারার কু-প্রভাব ছড়াবার পাঁয়তারা করছিল। ইসলামের ইতিহাসে সুলতান সালাহুদ্দীনের এই দু'টি স্মরণীয় কীর্তি কখনও বিস্মৃত হবার নয় এবং এই কুর্দী মুজাহিদের বীরত্ব ও আত্মদানের কথা বিশ্বের মুসলমানরা কখনো ভুলতে পারবে না।

দ্বাদশ অধ্যায়

শায়খু'ল-ইসলাম 'ইযযুদ্দীন ইব্ন 'আবদুস সালাম (র)

সুলতান সালাহুদ্দীনের মুজাহিদসুলভ প্রয়াস, ইসলাম ও ধর্মীয় জ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা, স্থানে স্থানে দীনী মাদরাসা কায়েমের কারণে ও শী'আ মতবাদের প্রভাব হ্রাস ও সুন্নী 'আকীদার প্রভাব বিস্তারের ফলে মুসলমানদের জ্ঞান ও কর্মের জগতে এক অভূতপূর্ব প্রাণ-চাঞ্চল্যের সৃষ্টির হয়। 'ইলমে শরীয়তের শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা দান এবং এক্ষেত্রে পরিপূর্ণতা হাসিলের দিকে নতুনভাবে মুসলিম জগতের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। ফলে হিজরী সপ্তম শতাব্দীতে কতিপয় প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে যাঁরা নিজ নিজ সীমারেখায় দা'ওয়াত ও ইসলামের অপরিহার্য দায়িত্ব পালন করেন এবং সে যুগের রাষ্ট্রীয় শক্তির ভুল প্রবণতারও মুকাবিলা করেন। এঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন শায়খু'ল-ইসলাম 'ইযযুদ্দীন ইবনে 'আবদুস সালাম (মৃ. ৬৬০ হি.) যিনি তাঁর জ্ঞান, তাক'ওয়া, সত্য কথন ও নির্ভীকতার ক্ষেত্রে ছিলেন অনন্য। তাঁকে দেখলে ইসলামের প্রথম যুগের বুযুর্গ সাহাবা ও তাবি'ঈদের ছবি হৃদয়পটে ভেসে উঠত।

জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্ব

'ইযুদ্দীন ইবনে 'আবদুস সালাম ৫৭৮ হিজরীতে বর্তমান সিরিয়ার রাজধানী দামিশকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্থানীয় প্রখ্যাত উস্তাদ মশহুর 'আলিম-'উলামার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন। ফখরুদ্দীন ইবনে 'আসাকির, সায়ফুদ্দীন আমেদী, হাফিজ আবু মুহাম্মদ আল-কাসিম ইবনে 'আসাকির-এর মত সে যুগের নামকরা 'আলিমগণ তাঁর উস্তাদ ছিলেন। কতক বর্ণনা অনুসারে তিনি যৌবনে পড়াশোনা আরম্ভ করেন এবং সত্বরই জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তাঁর সমসাময়িক সকলেই তাঁর জ্ঞানবত্তা ও মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়েছেন। 'আল্লামা ইবনে দাকীক আল-'ঈদ তাঁর কতক গ্রন্থে ইবনে সালামকে সুলতানু'ল-'উলামা' খেতাবে স্মরণ করেছেন। ৬৩৯ হিজরীতে তিনি যখন মিসর পৌছেন তখন 'আত-তারগীব ওয়া'ত-তারহীব' নামক গ্রন্থের প্রণেতা হাফিজ 'আবদুল 'আজীম মুনযিরী ফতওয়া প্রদানে অসম্মতি জ্ঞাপন করে বলেন : যে শহরে 'ইযযুদ্দীন ইবনে 'আবদুস সালাম থাকেন সেখানে অন্যদের ফতওয়া দেওয়া

সমীচীন নয়। শায়খ জামালুদ্দীন ইবনু'ল-হাজিব বলেন : ইমাম গাযালী (র) থেকে শায়খ 'ইযযুদ্দীন (র)-এর স্থান অনেক ওপরে।[১]

হাফিজ যাহবী তাঁর 'আল-'ইবার' নামক গ্রন্থে বলেন :

انتهت اليه معرفة المذهب مع الزهد والورع وبلغ رتبة الاجتهاد

তিনি ফিক্'হ বিষয়ক জ্ঞান, যুহ্দ ও আল্লাহ-ভীতিতে ছিলেন শীর্ষস্থানীয় এবং মুজতাহিদের মর্যাদায় তিনি উপনীত হয়েছিলেন।[২]

শায়খ 'ইযযুদ্দীন ইবনে 'আবদুস সালাম দীর্ঘকাল যাবত দামিশকে 'যাবিয়া-ই-গাযালিয়া' নামক স্থানে দর্স প্রদান করেন। উমায়্যা মসজিদে খতীব ও ইমাম পদেও অনেক কাল যাবত তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। শায়খ শিহাবুদ্দীন আবু শামা বলেন ঃ তাঁর কারণে ঐ সব বিদ'আত দূরীভূত হয় যা সে যুগে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি সালাতু'র-রাগাইব ও শবে বরাত[৩] উদ্‌যাপনের প্রকাশ্য বিরোধিতা করেন এবং এগুলো যে বিদ'আত তা যথাযথভাবে প্রমাণ করেন। কতিপয় বিখ্যাত 'আলিমও এ ব্যাপারে নিশ্চুপ ও দ্বিধান্বিত ছিলেন। সুলতান আল-মালিকু'ল-কামিলও এ ব্যাপারে নিশ্চুপ ও দ্বিধান্বিত ছিলেন। সুলতান আল-মালিকু'ল-কামিল তাঁকে দামিশকে কাযীর পদ গ্রহণ করতে অনুরাধ জানান। শায়খ (র) অনেকগুলো শর্তের ভিত্তিতে সে অনুরোধে সাড়া দেন। ঐ সময় তিনি আল-মালিকু'ল-কামিলের পক্ষে দূত হিসাবে একবার বাগদাদে খলীফার দরবারে গিয়েছিলেন।

সুলতানদের সৎ পরামর্শ দান এবং ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণ কামনা

সিরিয়ায় শায়খ ইয্‌যুদ্দীন-এর ব্যক্তিত্ব ছিল এক সেরা ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব। সে যুগের ক্ষমতাসীন সুলতানেরা পর্যন্ত এ ব্যক্তিত্বের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতেন। তিনি আত্মর্যাদাবোধে এত উদ্দীপ্ত ছিলেন যে, কোন বাদশাহের দরবারে

---

১. ত'বাক'াতু'স-শাফি'ঈয়াতু'ল-কুবরা, ৫ম খণ্ড, ৮৩ পৃ.।

২. হু'সনু'ল-মুহ'দ'ারা, সুয়ুতীকৃত, ১ম খণ্ড, ১৪১ পৃ.।

৩. সালাতু'র-রাগাইব, ১২ রাকা'আত নামায যা ২৭শে রজবের রাত্রিতে বিশেষ রীতিতে আদায় করা হয়। এর বিরাট ফযীলতও বর্ণনা করা হয়। ৪৪৮ হিজরীতে এই নামায প্রবর্তন করা হয় এবং অপরাপর বিদ'আতের ন্যায় তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। শায়খ 'ইয্‌যুদ্দীন ইবনে 'আবদুস সালাম কিভাবে এর প্রকাশ ঘটেছিল তার পূর্ণ বিবরণ দান করেছেন। দ্র. ইত্তিহাফু'স-সা'আদাহ-শরাহ ইহ্'য়া, ৪৪৩ পৃষ্ঠা; অনুরূপভাবে শা'বানের ১৫ তারিখের রাত্রে এক শ' রাক'আত নামায বিশেষ রীতিতে পড়া হয়। আহলে সুন্নত ওয়া'ল-জামা'আত এ দু'টোকেই বিদ'আত বলেন। ইবনু'স-সুবকী. একে নিকৃষ্ট বিদ'আত বলেছেন। ইমাম নববী (র) একে মওযূ, মুনকির ও কবীহ' বলেছেন। -ইত্তিহ'াফ, ৩য় খণ্ড, ৪২৫-২৭ পৃ.।

হাযিরা দেওয়া কিংবা শাহী দরবারের লেজুড়বৃত্তি করাকে নিজের জন্য অবমাননাকর মনে করতেন। অবশ্য বাদশাহ্ নিজ থেকে তাঁকে দরবারে উপস্থিত হবার অনুরোধ জানালে তিনি সেখানে গিয়েছেন এবং বাদশাহকে সঠিক পরামর্শ দিয়েছেন। বাদশাহ্র এবং ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণ কামনায় তিনি কখনো পরান্মুখ ছিলেন না।

সুলতান আল-মালিকু'ল-আশরাফ যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত তখন তিনি তাঁর রাজ্যের সর্বোচ্চ পদাধিকারী কর্মচারীকে শায়খ (র)-এর খিদমতে পাঠান এবং তাঁর মাধ্যমে বলেন : আপনার প্রিয়ভাজন মূসা ইব্‌ন আল-মালিকু'ল-'আদিল আবূ বকর আপনাকে সালাম পেশ করছে এবং আপনার সমীপে তাঁর জন্য শুশ্রূষা ও দু'আর আবেদন জানাচ্ছে। সঙ্গে তিনি এও চাইছেন, আপনি তাঁকে এমন কোন উপদেশ দান করুন যা আগামী কাল (কিয়ামতে) আল্লাহ্র দরবারে কাজে আসে। এতদ্‌শ্রবণে শায়খ বললেন : পীড়িতের সেবা-শুশ্রূষা তো শ্রেষ্ঠতম 'ইবাদত। অতঃপর তিনি সুলতানের দরবারে রওয়ানা হন। শায়খ (র)-এর আগমনে সুলতান অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং তাঁর হস্ত মুবারক চুম্বন করেন। এর পূর্বে সুলতান শায়খ (র)-এর ব্যাপারে কতকগুলো ভুল ধারণায় পতিত হয়েছিলেন এবং ঐ কারণে তাঁর প্রতি অসন্তুষ্টও ছিলেন।[১]

সুলতান তাঁর ঐ ভ্রান্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং বলেন : আপনি আমাকে মা'ফ করুন, আমার জন্য দু'আ করুন এবং আমাকে কিছু উপদেশ দিন। এর প্রত্যুত্তরে শায়খ (র) বললেন : ক্ষমা সম্পর্কিত ব্যাপারে আমার বক্তব্য হ'ল, দৈনিক বিছানায় শোবার প্রাক্কালেই আমি আল্লাহ্র বান্দাদের যাবতীয় ভুলভ্রান্তি মা'ফ করে দিয়ে থাকি এবং আমি যখন শুতে যাই তখন আল্লাহ্র কোন বান্দাহ্র

১. মৌলিক ঐক্য সত্ত্বেও হি. ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে আশ'আরী মতবাদ ও হাম্বলী মাযহাবের ভেতর বিরাট মতভেদ দেখা যায় যেরূপ মতভেদ দেখা দিয়েছিল হি. চতুর্থ শতাব্দীতে আহলে সুন্নত ওয়া'ল-জামা'আত ও মু'তাযিলাদের মধ্যে। আশ'আরীপন্থীরা (আল্লাহ্র) গুণাবলীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিতেন এবং এর নিগূঢ় অর্থ খুঁজে বের করতেন। পক্ষান্তরে হাম্বলীরা এর হাকীকত ও শব্দের ওপরই জোর দিতেন। এদের প্রত্যেকেই তাদের খোশকল্পনার ভিত্তিতে একে একটি ধর্মীয় খিদমত এবং সুন্নাহ ও শরীয়তের কল্যাণ সাধন বলে মনে করতেন। কিন্তু পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে এর ওপর অস্বাভাবিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই বিরাট মতভেদের সৃষ্টি হয় এবং স্পর্শকাতরতা ও পারস্পরিক বিদ্বেষ চরমে গিয়ে পৌঁছে। শায়খ 'ইযযুদ্দীন (র)-এর যুগে এ বিতর্ক মারাত্মক আকার ধারণ করে। তিনি জ্ঞানত ও 'আকীদাগত দিক দিয়ে আশ'আরী মতাবলম্বী ছিলেন। অপরদিকে আল-মালিকু'ল-আশরাফ ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী। ফলে সুলতানের মনে শায়খ (র) সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়, সৃষ্টি হয় অভিযোগের। কিন্তু শায়খ (র)-এর এই সাক্ষাৎ এবং তাঁর থেকে বিস্তারিত অবগতি লাভের মাধ্যমে সকল সন্দেহের অপনোদন ঘটে (বিস্তারিত জানতে চাইলে ত'াবাক'াতু'স-শাফি'ইয়্যা, ৫ম খণ্ড, ৮৫৯৫ পৃষ্ঠা দেখুন)।

যিম্মায় আমার কোন হক, দাবি কিংবা অভিযোগ অবশিষ্ট থাকে না, আর আমার বিনিময় সৃষ্ট জীবের পরিবর্তে একমাত্র আল্লাহ্র হাতেই ন্যস্ত থাকে فَمَنْ عَفَى وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ এরপর রইল দু'আ। সুলতানের জন্য আমি তো সব সময়ই দু'আ করি। কেননা ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণ ও সাফল্য সুলতানের সৎ পরামর্শের ওপর অনেকখানি নির্ভর করে। আল্লাহ্ পাক সুলতানকে সে সব বিষয়ে অর্ন্তদৃষ্টি দান করুন যদ্দ্বারা তিনি আল্লাহ্র সামনে মাথা উঁচু রাখতে পারেন। সুলতানের আসক্তি ও আগ্রহের কারণে তাঁকে উপদেশ দান আমার জন্য ওয়াজিব হয়ে গেছে। আমি বলতে চাচ্ছি যে, একদিকে আপনার বিজয় এবং শত্রুর ওপর আপনার প্রাধান্যের উৎসব চলছে, অপর দিকে মুসলিম দেশগুলোতে একের পর এক তাতারীদের অনুপ্রবেশ ঘটছে। তারা জানতে পেরেছে যে, সুলতানের এ সময় আল্লাহ্র দুশমন এবং মুসলমানদের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার ফুরসৎ নেই। কেননা এ মুহূর্তে আপনি আল-মালিকু'ল-কামিলের সঙ্গে যুদ্ধ করতেই বেশী আগ্রহী। তার মুকাবিলা করার জন্য আপনি ছাউনিও ফেলে রেখেছেন। আল-মালিকু'ল-কামিল আপনার ভাই এবং নিকটাত্মীয়ও বটে। আপনার কাছে আমি কেবল এতটুকুই আরয করতে চাই, আপনি আপনার গতিমুখ আপনার ভাইয়ের দিক থেকে সরিয়ে ইসলামের দুশমনদের দিকে ঘুরিয়ে দিন এবং এই অন্তিম সময়ে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা থেকে বিরত থাকুন। আপনি আল্লাহ্র দীনের সাহায্য করবেন এবং তার মস্তক সমুন্নত রাখবেন, এই নিয়ত করুন। যদি আল্লাহ্ সুলতানকে আরোগ্য দান করেন, দান করেন সুস্বাস্থ্য, তাহলে আমরা সুলতানের মাধ্যমে কাফির দুশমনের ওপর জয় লাভের আশায় বুক বাঁধব। এও আশা করব, আপনার আমলনামায় যেন এই সৌভাগ্যের কথা লেখা হয়। আর আল্লাহ্র ফয়সালা যদি অন্য কিছু হয় তবুও আশা করব সুলতান যেন তাঁর নেক নিয়তের বরকত নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার সুযোগ পান। সুলতান বললেন: আল্লাহ্ আপনাকে এই সময়োচিত সতর্কবাণী উচ্চারণ ও নিষ্ঠাপূর্ণ পরামর্শের জন্য কল্যাণকর প্রতিদান দিন। এরপর তিনি তখনই নির্দেশ দিলেন ফৌজের গতিমুখ মিসরের পরিবর্তে (যা ছিল আল-মালিকু'ল-কামিলের অভিমুখী) তাতারীদের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হোক এবং ফৌজ এ স্থান থেকে যাত্রা করে কুসায়রা নামক স্থানে ছাউনি ফেলুক। অনন্তর সেদিনই এ নির্দেশ পালিত হয়। লোকে জানতে পারে যে, তাতারীদের মুখোমুখি হওয়াই এখন সুলতানের ইচ্ছা।

আল-মালিকু'ল-আশরাফ শায়খ (র)-এর নিকট আরও কিছু উপদেশের জন্য আবেদন জানান। এ প্রেক্ষিতে শায়খ (র) জানান : বাদশাহ! তুমি তো এই

অবস্থায়, আর ওদিকে তোমার সাম্রাজ্যের প্রতিনিধি ও কর্মকর্তারা আমোদ-প্রমোদে মত্ত। মদের রাজত্ব চলছে, মানুষ পাপে লিপ্ত হচ্ছে, নিত্য নতুন কর ভারে মুসলমানেরা ন্যুজ দেহ। আল্লাহ্‌র দরবারে সর্বোত্তম যে 'আমল আপনি পেশ করতে পারেন তা'হল এই যে, আপনি সর্বাগ্রে এসব ময়লা-আবর্জনা দূর করুন, নিত্য-নতুন ট্যাক্স ও করারোপ বন্ধ করুন এবং এখনই জুলুম ও নিপীড়নমূলক সব কর্মকাণ্ড থামিয়ে দিন। ফরিয়াদীকে সান্ত্বনা দিন, তার অভিযোগের প্রতিকার করুন। আল-মালিকু'ল-আশরাফ তক্ষুণি এসবের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে নির্দেশ জারী করেন এবং বলেন : আল্লাহতা'আলা আপনাকে এই দীনী খিদমত ও কল্যাণকর দায়িত্ব সম্পাদনের বিনিময়ে মুসলমানদের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন এবং তাঁর অপার মহিমা ও করুণা দ্বারা আমাকে জান্নাতে আপনার সাহচর্য দান করুন। এ কথা বলার সঙ্গেই তিনি শায়খ (র)-কে এক হাজার মিসরীয় দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) প্রদান করেন। কিন্তু শায়খ (রা) উক্ত অর্থ গ্রহণ করতে অসম্মতি প্রকাশ করেন এবং বলেন : আপনার সঙ্গে আমার এ সাক্ষাৎ সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ছিল। পার্থিব কোন বস্তুর বিনিময়ে একে আমি কলুষিত করতে চাই না।

সিরিয়ার বাদশাহ্‌র মুকাবিলায় নির্ভীকতা ও দৃঢ়তা প্রদর্শন

আল-মালিকু'ল-আশরাফের পরবর্তী সুলতান সালিহ ইসমা'ঈল (আবুল খারশ) মিসরের সুলতান আল-মালিকু'স-সালিহ নজমুদ্দীন আয়্যুবের মুকাবিলায় (যিনি সিরিয়ার ওপর হামলা করবেন বলে সুলতান আশংকা করেছিলেন) ফিরিঙ্গীদের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হন এবং সে সাহায্যের বিনিময়ে সায়দা ও ছাকীফ নামক দু'টি শহরসহ কতিপয় দুর্গের অধিকার সমর্পণের পরওয়ানা লিখে দেন। এই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ভিত্তিতে ফিরিঙ্গীরা এতখানি খোলামেলা ও দুঃসাহসী হয়ে গিয়েছিল যে, তারা দামিশ্‌ক থেকেই অস্ত্রশস্ত্র খরিদ করত। বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত হয়ে শায়খ (র) অত্যন্ত মনঃকষ্ট পান যে, ফিরিঙ্গীরা মুসলমানদের শহরে এসে তাদেরই থেকে অস্ত্র খরিদ করবে এবং সেই অস্ত্র দিয়ে মুসলমানদের গর্দান ওড়াবে। অস্ত্র ব্যবসায়ীরা এক্ষেত্রে তাদের করণীয় কি জানতে চাইলে তিনি পরিষ্কার ভাষায় ফতওয়া প্রদান করেন যে, ফিরিঙ্গীদের কাছে অস্ত্র বিক্রি সম্পূর্ণ হারাম। কেননা তোমরা বেশ ভালভাবেই জান যে, এসব অস্ত্র তোমাদের মুসলিম ভাইদের বিরুদ্ধেই ব্যবহৃত হবে। সুলতানের এই কাপুরুষোচিত কর্ম এবং ইসলামের এই লাঞ্ছনা ও অসহায়ত্ব দৃষ্টে শায়খ (র) গভীরভাবে মর্মাহত হন। তিনি খুতবায় বাদশাহ্‌র জন্য দু'আ করা থেকে বিরত থাকেন। এর পরিবর্তে তিনি

উভয় খুতবা শেষ হবার পর অত্যন্ত উৎসাহ ও আবেগের সঙ্গে দু'আ করতে থাকেন, "ইলাহী! ইসলাম ও ইসলামের অনুসারীদের তুমিই সাহায্য কর; মূলহিদ ও ধর্মের দুশমনদের তুমিই লাঞ্ছিত ও অপদস্থ কর।" শায়খ (র) এই মুনাজাত করছিলেন আর সব মুসলমান আবেগ ও অশ্রুসজল কণ্ঠে 'আমীন! আমীন!' বলছিল। সরকারের লোকেরা এ ঘটনাকে অনেক রঙ চড়িয়ে ফলাও করে সুলতানের নিকট বিবৃত করে। ফলে শায়খ (র)-কে গ্রেফতার করবার ফরমান জারী হয়। অনেক দিন তিনি বন্দী থাকেন। কিছু কাল পর তাঁকে দামিশ্ক থেকে বায়তু'ল-মুকাদ্দাসে স্থানান্তরিত করা হয়।

ইতোমধ্যে সুলতান সালিহ্ ইসমা'ঈল, হেম্স-এর শাসনকর্তা আল-মালিকু'ল মনসূর ও ফিরিঙ্গী সম্রাট স্ব স্ব ফৌজ ও সেনাবাহিনীসহ মিসরের উদ্দেশে বায়তু'ল-মুকাদ্দাস আগমন করেন। সালিহ্ ইসমা'ঈলের অন্তরে শায়খ 'ইয্যুদ্দীন (র)-এর অসন্তোষ কাঁটার মত বিঁধত এবং এ ব্যাপারে তিন বেশ চিন্তান্বিত ছিলেন। তিনি তাঁর এক বিশিষ্ট সভাসদকে স্বীয় রূমাল প্রদান করে বলেন : তুমি এই রুমাল শায়খ (র)-এর খিদমতে পেশ করবে এবং অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে তাঁকে বলবে, তাঁকে তাঁর পূর্বের পদমর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া হবে, যদি তিনি তা চান। যদি তিনি এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন তাহলে তাঁকে আমার নিকট নিয়ে আসবে। আর তিনি যদি তা গ্রহণ না করেন তাহলে আমার পার্শ্ববর্তী অন্য তাঁবুতে তাঁকে বন্দী করে রাখবে। আমীর শায়খ (র)-এর সাথে অত্যন্ত বিনয় ও তোষামোদের সুরে কথা বলেন এবং নিজ সম্মান ও শ্রদ্ধা বজায় রাখতে তাঁকে অনুপ্রাণিত করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি এত দূর বললেন যে, তিনি যদি কিছুটা বিনয় সহকারে অন্তত বাদশাহ্র সঙ্গে মিলিত হতে রাযী হন এবং তাঁর হস্ত চুম্বন করেন, তাহলেও ব্যাপারটার একটা সুরাহা হয়ে যেতে পারে এবং তিনি অনায়াসে তাঁর হৃত পদমর্যাদা ফিরে পেতে পারেন। শায়খ (র) এর উত্তরে যা বলেছিলেন, ইতিহাসের পাতায় তা চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। তিনি বলেছিলেন :

والله يا مسكين ما ارضاه ان يقبل يدى فضلا ان يقبل يده - ياقوم انتم فى واد وانا فى واد والحمد لله الذى عافانى مما ابتلاكم به -(طبقات الشافعية - ج ٥ ص ١٠١)

আরে মুর্খ! যে ক্ষেত্রে আমিই রাযী নই যে, বাদশাহ আমার হস্ত চুম্বন করুন, সেক্ষেত্রে আমি বাদশাহ্র হস্ত চুম্বন করব-এটা কি বাতুলতা নয়? লোক সকল! তোমরা এক জগতের অধিবাসী আর আমি অন্য জগতের। আল্লাহ্র যাবতীয় প্রশংসা যে, তোমরা যার হাতে বন্দী, আমি তা থেকে মুক্ত।

এ জওয়াব শ্রবণের পর আমীর বললেন ঃ তাহলে তো আপনাকে গ্রেফতার করতে আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শায়খ (র) বললেন ঃ আনন্দের সঙ্গে তুমি তোমার ওপর অর্পিত নির্দেশ পালন করতে পার। অতঃপর আমীর তাঁকে বাদশাহের তাঁবুর পাশে অন্য একটি তাঁবুতে নিয়ে রাখেন। শায়খ (র) তাঁর তাঁবুতে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করতেন। আর ওদিকে বাদশাহ্ তার তাঁবুর ভেতরে বসে সে তিলাওয়াত শ্রবণ করতেন। একদিন বাদশাহ্ ফিরিঙ্গী রাজাকে বলেন : তুমি শায়খ (র)-এর কুরআন মজীদ তিলাওয়াত শুনতে পাচ্ছ কি? রাজা বললেন, "হাঁ, শুনতে পাচ্ছি।" বাদশাহ্ বললেন : তুমি কি এঁর পরিচয় জান? ইনি হচ্ছেন মুসলমানদের সর্বশ্রেষ্ঠ পাদরী [illegible] । আমি তাঁকে এজন্যই বন্দী করেছি যে, তিনি তোমার কাছে দুর্গ সমর্পণের বিরোধী ছিলেন এবং এ ব্যাপারে তাঁর ভীষণ আপত্তি ছিল। এই অপরাধে আমি তাঁকে দামিশকের মসজিদের খতীব-এর পদসহ অন্যান্য সকল পদ থেকেও অপসারণ করেছি, এমন কি তাঁকে দামিশ্ক থেকে নির্বাসিতও করেছি। অতঃপর তোমার খাতিরেই আমি তাঁকে পুনরায় বন্দী করেছি। খৃস্টান রাজা বললেন, "ইনি যদি আমাদের পাদরী হতেন তাহলে আমরা তাঁর পা ধুয়ে সে পানি পান করতাম।"[১]

ইতিমধ্যে মিসরীয় ফৌজের আগমন ঘটে। যুদ্ধে সালিহ্ ইসমা'ঈলের পরাজয় হয়। ফিরিঙ্গী ফৌজ নিহত ও পর্যুদস্ত হয়। শায়খ (র) সহী-সালামতে মিসরের দিকে রওয়ানা হন।

পথিমধ্যে কির্ক রাজ্য অতিক্রমকালে কির্ক-এর শাসনকর্তা তাঁকে সেখানে বসবাস করার আবেদন জানালে তিনি বলেন : তোমাদের এই ছোট্ট শহর আমার জ্ঞানের ভার বইতে পারবে না।

মিসরে শায়খ 'ইয্যুদ্দীন (র)

মিসরের সুলতান আল-মালিকু'স-সালিহ্ নজমুদ্দীন আতি সমাদরের সঙ্গে তাঁকে গ্রহণ করেন। 'আমর (র) ইবনু'ল-'আস মসজিদের খতীব নিযুক্ত করা হয় তাঁকে। তিনি মিসরের কাযীর পদ আল-ওয়াজহু'ল-কিবলা এবং বিরান প্রায় মসজিদের সংস্কার কর্মের দায়িত্বভারও তাঁর হাতে সোপর্দ করেন। মাদরাসা সালিহিয়া নির্মিত হলে সুলতান তাঁকে শাফি'ঈ মযহাবের শিক্ষক হিসাবে সেখানে

১. তাবাক 'াতু'স-শাফি'ঈয়্যাতু'ল-কুবরা, ৫ম খণ্ড, ১০০-১ পৃ. শায়খ পুত্র শরফুদ্দীন 'আবদুল লতীফ বর্ণিত।

নিযুক্ত করেন। তিনি নিবিষ্ট চিত্তে শিক্ষা দান ও জ্ঞানের প্রচার-প্রসারের দায়িত্ব আঞ্জাম দেন।

শায়খ (র)-এর স্পষ্ট ভাষণ ও নির্ভীকতা প্রদর্শন

সে সময় একবার শাহী প্রাসাদের মুহতামিম ও কার্যত মিসর সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপক ফখরুদ্দীন 'উছমান মিসরের একটি মসজিদের ছাদের ওপর তবলখানা নির্মাণ করেন। সেখানে তবলা ও কাড়া-নাকাড়া বাজতে থাকে। শায়খ 'ইযযুদ্দীন (র) ঘটনাটি জানতে পেরে (কাযী ও মসজিদসমূহের মুহতামিম হিসাবে) উক্ত গৃহটি ধ্বসিয়ে দেবার নির্দেশ জারী করেন এবং এই অপরাধে ফখরুদ্দীনের সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য বলে ঘোষণা দেন। অবশ্য এই সঙ্গে তিনি বিচার বিভাগীয় পদ থেকে ইস্তিফাও দেন। এই পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে সুলতানের দৃষ্টিতে শায়খ (র)-এর মর্যাদা এতটুকু হ্রাস পায়নি। কিন্তু তিনি তাঁকে তাঁর পদে পুনরায় আর নিয়োগও করেননি। এদিকে শায়খ (র)-এর ফয়সালার ধর্মীয় প্রভাব এত বেশী পরিলক্ষিত হয় যে, সেই যুগেই মিসরের সুলতান আল-মালিকু'স-সালিহ বাগদাদের খলীফার দরবারে একজন দূত প্রেরণ করেন। দূত খলীফার দর্শন লাভ করেন এবং সুলতানের পয়গাম খলীফাকে হস্তান্তর করেন। তখন দূতকে জিজ্ঞাসা করা হয়, এ পয়গাম কি সে স্বয়ং মিসরের সুলতানের মুখ থেকেই পেয়েছে, নাকি অন্য কোন মাধ্যম থেকে? প্রত্যুত্তরে দূত জানায় যে, এ পয়গাম সে শাহী প্রাসাদের মুহতামিম ফখরুদ্দীনের মুখ থেকেই পেয়েছে। তখন খলীফা এই বলে তা প্রত্যাখ্যান করেন যে, ফখরুদ্দীনের সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য নয়। কেননা শায়খ 'ইয্যুদ্দীন তার সাক্ষ্যকে গ্রহণের অযোগ্য বলেছেন। ফল দাঁড়াল এই যে, দূতকে ব্যর্থ হয়ে সে যাত্রা ফিরে আসতে হ'ল। অতঃপর সে সরাসরি সুলতান থেকে পয়গাম গ্রহণ করে পুনরায় বাগদাদে গিয়ে খলীফার কাছে তা পৌঁছিয়ে দিয়ে এল তাঁর সাহসিকতার এর থেকেও বিস্ময়কর ঘটনা ছিল নিম্নরূপ ঃ

> 'ঈদের দিন। দুর্গের ভেতর শাহী দরবার বসেছে। বাদশাহ্ অত্যন্ত জাঁকজমক ও জৌলুসের সঙ্গে সিংহাসনে সমাসীন। দু'সারি ফৌজ কোমর বেঁধে দণ্ডায়মান। আমীর-উমারা যিনি যাঁর মত হাযির হয়ে বাদশাহ্কে আদাব ও তসলীম জানাচ্ছেন এবং আ-ভূমি নত হয়ে কুর্নিশ করছেন। এরূপ একটি ভরা দরবারে আকস্মিকভাবে শায়খ (র) বাদশাহ্র নাম ধরে সম্বোধন করলেন বললেন ঃ আয়্যুব! আল্লাহ্র নিকট কি জওয়াব দেবে যখন তোমাকে জিজ্ঞাস করা হবে, "আমি তোমাকে মিসরের সালতানাত কি এজন্যই দিয়েছিলাম যে

স্বাধীনভাবে মদ পান করা হবে?" বাদশাহ্ বললেন : আসলেই কি ঘটনাটা সত্যি? শায়খ (র) সজোরে বললেন : হাঁ, অমুক শরাবখানায় প্রকাশ্যে মদের ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে। এছাড়া এ ধরনের আরও বহু ঘটনা ঘটছে, অথচ তুমি এখানে বিলাসিতায় মত্ত রয়েছ। প্রত্যুত্তরে বাদশাহ্ জানালেন : জনাবে ওয়ালা! এ ব্যাপারে আমার কোন হাত নেই। এ তো আমার পিতার আমল থেকেই চলে আসছে। জওয়াবে শায়খ (র) বললেন : তাহলে তুমিও সে সব লোকের অন্তর্ভুক্ত যারা এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলত : إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ (এ তো আমাদের বাপ-দাদার আমল থেকেই চলে আসছে)। অতঃপর সুলতান তাৎক্ষণিকভাবে উক্ত শরাবখানা বন্ধের নির্দেশ দেন।

শায়খ (র)-এর একজন শাগরিদ বলেন : দরবার থেকে ফিরে আসার পর আমি আরয করলাম, "হযরত! ঘটনাটা কি?" শায়খ (র) বললেন : আমি বাদশাহকে যখন এরূপ শান-শওকতের সঙ্গে এজলাস করতে দেখলাম তখন আমার আশংকা হ'ল, না জানি বাদশাহ্ এ দৃশ্যে গর্বিত হন, শিকার হন অহমিকা ও দাম্ভিকতার। তাই তাঁর সংস্কার সাধন মানসেই আমি ঐ কথাগুলো বললাম। আমি আরয করলাম : ও কথা বলতে আপনার ভয় হ'ল না! তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র ভয় ও তাঁর মহিমান্বিত মর্যাদা আমার মানস জগতে এমনভাবে উদ্ভাসিত ছিল যে, তার মুকাবিলায় বাদশাহ্‌কে এক বাচ্চা বিড়ালের মতই মনে হচ্ছিল।[১]

ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে জিহাদ

সে সময় ফিরিঙ্গীদের সাথে সংঘর্ষ চলছিল। একবার ফিরিঙ্গী ফৌজ মনসূরা পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং মুকাবিলায় মুসলমানদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। এ জিহাদে শায়খ (র)-ও মুসলমানদের সঙ্গে শরীক ছিলেন। আল্লাহ্ তাঁকে ঘুল্ভজন্দ জক্ষৈন্নশ্হন্ধ হবার সৌভাগ্য দান করেছিলেন। ইবনু'স-সুবকী "ত'াবাক'াত" নামক গ্রন্থে বলেন : তাঁর দু'আয় শেষ পর্যন্ত মুসলমানরা জয় লাভ করেন। বাতাসের গতি হঠাৎ পাল্টে যায় এবং ফিরিঙ্গীদের জাহাজগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে। ফলে অধিকাংশ ফিরিঙ্গীরই সলিল সমাধি ঘটে।[২]

জিহাদের ব্যয় নির্বাহের জন্য শায়খ (র)-এর ইন্তেজাম

সে সময় তাতারী ফৌজ সমগ্র মুসলিম জাহানের ওপর বন্যার বেগে আছড়ে পড়ছিল এবং একাদিক্রমে মুসলিম জনপদগুলো তছনছ করে যাচ্ছিল। এক পর্যায়ে

১. ত'াবাক'াতু'স-শাফি'ঈয়্যা, ৮২ পৃ.; ২. ঐ, ৮৪ পৃ.।

তারা মিসর অভিমুখে তাদের গতিমুখ পরিবর্তন করে। তখন তাতারীদের সম্পর্কে মুসলমানদের মনে যে ভীতি ও আতংকের সঞ্চার হয়েছিল তা ছিল অনেকটা প্রবাদ বাক্যের মত। মিসরবাসীরা এমন হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল যে, সে মুহূর্তে তাদের করণীয় কি তা যেন বুঝতেই পারছিল না, এমন কি মিসরের সুলতানও তাতারীদের মুকাবিলা করার সাহস হারিয়ে ফেলেছিলেন। সেই হতাশাজনক অবস্থায় একমাত্র শায়খু'ল-ইসলাম (র)-ই সকলের মনে সাহসের সঞ্চার করেন। তিনি বলেন : তোমরা আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে বেরিয়ে পড়; তোমাদের জয় লাভ সুনিশ্চিত। এ ব্যাপারে আমি কেবল আশ্বাস দিচ্ছি না, দায়িত্ব গ্রহণ করতেও রাযী আছি। বাদশাহ বললেনঃ আমার রাজকোষে টাকা-পয়সা এ মুহূর্তে কম। ব্যবসায়ীদের থেকে ধার নিতে চাই। শায়খ (র) বললে : বাদশাহ্‌র নিজের মহলে যে সব জওয়াহেরাত আছে, বেগমদের যে সব অলংহার আছে-আগে সেগুলো বের করুন। সাম্রাজ্যের সকল রাজকর্মচারী, আমীর-উমারা ও দরবারীদের বেগমদেরকে তাদের অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থের, অলংকারাদি হাযির করতে বলুন। অতঃপর সে সব ছাঁচে ঢেলে মুদ্রায় পরিণত করুন এবং তা সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করুন। এরপরও যদি আবশ্যক হয় তাহলে কর্জ গ্রহণ করা যেতে পারে, কিন্তু এর আগে কিছুতেই নয়। শায়খ (র)-এর ব্যক্তিত্বের প্রভাব এত বেশী ছিল যে, বাদশাহ ও সালতানাতের আমীর- উমারা কোনরূপ বাদ-প্রতিবাদ ছাড়াই সকল জওয়াহেরাত ও অলংকারাদি শায়খ (র)-এর সামনে এনে হাযির করেন এবং এর দ্বারাই যুদ্ধের যাবতীয় খরচ মেটানো সম্ভব হয়। যুদ্ধে মুসলমানরা জয় লাভ করে।

সালতানাতের আমীরদের নীলাম

শায়খ (র)-এর জীবনে সর্বাধিক বিস্ময়কর ও উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, তিনি সালতানাতের ঐ সব তুর্ক বংশীয় আমীরদের নীলামে চড়িয়েছিলেন যাঁরা ছিলেন, তাঁর মতে, মুসলমানদের সাধারণ ধনাগার বায়তু'ল-মালের সম্পত্তি। কেননা ওদেরকে শরীয়ত প্রদর্শিত পন্থায় আযাদ করা হয়নি। মিসর সালতানাতের ওপর এ সব আমীর-উমরারার ছিল বিরাট প্রভাব-প্রতিপত্তি। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন নায়েবে সালতানাত। শায়খ (র) ফতওয়া দেন ঃ যতক্ষণ পর্যন্ত এসব আমীরকে শরীয়ত প্রদর্শিত পন্থায় মুক্ত করা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এদের সঙ্গে কোনরূপ কায়-কারবারে লিপ্ত হওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে ঠিক হবে না; এরা ক্রীতদাস হিসাবেই বিবেচিত হবে। তাঁর এ ফতওয়ার এরূপ প্রতিক্রিয়া হয় যে, লোকেরা তুর্ক আমীরদের সাথে কায়-কারবারে লিপ্ত হতেও সতর্কতা অবলম্বন

করতে থাকে। ফলে আমীররা বিরাট বিপদের সম্মুখীন হন। তাদের মধ্যে উত্তেজনা ও দুশ্চিন্তা দেখা দেয়। একদিন তারা একত্র হয়ে শায়খ (র)-কে ডেকে পাঠান এবং বলেন : আপনি কি চান? শায়খ (র) বললেন : আমি একটি মজলিস ডাকব এবং বায়তু'ল-মালের পক্ষ থেকে আপনাদের নীলামে চড়াব। শর'ঈ তরীকায় অতঃপর আপনাদেরকে আযাদীর পরওয়ানা প্রদান করা হবে। এতদ্‌শ্রবণে তারা সুলতানের নিকট আরয পেশ করেন : শায়খ আমাদেরকে অপদস্থ করতে চান এবং তারই জের হিসাবে আমাদের প্রকাশ্য নীলামে ওঠাতে বলছেন। বাদশাহ্ শায়খ (র)-কে কোন রকম মানিয়ে নিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু শায়খ তাঁর অভিমত থেকে পিছু হটতে রাযী হননি। উভয়ের মধ্যে আলোচনাকালে বাদশাহ্‌র মুখ থেকে এমন কিছু কথা বেরিয়ে পড়ে যা ছিল শায়খ (র)-এর মর্যাদার পরিপন্থী। বাদশাহ্ বলেছিলেন : এসব ব্যাপারের সঙ্গে শায়খ (র)-এর কি সম্পর্ক? তিনি আমীর-উমারার ব্যাপারে নাক গলাতে যাচ্ছেন কেন? এতদ্‌শ্রবণে শায়খ (র) এত অসন্তুষ্ট হন যে, তখন তখনই তিনি মিসর থেকে হিজরত করতে মনস্থ করেন। তিনি তাঁর সব মাল-সামান পশুর পিঠে চাপান এবং পশুর সংখ্যা কম থাকায় ঘরের লোকদের পালাক্রমে সেগুলোর ওপর চড়িয়ে অজানার উদ্দেশে রওয়ানা হন।

তাঁর রওয়ানা হবার সংবাদ প্রচারিত হবার সাথে সাথে কায়রো শহরে যেন এক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। উলামা, নেককার, বুযুর্গ, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ীসহ শহরের মুসলিম অধিবাসীদের এক বিরাট অংশ নিজেদের ঘরবাড়ী ছেড়ে তাঁর পিছু পিছু রওয়ানা হয়ে পড়ে। সুলতান বিষয়টি অবহিত হন। কেউ সুলতানকে গিঁয়ে বলেছিল : জেনে রাখুন,শায়খ 'ইয্‌যুদ্দীন চলে গেলে আপনার রাজত্বের পতন কালও ঘনিয়ে আসবে। অগত্যা সুলতান নিজেই অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে শায়খ (র)-এর সমীপে গিয়ে পৌঁছেন এবং বুঝিয়ে-সমঝিয়ে তাঁকে শহরে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। সিদ্ধান্ত হয় যে, সালতানাতের আমীরদের তিনি নীলাম করবেন। এতদ্‌শ্রবণে সালতানাতের নায়েব (ভাইসরয় বা রাজপ্রতিনিধি) অত্যন্ত তোষামোদের সুরে তাঁকে এই কাজ থেকে নিবৃত্ত রাখতে চেষ্টা করেন। কিন্তু শায়খ (র) তাঁর মতে ছিলেন অটল। এতে নায়েব ক্রোধান্বিত হয়ে বলেন : দেখি, শায়খ আমাদের কিভাবে নীলাম করেন? আমরা দেশের শাসক। আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলছি, আমি এই তলোয়ার দিয়ে তাঁর গর্দান উড়িয়ে দেব। এই বলে তিনি তার আমলা-কর্মচারী সহযোগে সোজা শায়খ (র)-এর দরজায় গিয়ে হাযির হন। খোলা তলোয়ার ছিল তার হাতে। এমতাবস্থায় তিনি দরজায় করাঘাত করেন। শায়খ

(র)-এর পুত্র বাইরে এসে দেখতে পান, নায়েব-ই-সালতানাত খোলা তরবারি হাতে তাঁদের দরজা মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি ভেতরে গিয়ে তাঁর পিতাকে এ অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেন। শায়খ (র) বেপরোয়া ভঙ্গীতে জওয়াব দেন : বৎস, তোমার পিতার এত বড় সৌভাগ্য কোথায় যে, আল্লাহ্র রাস্তায় শহীদ হবেন, এই বলে তিনি বাইরে বেরিয়ে আসেন। তিনি বেরিয়ে আসতেই নায়েবে সালতানাতের হাত থেকে তলোয়ার মাটিতে খসে পড়ে এবং তার দেহে কম্পন দেখা দেয়। তিনি কান্নাজড়িত কণ্ঠে শায়খ (র)-কে বলেন : প্রভু! আপনার অভিপ্রায় কি? "তোমাদের নীলামে চড়িয়ে বিক্রি করব"-এই ছিল শায়খ (র)-এর একমাত্র জওয়াব। নায়েব আবার জিজ্ঞেস করলেন, "আমাদের মূল্য কি কাজে লাগাবেন?" তিনি বললেন, "মুসলমানদের কাজে।" "এর দাম কে দেবে?" নায়েবের জিজ্ঞাসা। "আমি নিজেই"-এই ছিল শায়খ (র)-এর উত্তর। নায়েব বললেন, "ঠিক আছে।" অতঃপর এক এক করে শায়খ (র) সমস্ত আমীরকেই নীলাম করেন। সবার ক্ষেত্রেই ডাক ওঠে। শায়খ (তাঁদের সম্মান ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে) উঁচু দামই হেঁকেছিলেন। যা হোক, তিনি আমীরদের চড়া দামে বিক্রি করে সে অর্থ সৎ কাজে ব্যয় করেন। আমীররা সেদিন নিজ নিজ মূল্য পরিশোধ করেই তবে যে যার বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করতে পেরেছিলেন।[১]

ইবনু'স-সুবকী বলেনঃ এ ধরনের ঘটনা আর কারো জীবনে ঘটেছে বলে শোনা যায়নি। একজন 'আলিমের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও মর্যাদার এ ছিল এক চূড়ান্ত উদাহরণ।

শায়খ 'ইয্যুদ্দীন ও মিসরের সুলতানকুল

শায়খ (র)-এর জীবদ্দশায়ই মিসরে বিরাট পরিবর্তন সংঘটিত হয়। তিনি যখন মিসরে এসেছিলেন তখন ছিল আয়্যুবী শাসনামল। সুলতান সালাহুদ্দীনের বংশধরগণ তখন রাজত্ব করছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায়ই এই বংশের পতন হয়। আল-মালিকু'স-সালিহ্ নজমুদ্দীন আয়্যুব-এর স্থলবর্তী আল-মালিকু'ল-মু'আজ্জাম তূরান শাহের পর তুর্কী বংশীয় আমীরদের শাসনামল শুরু হয়। তারা সবাই শায়খ (র)-এর গুণগ্রাহী এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, বিশেষত মিসরের খ্যাতিমান তুর্ক সুলতান আল-মালিকু'জ-জাহির বায়বার্স শায়খ (র)-কে অত্যন্ত ভক্তি করতেন এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব দ্বারা তিনি বেশ প্রভাবান্বিত ছিলেন। শায়খ (র)-এর পরামর্শেই তিনি বাগদাদের পতন এবং 'আব্বাসী খিলাফতের অবসানে বাগদাদের শেষ

১. ত'বাক'াতু'স-শাফি'ঈয়্যাতু'ল-কুবরা, ৫ম খণ্ড, ৮৪-৮৫ পৃ.।

খলীফা মুস্তা'সিমের চাচা আবুল কাসিম আহমদকে (যাঁর উপাধি ছিল আল-মুস্তানসির) ৬৫৯ হি./১২৬১ খ্রিস্টাব্দে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে মিসরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। প্রথমে শায়খ 'ইয্‌যুদ্দীন তাঁর হাতে বায়'আত করেন। অতঃপর বায়'আত করেন আল-মালিকু'জ-জাহির বায়বার্স, কাযীউ'ল-কুযাত তাজুদ্দীন প্রমুখ।[১]

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

শায়খ (র) শুধু একজন বিরাট জ্ঞানী, মর্যাদাশীল বা পরাক্রমশালী ব্যক্তিই ছিলেন না, সেই সাথে ছিলেন যারপরনাই দয়ার্দ্রচিত্ত, দানশীল ও উদারহৃদয়। কাযীউ'ল-কুযাত বদরুদ্দীন ইব্‌ন জিমা'আ বলেন : দামিশকে অবস্থানকালে একবার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং বাগ-বাগিচা অত্যন্ত সস্তা দামে বিক্রি হতে থাকে। তখন শায়খ (র)-এর সহধর্মিণী তাঁকে একটি গহনা দিয়ে বলেন : এটি বিক্রি করে তা দিয়ে গ্রীষ্মকাল কাটাবার উপযোগী একটি বাগান খরিদ করুন। কিন্তু শায়খ উক্ত গহনা বিক্রি করে তার সমস্ত মূল্যটাই খয়রাত করে দেন। তিনি বাগান খরিদ করেছেন কিনা সে সম্পর্কে বেগম সাহেবা জানতে চাইলে তিনি প্রত্যুত্তরে জানান, "হ্যাঁ! তবে এখানে নয়, জান্নাতে। আমি দেখতে পেলাম লোকে অভাব-অনটনের কারণে খুবই কষ্টের মাঝে কাল কাটাচ্ছে। তাই আমি তোমার গহনার অর্থ তাদের মধ্যেই বিলি করে দিয়েছি।" "আল্লাহ আপনাকে এর উত্তম প্রতিদান দিন"-এ ছিল তাঁর সুযোগ্য সহধর্মিণীর জওয়াব।

শ্রদ্ধেয় কাযীউ'ল-কুযাত এও বর্ণনা করেছেন যে, শায়খ (র) অভাব-অনটন সত্ত্বেও অত্যন্ত মুক্তহস্ত ও উদার হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। এমনও দেখা গেছে যে, তাঁর নিকট দেবার মত কিছু না থাকলে তিনি আপন পাগড়ীটি টুকরো টুকরো করে অভাবীদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছেন।

শায়খ 'ইযযুদ্দীন কেবল সুলতানদের মুকাবিলায়ই নয়, বরং নিজের ব্যাপারেও নির্ভীক ও স্পষ্টভাষী ছিলেন। ইবনু'স-সুবকী ও 'আল্লামা সুয়ূতী বর্ণনা করেন, "একবার মিসর অবস্থানকালে তাঁর দেয়া একটি ফতওয়ায় ভুল ধরা পড়ে। তিনি তক্ষুণি প্রকাশ্যে ঘোষণা দেন : ইবনে 'আবদুস সালাম যাকে অমুক ফতওয়াটি দিয়েছেন তিনি যেন সেটার ওপর 'আমল না করেন। কেননা ফতওয়াটি ভুল ছিল।"

---

১. হু'সনু'ল-মুহ'দ'ারা, ২ খণ্ড, ৪৯ পৃ.।

ইবনু'স-সুবকীর বর্ণনায় জানা যায় যে, শায়খ শুধু 'ইলমে জাহিরীতে নয়, বরং 'ইলমে বাতেনীতেও গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।[১] তাঁর ঈমান, ইয়াকীন, আল্লাহ্‌র প্রতি আস্থা ও নির্ভরতা, নিঃশংকচিত্ততা, বীরত্ব, পার্থিব ক্ষমতায় ক্ষমতাবানদের প্রতি নিস্পৃহতা প্রভৃতি থেকেই এর পরিচয় মেলে। অধিকন্তু ইবনু'স-সুবকী তাঁর "ত'াবাক'াত" গ্রন্থে পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন : তিনি (শায়খ) তরীকতের ইমাম শায়খ শিহাবুদ্দীন সুহ্‌রাওয়ার্দী (র) থেকে 'ইল্‌মে মা'রিফতে সবক নিয়েছিলেন এবং হযরত সুহরাওয়ার্দী (র)-এর তরফ থেকে তিনি লোকদের হিদায়াত ও তরবিয়তের ব্যাপারে অনুমতিপ্রাপ্ত ছিলেন।[২] সুয়ুতী শায়খ আবুল হাসান শাযিলী (র)-এর সঙ্গে তাঁর (ইবনে 'আবদুস সালামের)-সাক্ষাৎ ও তৎকর্তৃক উপকৃত হবার কথাও উল্লেখ করেছেন।[৩]

আমরু বি'ল-মা'রূফ ওয়া নাহী 'আনি'ল-মুনকার সম্পর্কে শায়খ (র)-এর নীতি

শায়খ (র) তাঁর জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে আমরু বি'ল-মা'রূফ ওয়া নাহী 'আনি'ল-মুনকার তথা সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ– এই নীতির ওপর অটল ছিলেন। তাঁর মতে, এ দায়িত্ব সম্পাদন করা 'উলামায়ে কিরামের ওপর ফরয। তিনি এও বলতেন, এই অপরিহার্য দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যে বিপদ-আপদ আসবে, 'উলামায়ে কিরামকে তা বরদাশ্‌ত করতে হবে এবং সব ধরনের মুসীবত সইবার জন্য তাঁদেরকে তৈরী থাকতে হবে।

সুলতান আল-মালিকু'ল-আশরাফের নামে প্রেরিত এক পত্রে তিনি বলেন ঃ

وبعد ذلك فانا نزعم اننا من جملة حزب الله وانصار دينه وجنده وكل جندى لايخاطر بنفسه فليس بجندى –

আমাদের দাবি এই যে, আমরা আল্লাহ্‌র দল, তাঁর দীনের মদদগার ও তাঁরই সেনাদল। যে সেনাদল বিপদের মুখোমুখি হতে ভয় পায় তারা কোন সেনাদলই নয়।

তিনি বিশ্বাস করতেন, 'ইল্‌ম বা জ্ঞান এবং ভাষা ও সাহিত্য হ'ল একজন 'আলিম বা জ্ঞানীর হাতিয়ার। অতএব, তাঁদের জিহাদ হ'ল এ দুটো হাতিয়ারকে হক বা সত্যের সমর্থনে এবং বাতিল তথা মিথ্যা ও অসত্যের বিরোধিতায়

১. হু'সনু'ল-মুহ'দ'ারা, ১ম খণ্ড, ১৪২ পৃ.।
২. ত'াবাক'াত, ৫ম খণ্ড, ৮৩ পৃ.।
৩. হু'সনু'ল-মুহ'াদ'ারা, ১৪২ পৃ.।

নিয়োজিত করা। অপর এক চিঠিতে তিনি লেখেন ঃ

قد امرنا الله بالجهاد فى نصرة دينه الا ان سلاح العالم علمه ولسانه كما ان سلاح الملك سيفه وسنانه – فكما لا يجوز للملوك اغماد اسلحتهم عن الملحدين والمشركين لا يجوز للعلماء اغماد السنتهم عن الزائفين والمبتدعين .

আল্লাহতা'আলা আমাদেরকে দীনের সাহায্যের জন্য জিহাদ বা সংগ্রাম চালিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়েছেন। আর এটা পরিষ্কার কথা যে, 'আলিমের হাতিয়ার হ'ল তাঁর জ্ঞান, তাঁর ভাষা ও সাহিত্য, যেমন একজন বাদশাহ্‌র হাতিয়ার হ'ল তাঁর তলোয়ার ও তীর-ধনুক। বাদশাহ্‌র পক্ষে তলোয়ার খাপে পুরো রাখা যেমন সমীচীন নয়, তেমনই 'আলিম-'উলামার পক্ষে বাতিল, গোমরাহ ও বিদ'আতীর বিরুদ্ধে নিশ্চুপ থাকা জায়েয নয়।[১]

তাঁর মতে, আম্‌র বি'ল-মা'রূফ ওয়া নাহী 'আনি'ল-মুনকার তথা সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ-এর ক্ষেত্রে একজন 'আলিম-ই-রব্বানীকে সর্বপ্রকারের বিপদ-আপদ বরদাশ্‌ত করবার জন্য তৈরী থাকতে হবে অর্থাৎ তিনি সে সব 'আলিম-'উলামার দলে ছিলেন না, যাঁরা বিপদ-আপদের মুখোমুখি হওয়াকে অনুচিত বলে মনে করেন, যাঁরা তাঁদের সমর্থনে দলীল হিসেবে কুরআনের আয়াত :

وَلاَ تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلى التَّهْلُكَةِ .

"তোমরা নিজেদের ধ্বংসের মাঝে নিক্ষেপ ক'র না" পেশ করেন। তাঁদের ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য তিনি বলেছেন :

والمخاطرة بالنفوس مشروعة فى اعزاز الدين ولذلك يجوز للبطل من المسلمين ان ينغمر فى صفوف المشركين وكذلك الخاطرة بالامر بالمعروف والنهى عن المنكر ونصرة قواعد الدين بالحجج والبراهين مشروعة فمن خشى على نفسه سقط عنه الوجوب وبقى الاستحباب ومن قال بان التعزيز بالنفوس لا يجوز فقد بعد عن الحق ونأى عن الصواب وعلى الجملة فمن اثر الله على نفسه أثره الله ومن طلب رضا الله بما يسخط الناس رضى الله عنه وارضى عنه الناس ومن طلب رضا الناس بما يسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس وفى رضا الله كفاية عن رضا كل احد –(طبقات ج ٥ صـ ٩١)

১. ত'বাক'াতু'স-শাফি'ঈয়্যাতু'ল-কুবরা, ৫ম খণ্ড, ৯-১২ পৃ.।

দীনের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য নিজের জীবনকে বিপদের মুখে নিক্ষেপ করা ধর্মের দৃষ্টিতে সিদ্ধ। মুসলিম যোদ্ধার পক্ষে (নিজের জীবন বিপন্ন করে হলেও) মুশরিক সেনা ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করা জায়েয। ঠিক তেমনি আম্‌র বি'ল-মা'রূফ ওয়া নাহী 'আনি'ল-মুনকার এবং দলীল-প্রমাণ সহযোগে ধর্মীয় নিয়ম-নীতিকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে নিজেকে বিপদের মাঝে নিক্ষেপ করা সিদ্ধ। অবশ্য এটা করতে গিয়ে কেউ যদি তার জীবন বিপন্ন মনে করে তবে সে এর অপরিহার্য বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত থাকবে। তবে মুস্তাহাব হিসাবে এ দায়িত্ব অবশিষ্ট থাকবে। যাদের ধারণা যে, জীবন বিপন্ন করা আদৌ জায়েয নয় তারা সত্য থেকে বহু দূরে সরে গেছে এবং তাদের এ ধারণা মোটেই সঠিক নয়। সারকথা এই যে, যে আল্লাহ্‌কে নিজের মুকাবিলায় অগ্রাধিকার দান করবে, আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করবে, আল্লাহ্ স্বয়ং তার ওপর সন্তুষ্ট হবেন এবং অন্য লোককেও তার প্রতি সন্তুষ্ট রাখবেন। যারা আল্লাহ্‌কে নারায করে মানুষকে রাযী রাখতে চেষ্টা করে, আল্লাহ তাদের ওপর অসন্তুষ্ট হন এবং মানুষকেও তার প্রতি নারায করে দেন। আর সবার সন্তুষ্টির মুকাবিলায় শুধু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিই যথেষ্ট।-তাবাকাত, ৫ম খণ্ড, ৯১ পৃ.।

আরব কবি কত সুন্দরই না বলেছেন ঃ

فليتك تحلو والحياة مريرة + وليتك ترضى والانام غضاب

হায়! তোমার প্রেমের স্বাদ যদি আমি লাভ করতে পারতাম তাহলে জীবন যত তিক্তই হোক, আমি বিন্দুমাত্রও পরওয়া করতাম না। তোমার সন্তুষ্টির বিনিময়ে গোটা পৃথিবীর অসন্তুষ্টিও তুচ্ছ।

তাঁর জীবন সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি তাঁর সারাটা জীবন এই বিশ্বাসে অটল ছিলেন এবং এ পথেই তিনি চলতে চেষ্টা করেছেন। আম্‌র বি'ল-মা'রূফ ওয়া নাহী 'আনি'ল-মুনকার-এর ক্ষেত্রে এবং তাঁর মতে ভুল ও শরীয়তবিরোধী কোন কিছু প্রত্যাখ্যান করতে জান-মাল, সহায়-সম্পদ, মান-সম্মান ও পদ মর্যাদা, এমন কি স্বদেশ পরিত্যাগ করতেও কোন আপত্তি নেই।

শায়খ (র)-এর রচনাবলী

শায়খ (র) যেমন একজন সফল মুদাররিস, সূক্ষ্ম দৃষ্টির অধিকারী ফকীহ ও গভীর পাণ্ডিত্যসম্পন্ন মুফতী ছিলেন, ঠিক তেমনি ছিলেন একজন প্রবীণ খ্যাতনামা লেখকও। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে 'আল-ক'ওয়াইদু'ল-কুবরা' ও 'কিতাবু মাজাযু'ল-

কু'রআন' বিশেষ মর্যাদার দাবিদার। ইবনু'স-সুবকী বলেন :

وهذان الكتابان شاهدان بامامته وعظيم منزلته فى علوم الشريعة .

এ দু'টি গ্রন্থ তাঁর রচনাশক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ও 'ইলমে শরীয়তে তাঁর পাণ্ডিত্য ও মর্যাদার সাক্ষ্য দেবে।[১]

এ দু'টি গ্রন্থের বক্তব্য তিনি দু'টি আলাদা পুস্তকে সংক্ষিপ্তাকারে পেশ করেছেন। তাঁর আরও দু'টি কিতাব 'শাজারাতু'ল-মা'আরিফ' ও 'আদ্দালাইলু মুতা'আল্লাক'াতু বি'ল-মালাইকা ওয়া'ল-ইনসু 'আলায়হিম'-এরও তিনি বিশেষ তা'রীফ করেছেন। তাঁর 'মাক'াসি'দু'স-সা'লাত' নামক গ্রন্থটি তাঁরই জীবনদ্দশায় জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং লোকেরা তার হাযার হাযার কপি করিয়ে নেয়।[২] ছোট-বড় রচনা ছাড়াও তাঁর দেয়া ফতওয়ার একটি বিরাট সংকলন রয়েছে। শাফি'ঈ মাযহাবের এটি একটি মূল্যবান সম্পদ।

ইমাম গাযালী (র)-এর পরে শায়খ 'ইযযুদ্দীন সম্ভবত দ্বিতীয় 'আলিম ও গ্রন্থকার যিনি বিশেষভাবে শরীয়তের বিধি-বিধানের পেছনের উদ্দেশ্য ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং শরীয়তের রহস্য ও গুপ্তভেদগুলো বর্ণনা করেছেন। এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক তিনি হচ্ছেন শায়খু'ল-ইসলাম শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (র)। তিনি তাঁর হু'জ্জাতুল্লাহি'ল-বালিগ'া' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর পূর্বসুরি তিনজন লেখক হু'জ্জাতু'ল-ইসলাম ইমাম গাযালী, আবূ সুলায়মান খাত্তাবী ও শায়খু'ল-ইসলাম 'ইযযুদ্দীন (ইবনে 'আবদুস সালাম)-এর নাম উল্লেখ করেছেন।[৩]

ওফাত

৬৬০ হিজরীর ৯ই জুমাদা আল-উলা. ৮৩ বছর বয়সে শায়খ ইবনে 'আবদুস সালামের ওফাত হয়। সময়টা ছিল সুলতান আল-মালিকু'জ-জাহির বায়বার্স-এর রাজত্বকাল। শায়খ (র)-এর ওফাতে তিনি খুবই ব্যথা পান। তিনি বলতেন, "আল্লাহ্‌র কী শান! শায়খ (র)-এর ওফাত আমার শাসনামলেই নির্ধারিত ছিল।" জানাযায় দরবারের আমীর-উমারা, সাম্রাজ্যের গণ্যমান্য সদস্যবর্গ ও শাহী ফৌজ শরীক ছিল। সুলতান নিজ কাঁধে খাটিয়া বহন করেছিলেন এবং দাফন কর্মে শরীক

১. ত'াবাক'াতু'স-শাফি'ঈয়্যাতু'ল-কুবরা, ৫ম খণ্ড, ১০৩ পৃ.।
২. ঐ, ৫ম খণ্ড, ৯৮ পৃ.।
৩. হু'জ্জাতুল্লাহি'ল-বালিগ'া, ৪র্থ পৃষ্ঠা।

হয়েছিলেন।

শায়খ (র)-এর জানাযা যখন দুর্গের নিম্নেদেশ দিয়ে অতিক্রম করছিল, সুলতান তখন মানুষের ভীড় দেখছিলেন। এ সময় তিনি তাঁর জনৈক ঘনিষ্ঠ জনকে বলেছিলেন : আজ বুঝতে পারছি, আমার রাজত্ব সুদৃঢ় ও সুসংহত হ'ল। কেননা এই ব্যক্তি ছিলেন মানুষের প্রত্যাবর্তনস্থল। তিনি ইঙ্গিত করলে আমার রাজত্বই চলে যেত। তাঁর ইনতিকালের পর আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ পেলাম।[১]

১. ত'বাক'াতু'স-শাফি'ঈয়্যাতু'ল-কুবরা, ৫ম খণ্ড, ৮৪ পৃ.।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

তাতারী ফিতনা : নবতর সংকটের মুখে ইসলাম

তাতারী হামলা ও তার পটভূমি

হিজরী সপ্তম শতাব্দীতে মুসলিম জাহানের ভাগ্যাকাশে এমন এক আকস্মিক দুর্যোগ দেখা দেয় যার নজীর দুনিয়ার ইতিহাসে বিরল। তাতারী লুটেরা ও ফিতনাবাজদের দুর্বার আক্রমণরূপে প্রাদুর্ভাব হয়েছিল এ দুর্যোগের। তাতারীরা পিপীলিকা ও পঙ্গপালের ন্যায় প্রাচ্য ভূখণ্ড থেকে অগ্রসর হয়ে ছেয়ে ফেলেছিল গোটা মুসলিম জাহান।

বাহ্যত সুলতান 'আলাউদ্দীন মুহাম্মদ খাওয়ারিয্‌ম শাহ্‌র একটি ভুল ও বোকামির জন্যই মুসলমানদের ওপর এ দুর্যোগ নেমে এসেছিল। সুলতান বাণিজ্যোপলক্ষে আগত একদল তাতারী বণিককে (অজ্ঞাত কারণে) হত্যা করেন। চেঙ্গীয খান এর কারণ অবগত হবার উদ্দেশে দূত পাঠান। খাওয়ারিয্‌ম শাহ্ এ দূতকেও হত্যা করেন। এতে করে তাতার সম্রাট চেঙ্গীয খান ক্রোধান্বিত হয়ে প্রথমে খাওয়ারিয্‌ম শাহী সালতানাত, অতঃপর গোটা মুসলিম জাহানকেই তাঁর আক্রমণের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করেন।

কিন্তু কুরআন মজীদে আচার-আচরণের যে পরিণতি এবং বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর উত্থান-পতনের যে চিরন্তন ও বিশ্বজয়ী বিধান পেশ করা হয়েছে, বিশেষ করে সূরা বনী ইসরাঈলে বনী ইসরাইল জাতিগোষ্ঠীর ধ্বংস, গণহত্যা, লাঞ্ছনা ও অপমান এবং বায়তু'ল-মুকাদ্দাসের ধ্বংস ও মর্যাদাহানির যে উপদেশাত্মক কাহিনী বিবৃত হয়েছে[১] তার আলোকে এই বিশ্বব্যাপী দুর্যোগ ও তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের ওপর আপতিত ছোট্ট এই কিয়ামতের মূল কারণ শুধু একজন বাদশাহ্‌র সংকীর্ণ মানসিকতা ও বোকামি ছিল বলে মনে হয় না। এটাও মনে হয় না যে, অত্যন্ত আকস্মিকভাবেই মুসলিম জাহানের ওপর দুর্যোগ প্লাবনের বেগে আছড়ে পড়েছিল এবং একজনের ভুলের কারণে গোটা মুসলিম মিল্লাতকে সেই অশুভ দিনটিকে প্রত্যক্ষ করতে হয়েছিল যার জন্য তারা আদৌ প্রস্তুত ছিল না কিংবা ছিল না আদৌ এর জন্য দায়ী। কুরআন মজীদের উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে যদি যে যুগের মুসলমানদের নৈতিক, চারিত্রিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক

১. সূরা বনী ইসরাঈল-এর ৪র্থ আয়াত থেকে ৭ আয়াত দ্র.।

অবস্থা গভীরভাবে অধ্যয়ন করা হয়, তাহলে এর অন্তরালবর্তী এই সত্য দিবালোকের ন্যায় ফুটে উঠবে যে, এই অশুভ ঘটনা আকস্মিকভাবে মুসলমানদের ওপর আপতিত হয়নি, বরং এর কারণ আরও গভীরে কোথাও রয়েছে। যতটা বুঝেছি এবং যতটা বলা হয়েছে, তার সত্যাসত্য নিরূপণের জন্য আমাদের আরও কয়েক বছর পেছনে ফিরে যেতে হবে এবং সে যুগের মুসলিম সালতানাত ও ইসলামী সমাজের ওপর সংক্ষিপ্ত নজর বুলাতে হবে।

সুলতান সালাহুদ্দীন আয়্যুবীর ওফাতের (হি. ৫৮৯) পর তাঁর বিস্তৃত সাম্রাজ্য তাঁর সন্তান-সন্ততি ও বংশধরদের মধ্যে বন্টিত হয়ে যায়। বিশ্বের অনেক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ও দৃঢ়চেতা শাসকের মত তাঁর সন্তান-সন্ততিও যোগ্য উত্তরসুরি হিসেবে নিজেদের প্রমাণিত করতে পারেনি।[১] দীর্ঘকাল যাবত তারা নিজেদের মধ্যেই লড়াই-ঝগড়ায় লিপ্ত থাকে। এমনও দেখা গেছে যে, তাদের কেউ কেউ নিজেদেরই ভাই ও বংশের লোকদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড শাসক ও ফিরিঙ্গী প্রতিপক্ষের থেকেও সাহায্য নিতে এবং তাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে মিলিত হতে এতটুকু ইতস্তত করেনি। এ সম্পর্কে একটি নমুনা শায়খু'ল-ইসলাম 'ইযযুদ্দীন ইবনে 'আবদুস সালামের আলোচনায় পেশ করা হয়েছে। এই রাষ্ট্রীয় অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা খান্দানী দ্বন্দ্ব ও গৃহযুদ্ধের কারণে সাম্রাজ্যের অধীনস্থ প্রদেশগুলোতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। জনসাধারণ এক অনিশ্চয়তার মাঝে কাল কাটাচ্ছিল। ক্রুসেডার ও ফিরিঙ্গীরা বারবার ঐসব মুসলিম শহরগুলোর ওপর হামলা চালাচ্ছিল যেগুলো সুলতান সালাহুদ্দীন বিরাট কুরবানী ও সংগ্রামের মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে এনেছিলেন। ব্যবস্থাপনা ও চরিত্রগত বিচ্যুতি ও পথভ্রষ্টতা মহামারী ও দুর্ভিক্ষের করাল মূর্তি নিয়ে হাযির হয় এবং মিসরের মত উর্বর ও শস্য-শ্যামল ভূখণ্ডে যা অন্য দেশের জনগণেরও উদর পূর্তির ব্যবস্থা করত, ৫৯৭ হিজরীতে চাচা-ভাতিজা যথাক্রমে আল-মালিকু'ল-'আদিল ও আল-মালিকু'ল-আফযালের মধ্যকার গৃহযুদ্ধের কারণে পরিণত হয় এক মূর্তিমান ভাগাড়ে। সে বছর নীলনদে প্লাবন আসেনি। ফলে মিসরে এমন আকাল দেখা দেয় যে, মানুষ মানুষেরই গোশ্‌ত সিদ্ধ করে ভক্ষণ করে। মৃত্যু এমন সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয় যে, মৃতের কাফনের ব্যবস্থা করাও অসম্ভব হয়ে ওঠে। ঐতিহাসিক আবূ শামার বর্ণনা মুতাবিক কেবল আল-মালিকু'ল-'আদিল (মিসরের সুলতান) তাঁর ব্যক্তিগত তহবিল থেকে একাই এক মাসে দু'লাখ বিশ হাযার মৃত্যের কাফন দিয়েছিলেন।

১. ভারতবর্ষে মহান 'আলমগীর এবং তাঁর 'লাভিষিক্তদের উদাহরণ আমাদের জন্য যথেষ্ট।

অবস্থার শোচনীয়তা এতদূর গিয়ে পৌছেছিল যে, মানুষ মৃতদেহ ও কুকুরের মাংস পর্যন্ত ভক্ষণ করতে শুরু করে; বিপুল সংখ্যক শিশু সন্তানকেও আগুনে ঝলসিয়ে ভক্ষণ করা হয়। এর কদর্যতা এত দূর পর্যন্ত গিয়ে পৌছে যে, নৈতিকতা বা সুরুচি বলে কোন জিনিসের অস্তিত্ব আর বাকি থাকে নি। ঐতিহাসিক ইবনে কাছীরের বর্ণনানুসারে যখন খাবার হিসাবে শিশু ও অল্পবয়স্ক বালক-বালিকা দুর্লভ হয়ে উঠল তখন যে যাকে যেভাবে পেরেছে– ধরে ভুনা করে করে খেয়েছে।[১] আল্লাহ্র চিরন্তন রীতি মুতাবিক আসমানী সতর্কতা জ্ঞাপনের ধারাও ছিল অব্যাহত এবং এমন ধরনের অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে চলেছিল যা তওবা ও সংস্কার-সংশোধনের প্রেরণা সৃষ্টির জন্য ছিল যথেষ্ট। অনন্তর ৫৯৭ হিজরীতেই এক বিরাট ভূমিকম্প দেখা দেয়। এর আওতায় পড়েছিল, বিশেষ করে শাম (আজকের সিরিয়া, লেবানন, ফিলিস্তীন ও জর্দান), তুরস্ক ও ইরাক। এর ফলে ধ্বংসের এমন বিরাট তাণ্ডব ও বিভীষিকা দেখা দিয়েছিল যে, কেবল নাবলুস শহর ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতেই বিশ হাযার মানুষ মাটি চাপা পড়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 'মিরআতু'য-যামান' গ্রন্থের লেখকের বর্ণনামতে (যা অতিশয়োক্তির হাত থেকে মুক্ত নয়) প্রায় এগারো লক্ষ মানুষ এ ভূমিকম্পের শিকার হয়েছিল।

একদিকে অস্বাভাবিক প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাতছানি যা মুসলমানদের তাদের অলস নিদ্রা থেকে জাগ্রত করবার জন্য ছিল যথেষ্ট, আর অন্য দিকে মুসলিম জাহানের বিভিন্ন অংশে গৃহযুদ্ধ ও ভ্রাতৃহত্যার ধারা ছিল অব্যাহত। ৬০১ হিজরীতে একই খান্দানের দুই ব্যক্তি মক্কার আমীর কাতাদাহ্ হুসায়নী ও মদীনার আমীর সালিম হুসায়নীর মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ৬০৩ হিজরীতে যুদ্ধ শুরু হয় ঘুরী বংশ ও খাওয়ারিয্‌ম শাহীর মধ্যে। মুসলমানের হাত মুসলমানেরই রক্তে রঞ্জিত হতে থাকে। অপর দিকে ৬০৪ হিজরীতে ফিরিঙ্গীরা সিরিয়ার বিভিন্ন এলাকায় হামলা শুরু করে। ৬০৭ হিজরীতে জযীরার[২] মুসলিম শাসনকর্তা ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে চক্রান্তে লিপ্ত হয়[৩] এবং ৬১৬ হিজীতে ফিরিঙ্গীরা সামরিক ও প্রতিরক্ষাগত দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মিসরের দিময়াত শহর দখল করে নেয়।

১। বিস্তারিত জানবার জন্য দেখুন-'আল-বিদায়া 'ওয়া'ন-নিহায়া'-১৩শ খণ্ড, ২৬ পৃ. ৫৯৭ হিজরীর দুর্যোগ।

২. দজলা ও ফোরাত নদীর মধ্যবর্তী এলাকা জযীরা নামে পরিচিত। একে بلاد ما بين النهرين ও বলা হয়। এর পশ্চিম-উত্তর অংশ জযীরা নামে খ্যাত এবং দক্ষিণ-পূর্ব অংশ ইরাক নামে মশহুর।

৩. আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, ১৩শ খণ্ড, ৫৯ পৃ.।

এদিকে মুসলিম খিলাফতের কেন্দ্রভূমি দারু'স্-সালাম বাগদাদ বাহ্যিক শান-শওকত, অনারবীয় আচার-অনুষ্ঠান ও অনৈসলামী সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়। খলীফাদের অনুগ্রহভোজী মোসাহেব, চাটুকার, ফররাশ (যে ভৃত্য কার্পেট পাতে ও শয্য ইত্যাদি রচনা করে), সাকী (সুরাবাহী, পানি ও মদ যারা পান করায় কিংবা পরিবেশন করে) ও তোষকখানার মুহতামিম প্রভৃতি পদে নিযুক্ত ব্যক্তিদের (যারা ক্রীতদাস হিসাবে খিলাফতের সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল) সম্পদের কোন লেখা-জোখা ছিল না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, খলীফা আজ-জাহিরের ক্রীতদাস 'আলাউদ্দীন আত্-তাবরিসী আজ-জাহিরীর নিজস্ব সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত বার্ষিক আমদানী ছিল তিন লক্ষ দীনারের মত। বাগদাদে তার প্রাসাদের তুল্য প্রাসাদ আর দ্বিতীয়টি ছিল না। ঠিক একই অবস্থা ছিল মুজাহিদ উদ্দীন আয়বক আদ্দুওয়ায়দার আল-মুস্তানসিরীর সম্পদের। এসব লোক তাদের পুত্র-কন্যার বিবাহ উপলক্ষে যেভাবে উদার হস্তে যৌতুক দিয়েছিল বা উপহারসামগ্রী বন্টন করেছিল তাতে হতবাক হতে হয়। শেষোক্ত জনের জমিদারী থেকে প্রাপ্ত আমদানী ছিল বার্ষিক পাঁচ লক্ষ দীনার। একই অবস্থা ছিল আস-সালাহ্ 'আবদুল গনী ইবনে ফাখির ফররাশের। এ ব্যক্তি মূর্খ হওয়া সত্ত্বেও রাজসিক জীবন যাপন করত। তার মুকাবিলায় 'আব্বাসী সাম্রাজ্যের সর্ববৃহৎ মাদরাসা আল-মুস্তানসিরিয়ার একজন প্রবীণ উস্তায (অধ্যাপক)-এর আয় এত স্বল্প ছিল যে, তা বিশ্বাস করাও কষ্টকর। এঁদের ভেতর যিনি সবচে' বেশী বেতন পেতেন তিনিও মাসিক বারো দীনারের বেশী পেতেন না, অথচ 'আব্বাসী সাম্রাজ্যের একজন আমীর আশ-শারাবীর একজন খাদেমও অপর এক আমীরের শাদী উপলক্ষে চার হাযার দীনার ব্যয় করেছিল। স্বয়ং আমীর শারাবীর পক্ষে উপহার হিসাবে মাওসিল থেকে আনীত একটি পাখী উক্ত আমীরকে দান করা হয়েছিল যার মূল্য ছিল তিন হাযার দীনার।[১]

শান-শওকত প্রদর্শনের জন্য 'ঈদ ও খলীফার অভিষেক উপলক্ষে যে রাজকীয় মিছিল বের হ'ত তাতে গোটা বাগদাদ শরীক হ'ত। এসব উৎসব অনুষ্ঠানে অপরিহার্য ধর্মীয় কর্তব্যগুলো যেভাবে উপেক্ষিত হ'ত তার পরিমাপ করার জন্য কেবল এই একটি উদাহরণই যথেষ্ট যে, ৬৪০ হি. সনে 'ঈদ উপলক্ষে যে শাহী মিছিল বেরিয়েছিল তা রাত্রে গিয়ে শেষ হয়েছিল। লোক এ নিয়ে এত মত্ত হয়ে উঠেছিল যে, 'ঈদের নামায তারা কাযা করেছিল অর্ধ-রাত্রির কিছু পূর্বে।[২] ঠিক তেমনি ৬৪৪ হিজরীতে 'ঈদু'ল-আযহার দিনে বাগদাদের লোকেরা খলীফার

১. সমসাময়িক ইতিহাস গ্রন্থ আল-হ'াওয়াদিছু'ল-জামি'আ এবং আল-মাসজিদু'ল-মাসবুক' দ্র.।
২. আল-হ'াওযাদিছু'ল-জামি'আ, ৬৪০ হিজরীর ঘটনাবলী।

রাজকীয় মিছিল দেখতে শহরের বাইরে বেরিয়েছিল এবং 'ঈদের সালাত তারা আদায় করেছিল ঠিক সূর্য অস্ত যাবার মুহূর্তে।

খলীফাকে অভিবাদন জানাতে ভুমি চুম্বনের সাধারণ রীতি তখন প্রচলিত ছিল। আস্তানা চুম্বন ও যমীনের ওপর নাক রেখে ষষ্ঠাঙ্গে প্রণিপাতের নিয়মও তখন চালু ছিল। সম্পত্তি ছিনিয়ে নেবার ঘটনা ছিল প্রচুর। ঘুষের বাজার ছিল গরম। বাতেনী, ঠগ ও জোচ্চোরদের তৎপরতা খুবই বেড়ে গিয়েছিল। নীতি ও নৈতিকতা-বিহীন কার্যকলাপ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। মন ভোলানো কার্যকলাপের ছিল বেজায় জোর। গান-বাজনার ছিল আধিক্য এবং সম্পদ আহরণ ও পুঞ্জীভূতকরণের প্রতি ছিল মানুষের মাত্রাতিরিক্ত ঝোঁক।[১]

এটা ছিল সেই যুগ যখন তাতারীরা ইরান ও তুর্কিস্তানকে তছনছ করে চলছিল, আর শিকারী পাখীর ন্যায় শ্যেন দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল বাগদাদের দিকেও। ৬২৬ হিজরীর সূচনা সম্পর্কে ঐতিহাসিক ইবনে কাছীর বলেন :

আয়্যূবী রাজবংশ (সুলতান সালাহুদ্দীন আয়্যূবীর বংশের সুলতানগণ) নিজেদের ভেতর গৃহযুদ্ধের সূচনা করে এই হিজরী সনকে স্বাগত জানায়। রাজধানী বাগদাদে বিশৃঙ্খল ও অরাজক অবস্থা এরূপ ছিল যে, ৬৪০ হি. পর্যন্ত প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী খলীফার পক্ষ থেকে হ্জ্জ-এর কোন ইন্তেজামই করা হয়নি; কা'বার গেলাফও বদলানো হয়নি। একুশ দিন পর্যন্ত বায়তুল্লাহ্ শরীফের দেওয়াল মাত্র একেবারে খোলামেলা ও নিরাবরণ থাকে। লোকেরা একে অশুভ 'আলামত হিসাবে ধরে নেয়।

৫৭৫ হিজরীতে আন-নাসির লি-দীনিল্লাহ খিলাফতের আসনে সমাসীন হন। তিনি ছেচল্লিশ বছরের অধিককাল একাদিক্রমে খিলাফত পরিচালনার সুযোগ পান। এত দীর্ঘকাল খিলাফত পরিচালনার সুযোগ অপর কোন 'আব্বাসী খলীফাই পাননি। কিন্তু তাঁর খেলাফত আমলই ছিল 'আব্বাসীয় খিলাফতের সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক যুগ। ঐতিহাসিকগণ কঠোর ভাষায় তাঁর সমালোচনা করেছেন এবং তাঁর আমল-আখলাক তথা তাঁর কার্যকলাপ ও চরিত্রেরও নিন্দা করেছেন। ঐতিহাসিক ইবনে আছীর বলেন ঃ

জনসাধারণের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার ছিল খুবই অত্যাচারমূলক। তাঁর যমানায় ইরাক একেবারে বিরান হয়ে যায়। রাষ্ট্রের অধিবাসীবৃন্দ বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন শহরে গিয়ে ভবঘুরে জীবন কাটাতে থাকে। তিনি তাদের সহায়-সম্পত্তি ছিনিয়ে নেন। তাঁর কার্যকলাপ ছিল পরস্পরবিরোধী। আজ এক কথা বলতেন

দ্র. 'আসরু'শ-শারাবী বি-বাগদাদ, নাজী মা'রূফ প্রণীত, আল-আক'লাম নামক রিসালা, বাগদাদ, মুহারাম

তো কাল অন্য কথা। খেলাধূলা ও আমোদ-প্রমোদের দিকেই ছিল তাঁর যত আকর্ষণ। তিনি যুবক ও সৈনিকদের জন্য এক বিশেষ ধরনের ইউনিফর্ম তৈরি করেছিলেন। কেবল এই ইউনিফর্মধারীদেরই পুরুষোচিত খেলাধূলা, সামরিক কুচকাওয়াজ ও যুদ্ধ মহড়ায় অংশ গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হ'ত। এর ফলে পুরুষোচিত পারদর্শিতা ও সৈনিকবৃত্তি ইরাক থেকে বিদায় নেয়। খেলাধূলার প্রতি খলীফার অস্বাভাবিক আসক্তি সকল সীমা ছাড়িয়ে যায়। ইরানীদের বর্ণনা এই যে, তিনিই সর্বাগ্রে তাতারীদেরকে মুসলিম রাজ্যগুলোর ওপর হামলা করবার প্ররোচনা দিয়েছিলেন[১] এবং এ ব্যাপারে তাদের নিকট পয়গাম পাঠিয়েছিলেন।[২]

৬২২ হিজরীতে আন-নাসির লি-দীনিল্লাহ্ মারা যান। মুস্তানসির বিল্লাহ (হি. ৬২৩-৬৪০) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।[৩] এই খলীফা ছিলেন বেশ দীনদার, পবিত্র স্বভাব, সৎ চরিত্র ও পরিচ্ছন্ন প্রকৃতির। এ ছাড়া আরও অনেক গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী থাকায় তিনি ছিলেন একজন আদর্শ খলীফার প্রতিচ্ছবি। কিন্তু আফসোসের বিষয় এই যে, রাজ্যের ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও সংস্কারের জন্য খুব বেশি সময় তিনি পাননি। ৬৪০ হিজরীতে তাঁর ইনতিকালের পর তৎপুত্র মুস্তা'সিম বিল্লাহ্ খলীফা হন। মুস্তা'সিম বিশুদ্ধ 'আকীদার অধিকারী, দীনদার ও সংযমী খলীফা ছিলেন। তিনি কখনো মদ কিংবা হারাম জাতীয় কোন কিছুর ধারে কাছেও যাননি। তিনি প্রতি মাসের সোমবার ও বৃহস্পতিবার এবং গোটা রজব মাসব্যাপী সিয়াম পালন করতেন। কুরআনের হাফেজ ছিলেন। সময়মত সালাত আদায়ের ব্যাপারে তিনি কঠোর নিয়ম মেনে চলতেন। কিন্তু ঐতিহাসিক ইবনে আছীরের ভাষ্যানুযায়ী স্বভাবের দিক দিয়ে তিনি প্রয়োজনাতিরিক্ত কোমল ছিলেন এবং তাঁর মেধাও তত প্রখর ছিল না। ধন-সম্পদের বেলায়ও তিনি কিছুটা লোভী ও কৃপণ স্বভাবের ছিলেন।

৬৪২ হিজরীতে ইবনু'ল-'আলকামী 'আব্বাসী খিলাফতের উযীরে আজম নিযুক্ত হন।[৪] এ সময় থেকেই সাম্রাজ্যের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা শুরু হয়। ৬৫৫ হিজরীতে বাগদাদে শী'আ-সুন্নীর বিরাট দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এ সময় শী'আদের বাড়ি-ঘর, এমন কি ইবনু'ল-'আলকামীর আত্মীয়-বান্ধবদের বাড়ি-ঘরও লুণ্ঠিত হয়।[৫] এসব ঘটনাদৃষ্টে তার মনে অশুভ কল্পনার ছায়াপাত ঘটা কিংবা প্রতিশো

১. খাওয়ারিযম সাম্রাজ্যের শক্তি গুঁড়িয়ে দেবার জন্য তিনিই তাতারীদের উস্কানি দিয়েছিলেন। খলীফার সঙ্গে সুলতানের সম্পর্কের অবনতিই এই উস্কানির কারণ।
২. কামিল, ১২শ খণ্ড, ১৮১ পৃ.।
৩. দ্র. আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, ১৩শ খণ্ড, ১৫৯ পৃ.।
৪. পূর্ণ নাম মুওয়ায়্যিদুদ্দীন আবূ তালিব মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন 'আলী মুহাম্মদ আল-'আলকামী।
৫. আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, ১৩শ খণ্ড, ১৯৬ পৃ.।

স্পৃহা জাগ্রত হওয়া অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। সে মুহূর্তে তাতারী বিপদ বাগদাদের প্রবেশ পথে তার আগমনী সংকেত দিচ্ছিল। একদিকে তাতারী সেনাবাহিনী বাগদাদ অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিল, অন্য দিকে উযীর ইবনু'ল- 'আলকামীর পরামর্শ ও নির্দেশে বাগদাদে সেনাবাহিনীর সংখ্যাশক্তি বিপুলভাবে হ্রাস করা হয়। এমন কি অশ্বারোহী বাহিনীর সদস্য সংখ্যাও দশ সহস্রে নামানো হয়। বাকী সৈন্যদেরকে বিদায় করে দেওয়া হয়। তাদের পদগুলো বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। ফলে ঐ সব সৈনিকের অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যে, তাদেরকে বাজারে ও মসজিদের দরজায় ভিক্ষা করে ফিরতে দেখা যায়। কবিগণ ইসলামের এই দুর্দশা-দৃষ্টে শোকগাথা রচনা করেন।[১] মুস্তা'সিম ব্যক্তিগতভাবে যদিও চরিত্রবান ও সৎ কল্পনার অধিকারী খলীফা ছিলেন এবং রাজ্যের ব্যাপক সংস্কার ও উন্নতির অভিলাষী ছিলেন, কিন্তু যুগের বিপর্যয়, সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও শাসন কর্তৃত্বে সমাসীন ব্যক্তিবর্গের নৈতিক অবক্ষয় ও বিকৃতি এতদূর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছিল যে, তা রুখতে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রে সংস্কার ও সংশোধনের নতুন প্রাণ-স্পন্দন সৃষ্টি করতে এমন একজন উৎসাহী মনোবলসম্পন্ন ও শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের দরকার ছিল যিনি সাধারণভাবে ইতিহাসে নতুন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ও নবযুগের বিজেতা হিসাবে প্রমাণিত হয়েছেন। ইতিহাসে এ জাতীয় ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখা গেছে যে, অধিকাংশ রাজবংশের সর্বশেষ ব্যক্তি তথা পতনোন্মুখ সাম্রাজ্যের শেষ শাসক ব্যক্তিসত্তার দিক দিয়ে কল্যাণের প্রতীক, সংস্কারপ্রিয় ও সৎ চরিত্রবানই ছিলেন, কিন্তু সে বংশের কিংবা সাম্রাজ্যের জীবনদায়িনী শক্তি এমনভাবে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল এবং বিপর্যয় ও অশান্তিকর অবস্থা বৃদ্ধি পেতে পেতে এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল যে, তখন আর সেটাকে তার স্বাভাবিক পরিণতি থেকে রক্ষা করার কোন পথই অবশিষ্ট ছিল না। তাই স্বাভাবিকভাবে কোন বংশ বা রাজত্বের পতনের ইতিহাসে সেই ব্যক্তির নামটাই লিখিত হয়েছে যিনি তাঁর অনেক পূর্বসূরীর চেয়ে উত্তম ছিলেন এবং যিনি প্রকৃতই সংস্কার ও সংশোধনের অভিলাষী ছিলেন।

বাগদাদে যদিও সংস্কারবাদীদের একটি দল জ্ঞান চর্চা, শিক্ষা দান ও 'ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল ছিলেন এবং কিছু আল্লাহ্র বান্দা মসজিদ ও খানকাহগুলোতে একাগ্র চিত্তে নির্জন বাস অবলম্বন করেছিলেন, কিন্তু শাসক ও বিত্তবানদের ভেতর অনাচার ও বিকৃতি ছড়িয়ে পড়েছিল দারুণভাবে। সে যুগের একজন খ্যাতনামা ঐতিহাসিক আবুল হাসান খাযরাজী তাঁর যুগে ইরাকের লোকদের যে অবস্থা ছিল

১. ঐ ৩০১ পৃ.;

তার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন :

জায়গীর জমিদারী ও সহায়-সম্পত্তি লাভের আগ্রহ প্রবলভাবে বেড়ে গেছে। সমাজ সংস্কার ও জনকল্যাণমূলক কাজের প্রতি সৃষ্টি হয়েছে নিস্পৃহ ভাব। নাজায়েয ও অননুমোদিত পার্থিব বিষয়াদিতে লোকের মত্ততা খুবই বৃদ্ধি পেয়েছে। সাম্রাজ্যের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা জুলুম-নিপীড়নে বদ্ধপরিকর, সকলেই অধিকতর ধন-সম্পদ উপার্জনের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত।

তিনি আরও বলেন :

এ অবস্থা খুবই বিপজ্জনক। কেননা সাম্রাজ্য কুফরীর সঙ্গে সহাবস্থান করতে পারে, কিন্তু জুলুমের সঙ্গে নয়[১] অর্থাৎ জুলুম-নিপীড়ন সাম্রাজ্যের ত্বরিৎ পতন ডেকে আনে।

ওদিকে মুসলিম বিশ্বের পূর্বাংশে খাওয়ারিয্‌মশাহী নির্বিঘ্নে রাজত্ব করে চলছিল। সে সাম্রাজ্য ছিল খুবই প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী। হি. পঞ্চম শতাব্দীর শেষ দিকে সালজূকী সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের ওপর ঐ সাম্রাজ্যে গড়ে উঠেছিল। মিসর, শাম, ইরাক, হেজায ও উত্তর-পশ্চিমে এশিয়া মাইনরের সংক্ষিপ্ত সালজূকী এলাকা ও দক্ষিণ-পূর্বে ঘোরীদের নবোত্থিত সাম্রাজ্য বাদ দিলে প্রায় গোটা মুসলিম জগতই খাওয়ারিয্‌মশাহীর শাসনাধীন ছিল। এ বংশের সর্বাধিক উৎসাহী, মনোবলসম্পন্ন ও দিগ্‌বিজয়ী নৃপতি ছিলেন সুলতান 'আলাদ্দীন মুহাম্মদ খাওয়ারিয্‌ম শাহ (৫৯৪-৬১৭ হি.)। তিনি কেবল তাঁর যুগেরই সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম নৃপতি ছিলেন না, সম্ভবত সে যুগের সর্বাধিক শক্তিশালী সুলতানও ছিলেন। হ্যারল্ড ল্যাম্ব (ঔ.ৗটবঠ) তাঁর "চেঙ্গীয খান" নামক পুস্তকে ঠিকই লিখেছেন :

মুসলিম বিশ্বের হৃৎপিণ্ডে সুলতান মুহাম্মদ খাওয়ারিয্‌ম শাহ্ আওরঙ্গশাহীর ওপর রণদেবতা সেজে বসেছিলেন। তাঁর রাজ্যসীমা ভারতবর্ষের সীমান্ত থেকে বাগদাদ এবং খাওয়ারিয্‌ম সমুদ্র (আরাল সাগর) থেকে পারস্যোপসাগর পর্যন্ত ছিল বিস্তৃত। সালজূকী তুর্কী ভিন্ন, যারা ক্রুসেডারদের ওপর জয় লাভ করেছিল এবং মিসরের মামলূক সুলতানগণ ছাড়া– যারা উত্তরোত্তর উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির পথে ধাবিত হচ্ছিল, বাকি মুসলিম সাম্রাজ্যের ওপর সুলতান মুহাম্মদ খাওয়ারিয্‌ম শাহ পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। মর্যাদার দিক দিয়ে সুলতান মুহাম্মদ ছিলেন রাজাধিরাজ (শাহানশাহ্)। 'আব্বাসী খলীফা নাসির লে-দীনিল্লাহ্ সুলতানের প্রতি নারায ছিলেন। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি তাঁর

---

১. বাগদাদের আল-আকলাম পত্রিকার হি. ১৩৮৬-র মুহাররাম সংখ্যার "আসরু'শ-শারাবী বি বাগদাদ' নিবন্ধ দ্র.।

শক্তির স্বীকৃতি দিতেন। বাগদাদের খলীফা পার্থিব সকল ক্ষমতা হারিয়ে রোমের পোপের ন্যায় কেবল ধর্মীয় নেতা হিসাবে কোনরূপে নিজের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রেখেছিলেন।[১]

আরব ঐতিহাসিকগণ 'আলাউদ্দীন মুহাম্মদ খাওয়ারিয্ম শাহ্‌র জীবন-চরিত্রে ও আচার-ব্যবহারে বড় রকমের কোন দুর্বলতা কিংবা ব্যক্তিগত দোষত্রুটি পাননি, বরং সকলেই তাঁর দীনদারী, সৎ নিয়ত, বীরত্ব ও দৃঢ়তার সাধারণ স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, তাঁর সকল যোগ্যতা ও শক্তিই সে সব ছোট-বড় সাম্রাজ্যকে নিঃশেষ করতে ব্যয়িত হয়েছে যেগুলো তাঁর বিশাল বিস্তৃত সাম্রাজ্যের পূর্বাংশে ছিল। একদিকে উত্তর ও পশ্চিমে তিনি সালজূকীদেরকে তাদের শেষ সীমা পর্যন্ত পিছু হটতে বাধ্য করেন, অপরদিকে পূর্ব ও দক্ষিণে তিনি ঘারীদের সঙ্গে নিরন্তর লড়াইয়ে ব্যাপৃত থাকেন এবং তাদেরকেও একটি সীমাবদ্ধ অংশে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য করেন। ইরান ও তুর্কিস্তানের সামরিক কাঠামো এই অব্যাহত ও নিরন্তর যুদ্ধের কারণে ভেঙে পড়ে। প্রাকৃতিক ও মানবীয় সম্পদে সমৃদ্ধ ঐ রাষ্ট্রপুঞ্জের শহর ও পল্লীগুলোর ভাগ্যাকাশ অহরহ যুদ্ধের মেঘে ছেয়ে থাকত। বিজিত দেশের সম্পদ, উৎপাদিত দ্রব্য এবং সেই সাথে কারিগর ও শিল্পী এসে জড়ো হয়েছিল মুসলিম সাম্রাজ্যের এই কেন্দ্রভূমিতে। তাই আধুনিক সংস্কৃতি তথা নগর সভ্যতার দ্রুত বিস্তৃতি ঘটেছিল এবং সেই সাথে সংগৃহীত হয়েছিল প্রাচুর্য, নেতৃত্ব ও বিজয়ের প্রয়োজনীয় উপাদান। সে যুগের সাংস্কৃতিক জীবনের নিষ্টকারিতার উল্লেখ সে সব ইতিহাসে পাওয়া দুষ্কর যে ইতিহাস কেবল রাজ-রাজড়া ও তাঁদের দরবারের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এসবের কিছু সন্ধান যদি পাওয়াও যায় তবে তা পাওয়া যাবে সূফী-দরবেশ, বুযুর্গ ও মহান সংস্কারকদের স্মারকলিপি (নোটবুক), বাণী সংকলন ও তাঁদের ওয়া'জ-নসীহতে যার বিরাট অংশই তাতারী প্লাবনে ভেসে গেছে। এ ক্ষেত্রে "চেঙ্গীয খান" গ্রন্থের লেখক খ্রিস্টান ঐতিহাসিক হ্যারল্ড ল্যাম্ব-এর বর্ণনা কেবল ধর্মীয় ঈর্ষাপ্রণোদিত ও অতিরঞ্জন দোষে দুষ্ট বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না।

মুসলমানদের গোটা জগৎটাই ছিল লড়াই-সংঘর্ষের জগত, ছিল গান-বাজনা ও সুর সংযোজনার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ। তারা এর ভাল সমঝদার ছিলেন। কিন্তু তাদের বাহ্যিক দিকের মত অভ্যন্তরীণ দিকেও এক উত্তেজনাকর অবস্থা সব সময় অনিবার্যভাবে বিরাজ করত। রাজা-বাদশাহদের স্থলে গোলাম ও মামলূক (মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস)-রাই রাজত্ব করত। ধন-সম্পদ সঞ্চয়ের প্রতি তাদের

১. চেঙ্গীয খান, ১৪৭ পৃ. মওলভী 'ইনায়েতুল্লাহ মরহুম কর্তৃক অনূদিত।

আগ্রহ ছিল প্রবল। নৈতিক ও চারিত্রিক বিচ্যুতি এবং রাষ্ট্রীয় মনোমুগ্ধকর বিষয়াবলীর কোন ঘাটতি ছিল না। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা এমন সব লোকের হাতে ছিল– প্রজাদের শোষণ ও লুণ্ঠনই ছিল যাদের একমাত্র কাজ। সম্ভ্রম-বিক্রেতার হাতে ছিল নারীর দেখাশোনার দায়িত্ব আর ঈমানের মালিক ছিলেন খোদা।[১]

এমতাবস্থায় খাওয়ারিয্‌ম শাহী সুলতানদের দ্বারাও সেই একই ধ্বংসাত্মক ভুল সংঘটিত হ'ল যে ভুল করেছিল স্পেনের আরব শাসকবৃন্দ এবং যে ভুল আল্লাহ্‌ও ক্ষমা করেননি। সে ভুল হ'ল, তারা তাদের গোটা শক্তি সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ও সংহতকরণ এবং প্রতিপক্ষের দমনে ব্যয় করেছিল। যে সব মানব বসতি ছিল তাদের সীমান্ত সংলগ্ন এবং ছিল একট স্বয়ংসম্পূর্ণ জগত সেখানে ইসলামের প্রচার ও আল্লাহ্‌র এই শেষ পয়গাম পৌঁছুবার আদৌ কোন চিন্তাও তারা করেনি। ধর্মীয় আবেগ ও প্রেরণার কথা না হয় বাদই দিলাম, রাজনৈতিক কারণেও তো তারা এই বিস্তৃত মানব বসতিকে নিজেদের সমমনা ও একই বিশ্বাসে বিশ্বাসী করে তুলতে পারত, যার ফলে তারা চিরদিনের তরে সেই বিপদের হাত থেকে নিরাপদ হয়ে যেত যা কেবল তাদের নয়, বরং গোটা মুসলিম সমাজের সামনে এসে দেখা দিয়েছিল।

এ রকম যুগ ও অবস্থার ভেতর তাতারীরা তাদের সর্দার ও নেতা চেঙ্গীয খানের[২] নেতৃত্বে খোদায়ী আযাব ও গযব হিসাবে মুসলিম জাহানের পূর্বাংশ ইরান ও তুর্কিস্তানের দিকে অগ্রসর হয়। এরপর বাগদাদের পালাও এসে যায় যার চিত্র ওপরের লাইনগুলোতে অংকিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ৬৫৬ হিজরীতে তারা এর প্রতিটি ইটও ভেঙে গুঁড়িয়ে চুরমার করে দেয়।

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّاتُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً - وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ *

তোমরা সেই বিপর্যয় ও দুর্যোগ থেকে সাবধান হও যা কেবল জালেমদেরই পাকড়াও করবে না; জেনে রেখ, আল্লাহ্‌ শাস্তি দানে বড় কঠোর।
–আল-কুরআন।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে এর পেছনে যে কারণ ক্রিয়াশীল ছিল তা এই যে, চেঙ্গীয খান খাওয়ারিয্‌ম শাহকে বার্তা পাঠায়, আমিও বিস্তৃত এক সাম্রাজ্যের অধীশ্বর। এটাই

১. চেঙ্গীয খান– ১৪৩ পৃ. হ্যারল্ড ল্যাম্বকৃত ও মওলভী 'ইনায়েতুল্লাহ্‌ মরহুম অনূদিত।
২. চেঙ্গীয খানের রাজত্বের সূচনা হয় ৫৯৫ হি. থেকে। খাওয়ারিয্‌ম শাহ্‌র হুকুমতের ওপর প্রথম হামলা হয় ৬১৬ হিজরীতে। ৬২৪ হিজরীতে তার মৃত্যু হয়। অতঃপর তদীয় পুত্র ও পৌত্র তার উদ্দেশ্য পূরং করে। তার পৌত্র হালাকু খানের নেতৃত্বে তাতারী ফৌজ ৬৫৬ হিজরীতে বাগদাদ আক্রমণ করে।

ভাল যে, আমরা উভয়ে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলি। আমাদের ব্যবসায়ী বণিককুল ভয়-ভীতিহীনভাবে ও নিঃশংক চিত্তে আপনার রাজ্যে যাবে এবং এখানকার উৎপন্নজাত বিশেষ দ্রব্যাদি ও মাল-সামান আপনার ওখানে বিক্রি করবে আর আপনার ব্যবসায়ীরাও পরম নিশ্চিন্তে আমাদের দেশে আসবে এবং ওখানকার মাল-সামান এখানে বিক্রি করবে। খাওয়ারিয্‌ম শাহ্ এ প্রস্তাব মঞ্জুর করেন এবং বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। বাণিজ্য কাফেলা দ্বিধাহীনভাবে ও অসংকোচে একে অপরের দেশে যাতায়াত করতে থাকে। এরপর এমন কি ঘটল যার ফলে মুসলিম জগত আকস্মিকভাবে রক্তের সমুদ্রে নিমজ্জিত হ'ল? এর বিস্তারিত বিবরণ পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকের মুখ দিয়েই শোনা যাক— মুসলিম ঐতিহাসিকের বর্ণনায়ও এর সত্যতার সমর্থন মেলে।[১]

হ্যারল্ড ল্যাম্ব তাঁর "চেঙ্গীয খান" নামক গ্রন্থে বলেন :

> কিন্তু যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক চেঙ্গীয খান কায়েম করেছিলেন তা অকস্মাৎ ছিন্ন হয়ে যায়। আর তা এভাবে যে, কারাকোরাম থেকে ব্যবসায়ীদের একটি কাফেলা পশ্চিমে আসছিল। পথিমধ্যে উত্‌রার শাসনকর্তা অনিলজুক কাফেলার সমস্ত লোক বন্দী করে এবং তার প্রভু খাওয়ারিয্‌ম শাহ্‌কে অবহিত করে যে, এই কাফেলার ভেতর গুপ্তচর রয়েছে। অনিলজুকের এ ধারণা ছিল একান্ত তারই বুদ্ধিপ্রসূত।
>
> উতরার শাসকের কাছ থেকে এ সংবাদ আসতেই সুলতান মুহাম্মদ খাওয়ারিয্‌ম শাহ্ কোনরূপ চিন্তা-ভাবনা না করেই কাফেলার সমস্ত বণিককেই হত্যার নির্দেশ দেন। এই নির্দেশ অনুসারে কারাকোরাম থেকে আগত সমস্ত বণিককেই হত্যা করা হয়। এই ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হতেই চেঙ্গীয খান এর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে একদল দূত পাঠান। সুলতান মুহাম্মদ এই দূতদলের সর্দারকেও হত্যা করেন এবং দলের অন্যান্য সদস্যের দাড়ি জ্বালিয়ে দেন। দূতদের মধ্যে যারা কোন রকমে জান বাঁচিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল তারা চেঙ্গীয খানের নিকট ফিরে গিয়ে সকল ঘটনা বিবৃত করে। গোবি মরুভূমির অধিপতি অবস্থার এ বর্ণনা শ্রবণ মাত্রই একটি পাহাড়ে আরোহণ করেন যাতে একাকী গোটা বিষয়টির সকল দিক ভেবে দেখতে পারেন। মোগল দূত হত্যা ছিল এমন একটি অমার্জনীয় অপরাধ যা কোনরূপ শাস্তি দান ব্যতিরেকে এমনিতে ছেড়ে দেওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব

---

১. আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া— ১৩শ খণ্ড, ২০০-৪ পৃ; আল-কামিল, ইবনু'ল-আছীরকৃত, ১২শখণ্ড, ১৪৯ পৃ।

ছিল। এটি এমন একটি কর্ম ছিল যার বদলা নেওয়া মোগলদের অতীত ঐতিহ্য অনুসারেই অপরিহার্য ছিল।

চেঙ্গীয খান বলেন ঃ আসমানে যেমন দু'টো সূর্যের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না, ঠিক তেমনি পৃথিবীর বুকে দু'জন খাকান (সম্রাট) থাকতে পারে না।[১]

তাতারী আক্রমণের আওতায় মুসলিম প্রাচ্য ভূখণ্ড

তাতারীরা প্রথমে বোখারাকে তাদের আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত করে এবং একে পরিণত করে ধ্বংসস্তূপে। শহরের একজন অধিবাসীও তাদের হাত থেকে জীবন বাঁচাতে পারেনি। এরপর সমরকন্দ শহরও মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয় এবং এর সমস্ত অধিবাসীকেই তলোয়ারের মুখে নিক্ষেপ করা হয়। মুসলিম বিশ্বের উল্লেখযোগ্য শহরগুলোর মধ্যে রে, হামদান, যুনজান, কুযভীন, মার্ভ, নিশাপুর ও খাওয়ারিযম একই ভাগ্য বরণ করে। ইসলামী বিশ্বের একমাত্র বাদশাহ ও সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সুলতান খাওয়ারিযম শাহ তাতারীদের ভয়ে পালিয়ে বেড়াতে থাকেন। তাতারীরাও তাঁর পশ্চাদ্ধাবন অব্যাহত রাখে। শেষাবধি এক অজ্ঞাতনামা উপদ্বীপে তাঁর ইনতিকাল হয়।

খাওয়ারিযম শাহ ইরান ও তুর্কিস্তানের মুসলিম রাজ্য ও স্বায়ত্তশাসিত সরকারগুলোকে তাঁর বিশাল রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন। অতএব, তাতারীদের মুকাবিলায় তিনি যখন পরাজিত হলেন তখন তাদের মুকাবিলা করবার মত প্রাচ্য ভূখণ্ডে আর কেউ রইল না। তাতারীদের ভয়ে মুসলমানরা এত বেশি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল যে, একজন তাতারীও যে গলিতে ঢুকেছে, সেখানে এক শ' জন মুসলমান থাকলেও তাদের ভেতর একজনেরও সাহস হয়নি তার সম্মুখীন হবার। সে একে একে সবাইকে হত্যা করেছে। তার প্রতি কেউ হাত পর্যন্ত তোলেনি। কোন এক তাতারী মহিলা পুরুষের বেশে কোন ঘরে প্রবেশ করেছে এবং একাকী ঘরের সমস্ত অধিবাসীকে হত্যা করেছে। এরপর তার সঙ্গী একজন কয়েদী টের পেয়েছে যে, লোকটি পুরুষবেশী একজন মহিলা, তখন সে তাকে হত্যা করেছে। এমনও দেখা গেছে যে, একজন তাতারী কোন মুসলমানকে গ্রেফতার করেছে। এরপর সে মুসলমান বন্দীকে বলেছে ঃ তোর মাথাটা পাথরের ওপর রাখ, আমার তলোয়ারটা আমি নিয়ে আসি, তারপর তোকে জবাই করব। মুসলমান বিবশ অবস্থায় পড়ে থেকেছে, পালাবার কথা একবারও তার মনে জাগেনি। তাতারী শহরে গিয়ে তার তলোয়ার নিয়ে এসেছে, তারপর মুসলমানকে

১. চেঙ্গীয খান, ১৪৩ পৃ. হ্যারল্ড ল্যাম্বকৃত।

জবাই করেছে।[১]

তাতারী আক্রমণ ছিল মুসলিম জগতের ওপর আল্লাহ্‌র গযব। এর ফলে মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি লোমকূপ ফুলে উঠেছিল। মুসলমানরা ছিল হত-বিহ্বল। এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সর্বত্রই সন্ত্রাস ও হতাশা বিরাজ করছিল। তাতারীদেরকে মনে করা হ'ত এমন এক বিপদ যার থেকে কোন রেহাই নেই। তাদের মুকাবিলা করা যায় এবং তাদেরকে পরাজিত করা যায় এ ছিল এক অসম্ভব কল্পনা, এমন কি তাদের সম্পর্কে এ কথা প্রবাদ বাক্যের মত তখন ছড়িয়ে পড়েছিল, اذا قيل لك ان التترا انهزموا فلا تصدق অর্থাৎ "কেউ যদি তোমাকে বলে যে, তাতারীরা পরাজিত হয়েছে, তাহলে তুমি তা বিশ্বাস করবে না।" যে শহর কিংবা যে দেশের দিকেই তাদের গতি পরিবর্তিত হ'ত, ধরে নেওয়া হ'ত যে, ঐ শহর বা সেই দেশের দুর্ভাগ্য ঘনিয়ে এসেছে। জান-মাল, 'ইয্‌যত-আবরু, মসজিদ-মাদরাসা কোন কিছুই নিরাপদ ছিল না তাদের হাত থেকে। তাতারীদের বিশেষ কোন দিক কিংবা বিশেষ কোন অভিমুখে ধাবিত হবার অর্থই ছিল ধ্বংসযজ্ঞ, ব্যাপক হত্যাকাণ্ড, যিল্লতি ও সম্ভ্রম হানি। একবার প্রায় গোটা মুসলিম জগতই (বিশেষ করে তার পূর্বাংশ) এই বিশ্ব দহনকারী ফেতনার গ্রাসে পরিণত হয়েছিল। ঐতিহাসিক সব ধরনের ঘটনা অধ্যয়ন করেন এবং তা লিপিবদ্ধও করেন। পৃথিবীর জাতিগোষ্ঠীর ও রাষ্ট্রপুঞ্জের ধ্বংসের এত সব দৃশ্য তার চোখের সামনে দিয়ে গুযরে যায় যে, তা দেখার পর তার প্রকৃতি অনুভূতি শূন্য এবং তার লেখনী নির্মম ও নির্দয় হয়ে যায়। কিন্তু এ ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে ইবনে আছীরের মত ঐতিহাসিকও (যিনি অত্যন্ত ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে পৃথিবীর ইতিহাস লিখেছেন) তাঁর মনের অবস্থা প্রচ্ছন্ন রাখতে পারেননি। তিনি লিখেছেন :

> এই দুযোর্গ ও দুর্বিপাক এত ভয়াবহ ও অসহনীয় ছিল যে, কয়েক বছর যাবত আমি দো-টানার মধ্যে ছিলাম এ ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করব কি না। এখনও যে করছি তাও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সাথে করছি। ইসলাম ও মুসলমানদের মৃত্যু খবর শোনানো কার পক্ষেই-বা সহজ, আর এতখানি বুকের পাটাই-বা কার আছে যে, তাদের যিল্লতী ও লাঞ্ছনার কাহিনী শোনাবে? হায়! আমি যদি জন্মগ্রহণ না করতাম। হায়! আমি যদি এর পূর্বেই মারা যেতাম, হারিয়ে যেতাম বিস্মৃতির অতলে। এতদ্‌সত্ত্বেও আমার কতক দোস্ত আমাকে এ ঘটনা লিখতে উদ্বুদ্ধ করেন। এরপরও আমি দ্বিধান্বিত ছিলাম। কিন্তু আমি দেখলাম

---

১. বিস্তারিত জানতে হলে দ্র. "আল-কামিল" (ইব্‌নে আছীরকৃত), ১২শ খণ্ড ও দাইরাতু'ল-মা'আরিফ (বুস্তানীকৃত), ৬ষ্ঠ খণ্ড, তাতার শিরো.।

এটা না লেখার মধ্যেও কোন ফায়দা নেই। এ এমনই এক দুর্ঘটনা এবং এমনই এক মুসীবত যে, দুনিয়ার ইতিহাসে এর কোন নজীর পাওয়া যাবে না। এ ঘটনার সম্পর্ক গোটা মানব সমাজের সঙ্গে। যদি কেউ দাবি করে যে, আদম (আ)-এর পর থেকে আজ অবধি দুনিয়ার বুকে এ ধরনের নির্দয় ঘটনা আর একটিও ঘটেনি তাহলে আর এ দাবি ভুল হবে না। আর তা এজন্য যে, ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনার সমপাল্লার কোন ঘটনার সন্ধানই পাওয়া যায় না। দুনিয়া কেয়ামত পর্যন্ত (ইয়াজূজ-মা'জূজ ভিন্ন) কখনো যেন এমন ঘটনা প্রত্যক্ষ না করে। ঐসব বর্বর পশু কারোর প্রতি এতটুকু দয়া-মায়া কিংবা কৃপা দেখায় নি। তারা নারী-পুরুষ ও শিশুদের হত্যা করেছে, মহিলাদের পেট চিরেছে এবং গর্ভস্থ সন্তানকে হত্যা করেছে। লা হ'াওলা ওয়ালা কু'ওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি'ল-'আলিয়্যি'ল-'আজ'ীম। এ দুর্যোগ ও দুর্ঘটনা ছিল যেন বিশ্বগ্রাসী! মহাপ্লাবন আকারে এটি দেখা দেয় এবং দেখতে দেখতেই তা গোটা পৃথিবীটাই যেন ছেয়ে ফেলে।[১]

কেবল একা মুসলিম জাহানই নয়, সে যুগের গোটা সভ্য জগতই তাতারী হামলায় কেঁপে উঠেছিল। যেখানে তাদের পৌঁছুবার সম্ভাবনা কম ছিল সেখানেও ভীতি ছড়িয়ে পড়েছিল। ঐতিহাসিক গীবন তাঁর Decline and fall of the Roman empire নামক বিখ্যাত ইতিহাস-পুস্তকে লিখেছেন ঃ

সুইডেনের অধিবাসীরা রাশিয়ানদের মারফত তাতারী ঝঞ্ঝার খবর শুনে এতটাই ভীত হয়ে পড়েছিল যে, শেষ পর্যন্ত তাতারীদের ভয়ে তারা তাদের চিরাচরিত অভ্যাস পরিত্যাগ করে ইংল্যান্ডের সমুদ্রোপকূলে মৎস্য শিকার বন্ধ করে দিয়েছিল।

Cambridge History of Medieval Age নামক গ্রন্থের লেখকগণ মোগলদের এই ভীষণ সংঘর্ষকে– যার নেতা ছিলেন চেঙ্গীয খান– অত্যন্ত সুন্দররূপে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন :

মোগলদের আক্রমণ প্রতিরোধ করা ছিল মনুষ্য-শক্তিবহির্ভূত। মরু প্রান্তরের সমস্ত বাধা-বিপত্তি তাদের কাছে হার মানে। পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, সমুদ্র ও আবহাওয়াগত প্রতিবন্ধকতা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী কিছুই তাদের যাত্রা পথে বাধার সৃষ্টি করতে পারেনি। যে কোন ধরনের ভয়ভীতি থেকে তারা ছিল মুক্ত। কোন দুর্গই তাদের আক্রমণের মুখে টিকতে পারত না। নিপীড়িত ও মজলুম কোন আদম-সন্তানের ফরিয়াদই তাদের হৃদয়ে দাগ কাটত না। ... পৃথিবীর

১. আল-কামিল (ইবনে আছ'ীর, মৃত্যু ৬৩৮ হি.), ১২শ খণ্ড, ১৪৭-৪৮ পৃ.।

ইতিহাসে এই নবোদ্ভূত শক্তির আবির্ভাব অর্থাৎ এক ও একক ব্যক্তির এই প্রতিপত্তি যা সমগ্র জাতির সভ্যতাও সংস্কৃতিকেই বদলে দেয়– চেঙ্গীয খান থেকে শুরু হয় এবং তার পুত্র কুবলাই খানে গিয়ে শেষ হয়। কুবলাই খানের যুগেই মোগলদের সুরক্ষিত বিস্তৃত সাম্রাজ্য খণ্ডিত ও বিভক্ত হবার আলামত প্রকাশ পেতে শুরু করে।[১]

বাগদাদ ধ্বংস

শেষ পর্যন্ত এই বন্য ও বর্বর জাতিগোষ্ঠী মুসলিম জাহানকে পদানত করতে করতে, রক্তের বন্যা বহাতে বহাতে এবং সর্বত্র আগুন লাগাতে লাগাতে ৬৫৬ হিজরীতে চেঙ্গীয খানের পৌত্র হালাকূ খানের নেতৃত্বাধীনে তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের রাজধানী এবং সে যুগের সর্ববৃহৎ শিক্ষা-সভ্যতার কেন্দ্র বাগদাদে প্রবেশ করে এবং তার অস্তিত্ব লণ্ডভণ্ড করে দেয়। বাগদাদের ধ্বংস ও মুসলমানদের ব্যাপক গণহত্যার বিবরণ অত্যন্ত হৃদয়বিদারক, খুবই করুণ ও বেদনাদায়ক। এর কিছুটা পরিমাপ করা যাবে ঐসব ঐতিহাসিকের বিবরণ থেকে যাঁরা এই দুর্যোগ ও দুর্ঘটনার আলামত নিজেদের চোখে দেখেছেন কিংবা যাঁরা এর প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন তাঁদের কাছ থেকে শুনেছেন। ঐতিহাসিক ইবনে কাছীর লিখেছেন :

> চল্লিশ দিন পর্যন্ত বাগদাদে ব্যাপক হত্যা ও ধ্বংসের রাজত্ব চলে। ফলে তৎকালীন বিশ্বের গৌরবোজ্জ্বল ও জমজমাট এই শহরটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। মাত্র গুটি কয়েক লোকই সেখানে দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। বাজার ও পথ-ঘাটগুলো ছিল মানুষের লাশে পূর্ণ। লাশের এক একটি স্তূপ ছোটখাটো একটি টিলার আকৃতি ধারণ করেছিল। এসব লাশের ওপর বৃষ্টিপাত হলে তা (ফুলে) আরও বীভৎস আকার ধারণ করে। গোটা শহর-ভর্তি গলিত শবের গন্ধে এলাকার আবহাওয়াই দূষিত হয়ে পড়ে। ফলে চতুর্দিকে মহামারী শুরু হয়। এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সিরিয়া (শাম) পর্যন্ত পৌঁছে। মহামারীর কারণেও আরও বহু লোক মারা যায়। মোট কথা, বাগদাদে তখন দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও ধ্বংস–এই তিনের রাজত্ব চলছিল।[২]

শায়খ তাজুদ্দীন সুবকী বলেন :

> হালাকূ খান একটি তাঁবুতে বাগদাদের খলীফা (মুস্তা'সিম)-কে তলব করেন এবং উযীর ইবনু'ল-'আলকামী, 'উলামা-ই-কিরাম ও শহরের গণ্যমান্য ও

---

১. "চেঙ্গীয খান" নামক পুস্তক থেকে উদ্ধৃত–২৬৬ পৃ.।
২. আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া–১৩শ খণ্ড, ২০২-৩ পৃ.।

সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে দা'ওয়াত দেন যেন তারা খলীফা ও হালাকূ খানের মধ্যে সম্পাদিত সন্ধিতে সাক্ষী হন। কিন্তু সেখানে গিয়ে পৌঁছুতেই তাঁদের সবাইকে তলোয়ারের মুখে নিক্ষেপ করা হয়। এভাবে এক দলের পর অন্য দলকে ডেকে পাঠিয়ে পর্যায়ক্রমে হত্যা করা হয়। অতঃপর খলীফার বিশ্বস্ত সভাসদ ও নিকটস্থ লোকদের ডেকে পাঠানো হয় এবং তাদেরকেও হত্যা করা হয়। খলীফার সম্পর্কে সাধারণভাবে প্রসিদ্ধি ছিল যে, তাঁর রক্ত মাটিতে ঝরলে বিরাট কোন বিপদ কিংবা দুর্যোগ দেখা দেবে। হালাকূ খান দ্বিধান্বিত ছিলেন। নাসীরুদ্দীন তূসী [১] এ সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসে। সে বলে ঃ এ তেমন কঠিন কাজ নয়। খলীফার রক্তপাত না ঘটিয়েও তো অন্য কোনভাবে তাঁর জীবন ছিনিয়ে নেওয়া যায়। অনন্তর তাঁকে বিছানার ওপর শুইয়ে দেওয়া হয় এবং পদাঘাতে পদাঘাতে তাঁর জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দেওয়া হয়।

বাগদাদে মাসাধিক কাল ধরে নরহত্যা চলে। যে দু'-চারজন এদিক-সেদিক আত্মগোপন করেছিল কেবল তারাই জীবন বাঁচাতে সক্ষম হয়। কথিত আছে যে, হালাকূ খানের সংগৃহীত পরিসংখ্যান অনুযায়ী নিহতের সংখ্যা ছিল ১৮ লাখ। [২]

---

১. একজন ইরানী মনীষী কর্তৃক লিখিত ইতিহাস "আখবার ও আছার-ই-খাজা নাসীরুদ্দীন তূসী"–তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত–থেকেও এ সমর্থিত হয়। উক্ত লেখক খলীফা হত্যার ব্যাপারে নাসীরুদ্দীন তূসীকেই দায়ী করেছেন।

তূসীর সর্ববৃহৎ যে রাজনৈতিক চাল শেষাবধি সফল হয়েছিল তা ছিল, হালাকূ খানকে 'আব্বাসী সাম্রাজ্য উৎখাতের জন্য উস্কানি দেওয়া এবং খলীফার প্রাসাদ ভেঙে গুঁড়িয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া। হালাকূ নিজেও তদীয় ভ্রাতা মংকূ কা'আনের পক্ষ থেকে, বাতেনীদের নির্মূল করবার পর, 'আব্বাসী খেলাফত উৎসাদনের নিমিত্ত আদিষ্ট ছিলেন। বাগদাদের খলীফা মুস্তা'সিমকে হালাকূ খানের আনুগত্য স্বীকারের জন্য নির্দেশ পাঠানো হয়। পত্র বিনিময় চলতে থাকে। কিন্তু ফলাফল থাকে অনিশ্চিত। এরপর হালাকূ খা তার সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে পরামর্শ বৈঠকে মিলিত হন। মোগলেরা নক্ষত্রের রাশিচক্রে খুবই বিশ্বাসী ছিল। দরবারে হুসসামুদ্দীন নামে একজন সুন্নী গণক অভিমত রাখেন, "বাগদাদ আক্রমণের জন্য এ মুহূর্তটি খুবই অশুভ। কেননা যখনই কোন বাদশাহ খেলাফতের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছে তখনই তাকে কোন না কোন বিপদে আক্রান্ত হতে হয়েছে। আপনি যদি হামলা করেন তাহলে বৃষ্টি বন্ধ হবে, তুফান ও ভূমিকম্প শুরু হবে এবং জগত বিরান হয়ে যাবে। সবচেয়ে বড় কথা, বাদশাহ (মংকূ কা'আন) মারা যাবেন।" এতদশ্রবণে হালাকূ চিন্তিত হয়ে পড়েন। হালাকূ এরপর তূসীর অভিমত জানতে চান اگر ببغداد حمله کنیم عاقبت چه خواهد شد। তূসী উত্তরে জানায় : چیزے نخواهد شد جزاینکه بجائے خلیفه خان خواهد بود হালাকূ উভয়ের মধ্যে বিতর্কের ব্যব া করেন। তূসী বলে ঃ হাযার হাযার সাহাবা শহীদ হয়েছেন, কিন্তু কোন দুর্যোগ আসেনি। এ যদি 'আব্বাসীদেরই বৈশিষ্ট্য হয় তাহলে তাহিরের দিকে দেখ, সে মামূনের নির্দেশে তৎকালীন খলীফা আমীনের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় এবং তাঁকে হত্যা করে। খলীফা মুতাওয়াক্কিলকে তাঁরই সন্তান ও ক্রীতদাসেরা একজোট হয়ে হত্যা করে। মুনতাসির ও মু'তাদিদকে আমীর-উমারা ও ক্রীতদাসেরা খতম করে। কিন্তু কই, তুফান কিংবা ভূমিকম্প তো হয়নি (এরপর হুসসামুদ্দীন নিরুত্তর হয়ে যান)।

২. ২৫ লক্ষ অধিবাসীর ভেতর এ অতিরঞ্জিত কিছু নয়। কতক ঐতিহাসিক এ সংখ্যা আরও কম বলে উল্লেখ করেছেন।

খৃস্টানদের প্রকাশ্যে মদ্য পান ও শুকরের মাংস ভক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়। যদিও রমযান মাস ছিল তথাপি মুসলমানদেরকেও এতে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়। মসজিদের ভেতর মদের পিপা উজাড় করা হয়। আযান নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। এ ছিল সেই বাগদাদ যা আবাদ করার পর থেকে কখনো দারু'ল-কুফ্র (কাফিরদের আবাস'ল)-এ পরিণত হয়নি। এবার সেখানে এমন ঘটনা ঘটল যার নজীর কোন ইতিহাসে নেই। –তাবাক'াতু'স-শাফি'ঈয়্যাতু'ল-কুবরা, ৫ম খণ্ড, ১১৪-১৫ পৃষ্ঠা।

হাযারো খারাপ দিকে থাকলেও বাগদাদ ছিল তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের সর্ববৃহৎ শহর, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য-সংস্কৃতির পীঠস্থান, 'আলিম-'উলামা ও জ্ঞানী-গুণীদের আবাসস্থল এবং সর্বোপরি খেলাফতের রাজধানী। তাই সঙ্গত কারণেই এটা ছিল মুসলমানদের 'ইযযত-আবরূর রক্ষক, ছিল মান-সম্ভ্রমের বস্তু। তাই এর ধ্বংস মুসলমানদের অনুভূতিতে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। চতুর্দিকে নেমে আসে শোকের ছায়া। শায়খ সা'দী (র)–যিনি এককালে বাগদাদের ছাত্র ছিলেন এবং সেখানকার জাঁকজমক স্বচক্ষে দেখেছিলেন,এ উপলক্ষে একটি মর্মস্পর্শী মর্ছিয়া (শোকগাথা) রচনা করেন যা ছিল সে যুগের সমস্ত মুসলমানের অন্তরেরই প্রতিধ্বনি– এর কতিপয় পংক্তি এখানে উদ্ধৃত করা হ'ল।

آسماں راحق بود گرخوں ببارد برزمین
برزوال ملك مستعصم امیر المؤمنین
اے محمد صـ گر قیامت می برآری سرزخاك
سر برآور دین قیامت درمیاں خلق بین
نازنینان حرم را خوں خلق نازنین
زاستان بگزشت وما را خون دل آراستیں
زینها راز دور گیتی وانقلاب روزگار
در خیال کس نگشتی کانچناں گردد چنیں
دیده بردارائے که دیدی شوکت بیت الحرام
قیصراں روم سر برخاك وخاقاں بر زمین
خون فرزندان عم مصطفی صـ شد ریخته
هم برآں خاکے که سلطاناں نهادندے جبیں
دجله خونا بست زیں پس گرنهد سر بر نشست
خاك نخلستان بطحا راکند باخون عجیں
روے دریا درهم آمد زیں حدیث هولناك

می تواں دانست بررویش زیرج افتاده چیں

نوحه لائق نیست برخاك شهید اں زانکه هست

کمتریں دولت مر ایشاں رابهشت برتریں

لیکن ازروے مسلمانی وراه مرحمت

مهربان را دل بسوزد در فراق نازنین

"আসমান এ অধিকার পেয়েছে যে, সে আমীরু'ল-মু'মিনীন মুস্তা'সিম বিল্লাহ্‌র হুকুমতের অবসানে যমীনের ওপর রক্ত বৃষ্টি ঝরাবে।

"হে মুহাম্মদ (সা)! আপনি যখন কেয়ামতের দিন মাটি থেকে মস্তক ওঠাবেন তখন তা আর একটু উঠিয়ে– গোটা সৃষ্টি জগতে ইতিমধ্যে যে কেয়ামত ঘটে গেছে– তাও দেখবেন।

"প্রিয় সৃষ্টি জগতের পবিত্র রক্ত প্রিয় লোকদের আস্তান থেকে অতিক্রম করেছে আর এই ঘটনা আমাদের কলিজার তপ্ত খুনকে রঞ্জিত করেছে।

"যুগের এই বিপ্লব ও কালের এই বিবর্তন সম্পর্কে সাবধান! কারোর ধারণাও ঠাঁই পাইনি যে, ওরূপ জিনিষ এরূপ হয়ে যাবে।

"ওহে! যারা কখনো কখনো বায়তু'ল-হারামের শান-শওকত দেখেছ, একটু চোখ তুলে দেখ, রোম ও পারস্যের সুলতানদের মস্তক ধূলি-ধূসরিত হয়ে মাটিতে পড়ে আছে।

"মোস্তফা (সা)-এর চাচার বংশধরদের রক্ত ঝরানো হয়েছে, এমন মাটিতে যার ওপর বড় বড় বাদশাহ্‌ তাদের মস্তক অবনমিত করত।

"দজলা (টাইগ্রীস) নদী রক্তে পরিপূর্ণ; এরপর যদি আবার মাথা ওঠায় তাহলে মক্কার খেজুর বাগানের মাটিকে রক্ত দ্বারা খামীর বানাবে।

"এই ভয়াবহ কথায় নদীর চেহারা বিগড়ে গেছে। সে জানতে পেরেছে যে, তার চেহারার ওপর আসমানী বিপদের কারণে ভাঁজ পড়ে গেছে।

"শহীদদের কবরের ওপর আমাদের গাওয়া শোকগাথা ও বিলাপ তাদের মর্যাদার উপযোগী নয়; কেননা বিরাট বড় বেহেশ্‌তও তাঁদের সম্পদের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর।

"কিন্তু ঐসব প্রিয় শহীদের বিচ্ছেদের কারণে প্রত্যেক হৃদয়বানের দিলই ইসলামের সম্পর্ক, স্নেহ-মমতা ও করুণায় কাঁদতে থাকবে।" [১]

বাগদাদের পর তাতারীরা হলব (আলেপ্পো) অভিমুখে রওয়ানা হয় এবং ইব্‌নে কাছীরের বর্ণনা অনুযায়ী সেখানেও বাগদাদের ন্যায় আচরণ করে। সেখান থেকে

১. কুল্লিয়াত-ই-সা'দী, ৫৬ পৃ.।

তারা দামিশকের দিকে অগ্রসর হয় এবং জুমাদাল-উলাতে (৬৫৮ হি.) তা দখল করে নেয়। শহরের খ্রিস্টান অধিবাসীরা শহরের বাইরে গিয়ে বিজয়ী তাতারীদের অভ্যর্থনা জানায় এবং তাদেরকে নানা রকম উপঢৌকন পেশ করে। তারা তাতারী শাসকদের কাছ থেকে ফরমান নিয়ে আসে এবং বিজয়ী বেশে শহরে প্রবেশ করে। ইব্‌নে কাছীর, যিনি নিজেই দামিশকের অধিবাসী ছিলেন– উক্ত ঘটনার ছবি আঁকতে গিয়ে যা বলেছেন তা থেকে মুসলমানদের অসহায় অবস্থা ও লাঞ্ছনার পরিমাপ করা যাবে :

> খৃস্টানরা তুমা দরজা দিয়ে প্রবেশ করে। তারা তাদের মাথার ওপর ক্রস কাষ্ঠ তুলে ধরে উচ্চৈঃস্বরে শ্লোগান দিচ্ছিল ঃ ঈসা মসীহ্‌র সত্য ধর্ম আজ বিজয়ী। তারা ইসলাম ও মুসলমানদের পরিষ্কার ও খোলাখুলিভাবে নিন্দা করছিল। তাদের হাতে ছিল মদের পাত্র। তারা যে মসজিদের পাশ দিয়েই যাচ্ছিল তার আশপাশে মদ ছিটাচ্ছিল। কিছু বোতল থেকে তারা লোকের চোখ-মুখে ও পরিহিত কাপড়েও মদ ছিটিয়ে দিচ্ছিল। অলি-গলি কিংবা হাট-বাজার দিয়ে যে লোকই অতিক্রম করত, অমনি তাকে নির্দেশ দেওয়া হ'ত দাঁড়িয়ে ক্রস কাষ্ঠকে সম্মান জানাতে। মুসলমানরা এ অবস্থা দৃষ্টে একত্র হয় এবং তাদেরকে ধাক্কিয়ে মেরীর গির্জা পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। সেখানে খ্রিস্টান বক্তারা দাঁড়িয়ে খ্রিস্ট ধর্মের প্রশংসায় বক্তৃতা দেয় এবং ইসলাম ও মুসলমানদের নিন্দা জ্ঞাপন করে।

ইবনে কাছীর সম্মুখে গিয়ে "যায়লু'ল-মির'আত" গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে লেখেন ঃ

> খ্রিস্টানেরা মদের পাত্র হাতে দামিশকের জামে' মসজিদে প্রবেশ করে। তাদের অভিপ্রায় ছিল, তাতারীদের আধিক্য লক্ষ্য করা গেলে অনেকগুলো মসজিদ তারা এই সুযোগে ধ্বংস করে দেবে। শহরে এসব ঘটতে দেখে মুসলমানেরা কাযী, 'আলিম-'উলামা ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের নেতৃত্বে একত্রে দুর্গে গিয়ে তাতারী শাসক ও দুর্গাধিপতি 'ঈল-সিয়ানে'র নিকট অভিযোগ দায়ের করে। মুসলমানদের এ অভিযোগের প্রতিকার করা তো দূরে থাক, অত্যন্ত লজ্জাজনকভাবে তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দেওয়া হয়। অপরদিকে অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে খ্রিস্টান নেতৃবর্গের বক্তব্য শ্রবণ করা হয়। –ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজি'উন।[১]

সিরিয়া (শাম) দখলের পর তাতারীদের লক্ষ্য স্বাভাবিকভাবেই মিসরের দিকেই ছিল। আর মিসরই ছিল একমাত্র দেশ যা তাতারীদের ধ্বংসযজ্ঞের হাত

১. আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, ১৩শ খণ্ড, ২১৯-২০ পৃ.।

থেকে রক্ষা পেয়েছিল। মিসরের সুলতান আল-মালিকু'ল-মুজাফফার সায়ফুদ্দীন কুতুয পরিষ্কার বুঝতে পারছিলেন যে, এবার নির্ঘাত মিসরের পালা। তাতারীরা যদি আগে-ভাগেই তার ওপর চড়াও হয়ে বসে তাহলে দেশের নিরাপত্তা বিপন্ন হবে এবং স্বাধীনতা রক্ষা কষ্টকর হবে। অতএব, মিসরের অভ্যন্তরে থেকে আত্মরক্ষার পরিবর্তে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে শামে (সিরিয়ায়) তাতারীদের ওপর আক্রমণাত্মক হামলা পরিচালনা করাকেই তিনি সমীচীন মনে করেন। অনন্তর ৬৫৮ হিজরীর পবিত্র মাহে রমযানের ২৫ তারিখে 'আয়ন-ই জালূত নামক স্থানে তাতারীদের সঙ্গে মিসরের মুসলিম ফৌজের তীব্র যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং পূর্ব অভিজ্ঞতার বিপরীত এ যুদ্ধে তাতারীদের সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটে। ফৌজ পলায়নরত তাতারীদের পশ্চাদ্ধাবন অব্যাহত রাখে এবং ব্যাপকহারে তাদের কচু কাটা করে। বিরাট সংখ্যক তাতারী মুসলমানদের হাতে বন্দীও হয়।

সুয়ূতী "তারীখু'ল-খুলাফা" নামক গ্রন্থে বলেন :

তাতারীরা অপমানকর পরাজয় বরণ করে। আল্লাহ্‌র ফযল ও করমে মুসলমানরা তাদের ওপর জয়ী হয়, তাতারীরা ব্যাপকভাবে নিহত হয়। তাদের দিশেহারা হয়ে পালাতে দেখে মুসলমানদের মনোবল ফিরে আসে। তারা খুব সহজেই তাদেরকে পাকড়াও করে তাদের সর্বস্ব ছিনিয়ে নেয়।

'আয়ন-ই-জালূত যুদ্ধের পর সুলতান আল-মালিকু'জ-জাহির বায়বার্স তাতারীদের কয়েকবার উপর্যুপরি পরাজিত করেন এবং গোটা সিরিয়া (শাম) এলাকা থেকে তাদের উৎখাত ও বহিষ্কৃত করেন। এভাবে "তাতারীদের পরাজয় অসম্ভব"– এই প্রবাদ বাক্য মিথ্যায় পর্যবসিত হয়।[১]

তাতারীদের মধ্যে ইসলাম প্রচার

সমগ্র মুসলিম জাহান ঐ প্রলয়ঙ্করী সয়লাবে ভেসে যাবে, এ ধরনের আশংকাই ব্যক্ত করেছিলেন তৎকালীন দূরদর্শী ও সংবেদনশীল মুসলিম লেখকবৃন্দ। ইসলামের নাম-নিশানাটুকুও মুছে যাবার উপক্রম হয়েছিল। ঠিক এমনি মুহূর্তে সহসা তাতারীদের মধ্যে ইসলামের প্রচার কার্য শুরু হয় এবং যে কাজ মুসলমানদের তলোয়ার ও মুসলিম বাদশাহদের পরাক্রম আনজাম দিতে পারেনি সে কাজটিই সম্পাদন করলেন ইসলামের দা'ঈ ও আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দাগণ। দেখা গেল, ইসলাম তাঁর খুন-পিয়াসী তাতারীদের অন্তরেই বাসা বাঁধতে শুরু করেছে। এই অজেয় জাতিগোষ্ঠীর ও মুসলিম বিজয়ী শক্তির ইসলামের হাতে বন্দী

১. তারীখু'ল-খুলাফা, ১৯১ পৃ. মিসর থেকে প্রকাশিত।

হওয়া ও পরাজয় বরণ করাটা যতটা বিস্ময়কর, এক বছরের মধ্যে বিদ্যুত চমকের মত বিস্তৃত মুসলিম সাম্রাজ্যের ওপর তাদের ছেয়ে যাওয়া এবং মুসলিম জাহানকে তলোয়ারের শক্তিতে জয় করা মনে করি ততটা বিস্ময়কর নয়, এজন্য যে, হি. সপ্তম শতাব্দীর মুসলিম জাহান সে সব রোগ-ব্যাধি ও দুর্বলতার শিকার ছিল যা সাধারণত সভ্যতা ও সংস্কৃতির চরম উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করবার পর পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ভেতর জন্ম নেয় এবং সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীকে ভেতর থেকে ফোখলা করে ছাড়ে। অপরদিকে তাতারীরা ছিল প্রাণবন্ত, পরিশ্রমী, যাযাবর জীবনে অভ্যস্ত, খুন-পিয়াসী ও রক্তলোলুপ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, স্বীয় উত্থানের চরম মার্গে অবস্থানকালে এই অর্ধ-বন্য জাতিগোষ্ঠী তাদেরই হাতে বিজিত ও অসহায় মুসলমানদের ধর্মে দীক্ষা নিল যারা সর্বপ্রকার বস্তুগত ও রাজনৈতিক শক্তি খুইয়ে বসেছিল এবং যাদেরকে তারা (তাতারীরা) খুবই অবজ্ঞা ও ঘৃণার চোখে দেখত। অধ্যাপক টি. ডব্লিউ. আর্নল্ড তাঁর বিখ্যাত পুস্তক "Preaching of Islam"-এ এ সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করে লিখেছেন :

> কিন্তু ইসলাম তার অতীত শান-শওকতের ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে আবার মাথা তুলে দাঁড়াল এবং ইসলামের প্রচারক দল সেই বন্য মোগলদেরকে যারা মুসলমানদের ওপর জুলুম-নিপীড়ন চালাতে চেষ্টার এতটুকু কসুর করেনি— মুসলমান বানিয়ে নিল। এটি এমন একটি কাজ ছিল যা করতে গিয়ে মুসলমানদের ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কেননা তৎকালে আরও দু'টো ধর্ম (বৌদ্ধ ও খ্রিস্ট) মোগল ও তাতারীদেরকে তাদের ভক্তে ও অনুরক্তে পরিণত করতে সচেষ্ট ছিল। আর সে অবস্থাটাও খুবই বিস্ময়কর যে, যে সময়ে বৌদ্ধ, খ্রিস্ট ও ইসলাম ধর্ম প্রতিটিই সম্ভবত এই অত্যাচারী ও বন্য মোগলদেরকে নিজ নিজ আনুগত্যাধীনে টেনে আনবার চেষ্টায় নিয়োজিত ছিল যারা এই তিন ধর্মের অনুসারীদেরকেই পাইকারীভাবে হত্যা করেছিল, ইসলাম আপন পক্ষপুটে টেনে নেবে।[১]

ইসলামের পক্ষে এমত মুহূর্তে বৌদ্ধ ও খ্রিস্ট ধর্মের মুকাবিলা করা এবং মোগলদের এই দুই ধর্মের হাত থেকে বাঁচিয়ে স্বীয় অনুসারীতে পরিণত করা এমন একটি কর্ম ছিল যাতে সাফল্য লাভ করা বাহ্যত অসম্ভব মনে হচ্ছিল। মোগলদের এই প্রলয়ংকরী তুফানে মুসলমানদের মত আর কাউকেই এতটা ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়নি। সে সব বিখ্যাত শহর ও জনপদ যা এককালে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাদপীঠ ছিল এবং যেখানে এশিয়ার জ্ঞানী-গুণী ও মনীষীবৃন্দের

---

১. দা'ওয়াতে ইসলাম– (Preaching of Islam), মওলবী 'ইনায়তুল্লাহ অনূদিত, ২৪০-৪১ পৃ.।

বসতি ছিল, তার অধিকাংশই জ্বলে-পুড়ে ভস্মীভূত হয়েছিল। মুসলিম জ্ঞানী-গুণী পণ্ডিতবর্গকে হয় হত্যা করা হয়েছিল নতুবা ক্রীতদাসে পরিণত করা হয়েছিল।[১] মোগল শাসকগণ ইসলাম ভিন্ন আর সকল ধর্মের প্রতিই সদয় ও সহানুভূতিশীল ছিল। কেবল ইসলামের প্রতিই তারা চরম ঘৃণা ও শত্রুতাভাব পোষণ করত। চেঙ্গীয খান নির্দেশ দিয়েছিলেন, "যে সব লোক শরীয়ত-নির্দেশিত পন্থায় পশু যবাহ্ করবে তাদেরকে হত্যা কর।" উক্ত নির্দেশই কুবলাঈ খান তার শাসনামলে পুনরুজ্জীবিত করেন এবং তা ঠিকমত পালিত হচ্ছে কিনা– তা দেখবার জন্য সাম্রাজ্যের সর্বত্র গোয়েন্দা নিযুক্ত করেন। এভাবে সাত-সাতটি বছর ধরে মুসলমানদের ওপর নানারকম নির্যাতন ও উৎপীড়ন চালানো হয়। গরীব ও দরিদ্র লোকেরা এ সুযোগে ধন-সম্পদ জমা করে। ক্রীতদাসেরা স্বাধীনতা লাভের জন্য তাদের প্রভুদের নামে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করে।[২] গুয়ূক খাকানের শাসনামলে (১২৪৬-৪৮ খৃ.) যিনি তার সাম্রাজ্যের গোটা ব্যবস্থাপনাই দু'জন খ্রিস্টান মন্ত্রীর হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন, মুসলমানদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির শিকারে পরিণত করা হয়।[৩] চতুর্থ শাসক আরগূন খানও (১২৮৪-৯১ খৃ.) মুসলমানদের ওপর অমানুষিক জুলুম-নিপীড়ন চালান এবং বিচারালয়ে ও রাজস্ব বিভাগে রক্ষিত সব খাতক প্রজার মূলধন কেড়ে নেন এবং দরবারে তাদের আগমন বন্ধ করে দেন।[৪]

> এতসব সত্ত্বেও মোগল ও অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী যারা মোগলদের পরে এসেছিল, সেই মুসলমানদেরই ধর্ম গ্রহণ করে যাদেরকে একদা তারা নিজেদের পদতলে পিষ্ট করেছিল।[৫]

এ কাহিনী যতটা বিরাট ও হৃদয়বিদারক, ঠিক ততটাই আশ্চর্যজনকও যে, ইতিহাসে এর বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি কোন বিবরণ মেলে না এবং যে সব লোকের

---

১. মোগলেরা মুসলমানদের ওপর এমন জুলুম করেছিল যে, চীনা চিত্র প্রযোজকেরা যখন সিনেমার পর্দায় চিত্র প্রদর্শন করে সেখানে একটি ছবিতে দেখা যায়, শ্বেত শ্মশ্রুমণ্ডিত এক বৃদ্ধের আগমন ঘটছে যার গর্দান ঘোড়ার লেজের সঙ্গে বাঁধা আর ঘোড়াটা তাকে টেনে হিচড়ে নিয়ে ফিরছে। এ ছবি প্রকাশ করছে, মোগল অশ্বারোহীরা মুসলমানদের কিরূপ যন্ত্রণা দিয়েছিল (হাওয়ার্থ, ১ম খণ্ড, ১৫৯ পৃ.)।

২. হাওয়ার্থ, ১ম খণ্ড, ১১২, ৪৭৩ (যখন দেখা গেল যে, এই নির্দেশের ফলে মুসলিম বণিকদের দরবারে আগমন বন্ধ হয়ে গেছে এবং এর ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তখন এ নির্দেশ বাতিল করা হয়)।

৩. ঐ, ১ম খণ্ড, ১৬৫ পৃ.;

৪. দ্য গোয়েন, ৩য় খণ্ড, ২৬৫ পৃ.।

৫. দা'ওয়াতে ইসলাম, ২৪৫-৪৬ পৃ.।

হাতে এই বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছিল ইতিহাসের পাতায় তাদেরও বিশেষ কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। আল্লাহ্‌র যে সব একনিষ্ঠ বান্দা এই রক্তপায়ী তাতারী জাতিগোষ্ঠীকে ইসলামের ভক্ত অনুসারীতে পরিণত করেছিল তাঁদেরও খুব কম লোকের নাম দুনিয়াবাসী জানে। কিন্তু তাঁদের এই কর্ম কোন ইসলামী কর্মের চেয়ে আদৌ কম গৌরবজনক নয়। তাঁদের অনুগ্রহ কেবল মুসলমানদের ওপর নয়, বরং কেয়ামত অবধি গোটা মানবতার ওপরও বর্তাবে। কেননা তাঁরা বন্যতা ও বর্বরতার প্রতীক একটি জাতিগোষ্ঠীকে এমন একটি জাতিগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত করেন যারা ছিলেন শান্তি ও কল্যাণের প্রতীক, একক আল্লাহ্‌র পূজারী এবং রাহমাতুল্লিল-'আলামীন (সা)-এর প্রচারিত দীনের পতাকাবাহী।

চেঙ্গীয খানের মৃত্যুতে তার বিশাল সাম্রাজ্য তার চার পুত্রের মধ্যে চার ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রতিটি ভাগেই একযোগে ইসলামের প্রচার কার্য শুরু হয় এবং তাতারী খাকান (সম্রাট, রাজাধিরাজ) ও তাদের প্রচার ও প্রভাবের ফলে তাতারী জাতিগোষ্ঠী মুসলমান হতে শুরু করে, এমন কি এক শতাব্দীর ভেতর প্রায় সমগ্র তাতারী কওম মুসলমান হয়ে যায়। অধ্যাপক আর্নল্ড রেণটডদধভথ মত স্রফটব-এ এর অল্প-স্বল্প কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। চেঙ্গীয খানের জ্যেষ্ঠ পুত্র জূজী খানের রাজ্যে (যিনি সাম্রাজ্যের পশ্চিম অংশ সীরা দাদরার শাসক ছিলেন) ইসলাম প্রচারের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে আর্নল্ড লিখেছেন :

> মোগলদের ১ম বাদশাহ যিনি মুসলমান হয়েছিলেন তাঁর নাম ছিল বারাকা খান। ইনি ১২৫৬ খৃ. থেকে ১২৬৭ খৃ. পর্যন্ত সীরা দাদরার শাসক ছিলেন।[১] একদিন এই বাদশাহ এক কাফেলায় গিয়ে পৌঁছেন। ঐ কাফেলা বোখারা থেকে আসছিল। এর ভেতর দু'জন মুসলিম শ্রমিক ছিল। বারাকা খান তাদেরকে আলাদাভাবে ডেকে নিয়ে যান এবং ইসলাম সম্পর্কে তাঁদেরকে কিছু জিজ্ঞাসা করেন। মুসলমান দু'জন ইসলামের আরকান-আহকাম তথা ইসলামের শিক্ষা, নীতিমালা ও বিধি-বিধান তাঁর সামনে এত সুন্দরভাবে তুলে ধরেন যে, তিনি তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করেন। বারাকা খান তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে এ সম্পর্কে অবহিত করেন এবং তাঁকেও ইসলাম কবুল করতে বলেন। এরপর বারাকা খান প্রকাশ্যে তাঁর মুসলমান হবার ঘোষণা দেন।[১] ইসলাম কবুল করবার পর বারাকা খান মিসরের সুলতান রুক্‌ন উদ্দীন

১. ১২৬০ খৃ.-এ নজমুদ্দীন মুখতার আয-যাহেদী বারাকা খানের জন্য একটি বই লিখেন যার ভেতর রিসালতকে দলীল হিসাবে প্রমাণ করেন এবং মুসলমান ও খ্রিস্ট ধর্মের ভেতরকার ধর্মীয় বিতর্কের বর্ণনা দেন।

২. আবু'ল-গাযী তূম, ১৮১-৮৭ পৃ.।

বায়বার্সের সঙ্গে সমঝোতা করেন। এই সমঝোতার ফলে স্বয়ং মিসর সুলতান সীরা দাদরার দু'শ' মোগলকে খুবই খাতির-যত্ন করেন। এই মোগলদের কাহিনী এই যে, সীরা দাদরার শাসনকর্তা ও বাগদাদ বিজয়ী হালাকূ খানের মধ্যে শত্রুতা বৃদ্ধি পেলে হালাকূ খানের সৈন্যদলের এই দু'শ' মোগল সেখান থেকে পালিয়ে শাম এলাকায় চলে আসে। সেখান থেকে তাদেরকে পূর্ণ সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে কায়রোয় পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়। মিসর দরবারের পক্ষ থেকে তাদেরকে ইসলাম কবুলের আহ্বান জানানো হয়।[১] সুলতান রুকনুদ্দীন ঐ সব মোগলের ভেতর দু'শ' লোকের সঙ্গে তাঁর কতিপয় দূত প্রেরণ করেন এবং তাদের মারফত বারাকা খানের কাছে একটি চিঠিও পাঠান। এরা সীরা দাদরা থেকে কায়রো ফিরে এসে সুলতানকে সংবাদ দেয় যে, বারাকা খানের আমীরদের নিকট ও শাহযাদীর কাছে একজন করে ইমাম ও মুয়াযযিন নিযুক্ত আছেন এবং বাচ্চাদের মকতবে কুরআন শরীফ পড়ানো হচ্ছে।[২] সুলতানকে তারা এও বলে, "আমরা যখন কায়রো থেকে রওয়ানা হয়েছিলাম তখন পথিমধ্যে বারাকা খানের দূতের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাত হয়।[৩] দূত মিসরের সুলতান সমীপে এই সংবাদ দেবার জন্য হাযির হয়েছিল যে, বারাকা খান ও তাঁর প্রজাবর্গ মুসলমান হয়ে গেছেন।" মোট কথা, বারাকা খান ও সুলতান রুকনুদ্দীনের ভেতর ঐক্য ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হবার পর সীরা দাদরারও বহু মোগল মিসরে আগমন করে। এখানে তারা ইসলাম সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সুযোগ পায় এবং আগ্রহের সাথে ইসলাম গ্রহণ করে।[৪]

তাতারী সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় ভাগে অর্থাৎ ঈলখানিয়া শাসনাধীন এলাকায় ইসলাম প্রচার সম্পর্কে আর্নল্ড লিখেছেন :

ইরানে হালাকূ খান ঈলখানিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। এ সময় তুর্কীদের ভেতর ক্রমান্বয়ে ইসলামের প্রচার শুরু হয়। হালাকূ খানের পুত্র তেকূদার[৫] তদীয় ভ্রাতা বাকা খানের স্থলাভিষিক্ত হন। ঈলখানিয়া রাজবংশের ইনিই প্রথম বাদশাহ যিনি ইসলাম কবুল করেন। সে যুগের একজন খ্রিস্টান লেখক লিখেছেন[৬] যে, তেকূদারের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ হয়েছিল খ্রিস্ট ধর্মের ওপর। শৈশবে তাঁকে ব্যাপ্টাইজড় করা হয়েছিল এবং তাঁর নাম রাখা হয়েছিল

১. মাকরিযী, ২১ তূম, ১৮০, ৮১, ৮৭ পৃ.।
২. ঐ, ২১৫ পৃ.।
৩. ঐ, ১১৮ পৃ.।
৪. ঐ, ২২২ পৃ.।
৫. ওয়াসসাফ এই বাদশাহ্র নাম মুসলমান হবার আগে তেকুদার এবং মুসলমান হবার পর আহমদ লিখেছেন।
৬. হায়ছুম-(রামোসিভ তূম, ২য় খণ্ড, ৬০ পৃ.।

নিকোলাস। তেকূদার যৌবনে পদার্পণ করবার পর মুসলিম সাহচর্যের প্রভাবে খ্রিস্ট ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর ইসলামী নামকরণ করা হয় সুলতান মুহাম্মদ (আহমদ)। তিনি খুবই সচেষ্ট ছিলেন যাতে করে গোটা তাতারী জাতিগোষ্ঠী ইসলাম কবুল করে। এর জন্য তিনি লোকদেরকে পুরস্কার, সম্মানসূচক ডিগ্রী ও ক্ষমতা প্রদান করেন। তাঁর আমলে বহু তাতারী ইসলাম গ্রহণ করে। এই বাদশাহ্ মিসরের সুলতানকে নিম্নোক্ত পত্রের মাধ্যমে তাঁর মুসলমান হবার সংবাদটি জানিয়েছিলেন :

"আল্লাহ্র শক্তি ও কাআনের সৌভাগ্যে সুলতান আহমদের ফরমান মিসরের সুলতানের নামে প্রেরিত হচ্ছে। পর সমাচার এই যে, আল্লাহ্ পাক তাঁর অসীম অনুগ্রহে ও হিদায়াতের আলোকে যৌবনের প্রারম্ভেই আমাদেরকে তাঁর সার্বভৌমত্ব ও ওয়াহ্দানিয়াত স্বীকার, মুহাম্মদ (সা)-এর নবূওতকে সত্য বলে বিশ্বাস এবং স্বীয় বন্ধু ও নেক বান্দাদের সম্পর্কে শুভ ধারণা পোষণ করবার তওফীক দিয়েছেন। তিনি যাকে হিদায়াতের উজ্জ্বল রাজপথে টেনে আনতে চান তার মন-মানসকে ইসলাম কবূল করবার জন্য উন্মুক্ত করে দেন। আমরা সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত ইসলামের গৌরব বৃদ্ধি এবং ইসলাম ধর্ম ও মুসলমানদের পারস্পরিক ব্যাপারগুলো সংশোধন করবার জন্য আগ্রহ পোষণ করে আসছি। আমার মহান পিতা ও শ্রদ্ধেয় ভ্রাতার পক্ষ থেকে আমাদের কাছে রাজ্য শাসনের সুযোগও এসে পৌঁছেছে এবং আল্লাহ্ তাঁর অসীম মেহেরবানীতে আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছেন এবং রাজত্ব ও সাম্রাজ্য দান করেছেন। অতঃপর পবিত্র কুরবুলতাঈ (কুরেলতাই)-এর যদ্দ্বারা আমি এমন একটি মজলিস বোঝাতে চাচ্ছি যেখানে সমস্ত স্বগোত্রীয় ও স্বধর্মীয় আত্মীয়-বান্ধব, বড় বড় আমীর ও ফৌজের অধিনায়কগণ পরামর্শের জন্য বৈঠকে মিলিত হন– সবাই একবাক্যে স্বীকার করেছে যে, আমাদের শ্রদ্ধেয় ভ্রাতার নির্দেশে সেনা অভিযান চালানো হবে এবং আমাদের ফৌজের ভেতর থেকে, যাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে বিস্তৃত ভূখণ্ডও সংকীর্ণ হয়ে গেছে এবং যাদের প্রচণ্ডতা ও ভয়াবহতায় সবার অন্তর কেঁপে উঠেছে, একটি বিরাট অংশকে চতুর্দিকে পাঠাতে হবে। এই সেনা অভিযান এমন সুদৃঢ় ইচ্ছা ও অভিপ্রায় নিয়ে পাঠাতে হবে যার সম্মুখে সুউচ্চ পাহাড়ও মাথা হেঁট করবে, কঠিন প্রস্তরও হয়ে পড়বে দ্রবীভূত। আমরা এ নিয়ে ভেবে দেখেছি। ইসলামের রীতিনীতি ও চাল-চলনের আমরা পুনরুজ্জীবন ঘটাতে চাই এবং আমাদের তরফ থেকে যে নির্দেশ ও বিধি-বিধান জারী হবে তার ফলে

রক্তপাত যেন থেমে যায়, মানুষের দুঃখ-কষ্টের যেন লাঘব হয়, পৃথিবীর চতুর্দিকে শান্তি ও নিরাপত্তার আবহাওয়া যেন বিরাজ করে এবং বিভিন্ন শহরের শাসকগণ আমাদের সদয় ও কোমল আচরণের কারণে যেন আরাম পায়। কেননা আমরা আল্লাহ্‌কে সম্মান করি, ভক্তি করি; আমরা তাঁর সৃষ্টিকুলের প্রতি মেহেরবান। এজন্য আল্লাহপাক আমাদের অন্তর রাজ্যে এভাবের উদয় ঘটিয়েছেন যেন আমরা প্রজ্জ্বলিত অগ্নি নির্বাপিত করি এবং ফিতনা-ফাসাদ তথা পৃথিবীর অশান্তি ও বিপর্যয় দূর করি। যারা এ ব্যাপারে একমত আমরা যেন তাদেরকে আমাদের কর্মপন্থা সম্পর্কে অবহিত করি, যদ্দ্বারা বিশ্বের জ্বরা-ব্যাধি ও জ্বালা-যন্ত্রণা দূর হবার আশা করা যায় এবং যা সর্বাগ্রে বাস্তবায়িত করতে আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। এ কারণেই আমরা তীরের ফলক সক্রিয় করে তুলতে এবং ধনুকে ছিলা সংযোজন করতে তাড়াহুড়ো করি না এবং যতক্ষণ না সত্য প্রকাশ পায়, দলীল-প্রমাণ সবল ও শক্তিশালী হয় আমরা কোন কিছুর অনুমতি দেই না। শায়খু'ল-ইসলাম কু'দওয়াতু'ল-'আরিফীনের উপদেশ আমাদের এই ইচ্ছা ও অভিপ্রায়কে সুদৃঢ় ও পাকাপোক্ত করে দিয়েছে। অনন্তর আমরা একটি ফরমান জারী করেছি যা মান্যকারীর জন্য আল্লাহ্‌র রহমত এবং অমান্যকারীর জন্য আল্লাহ্‌র আযাব হিসাবে বিবেচিত হবে। আমরা এই ফরমান মান্যকারীদের উদ্দেশ্যে কাযীউ'ল-কুযাত কুত্‌বুদ্দীন শীরাযী ও আতাবেক বাহাউদ্দীন, যিনি এই সালতানাতের একজন সম্মানিত সদস্য–কে পাঠিয়েছি যাতে তাঁরা লোকদেরকে নামাযের তরীকা সম্পর্কে অবহিত করেন এবং সমগ্র মুসলমানদের ফায়দার জন্য যে কথা আমাদের মনে প্রচ্ছন্ন রয়েছে– সবাই যেন তা জানতে পারে। অধিকন্তু সবাইকে এও যেন জানিয়ে দেওয়া হয় যে, আল্লাহ্ আমাদেরকে অন্তর্দৃষ্টি ও হিদায়াত দান করেছেন এবং ইসলাম সে সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিয়েছে যা মুসলমান হবার আগে আমরা করেছি। এখন তো আল্লাহ্ আমাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন যেন আমরা সত্যের ও সত্য পথের পথিকদের অনুসরণ করি। অতএব, লোকের অন্তর-মানস যদি এমন দলীল-প্রমাণ চায় যদ্দ্বারা তারা আমাদের ওপর ভরসা করতে পারে এবং এমন প্রমাণপঞ্জীর দাবি জানায় যদ্দ্বারা সাফল্যের আশা করতে পারে তাহলে তারা যেন আমাদের সে সব শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার দিকে দৃকপাত করে যা পৃথিবীর বুকে সাধারণভাবে মশহূর হয়ে গেছে। কেননা আমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে ধর্মের পতাকা সমুন্নত করেছি এবং প্রতিটি নির্দেশ জারী করতে উক্ত আদর্শের প্রতি

লক্ষ্য রেখেছি এবং শরীয়তে মুহাম্মদীর কানূনগুলো তার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহামর্যাদার দাবি মাফিক ন্যায় ও সুবিচারের ভিত্তিতে জারী করেছি। আমরা আমাদের সমস্ত প্রজার অন্তর প্রসন্ন করেছি। যাদের থেকে ইতোপূর্বে কোন মন্দ ও অন্যায় আচরণ পরিদৃষ্ট হয়েছে তাদের সবাইকে আমরা মাফ করে দিয়েছি। আল্লাহ্ও তাদের অতীতের সব গোনাহ্-খাতা মাফ করে দিন। আমরা মুসলমানদের ওয়াক্ফ সম্পত্তির, যার ভেতর মসজিদ, মাদরাসা ও কবরস্থান শামিল, সংস্কার করেছি এবং সমস্ত দাতব্য প্রতিষ্ঠান, মেহমানখানা– যেগুলো একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল, পুনরায় আবাদ করেছি। ওয়াক্'ফ সম্পত্তির-আয়-আমদানি আগের নিয়ম মাফিক ও ওয়াক্'ফকারীর শর্তমাফিক হকদারকে পৌঁছে দিয়েছি। আমরা নির্দেশ দিয়েছি যে, আমাদের প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ হাজীদের ব্যাপারটাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেবে, তাদের জন্য সফরের প্রয়োজনীয় উপকরণের ব্যবস্থা করবে, যে সব রাস্তা দিয়ে তারা হজ্জ করতে যাবে সেগুলো আবাদ ও নিরাপদ রাখবে এবং হাজীদের কাফেলা পরিপূর্ণ আরামের সঙ্গে রওয়ানা করবার ব্যবস্থা করবে। আমরা সকল সওদাগরকে যারা আমাদের দেশে যাতায়াত করে থাকে, পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছি যে, তারা যেভাবে খুশি সফর করবে। ফৌজ, কোতওয়াল ও সান্ত্রীদেরকে, যারা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত, কঠোরভাবে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে তারা যেন সওদাগরদের যাতায়াত ও চলাচলের ক্ষেত্রে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না করে। এসব কিছু এজন্য করা হয়েছে যাতে দেশ ও শহরগুলো সজীব হয়ে ওঠে, ফেতনা-ফাসাদ দূরীভূত হয়, তলোয়ার কোষবদ্ধ থাকে, রাষ্ট্রের অধিবাসীবৃন্দ আরাম-আয়েশের সঙ্গে কাল কাটায় এবং মুসলমানদের গর্দান লাঞ্ছনা-গঞ্জনার হাত থেকে রেহাই পায়।"[১]

মোগল ইতিহাসের পাঠক সে সব জুলুম ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনা, যা মোগল ও তাতারীরা সৃষ্টি করেছিল, অধ্যয়ন করার পর যখন এই ফরমান অধ্যয়ন করবেন তখন খুবই আরাম অনুভব করবেন এবং সেই সঙ্গে বিস্মিতও হবেন এই দেখে যে, একজন মোগল শাসকের মুখ দিয়ে এ ধরনের বদান্যতা ও মানবীয় সহানুভূতির কথা প্রকাশ পাচ্ছে।[২]

---

১. ওয়াসসাফ–২৩১, ২৩৪ পৃ.।
২. দা'ওয়াতে ইসলাম–২৪৮, ২৫১ পৃ.।

১২৮৪ খ্রিস্টাব্দে তেকূদার আহমদের বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এর নেতৃত্ব দিয়েছিল আরগুন খান। তেকূদারকে সে হত্যা করে এবং নিজেই রাজমুকুট ও শাহী তখতের মালিক হয়ে বসে। আরগুনের কয়েক বছরের শাসনামলে (১২৮৪-৯১ খৃ.) খ্রিস্টানদের ওপর পুনরায় সাম্রাজ্যের পক্ষ থেকে অনুগ্রহ বর্ষণ শুরু হয়, আর মুসলমানদের ভাগ্যে নেমে আসে দুর্ভাগ্যের অমানিশা। সরকারী চাকুরি-বাকুরি ও বিভিন্ন পদ থেকে তাদের অপসারণ করা হয়।[১] ১২৯৫ খ্রি. পর্যন্ত তেকূদারের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিগণ প্রাচীন শামান ধর্মেরই অনুসারী থাকে। অবশ্য তাদের ৭ম বাদশাহ গাযান ১২৯৫ সনে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইনি ছিলেন ঈলখানিয়া বংশের সর্বাধিক প্রভাবশালী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শাসক। তিনি ইসলামকে ইরানের শাহী ধর্ম বলে ঘোষণা করেন।

মুসলমান হবার আগে সুলতান গাযানের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ হয়েছিল বৌদ্ধ ধর্মের ওপর। এই বাদশাহ খুরাসানে বৌদ্ধদের জন্য মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মের জ্ঞানী-গুণী, পণ্ডিত ও ভিক্ষুদের সাহচর্যে তিনি খুবই আনন্দ পেতেন। মোগল শাসন যখন সৌভাগ্যের মধ্যাহ্ন গগনে– এসব লোক তখন বিরাট সংখ্যায় ইরানে চলে এসেছিল।[২] সুলতান গাযানের বিভিন্ন ধর্মের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধানের ব্যাপারে খুবই আগ্রহ ছিল এবং প্রতিটি ধর্মের জ্ঞানী-গুণী ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে তিনি ধর্ম নিয়ে আলোচনা করতেন।[৩] গাযানের উযীর ও সে যুগের একজন ঐতিহাসিক হাকীম রশীদুদ্দীনের এ ধারণা অনেকটা সঠিক বলে মনে হয় যে, সুলতান গাযান খালেস নিয়ত ও সরল বিশ্বাসে মুসলমান হন এবং তিনি তাঁর গোটা রাজত্বকালে ইসলামের অত্যন্ত পাবন্দ থাকেন।[৪]

ঐতিহাসিক ইবনে কাছীরও ৬৯৪ হি. ঘটনাবলীর ভেতর গাযানের ইসলাম গ্রহণের আলোচনা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে করেছেন। তাঁর ও অপরাপর ঐতিহাসিকের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, এর সার্বিক কৃতিত্ব সৎ অন্তঃকরণবিশিষ্ট মুসলিম তুর্ক আমীর তূযূন[৫]-এর যাঁর শিক্ষা ও প্রচেষ্টার ফলে তাতারী সুলতান

১. দ্য গীবন–৩য় খণ্ড–২৬৩, ২৬৫।
২. হাউসন–তৃম ৪. পৃ. ১৪৮।
৩. ঐ, ৩৬৫।
৪. দা'ওয়াতে ইসলাম, ২৫৩ পৃ.।
৫. আর্নল্ড ও অপরাপর ঐতিহাসিক তাঁকে নওরোয বেগ নামে স্মরণ করে থাকেন।

ইসলাম কবূল করেন। ইবনে কাছীর ৬৯৪ হিজরীর ঘটনাবলীর ভেতর লিখেছেনঃ

এ বছর চেঙ্গীয খানের প্রপৌত্র কাযান ইবন আরগূন ইবন ঈগা ইবন তূলী ইবন চেঙ্গীয খান তাতারীদের বাদশাহ্ হন এবং আমীর তূযূন (র)-এর হাতে প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাতারীরা প্রায় সকলেই অথবা তাদের বেশির ভাগই ইসলামে প্রবেশ করে। যেদিন বাদশাহ্ ইসলাম কবূল করেন সেদিন স্বর্ণ-রৌপ্য ও মোতি মানুষের ওপর বর্ষণ করা হয়। বাদশাহ্ তাঁর নাম রাখেন মাহমূদ। জুমু'আ ও খুতবায় তিনি শরীক হন। বহু মন্দির ও গির্জা তিনি ধ্বসিয়ে দেন এবং অমুসলিমদের ওপর জিযিয়া ধার্য করেন। বাগদাদ ও অপরাপর শহর থেকে ছিনতাইকৃত জিনিসপত্র ফেরত দেওয়া হয়। লোকেরা তাতারীদের হাতে তসবীহমালা দেখে আল্লাহ্র অপার অনুগ্রহ ও বদান্যতার জন্য তাঁর শুকরিয়া আদায় করে।[১]

আর্নল্ড লিখেছেন :

১৩০৪ খৃস্টাব্দে বাদশাহ্ গাযানের ভাই সুলতান ইব্ন মুহাম্মাদ খোদা-বান্দাহ্র নামে ইরানের সিংহাসনে উপবেশন করেন। এই সুলতানের মা ছিলেন একজন খ্রিস্টান মহিলা এবং তাঁর শৈশবের শিক্ষা-দীক্ষাও হয়েছিল খ্রিস্টীয় পরিবেশে। নিকোলাস নামে তাঁকে ব্যাপ্টাইজ্ড করা হয়েছিল। কিন্তু মার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাঁর স্ত্রীর কথামত মুসলমান হয়ে যান। ইবনে বতূতা বলেন যে, নিকোলাস খানের অর্থাৎ খোদা বান্দাহ্র মুসলমান হবার ফলে মোগলদের ভেতর বিরাট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।[২] মোট কথা, সেদিন থেকে ঈলখানিযা রাজবংশে ইসলাম অপরাপর সকল ধর্মের ওপর প্রাধান্য লাভ করে।[৩]

এ বংশের তৃতীয় শাখার মধ্যে, যারা মধ্যঅঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ জাঁকিয়ে বসেছিল এবং যাদের রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন চুগতাঈ ইবনে চেঙ্গীয খান, ইসলাম প্রচারের অবস্থা সম্পর্কে আর্নল্ড লিখেছেন :

মধ্যভূখণ্ড চেঙ্গীয-পুত্র চুগতাঈ খান ও তার বংশধরদের ভাগে পড়েছিল। এখানে কিভাবে ইসলাম প্রচার লাভ করেছিল সে সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। ১ম বাদশাহ্ যিনি ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন তাঁর নাম ছিল বুরাক খান। ইনি ছিলেন চুগতাঈ খানের প্র-পৌত্র। সিংহাসনে আরোহণ

১. আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া-১৩শ খণ্ড, ৩৪০ পৃ.।
২. ইবনে বতূতা, ২য় খণ্ড, ৫৭ পৃ.।
৩. দা'ওয়াতে ইসলাম—২৫৪ পৃ.।
৪. আবু'ল-গাযী তূম, ১৫৯।

করবার দু'বছর পর তিনি সুলতান গিয়াছুদ্দীন (১২৬৬-৭০ খৃ.) নাম ধারণ করে মুসলমান হন।[৪] প্রথম দিকে এখানে ইসলামের উন্নতি ও প্রসার খুব একটা হয়নি। কেননা বুরাক খানের মৃত্যুর পর যে সমস্ত মোগল মুসলমান হয়েছিল তারা পুনরায় তাদের প্রাচীন পৈত্রিক ধর্মে ফিরে গিয়েছিল এবং খৃস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত এ অবস্থার উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন ঘটেনি। অবশ্য তর মুশীরীন খান (রাজত্ব ১৩২২-৩০ খৃ.) যে সময় মুসলমান হন তখন চুগতাঈ মোগলেরা সাধারণভাবে ইসলাম কবূল করে। এরপর তারা যখন একবার তাদের বাদশাহ্র অনুকরণে ইসলাম কবুল করল তখন তারা দৃঢ় চিত্তে তাতে কায়েম থাকল। কিন্তু সে বছরও ইসলামের পক্ষে অপরাপর ধর্মের ওপর– যেগুলো ছিল সরাসরি ইসলামের প্রতিপক্ষ, প্রাধান্য লাভ করা নিশ্চিত ছিল না। তর মুশীরীন-এর স্থলাভিষিক্তগণ মুসলমানদের ওপর জুলুম-নির্যাতন চালাতে শুরু করে এবং যতদিন পর্যন্ত না কাশগরের বাদশাহ্, যার সাম্রাজ্য চুগতাঈ সাম্রাজ্যের বিভক্তি ও দুর্বলতার কারণে স্বায়ত্তশাসিত হয়ে গিয়েছিল, ইসলামের সমর্থনে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে ততদিন পর্যন্ত ইসলামের উন্নতি সম্ভব হয়নি। কাশগরের সুলতান তুগলক তায়মূর (১৩৪৭-৬৩)-এর মুসলমান হওয়া সম্পর্কে লিখিত আছে যে, বুখারা থেকে শায়খ জামালুদ্দীন নামক একজন বুযুর্গ কাশগর আগমন করেন এবং তিনিই তুগলক তায়মূরকে ইসলামে দীক্ষিত করেন। শায়খ জামালুদ্দীন ও তাঁর সঙ্গী-সাথিগণ সফর করছিলেন। এমতাবস্থায় অজ্ঞাতসারে তাঁরা তুগলকের মৃগয়া শিকার ক্ষেত্রে ঢুকে পড়েন। এই অপরাধে তাদের সবাইকে দড়ি দিয়ে বেঁধে বাদশাহ্র সামনে হাযির করা হয়। বাদশাহ্ ক্রোধ-ভরে তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করেন, "তোমরা কেন বিনানুমতিতে আমার ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছ?" উত্তরে শায়খ (র) জানান, "আমরা এ দেশে অপরিচিত ভিন দেশী মুসাফির। আমরা আদৌ জানতে পারিনি যে, আমরা এমন এক ভূখণ্ডে এসে পড়েছি যার ওপর লোক চলাচল নিষিদ্ধ।" বাদশাহ্ যখন জানত পারলেন যে, লোকগুলো ইরানী, তখন তিনি বললেন, "ইরানীদের চেয়ে কুকুরও অনেক ভালো।" শায়খ (র)-এর ত্বরিৎ জওয়াব দেন : "বাদশাহ্ সত্য কথাই বলেছেন। আমাদের কাছে যদি সত্য-সঠিক একটি ধর্ম না থাকত তাহলে আসলেই আমরা কুকুরের চেয়েও নিকৃষ্ট ছিলাম।" শায়খ (র)-এর জওয়াবে তুগলক তায়মূর অত্যন্ত হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন এবং নির্দেশ দেন, "আমরা যখন শিকার শেষে ফিরে আসব তখন এই ইরানীদেরকে যেন আমার সামনে হাযির করা হয়।" অনন্তর শায়খ

(র)-কে বাদশাহ্‌র সম্মুখে উপস্থিত করা হলে বাদশাহ্ শায়খ জামালুদ্দীনকে আলাদা ডেকে নিয়ে বলেন : তুমি সে সময় যা বলেছিলে, আমাকে তা এবার বুঝিয়ে বল। সত্য-সঠিক ধর্ম বলতে তুমি কি বোঝাতে চাও? এতদ্‌শ্রবণে শায়খ (র) ইসলামের আরকান-আহকাম এমন আবেগময় ভাষায় তুলে ধরেন যে, তুগলক তায়মূরের পাষাণ অন্তরও মোমের মত গলে যায়। শায়খ (র) কুফরী অবস্থার এমন ভয়াবহ ও ভীতিপ্রদ ছবি বাদশাহ্‌র সামনে অংকন করেন যে, বাদশাহ্ এতদিনে যে অন্ধকারে ঘুরপাক খাচ্ছিলেন তা পরিষ্কার হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হন। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি বলেন ঃ এখনই যদি আমি আমার ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেই তাহলে আমি আমার প্রজাবৃন্দকে সত্য-সঠিক পথে নিয়ে আসতে সক্ষম হব না। এজন্য কিছুদিনের জন্য তুমি মৌনতা অবলম্বন কর। আমি যখন পিতৃ-সিংহাসনে উপবেশন করব এবং আমি যখন এ দেশের মালিক হব সে মুহূর্তে তুমি আমার সকাশে উপস্থিত হবে এবং আমার সঙ্গে দেখা করবে। চুগতাঈ সাম্রাজ্য খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। অনেকগুলো বছরের কঠিন চেষ্টা ও কঠোর সাধনার ফলে তুগলকে তায়মূর সেসব খণ্ড রাজ্যকে একই পতাকাতলে সমবেত করে পুনরায় বিশাল চুগতাঈ সাম্রাজ্যের ন্যায় একটি বিরাট সাম্রাজ্য কায়েম করতে সক্ষম হন। ইতোমধ্যে শায়খ জামালুদ্দীন স্বদেশে পাড়ি জমান এবং দেশে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ইনতিকালের মুহূর্ত ঘনিয়ে এলে তিনি পুত্র রশীদুদ্দীনকে বলেন ঃ বৎস! তুগলক তায়মূর একদিন বিরাট বাদশাহ্ হবেন। সে সময় তুমি তাঁর কাছে যাবে এবং বাদশাহ্‌কে আমার সালাম জানিয়ে নির্ভয়ে ও নিঃশংক চিত্তে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেবে, আমার সঙ্গে তিনি একদিন কি ওয়াদা করেছিলেন?

কয়েক বছর পর তায়মূর পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। এ সময় একদিন রশীদুদ্দীন বাদশাহ্‌র সেনাবাহিনীতে গিয়ে উপস্থিত হন। পিতার অন্তিম নির্দেশ পালনই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু বহু চেষ্টা-তদবীর সত্ত্বেও তিনি বাদশাহ্‌র দরবারে হাযিরা দিতে ও সাক্ষাৎ লাভে ব্যর্থ হন। শেষে ব্যর্থ হয়ে তিনি এক কৌশল অবলম্বন করেন। একদিন ভোরবেলা তিনি তুগলকের তাঁবুর কাছাকাছি গিয়ে সজোরে আযান দিতে শুরু করেন। এতে বাদশাহ্‌র ঘুম ভেঙে যায় এবং তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে রশীদুদ্দীনকে ডেকে পাঠান। রশীদুদ্দীন হাযির হয়ে স্বীয় পিতার পয়গাম তুগলক সমীপে পেশ করেন। তুগলক আগে থেকেই তাঁর প্রতিজ্ঞার ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ কলেমা পাঠান্তে মুসলমান

১. আর্নল্ডকৃত দা'ওয়াতে ইসলাম–২৫৬ পৃ.।

হন এবং এরপর তাঁর সাম্রাজ্যের প্রজাবর্গের মাঝে তিনি ইসলাম প্রচার করেন। তাঁর আমলেই সেসব দেশে ইসলাম রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা পায় যেসব দেশ চেঙ্গীযপুত্র চুগতাঈ-এর বংশধরদের অধীনে ছিল।[১]

কতক তুর্কী ঐতিহাসিকের ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে যে, তুগলক তায়মূর তাঁর শিকারী কুকুরের দিকে ইশারা করে অত্যন্ত ঘৃণাভরে শায়খ জামালুদ্দীন (র)-কে জিজ্ঞেস করেন, "এটা উত্তম না তুমি?" শায়খ (র) অত্যন্ত নির্বিকার প্রশান্তির সঙ্গে জওয়াব দেন, "যদি আমি দুনিয়ার বুক থেকে ঈমানের সঙ্গে চলে যেতে পারি তাহলে আমি উত্তম, অন্যথায় ঐ কুকুরটি।" তুগলক তায়মূরের গভীর অন্তর-মূলে এ কথা অনুপ্রবিষ্ট হয়। তিনি এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং জানতে চান, "ঈমান কাকে বলে?" শায়খ (র) এরপর ঈমানের হাকীকত বয়ান করেন। এরপর তুগলক তায়মূর এই মর্মে তার আগ্রহ ব্যক্ত করেন, তিনি যেন তার সিংহাসন আরোহণের পর তাঁকে সাক্ষাৎ দানে ধন্য করেন।

যা-ই হোক, এতটুকু সুনিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, তুগলক তায়মূরের ইসলাম গ্রহণ এবং সরাসরি কাশগর ও চুগতাঈ সাম্রাজ্যে ইসলামের প্রচারের বাহ্যিক কারণ শায়খ জামালুদ্দীন– যাঁর অন্তরের গভীর কন্দর থেকে নিঃসৃত একটি সংক্ষিপ্ত বাক্য, তাঁর ঈমানী কুওত, ইখলাস ও অন্তরের দরদ সেই কর্মটি সম্পাদন করেছে যা হাযারো বক্তৃতা ও লক্ষ উপদেশও করতে পারত না।

جزاه الله عن الاسلام ونبيه خير الجزاء .

চেঙ্গীয খানের চতুর্থ শাখা সম্পর্কে (যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ঊগতাঈ খান, যে শাখায় মঙ্গু খান ও কুবলাঈ খানের মত নামকরা শাসক জন্মেছেন এবং যারা বিশাল তাতারী সাম্রাজ্যের পূর্বাংশের দখলদার ছিলেন) আর্নল্ড লিখেছেন :

> গোটা মোগল সাম্রাজ্যের সবখানেই এমন সব মুসলমান বর্তমান ছিলেন যাঁরা বিধর্মীদেরকে গোপনে মুসলমান করে নিতেন। ঊগতাঈ খান (১২২৯-৪১ খৃ.)-এর শাসনামলে ইরানের শাসনকর্তা কিরঘিস প্রথমত বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী ছিলেন। অতঃপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।[১] তায়মূর খানের আমলে (১২২৯-৪১ খৃ.) চীনের কানসুয়া প্রদেশের শাসনকর্তা কুবলাঈ খানের পৌত্র খানে আনন্দা ইসলাম কবুল করেন এবং তাঙ্গুত-এ বহু লোককে তিনি ইসলামে দীক্ষা দেন। যে সব ফৌজ তাঁর অধীনে ছিল তাদের অধিকাংশই মুসলমান হয়ে যায়। তায়মূর খান আনন্দা

১. হাউসেন–৩য় খণ্ড, ১২১ পৃ.।

খানকে তাঁর দরবারে ডেকে পাঠান এবং তিনি যাতে ইসলাম পরিত্যাগ করে বৌদ্ধ ধর্মে ফিরে আসেন তার চেষ্টা চালান। কিন্তু তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় তা অস্বীকার করেন। তাঁকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অল্পকাল পরেই আনন্দা খানকে মুক্তি দেওয়া হয়। কেননা তাঙ্গুতের প্রজাবৃন্দ তাদের জনপ্রিয় শাসকের বন্দীত্বের কারণে বিদ্রোহী হয়ে উঠছিল।[১]

মোট কথা, এভাবেই গোটা তাতারী জাতিগোষ্ঠী, যারা এককালে সমগ্র মুসলিম জাহানকে ধ্বংস করে দিয়েছিল এবং যাদের সামনে কোন মুসলিম শক্তিই তিষ্ঠাতে পারত না, মাত্র কয়েক বছরের ভেতরই ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়। এভাবে ইসলাম আর একবার প্রমাণ করল যে, সে তার শত্রুকে জয় করবার এবং তাকে প্রেমের জালে আবদ্ধ করবার অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা রাখে। তাতারীরা কেবল নামে মাত্র মুসলমান হয়নি, তাদের ভেতর বিরাট বড় মুজাহিদ, খ্যাতনামা 'আলিম ও ফকীহ এবং বড় বড় আল্লাহ্ওয়ালা দরবেশও জন্ম লাভ করেছেন, যাঁরা বহু নাযুক মুহূর্তে ইসলামের মুহাফিজ হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন।

ہے عیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے

پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے

তাতারদের সৃষ্ট বিপর্যয় থেকে এ কথা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত যে, মন্দির থেকে কা'বা তাঁর রক্ষক খুঁজে পেয়েছে।

১. ঐ তূম ২য়, ৫৩২-৩৩ পৃ.।

চতুর্দশ অধ্যায়

মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (র)

ইলমে কালাম ও বুদ্ধিবৃত্তির সংকট

হি.সপ্তম শতাব্দীতে গোটা মুসলিম জাহান 'ইলমে কালামের চর্চায় ও আলোচনা-সমালোচনায় গুঞ্জরিত হচ্ছিল। যে ব্যক্তি 'ইলমে কালামের পরিভাষ এবং মু'তাযিলা ও আশ'আরী, অতঃপর আশ'আরী ও হাম্বলীদের মধ্যকা বিতর্কমূলক বিষয়াবলী সম্পর্কে অবহিত না হতেন- তাকে লেখাপড়া জানা লো বলেই গণ্য করা হ'ত না। এ শতাব্দীরই প্রথম ভাগে (৬০৬ হিজরীতে) ইমাম রা ইনতিকাল করেন, যিনি 'ইলমে কালামের বাঁশী এত উচ্চ স্বরে ফুঁকেছিলেন যে এর সুমধুর সুর-লহরী ছাড়া আর কোন আওয়াজই শ্রুতিগোচর হ'ত না। মুসলি জাহানের পণ্ডিত ও চিন্তাশীল মহল প্রমাণপঞ্জী ও কল্পনা-কিয়াসে ছিলেন অভ্যস্ত কোন জিনিসের অস্তিত্ব, কোন বস্তুর হাকীকত ও ধর্মের কোন 'আকীদা-বিশ্বাসকে ততক্ষণ পর্যন্ত স্বীকার্য বলে গণ্য করা হ'ত না, যতক্ষণ না তা বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ- ী, তার্কিক বিন্যাস ও দার্শনিক সূত্র দ্বারা সপ্রমাণিত হ'ত।

আশ'আরীপন্থী মুতাকাল্লিমগণ সাধারণ জনজীবনে যদিও মু'তাযিল দার্শনিকদের ওপর জয়লাভ করেছিলেন এবং তাদের 'ইলমে কালামের মুকাবিলা মু'তাযিলা মতবাদ ও দর্শনের আওয়াজ স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মু'তাযিল মতবাদের রূহ ও বুদ্ধিবৃত্তি স্বয়ং তার বিজেতাকেই বিজিতে পরিণত ক ফেলেছিল। আশ'আরীদের 'ইলমে কালামে মু'তাযিলাদের বুদ্ধিপূজারী রূহ' আস জমিয়ে বসেছিল। তারাও বুদ্ধিকে এতখানি লাগামহীন স্বাধীনতা দিয়ে ফেলেছিলে যে, স্বয়ং আল্লাহ্র যাত (সত্তা) ও সিফাতের (গুণাবলীর) ন্যায় নাযুক ও বুদ্ধি অগম্য (বুদ্ধিবিরোধী নয়) বিষয়াবলীর আলোচনায়ও বুদ্ধির হস্তক্ষেপ চলত তারাও বাহ্যিকতা ও অনুভূতিকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে চূড়ান্ত বলে ধরে নিয়েছিলেন এ ধর্মীয় মাসলা-মাসাইলের সমর্থন ও বস্তুর হাকীকতের অস্তিত্বের حقائق اشياء کے (وجود বুনিয়াদও যুক্তি-তর্ক, প্রমাণপঞ্জী ও অনুমানের ওপর স্থাপন করেছিলে

ফলে সারা মুসলিম জাহানে শব্দের কচকচানি ও যুক্তি-তর্কের জোয়ার ব যায়। কথায় কথায় সব কিছুর পেছনে দলীল-প্রমাণ খোঁজার একটা প্রবণতা দে

দেয়। তবে সাধারণভাবে 'ইলমে কালামের চর্বিত চর্বণই চলে। বহুকাল ধরে তাতে কোন নতুনত্ব সৃষ্টি করা হয়নি। মুতাকাল্লিমদের ভেতর অনেক দিন থেকেই ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী কিংবা হুজ্জাতু'ল-ইসলাম ইমাম গাযালী (র)-এর মত কোন মুজতাহিদ ও আল্লাহ-প্রদত্ত প্রতিভার অধিকারী মনীষীর জন্ম হয়নি। চিন্তার কর্ষণ ও যুক্তি-তর্কের দাপাদাপি মস্তিষ্ককে যতই উদ্দীপনা দান করুক, অন্তরের উত্তাপ, দাহ ও বিশ্বাসের আলোকমালাকে তা ক্ষতিগ্রস্তই করেছিল। মুতাকাল্লিমগণ তাদের যুক্তি-তর্কের জোরে সমালোচকদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তা তাদের অন্তর-মানসকে ঈমান ও প্রশান্তি এবং সন্দেহবাদীদেরকে নিশ্চিত বিশ্বাস ও আস্থা দানে ব্যর্থ হয়। তাদের এ ধরনের যুক্তি-তর্ক ও আলোচনা পদ্ধতি মানুষের মন-মস্তিষ্কে শত রকমের জটা জাল বিস্তার করে যার গ্রন্থি উন্মোচনে 'ইলমে কালাম ছিল ব্যর্থ। সত্যানুভূতি যা ছিল 'ইল্‌ম ও ইয়াকীন লাভের বিরাট উৎস, তার দ্বার একেবারে রুদ্ধ হতে চলেছিল 'ইলমে কালামের প্রতি অব্যাহত অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য প্রদর্শনের কারণে। বাহ্যিক পঞ্চেন্দ্রিয় ভিন্ন অপর কোন অনুভূতির অস্তিত্ব স্বীকার করা হত না। এজন্য এমন বহু বিষয় যা ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতি ব্যতিরেকে অনুভব ও উপলব্ধি করা যায় না, সমালোচনার লক্ষ্যে পরিণত হয় এবং তা অস্বীকার করার প্রবণতাও সৃষ্টি হয়। মোট কথা, গোটা জাতিই কালামী সংকট তথা বুদ্ধিবৃত্তিক বাহ্যিকতায় নিমজ্জিত হয়। মুসলিম উম্মাহ্‌র কর্মশক্তি ও "প্রেমের উত্তাপ", যা ছিল তার পুঁজি ও শক্তির উৎস এবং নবুওতের বড় অবদান, শীতল হয়ে পড়ে। দার্শনিকসুলভ আলোচনা- সমালোচনা এবং ইলমে কালাম সংক্রান্ত বিতর্কের ঝড় মুসলিম জাহানকে এমন একটি শিক্ষাগারে পরিণত করে যেখানে কথামালা ছিল প্রচুর, কিন্তু 'জীবন, মুহব্বত, মা'রিফত ও চাহনী'র ছিল দারুণ অভাব। যাঁরা অন্তর্লোকের অধিকারী তাঁদের আধ্যাত্মিক দ্বীপ-উপদ্বীপগুলোতে প্রেমের আনন্দ ও ইয়াকীনের আলো অবশ্য পাওয়া যেত, অন্যথায় গোটা জগতটাই ছিল তখন কথামালার যাদুতে বন্দী এবং বাহ্যিক ও ইন্দ্রিয়ানুভূত শক্তির বশীভূত।

অন্তর-মানসের অধিকারী মুতাকাল্লিমের প্রয়োজন

এমতাবস্থায় মুসলিম জাহানের জন্য এমন একজন বুলন্দ ও শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন ছিল যিনি সহানুভূতিশীল অন্তর-মন ও সঠিক চিন্তা-ভাবনার অধিকারী, যাঁর মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তির সমুদ্র হেঁটে পার হবার যোগ্যতা রয়েছে, যাঁর

সম্মুখে শব্দ ও বাহ্যিক আড়ম্বরের উপকরণাদি ভেঙে খান খান হয়ে গেছে, যিনি তাঁর প্রেমের উত্তাপ ও হৃদয়ের দাহিকা শক্তি দ্বারা মরণোন্মুখ মুসলিম জাহানে নতুন জীবনের সঞ্চার করবেন, বুদ্ধির চিত্রশালায় 'ইশ্‌ক-এর শিঙ্গা ফুঁকবেন, যিনি এমন একটি নতুন 'ইলমে কালামের বুনিয়াদ রাখবেন যা মস্তিষ্ক থেকে শক্তির মহড়া প্রদর্শন এবং বিরুদ্ধবাদীদের যবান বন্দ করবার পরিবর্তে মস্তিষ্কের জড়তা দূর করে দেবে, অন্তরের গ্রন্থি উন্মোচন করবে এবং তাতে আনন্দ, তৃপ্তি, ঈমান ও ইয়াকীন ভরে দেবে। সত্যি কথা বলতে গেলে, তৎকালীন মওলানা জালালুদ্দীন রূমীই (মৃ. ৬৭২ হি.) ছিলেন সেই ব্যক্তিত্ব যাঁর মছনবী 'ইল্‌মে কালামের ভারসাম্যহীনতা ও বুদ্ধিবৃত্তি পূজার বিরুদ্ধে এক প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। তিনি এমন এক 'ইলমে কালামের বুনিয়াদের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা পরিবর্তিত মুসলিম জাহানের জন্য ছিল খুবই প্রয়োজনীয়।

সংক্ষিপ্ত অবস্থা

'মিরআতু'ল-মছনবী'র লেখক তাঁর অপ্রকাশিত রচনা 'সাহিবু'ল-মছনবী'তে মাওলানার জীবন-কথা অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে ও বিশ্লেষণ সহকারে লিখেছেন। এখানে তার সংক্ষিপ্তসার পেশ করা হচ্ছে।[১]

নাম ও পিতৃ পরিচয়

নাম মুহাম্মদ, উপাধি জালালুদ্দীন, মওলানা রূম বা রূমী ছিল জনপ্রিয় উপাধি। পিতার দিক দিয়ে তাঁর বংশ নবম ঊর্ধ্বতন পুরুষে গিয়ে হযরত আবূবকর সিদ্দীক (র)-এর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। তিনি মায়ের দিক দিয়ে হযরত 'আলী (রা)-র বংশের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন।

মওলানা রূমী (র)-র পিতা খুরাসানের[২] অন্তর্গত বলখের অধিবাসী ছিলেন। সেখানেই মওলানার জন্ম হয়। মওলানার পিতৃ ও মাতৃকুলে বড় বড় 'উলামায়ে

১. কাযী তালাম্মুয হুসায়ন গোরখপুরী মরহুম এই শেষ যুগে মছনবী ও তাঁর রচয়িতার বিরাট বড় ভক্ত ও একজন মুহাক্কিক 'আলিম ছিলেন। তাঁর গ্রন্থ 'মিরআতু'ল-মছনবী' সংশ্লিষ্ট সাহিত্যে একটি তুলনাহীন সৃষ্টি। 'মিরআতু'ল-মছনবী' ছাড়াও (এটি প্রকাশিত হয়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে) তাঁর আরো দু'টি বিশ্লেষণধর্মী রচনা রয়েছে যা অদ্যাবধি অপ্রকাশিত : (১) সাহিবু'ল-মছনবী, (২) নকদু'ল-মছনবী। এ দুটি পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হলে মওলানা রূমী (র)-র ওপর সাহিত্য- চর্চার ক্ষেত্রে আরও এক ধাপ অগ্রগতি সাধিত হবে এবং একটি মূল্যবান খিদমত হিসাবে বিবেচিত হবে। 'সাহিবু'ল-মছনবী' দারু'ল-মুসান্নিফীন থেকে প্রকাশের পথে। গ্রন্থকার তৎপুত্র তাওয়াক্কুল হুসায়ন-এর সৌজন্যে এই মূল্যবান কিতাব থেকে উপকৃত হবার এবং তাঁর থেকে উদ্ধৃত করবার সুযোগ পেয়েছেন। আল্লাহ পাক তাঁকে পুরস্কৃত করুন।

২. বর্তমানে আফগানিস্তানের অন্তর্গত। –নদভী

কিরাম ও শাসকের জন্ম হয়। মওলানার পিতামহী মালেকা-ই-জাহান ছিলেন খাওয়ারিয্‌ম শাহী বংশোদ্ভূতা।

মওলানার পিতার নামও ছিল মুহাম্মদ; উপাধি ছিল বাহাউদ্দীন ওয়ালাদ। তাঁর জন্ম সম্ভবত ৫৪৩ হিজরীতে। হযরত বাহাউদ্দীন ওয়ালাদ জীবনের নব প্রভাতেই সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শিতা অর্জন করেন। তাঁর জ্ঞান ও মর্যাদার অবস্থা ছিল এই যে, খুরাসানের দূর-দূরান্তর এলাকা থেকে জটিল ও কঠিন ফতওয়াদি তাঁরই নিকট আসত। তাঁর মজলিস ছিল শাহী মজলিসেরই অনুরূপ। তাঁর উপাধিও ছিল সুলতানু'ল-'উলামা। তিনি সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সাধারণ দর্‌স প্রদান করতেন। জুহ্‌রের পর তিনি তাঁর বিশিষ্ট সাথীদের মজলিসে হাকীকত ও মা'রিফত বর্ণনা করতেন। তিনি সোমবার ও জুমু'আর দিন সাধারণভাবে ওয়া'জ করতেন। তাঁকে সব সময় ভীতিগ্রস্ত ও চিন্তাযুক্ত দেখা যেত।

মওলানার জন্ম ও প্রাথমিক শিক্ষা

বাহাউদ্দীন ওয়ালাদের পুত্র মওলানা জালালুদ্দীন রূম ৬০৪ হিজরীর ৬ই রবি'উ'ল-আওয়াল তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। সুলতানু'ল-'উলামার বিশিষ্ট মুরীদদের ভেতর একজন উন্নত স্তরের বুযুর্গ ছিলেন সায়্যিদ বুরহানুদ্দীন মুহাক্কিক তিরমিযী। সুলতানু'ল-'উলামা তাঁকেই মওলানার গৃহশিক্ষক (اتاليق) নিযুক্ত করেন। ৪-৫ বছর বয়স পর্যন্ত মওলানা তাঁরই প্রশিক্ষণাধীনে ছিলেন। মওলানা তাঁর বুযুর্গ পিতার ইনতিকালের পর এই গৃহশিক্ষকের অভিভাবকত্বে আধ্যাত্মিক সাধনার স্তরগুলো অতিক্রম করেন।

বল্‌খ থেকে পিতার হিজরত

মওলানার পিতা হযরত বাহাউদ্দীন ওয়ালাদের দা'ওয়াত ও নসীহত সীমাতিরিক্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং তাঁর মুরীদদের সংখ্যাও অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পায়। ফলে তিনি সমসাময়িক কতক 'আলিম-উলামা'র ঈর্ষার শিকারে পরিণত হন। হযরত সুলতানু'ল-'উলামা তাঁর ওয়াজে গ্রীক দার্শনিকদের ধর্ম বিষয়ক ধ্যান-ধারণার নিন্দা করতেন। তিনি বলতেন, "কিছু লোক আসমানী গ্রন্থ পশ্চাতে নিক্ষেপ করেছে এবং দার্শনিকদের অপূর্ণ ও কার্যানুপযোগী বাণীকে নিজেদের অনুকরণীয় আদর্শে পরিণত করেছে। এসব লোক কি করে নাজাত লাভের আশা করতে পারে?" এরূপ খোলাখুলি নিন্দা জ্ঞাপনের ফলে বাহ্যিক দৃষ্টিসম্পন্ন কিছু সংখ্যক 'আলিম তাঁর সম্পর্কে চরম আকারের বিদ্বেষ পোষণ

করতে থাকে। খাওয়ারিয্ম শাহ্ মওলানা ওয়ালাদের খুবই ভক্ত ও অনুরক্ত ছিলেন বিধায় এরা তাঁর নিকট মওলানার পিতা সম্পর্কে অভিযোগ উত্থাপনের সুযোগ পেত না। আকস্মিকভাবে একদিন সুলতান মওলানা ওয়ালাদের যিয়ারতে আসেন এবং সেখানে আগন্তুকদের সাংঘাতিক ভীড় দেখতে পেয়ে তাঁর সফর-সঙ্গী একজন 'আলিম[১]কে বলেন ঃ দেখুন, মওলানার দরবারে লোকের কত ভীড়! ঐ আলিম এটাকে একটা মোক্ষম মুহূর্ত জ্ঞান করে বলে ওঠেন ঃ বাদশাহ যদি এর একটা ব্যবস্থা না নেন তাহলে সাম্রাজ্যের ব্যবস্থাপনায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেবার আশঙ্কা রয়েছে এবং ঐ অবস্থায় পরিস্থিতি সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে পড়বে। কথাটা বাদশাহ্র মনে ধরে। তিনি জিজ্ঞেস করে জানতে চান, এমতাবস্থায় তিনি কোন্ পথ অবলম্বন করবেন? উল্লিখিত 'আলিম সংগে সংগে পরামর্শ দেন ঃ রাজকোষ ও দুর্গের চাবিগুলো মওলানা বাহাউদ্দীন ওয়ালাদ-এর খিদমতে পাঠিয়ে বলুন, "লোক সমাগম ও প্রয়োজনীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি সব কিছুই তো আপনার হাতে চলে গেছে। শাসন সংক্রান্ত বিষয়াবলীর মধ্যে আমার নিকট শুধু এই চাবিগুচ্ছই রয়েছে। অতএব, এগুলোও আপনার খিদমতে হাযির করা হ'ল।"[২]

এ কথা শোনার পর মওলানা বলেন : সুলতানকে গিয়ে আমার সালাম বলবে এবং এও বলবে, "ধ্বংসশীল এ পৃথিবীর সমস্ত ধনভাণ্ডার, গুপ্তধন, বিরাট দেশ ও তার বিশাল সেনাবাহিনী বাদশাহ্র পক্ষেই কেবল শোভা পায়। এ সবের সঙ্গে দরবেশের কি সম্পর্ক? আমি হৃষ্ট চিত্তে এখান থেকে চলে যাচ্ছি। বাদশাহ তাঁর লোকজন ও বন্ধু-বান্ধব নিয়ে সুখের সঙ্গে রাজত্ব করুন। জুমু'আর দিন নির্ধারিত ওয়া'জ শেষে আমি চলে যাব।"

---

১. সাধারণ জীবনী গ্রন্থগুলোতে দেখা যায় যে, এ কথোপকথন ইমাম ফখরুদ্দীন রাযীর সঙ্গে হয়েছিল যিনি সুলতানের সফর-সঙ্গী ছিলেন। কিন্তু সাহিবু'ল-মছনবী প্রণেতার সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত হ'ল এই যে, এটি একটি ঐতিহাসিক ভ্রান্তি যা সাধারণ্যে প্রচলিত এজন্য যে, হযরত বাহাউদ্দীন ওয়ালাদ ৬০৯/৭১০ হিজরীতে বল্খ ত্যাগ করেছিলেন। পক্ষান্তরে ইমাম রাযী ৬০৬ হিজরীতে হেরাতে ইনতিকাল করেন, আর এখানেই তিনি মৃত্যুর কয়েক বছর আগে থেকে বসবাস করে আসছিলেন। মওলানা রূমের জীবনীকার বদী'উ'য-যামান ফ্রুযানফারেরও (যাঁর গবেষণামূলক গ্রন্থ 'যিন্দেগানী ও মওলানা জালালুদ্দীন মুহাম্মাদ' সম্প্রতি ইরান থেকে প্রকাশিত হয়েছে) অভিমত হ'ল, এ বর্ণনা ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে অবিশ্বাস্য তাঁর এ অভিমতের পেছনে যুক্তি এই যে, বাহাউদ্দীন ওয়ালাদের হিজরত অধিকাংশের মতে ৬১০ হিজরীর ঘটনা, আর ইমাম ফখ্রুদ্দীন রাযী ৬০৬ হিজরীতে হেরাতে ইনতিকাল করেন (দ্র. ১৪ পৃ.) কাযী তালাম্মুয হুসায়ন মরহুম বলেন : সম্ভবত এই 'আলিমের নাম সায়্যিদ বাহাউদ্দীন রাযী হবে যিনি খাওয়ারিয্ম শাহীর নিকটজন ছিলেন এবং তাবাকাতে নাসিরী'র ৩৩৫ পৃষ্ঠায় তাঁর উল্লেখ রয়েছে —নদভী

২. বদী'উ'য-যামান ফ্রুযানফারের ধারণা এই যে, বাহাউদ্দীন ওয়ালাদের হিজরতের প্রকৃত কারণ খোরাসান ও ইরান অভিমুখে তাতারীদের অভিযান আশঙ্কা। এটা জানতে পেরে বড় বড় খান্দান, অভিজাত ব্যক্তি ও 'উলামায়ে কিরাম দেশত্যাগ করছিলেন এবং নিরাপদ স্থানের দিকে পাড়ি জমাচ্ছিলেন (দ্র. ১ পৃ.;)। —নদভী

বলখের অধিবাসীদের কানে এ খবর গিয়ে পৌঁছুতেই সারা শহরে বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। এতে খাওয়ারিয্‌ম শাহ ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েন। তিনি দূত পাঠান। অতঃপর রাত্রিবেলা নিজেই উযীর সমভিব্যাহারে গিয়ে মওলানা বাহাউদ্দীন ওয়ালাদকে তাঁর বহির্গমন থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি তাতে রাযী হননি। শেষাবধি তিনি তাঁকে অনুরোধ জানান, তিনি (মওলানা ওয়ালাদ) যেন এমনভাবে বেরিয়ে যান যাতে কেউ টের না পায়। অন্যথায় বিরাট গোলযোগ দেখা দিতে পারে। মওলানা এ অনুরোধে সম্মত হন। জুমু'আর দিন ওয়া'জ করেন এবং শনিবার দিন বল্‌খ থেকে বাগদাদের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েন। এ ওয়াজে তিনি খাওয়ারিযৃম শাহ্‌কে তাতার সেনাবাহিনীর আগমন সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন।

সুলতানু'ল-'উলামা বল্‌খ থেকে অত্যন্ত শান-শওকতের সাথে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে তিনি যে শহরে গিয়েই উপস্থিত হন সেখানকার নেতৃস্থানীয় অভিজাত ব্যক্তিবর্গ ও 'আলিম-'উলামা শহরের বাইরে গিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান এবং অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা সহকারে তাঁকে নিজ নিজ শহরে (ক্ষণকালের জন্য হলেও) নিয়ে আসেন। এভাবে বাগদাদ, মক্কা মু'আজ্জমা, দামিশ্‌কসহ বিভিন্ন স্থান ঘুরে অবশেষে তিনি মালাতিয়া গিয়ে পৌঁছেন। আকশিহর নামক স্থানে তিনি চার বছর অবস্থান করেন, পঠন-পাঠনে মগ্ন হয়ে পড়েন। অতঃপর আকশিহর থেকে লারিন্দা গমন করেন। এটি কাউনিয়ার অন্তর্গত একটি স্থান।

মওলানার কাউনিয়ায় উপস্থিতি

রূমের সুলতান 'আলাউদ্দীন কায়কোবাদের আগ্রহ ও অনুরোধে তিনি ৬২৬ হিজরীতে কাউনিয়ায় আগমন করেন। সুলতান নিজেই তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। মওলানা শাহীমহলের নিকট ঘোড়া থেকে অবতরণ করেন এবং সুলতান অত্যন্ত বিনয় সহকারে তাঁকে গ্রহণ করেন। মওলানা কাউনিয়া মাদরাসায় অবস্থান করেন। সুলতান তাঁর অধিকাংশ অমাত্যসহ মওলানার মুরীদ হন।

হযরত বাহাউদ্দীন ওয়ালাদ দু'বছর কাউনিয়া অবস্থানের পর ৬২৮ হিজরীতে ইনতিকাল করেন।

এই গোটা সময়টাতেই মওলানা রূমী তাঁর পিতার সঙ্গী ছিলেন এবং জাহিরী ও বাতিনী 'ইল্‌ম তাঁরই নিকট থেকে হাসিল করতে থাকেন। বাইশ বছর বয়সে তিনি কাউনিয়া শহরে আগমন করেন এবং এ শহরই তাঁর আবাসস্থল ও দাফনগাহ হিসাবে পরিচিতি লাভ করে।

সুলতানের গৃহ-শিক্ষক আমীর বদরুদ্দীন গহরতাশ তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ও খোদাদাদ প্রতিভা লক্ষ্য করে তাঁর জন্য কাউনিয়ায় 'মাদরাসা-ই-খোদা-ওয়ান্দিগার' নামক একটি মাদরাসা নির্মাণ করেন এবং এজন্য বিরাট ভূ-সম্পত্তিও ওয়াক্'ফ করেন।

সুলতান 'আলাউদ্দীন কায়কোবাদ মওলানাকে খুবই সম্মান করতেন এবং তাঁর সঙ্গে শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্পর্ক রাখতেন। তিনি কাউনিয়ায় দুর্গ নির্মাণ করলে মওলানাকে সেখানে একদিনের জন্য হলেও বেড়িয়ে যাবার আবেদন জানান। মওলানা দুর্গ পরিদর্শন করে মন্তব্য করেন :

"প্লাবন রোধ ও শত্রু প্রতিরোধে এ নিঃসন্দেহে একটি উত্তম ব্যবস্থা। কিন্তু মজলুম ও নিপীড়িত মানুষের তীররূপী কাতর ফরিয়াদ, যা হাজারো নয়, লাখো বুরূজ থেকে প্রতিদিন নির্গত হচ্ছে এবং বিশ্বকে ভারাক্রান্ত করে তুলছে, তার প্রতিকার সম্পর্কে কি আপনি কোন চিন্তা করেছেন? 'আদল ও ইনসাফের দুর্গ নির্মাণ করুন। এর ভেতরই বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা নিহিত।"

সুলতান মওলানার এ উপদেশে অত্যন্ত প্রভাবিত হন।

মওলানা বাহাউদ্দীন ওয়ালাদের ইনতিকালের পর তৎকালীন সুলতান, 'উলামায়ে কিরাম ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের ঐকমত্যে মওলানা রূমী স্বীয় পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি দর্স-তাদরীস তথা পঠন-পাঠন, তালকীন (ধর্মোপদেশ) ও ইরশাদের ধারা অব্যাহত রাখেন। তাঁর গৃহশিক্ষক সায়্যিদ বুরহানুদ্দীন মুহাক্কিক তিরমিযী তিরমিয চলে গিয়েছিলেন। মওলানা বাহাউদ্দীন ওয়ালাদের ইনতিকালের পর তিনিও কাউনিয়া আগমন করেন। মওলানা রূমী তাঁর মুরীদ হন এবং স্বীয় পিতার অবর্তমানে তাঁরই মাধ্যমে আধ্যাত্মিক সাধনার স্তরগুলো অতিক্রম করেন। নয় বছর তিনি তাঁর সাহচর্যে কাটান। ৬৩৭ হিজরীতে সায়্যিদ বুরহানুদ্দীন ইনতিকাল করেন।

মওলানার শিক্ষা সফর ও কর্মব্যস্ততা

৬৩০ হিজরীতে মওলানা অধিকতর শিক্ষা লাভ ও আধ্যাত্মিক ফয়েয হাসিলের জন্য সিরিয়া (শাম) সফর করেন এবং হলব (আলেপ্পো)-এ অবতরণ করেন। সুলতান সালাহুদ্দীন তনয় আল-মালিকু'জ-জাহির সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'আলিম কাযী বাহাউদ্দীন ইবনে শাদ্দাদের আন্দোলনের ফলে ৫৯১ হিজরীতে অনেকগুলো বড় মাদরাসা কায়েম করেছিলেন। এর ফলে হলবও দামিশ্কের মত জ্ঞান চর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।

হলব-এ মওলানা মাদরাসা-ই-হালাবিয়ায় অবস্থান নেন এবং কামালুদ্দীন ইবনু'ল-'আদীম থেকে উপকৃত হন। মওলানা যদিও এখানে বিদ্যার্জনে ব্যাপৃত ছিলেন, তবু সিপাহসালারের ভাষায় যে সব জটিল সমস্যার সমাধান কেউ করতে পারত না, তার সমাধান তিনিই করে দিতেন এবং সে সবের এমন সব যুক্তি পেশ করতেন যা কোন কিতাবে লিপিবদ্ধ ছিল না।

হলব থেকে মওলানা দামিশক গমন করেন। সেখানে তিনি মাদরাসা-ই-মুকাদ্দাসিয়ায় অবস্থান করেন। দামিশকে সে সময় 'আলিম-'উলামার ভীড় লেগেই থাকত। সিপাহসালার লিখেছেন যে, দামিশকে শায়খ মুহ্য়িউদ্দীন ইব্‌নে 'আরাবী, শায়খ সা'দুদ্দীন হামুবী, শায়খ 'উছমান রূমী, শায়খ আওহাদুদ্দীন কিরমানী ও শায়খ সদরুদ্দীন কাওনবীর সাহচর্যে মওলানা তাঁর সময় অতিবাহিত করতেন। এখানে হাকীকত ও মা'রিফত বিষয়ে তাঁদের পরস্পরের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হ'ত।

৬৩৪ কিংবা ৬৩৫ হিজরীতে তিনি দামিশ্‌ক থেকে ফিরে এসে কাউনিয়ায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। সায়্যিদ বুরহানুদ্দীনের ইনতিকালের (৬৩৭ হি.) পর পাঁচ বছর পর্যন্ত তিনি বাহ্যত 'আলিম-'উলামার বেশ ধারণ করে সার্বক্ষণিকভাবে জ্ঞান চর্চা ও শিক্ষা দান কর্মে ব্যাপৃত থাকেন। ৬৩৮ হি'তে শায়খ মুহ্য়িউদ্দীন ইবনে 'আরাবী ইনতিকাল করেন। তাঁর চারপাশে জ্ঞান জগতের যে সব উজ্জ্বল নক্ষত্রের সমাবেশ ঘটেছিল তাঁদের অধিকাংশই কাউনিয়ায় এসে সমবেত হয়েছিল। এঁদের মধ্যে শায়খ সদরুদ্দীনও অন্যতম। প্রাচ্য ভূখণ্ডের দিক থেকে যে সব 'আলিম-'উলামা ও বুযুর্গ সেখানকার ধ্বংসযজ্ঞের কারণে পেরেশান হয়ে রূমের দিকে রওয়ানা হতেন তাঁদের বেশির ভাগই পথিমধ্যে কাউনিয়াকেই তাঁদের আবাস ও আশ্রয়স্থল হিসাবে গ্রহণ করতেন। এভাবে কাউনিয়া সে যুগে 'মদীনাতু'ল-'উলামা'য় (জ্ঞানীদের শহর) পরিণত হয়। এসব 'আলিম-'উলামার মধ্যে মওলানার স্থান ছিল সবার ঊর্ধ্বে। সে যুগে মওলানা ঐ সব কাজই করতেন যা সাধারণত 'আলিম-'উলামা করে থাকেন অর্থাৎ পঠন-পাঠন, ওয়া'জ-নসীহত, ফতওয়া প্রদান ইত্যাদি। মওলানা বেশির ভাগ সময় শিক্ষা দান কার্যে ব্যাপৃত থাকতেন। তাঁর নিজের মাদরাসায়ই চার শ'র বেশি ছাত্র ছিল।

পঠন-পাঠন ছাড়াও মওলানা দ্বিতীয় যে কাজটি করতেন তা হ'ল ওয়া'জ বা বক্তৃতা দান। ফতওয়া দান ছিল তাঁর স্থায়ী কর্মের অন্তর্গত। বায়তু'ল-মাল থেকে মওলানার জন্য এক দীনার নির্ধারিত ছিল। একে তিনি সেই ফতওয়া প্রদানের পারিশ্রমিক হিসাবেই গণ্য করতেন। এ ব্যাপারে তিনি এতটা কঠোর ছিলেন যে,

যখন তিনি চরম অভাব-অনটনে পতিত হতেন এবং 'ইলমের মজলিসে গভীরভাবে ডুবে থাকতেন তখনও তাঁর নির্দেশ ছিল, যে মুহূর্তেই কোন ফতওয়া আসবে তাৎক্ষণিকভাবে যেন তাঁকে খবর দেয়া হয়। দোয়াত-কলম সব সময় তাঁর সাথেই থাকত।

অবস্থার বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন

৬৪২ হিজরী অবধি তাঁর ঐ একই অবস্থা ছিল। অতঃপর এমন সব ঘটনার সূত্রপাত হয় যার ফলে তাঁর জীবনে এক বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আসে এবং তিনি মওলবী জালালুদ্দীন কাওনবী থেকে 'মওলানা-ই-রূমী'তে রূপান্তরিত হন। মওলানা শাম্‌স-ই-তাবরীয-এর মোলাকাত এবং তাঁর সত্তার সঙ্গে আসক্তি ও বিলুপ্তির ফলে মওলানার এই অবান্তর ঘটেছিল। তিনি স্বয়ং বলেছেন :

مولوی هرگزنه شدمولائے روم + تاغلام شمس تبریزی نه شد

(রূমের) মওলভী ততক্ষণ পর্যন্ত মওলানা রূম হতে পারেনি যতক্ষণ পর্যন্ত না সে শাম্‌স তাবরীযীর গোলামী কবুল করেছে।

শাম্‌স তাবরীয

শাম্‌স তাবরীয (মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন মালিকদাদ)-এর দেশ ও বংশ পরিচয় কি? তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা অনেক অপবাদই তাঁর প্রতি আরোপ করেছিল। তন্মধ্যে একটি অপবাদ হ'ল তাঁর (শাম্‌স তাবরীযের) বংশ-পরিচয় অজ্ঞাত।[১]

نے در و اصل ونے نسب پیداست   می نه دانیم هم که اوزکجاست

না তাঁর আসল জানা যায়, না বংশ-পরিচয়; আমরা জানি না—তিনি কোথা থেকে এসেছেন।

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, শৈশব থেকেই তিনি উন্নততর যোগ্যতা, প্রেমের আবেগ ও মুহব্বতের অধিকারী ছিলেন। 'মানাকি'বু'ল-'আরিফীন' নামক গ্রন্থে স্বয়ং তাঁর মুখেই বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন সাবালকত্বে উপনীত হননি, তখন থেকেই তিনি মহানবী (সা)-এর 'ইশ্‌ক-এ এমন মত্ত হয়ে থাকতেন যে, তিরিশ চল্লিশ দিন পর্যন্ত তাঁর আহার গ্রহণের ইচ্ছেটুকুও হ'ত না। জাহিরী বিদ্যা অর্জন সমাপ্তির পর

---

১. কতক ইতিহাসে আছে, তিনি হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ ইসমা'ঈলীর লাভিষিক্ত ছিলেন। তাঁর পিতা জালালুদ্দীন হাসান যখন নেতৃপদে অধিষ্ঠিত হন তখন তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের পন্থা পরিত্যাগ করে সঠিক ইসলামী 'আকীদা অবলম্বন করেন এবং 'নও-মুসলিম' উপাধিতে মশহুর হন। কিন্তু এ বর্ণনা সন্দেহযুক্ত ও বিতর্কিত। দ্র. যিন্দেগানী মওলানা জালালুদ্দীন মুহাম্মাদ– পৃ. ৫৩-৫৪ (নদভী)।

তিনি শায়খ আবূ বকর সিল্লাবাফের নিকট মুরীদ হন। কতক বর্ণনায় জানা যায় যে, তিনি শায়খ 'ইয্যুদ্দীন সনজাসীর[২] মুরীদ ছিলেন। কতক বর্ণনায় অন্য নামের উল্লেখ আছে। হতে পারে যে, তিনি এঁদের সবার কাছ থেকেই ফয়েয লাভে ধন্য হয়েছিলেন।

এতসব সত্ত্বেও যখন তিনি তৃপ্ত হলেন না, তখন আল্লাহ্ওয়ালা মানুষের সন্ধানে চতুর্দিকে ঘুরতে শুরু করলেন। তিনি এরূপ সাধারণ বেশে সফর করতেন যে, স্বয়ং তাঁর বিলায়েত ও কামালিয়ত সম্পর্কে কেউ কিছু জানতেই পারত না। তিনি কালো পশমী কম্বল পরিধান করতেন এবং যেখানেই যেতেন সাধারণ সরাইখানায় অবস্থান করতেন এবং দরোজায় দামী তালা ঝুলিয়ে দিতেন, যাতে লোকে তাঁকে ধনী ব্যবসায়ী মনে করে। ঘরের ভেতর চাটাইয়ের বিছানা ছাড়া আর কিছুই থাকত না। সফরের আধিক্যের কারণে লোকে তাঁকে 'শাম্স পক্ষী' বলে ডাকত শুরু করেছিল। তিনি তাবরীয, বাগদাদ, জর্দান, রূম, কায়সারিয়া ও দামিশক সফর করেন। তিনি পায়জামার ফিতা বুনে বিক্রি করতেন এবং এটাই ছিল তাঁর জীবিকা অর্জনের মাধ্যম। খাদ্য গ্রহণের অবস্থা এ রকম ছিল যে, দামিশ্কে তিনি যে এক বছর অবস্থান করেন তখন সপ্তাহে এক পেয়ালা যবাইকৃত পশুর মাথার তৈরি শুরুয়া– তাও কোনরূপ তেল ছাড়া– পান করতেন। তাঁর সাহচর্যের বোঝা বহন করতে পারে এমন কাউকে তিনি পেতেন না। অধিকাংশ সময় তিনি দু'আ করতেন : প্রভু হে! আমাকে এমন কোন সঙ্গী জুটিয়ে দাও যে আমার সাহচর্যের ভার বইতে পারে।

মওলানার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও বিরাট পরিবর্তন

মওলানা শাম্স তাবরীযীর শায়খ তাঁকে রূম যাবার নির্দেশ দেন এবং বলেন ঃ সেখানে একটি দগ্ধ অন্তরের সাক্ষাৎ পাবে; তাঁকে আলোকিত করে এস। ৬৪২ হিজরীর ২৬শে জুমাদা আল-উখরার সোমবার তারিখে তিনি কাউনিয়া পৌঁছেন এবং সেখানে চিনি বিক্রেতাদের মহল্লায় অবস্থান করেন। একদিন দেখতে পেলেন, মওলানা পশুপৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে আসছেন আর তাঁর চারপাশের লোকেরা তাঁর জ্ঞান-ভাণ্ডার থেকে উপকৃত হয়ে চলেছে। শাম্স অগ্রসর হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ রিয়াযত ও জ্ঞানের উদ্দেশ্য কি? মওলানা বললেন ঃ আদব ও শরীয়ত সম্পর্কে

২. বদী'উ'য-যামান ফ্রুযানফার যয়নুদ্দীন সনজাসীর পরিবর্তে রুকনুদ্দীন সনজাসী লিখেছেন। তিনি লিখেছেন যে, সনজাস যুনজানের অধীনস্থ একটি জায়গা। পৃ. ৫৬; কিন্তু ইতিহাসের দৃষ্টিতে তাঁর এই বর্ণনার বিশুদ্ধতা তর্কাতীত নয় (–নদভী)।

জ্ঞাত হওয়া। শাম্‌স বললেন : না, আসল লক্ষ্যে না পৌঁছা পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়া। এরপর তিনি হাকীম সানাঈ-এর নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করেন :

علم کزتو ترانه بستاند + جهل ازاں علم به بود بسيار

যে জ্ঞান তোমার অহংবোধকে তোমা থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে না, সে জ্ঞানের চেয়ে মূর্খতাই উত্তম।

মওলানা এতে বিস্মিত হন। অপরদিকে শাম্‌সের তীর লক্ষ্যভেদে সক্ষম হয়।[১] মওলানা তাঁকে সংগে করে নিজের ঘরে নিয়ে আসেন এবং আফলাকীর ভাষায় চল্লিশ দিন পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে এক কামরায় থাকেন। ঐ সময় উক্ত কামরায় কারো প্রবেশাধিকার ছিল না। সিপাহসালার বলেন ঃ ছয় মাস পর্যন্ত সালাহুদ্দীন যরকূবের কামরায় এ দু'জন বুযুর্গ একান্তে অতিবাহিত করেন। শায়খ সালাহুদ্দীন ব্যতিরেকে আর কারোরই উক্ত কামরায় প্রবেশাধিকার ছিল না।

শাম্‌স-এর সাক্ষাৎ মওলানাকে এক নতুন জীবন, নতুন চেতনা ও নতুন জগত দান করে। মওলানা নিজেই বলেন :

شمس تبریزی بما راه حقیقت بنمود + ماز فیض قدم اوست که ایمان داریم

শাম্‌স তাবরীযী আমাদেরকে হাকীকতের রাস্তা দেখিয়েছেন। এটা তাঁরই পদযুগলের ফয়েয যে, আমরাও আজ ঈমানের অধিকারী।

এতদিন পর্যন্ত মওলানা ছিলেন সে যুগের উস্তাদ ও শ্রেষ্ঠতম বুযুর্গের আসনে আসীন। ছাত্র-শিক্ষক, জ্ঞানী-গুণী, সূফী-দরবেশ সবাই ছিল তাঁর অনগ্রহপ্রার্থী, তাঁর থেকে উপকৃত হতে আগ্রহী। কিন্তু আজ তিনি নিজেই অনুগ্রহপ্রার্থী আর শাম্‌স তাবরীয তাঁকে ইরশাদ ও ফয়েয প্রদানের মালিক। মওলানার সাহেবযাদা সুলতান ওয়ালাদ বলেন :

شیخ استاذ گشت نو آموز + درس خواندی بخدمتش هر روز

گرچه در علم فقر کامل بود + علم نو بود کو بوے به نمود

'আলিমদের শায়খ ও উস্তায নতুন করে শিক্ষার্থী সাজলেন; শাম্‌স-ই তাবরীযীর খেদমতে তিনি দৈনিক পাঠ গ্রহণ করতেন।

দরবেশীর 'ইলমে তিনি কামিল থাকা সত্ত্বেও তাঁকে একটি নতুনতর 'ইল্‌ম প্রত্যক্ষ করান।

---

১. সাহিবু'ল-মছনবীর বিভিন্ন বর্ণনা থেকে এ বর্ণনা বাছাই করা হয়েছে। এ বর্ণনা তাযকিরায়ে দওলত শাহ্‌র। পৃ. ১৯৬-৯৭; ফ্রুযানফার এ পর্যায়ে সমস্ত বর্ণনা উদ্ধৃত করে এ ব্যাপারে তাঁর অসন্তোষ ব্যক্ত করেছেন এবং শাম্‌স-এর ব্যাপারে মওলানার প্রতিক্রিয়া ও উন্মত্ততার কারণ কোন একটি আকস্মিক ঘটনাকে অভিহিত করেননি, বরং আল্লাহ্‌ওয়ালা মানুষের অনুসন্ধান এবং 'ইশ্‌ক ও 'আশিকের সঙ্গে মওলানার প্রকৃতিগত সম্পর্ককেই উল্লেখ করেছেন।—দ্র. যিন্দেগানী মওলানা জালালুদ্দীন মুহাম্মাদ, ৬১ পৃ.।

খোদ মওলানা (র) তাঁর নিজের মুখেই এ সম্পর্কে বলেন :

زاهد بودم ترنه گویم کردی + سرفتنه بزم وباده جویم کردی

سجاده نشین باوقارے بودم + بازیچه کو دکاں کویم کردی

আমি ছিলাম দরবেশ, (তিনি) আমাকে গায়ক বানিয়ে দিলেন, বানিয়ে দিলেন মদ্যপায়ীদের সর্দার ও মদখোর মাতাল।

আমি ছিলাম মর্যাদাবান গদ্দীনশীন পীর; তিনি আমাকে অলি-গলিতে ক্রীড়ারত শিশুদের খেলনায় পরিণত করলেন।

ফল দাঁড়াল এই যে, শাম্‌স-ই-তাবরীযীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার পর থেকে মওলানা শিক্ষা দান, ওয়া'জ-নসীহত সব কিছুই ছেড়ে দিলেন। তিনি বলেছেন :

عطار دوار دفتر پاره بودم + زدشت او زمانے می نشستم

چو دیدم نوح پیشانی ساقی + شدم مست وقلم هارا شکستم

আমি বুধ গ্রহের মত প্রতিটি মজলিসের আলোচ্য বিষয় ছিলাম। এবার অনেক কাল যাবত তার ময়দান থেকে বসে পড়েছি।

নূহ (আ)-এর মত ললাটধারী পানীয় পরিবেশনকারী (সাকী)-কে যখন দেখতে পেলাম তখন পাগল হয়ে গেলাম এবং কলমগুলো ভেঙে ফেললাম।

ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি

মওলানা যখন এভাবে অন্যান্য সব সম্পর্ক ছিন্ন করে প্রতিটি কথায় শাম্‌স তাবরীযীকে অনুসরণ ও অনুকরণ করতে লাগলেন, তখন বিষয়টি মওলানার শাগরিদ ও মুরীদদের নিকট ভীষণ পীড়াদায়ক ঠেকল। অতঃপর এ নিয়ে চারদিকেই আলোড়ন ও গুঞ্জরণের সৃষ্টি হ'ল। শাম্‌স-এর অবস্থা সম্পর্কে জনসাধারণ তেমন ওয়াকিফহাল ছিল না। মুরীদদের ধারণা, "আমরা বছরের পর বছর ধরে মওলানার খেদমতে কাটিয়ে দিলাম, মওলানার কারামত দেখলাম, তাঁর খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। অথচ আজ কোথা থেকে নাম-গোত্রহীন এক লোক এসে তাঁকে আমাদের মাঝ থেকে এমনভাবে ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিয়ে গেল যে, তাঁর চেহারা দেখার সুযোগ থেকেও আমরা বঞ্চিত হয়ে গেলাম। তাঁর লেখাপড়া, শিক্ষা দান, ওয়া'জ-নসীহত সবই বন্ধ হয়ে গেল। এ লোক নিঃসন্দেহে কোন যাদুকর হবে, নয়ত প্রতারক। অন্যথায় তার কী সাধ্য যে, পর্বতসম এই ব্যক্তিত্বকে খড়কুটোর মত ভাসিয়ে নিয়ে যায়!"

মোট কথা, সবাই শাম্‌স তাবরীযীর দুশমনে পরিণত হ'ল। তারা মাওলানার সামনে কিছু বলতে পারত না বটে, তবে তিনি একটু এদিক-সেদিক গেলেই তারা

শাম্‌সকে ভাল-মন্দ বলত এবং রাত-দিন এই ধান্ধায় ফিরত কখন ও কিভাবে হযরত শাম্‌স তাবরীযীকে সেখান থেকে বিতাড়িত করা যায় যাতে করে তারা পূর্বের মত মওলানার সাহচর্য লাভ করে ধন্য হতে পারে।

শাম্‌স-এর অন্তর্ধান

হযরত শাম্‌সুদ্দীন এসব লোকের গোস্তাখী নীরবে সইতে থাকেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, মওলানার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার কারণেই এসব লোক এভাবে মনঃক্ষুণ্ণ। কিন্তু তাদের আচরণ যখন সীমা লঙ্ঘন করল এবং তিনি বুঝতে পারলেন যে, এবার গোলযোগ সৃষ্টির সমূহ আশংকা রয়েছে, তখন তিনি একদিন নীরবে নিঃশব্দে কাউনিয়া পরিত্যাগ করলেন। আফলাকী তাঁর এই প্রথম অন্তর্ধানের তারিখ ৬৪৩ হিজরীর ১লা শাওয়াল রোজ বৃহস্পতিবার বলে উল্লেখ করেছেন। সে হিসাবে প্রথমবার তিনি সোয়া বছরের মত কাউনিয়ায় অবস্থান করেন।

শাম্‌স-এর বিচ্ছেদ ছিল মওলানার কাছে অত্যন্ত কষ্টকর ও পীড়াদায়ক। মুরীদেরা যা ভেবেছিল– ঘটল তার উল্টোটি। শাম্‌স চলে যাবার পর মওলানা তাদের প্রতি কী মনোযোগ দেবেন, আগে যেটুকু দিতেন এখন তাও ছেড়ে দেবার উপক্রম হ'ল। কিছু সংখ্যক নাদানের কারণে সৎ ও বিশ্বস্ত লোকেরাও মওলানার সাহচর্য থেকে এভাবে বঞ্চিত হ'ল।

মওলানার অস্থিরতা এবং শাম্‌স-এর প্রত্যাবর্তন

সিপাহসালারের বর্ণনা মুতাবিক দামিশ্‌ক থেকে মওলানার নামে শাম্‌সুদ্দীনের পত্র না আসা অবধি এই বিচ্ছেদ ও বিচ্ছিন্নতা বজায় ছিল। পত্র প্রাপ্তির পর মওলানার অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন ঘটে এবং শাম্‌স-এর প্রতি আগ্রহ ও প্রেম তাঁকে 'সামা'র প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে। তিনি সে সব লোকের প্রতি আগের মতই নেক নজর অব্যাহত রাখেন যারা শাম্‌স-এর বিরুদ্ধে কোনরূপ অসদাচরণ করেনি। ঐ সময় মওলানা হযরত শাম্‌স-এর খেদমতে পত্রাকারে চার লাইন কবিতা লিখে পাঠান। এতে তিনি নিজের অস্থিরতা এবং তাঁর প্রতি অপরিসীম আগ্রহের কথা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন :

ایها النور فی الفواد تعال + غایة الوجد والمراد تعال

ایها السابق الذی سبقت + منك مصدوقة الوداد تعال

چوں بیائی زهے کشاد ومراد + چوں نیائی زهے کساد تعال

انت كالشمس اذ دنت ونات + يا قريبا على البعاد تعال

ওহে আলো! আমার হৃদয়ে এস; হে আমার প্রেম ও লক্ষ্যের শেষ গন্তব্যস্থল! এস।

এস, ওহে অগ্রগামী! তোমার দিক থেকে সত্যিকার প্রেম তো আগেই প্রকাশ পেয়েছে; অতএব আর দেরী নয়, এস।

যখন তুমি আসবে তখন তা হবে বিরাট বিজয় ও সাফল্য। যদি তুমি না আস, তাহলে সেটা হবে বিরাট ক্ষতি; অতএব তুমি এস।

তুমি তো সূর্যের মত দীপ্তিময়– চাই কাছে থাক আর দূরেই থাক। হে দূরবর্তী থেকেও নিকটবর্তী, এস।

ইতিমধ্যে গোলমাল কিছুটা স্তিমিত হয়ে যায়। অবকাশ ও প্রসন্নতা লাভের পর লোকেরা শাম্‌স-এর বিরোধিতা পরিত্যাগ করে। মওলানা শাম্‌সকে ফিরিয়ে আনবার উপায় খুঁজে বের করেন। পুত্র সুলতান ওয়ালাদকে ডেকে বলেন ঃ তুমি আমার পক্ষ থেকে শাহ্‌-ই-মকবুলের দিকে ছুটে যাও এবং এটা নিয়ে গিয়ে তাঁর পায়ের ওপর উৎসর্গ কর–আর আমার হয়ে বল, যে মুরীদেরা গোস্তাখী করেছিল তারা সকলেই খোলা মনে তওবা করেছে এবং আশা করছে, যেসব অন্যায় ও ত্রুটি হয়ে গেছে তা যেন মাফ করে দেওয়া হয়। এবার দয়া করে তিনি যেন এদিকে পা ফেলেন। তিনি তার হাত দিয়ে যে চিঠি লিখেছিলেন তা ছিল নিম্নরূপ :

كه ازاں دم كه تو سفر كردى + از حلاوت جدا شديم چو موم
همه شب چو شمع مے سوزيم + ز آتشش جفت و زا انگبين محروم
در فراق جمال تو مارا + جسم و يران و جان از و چوں بوم
هاں عنان رابديں طرف برتاب + زفت كن پيل عيش را خرطوم
بے حضورت سماع نيست حلال + همچو شيطان طرب شده مرجوم
يك غزل بے تو هيچ گفته نشد + تارسيدآں مشر فه مفهوم
پس بذوق سماع نامه تو + غزل پنج وشش بشد منظوم
شامم از تو چو صبح روشن باد + اے بتو فخر شام و ارمن وروم

যে মুহূর্তে তুমি এখান থেকে চলে গেছ, আমি মোমের মত গলে গেছি, বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি জীবনের সকল স্বাদ ও আহলাদ থেকে।

সারা রাত আমি মোমবাতির মত জ্বলতে থাকি; আগুনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটলেও মধুর স্বাদ থেকে বঞ্চিত আমি।

তোমার সৌন্দর্য সুখ থেকে বঞ্চিত হবার কারণে আমার দেহ-মন পেঁচকের মত বিরান হয়ে গেছে।

একটু এদিকে তোমার অশ্বের গতি ফেরাও; আমার জীবনের হস্তীশুণ্ডকে একটু

মযবূত কর।

তোমার উপস্থিতি ব্যতিরেকে সামা'র মজলিস বৈধ নয়; আমার জীবন মালঞ্চের ওপর শয়তানসদৃশ বোঝা চেপে বসেছে।

তোমা ব্যতিরেকে কোন গযলই গীত হয়নি, এমতাবস্থায় মুবারক লিপি এসে পৌঁছল।

তোমার পবিত্র লিপি শোনার আনন্দে পাঁচ-ছ'টি কাব্য লিখে ফেলেছি। তোমার সন্দর্শনে আমার সন্ধ্যাও যেন ভোরের ন্যায় আলোকিত হয়ে ওঠে। ওহে! যাঁর সত্তার জন্য শাম, আরমান ও রোম গর্বিত।

সুলতান ওয়ালাদ হযরত শাম্‌সকে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে কাউনিয়া নিয়ে আসেন।

শাম্‌স-এর দ্বিতীয় দফা অন্তর্ধান

হযরত শাম্‌স-এর কাউনিয়া প্রত্যাবর্তনে মওলানার খুশির সীমা ছিল না। যে সমস্ত লোক গোস্তাখী করেছিল তারা সবাই এসে ক্ষমা প্রার্থনা করে। বেশ কিছুকাল উভয়ের এই নির্মল সাহচর্য অব্যাহত থাকে। ইতিমধ্যে হযরত শাম্‌স-এর সঙ্গে মওলানার ঐক্য ও ঘনিষ্ঠতা পূর্বের তুলনায় আরো বৃদ্ধি পায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ সুখ ও সৌভাগ্য বেশি দিন টিকল না। আবার আবিলতা ও মালিন্যের উপকরণ জমে উঠতে লাগল। মওলানার কামরার নিকটই সুফফা দালানের একদিকে হযরত শাম্‌স অবস্থান করতেন। শাম্‌স সেখানে তাঁর স্ত্রীসহ বসবাস করতেন। কাউনিয়াতেই তিনি এ বিয়ে করেন। মওলানার মেজোপুত্র (চিল্পী 'আলাউদ্দীন) যখন মওলানার ঘরে যেতেন তখন এদিক দিয়েই যেতেন। কিন্তু এদিক হয়ে তাঁর এ যাওয়া-আসা মওলানা শাম্‌সুদ্দীন তাবরীযী পছন্দ করতেন না। তিনি কয়েকবার তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ-কোমল কণ্ঠে কথাটি বোঝাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তা উল্টো 'আলাউদ্দীনের মনঃকষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। হযরত শাম্‌সুদ্দীন সুলতান ওয়ালাদকে বেশি স্নেহ করেন– এটাও ছিল তাঁর মর্মপীড়ার অন্যতম কারণ। চিল্পী 'আলাউদ্দীন বিষয়টি নিয়ে অন্যদের সঙ্গেও আলোচনা করেন। যে সমস্ত লোক এ ধরনের একটি সুযোগের অপেক্ষা করছিল তারা এর ওপর আরো একটু রঙ চড়ায়। তারা বলতে থাকে : বেশ তো লোক! কোথাকার কে, জানা নেই– শোনা নেই,হঠাৎ উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। মওলানার ঘর দখল করে তাঁর ছেলেকেই ঘরে আসতে দিচ্ছে না!

হযরত শামসুদ্দীন কেবল বিনয় ও সহিষ্ণুতার কারণে এতদিন এ বিষয়ে মওলানার সঙ্গে কোন আলাপ করেননি। কিন্তু পরিস্থিতি যখন সীমা অতিক্রম করল তখন তিনি সরাসরি সুলতান ওয়ালাদকে বললেন : ঐসব লোকের আচরণে এটা বুঝতে পারছি যে, এবার এমনভাবে অন্তর্ধান করতে হবে যাতে কেউ আর আমার খোঁজ না পায়। মওলানার কতক গযল থেকে পরিষ্কার প্রতিভাত হয় যে, তিনিও এ ব্যাপারে অবহিত ও আশংকিত ছিলেন এবং কবিতার মাধ্যমে এর থেকে বিরত হবার জন্য শায়খের কাছে অনুনয়-বিনয় করেছিলেন।

যা-ই হোক, হযরত শামসুদ্দীন-এর বিরুদ্ধে লোকের মন-মানসিকতা পুনরায় তুঙ্গে ওঠে। তিনি নিজেও অতিষ্ঠ হয়ে পড়েন। একদিন দেখা গেল যে, তিনি অকস্মাৎ অন্তর্ধান করেছেন।[১]

نا گہاں گم شد از میان ہمہ + تارو داز دل اندھان ہمہ

অকস্মাৎ তিনি সবার মাঝে থেকে হারিয়ে গেলেন যাতে করে অন্তর-মন থেকে সর্বপ্রকার অস্থিরতা খতম হয়ে যায়।

মওলানার অস্থিরতা

সকাল বেলা মওলানা যখন মাদরাসায় এসে শাম্‌সকে ঘরে পেলেন না— তখনই চিৎকার করে ওঠেন এবং সুলতান ওয়ালাদের ঘরে গিয়ে তাঁকে ডেকে বলেন :

"بہاو الدین چہ خفتہ؟ بر خیز وطلب شیخت کن کہ باز مشام جاں را از فوائح لطف او خالی می یا بیم"

আরে বাহাউদ্দীন! শুয়ে রয়েছ কেন? ওঠো, স্বীয় শায়খ-এর অনুসন্ধান কর। আমি আমার অন্তরের ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে তাঁর মেহেরবানীর সুরভি থেকে বঞ্চিত পাচ্ছি।

দু'তিন দিন যাবত তিনি চতুর্দিকে অনুসন্ধান করতে থাকেন। কিন্তু কোথাও হযরত শাম্‌স-এর সন্ধান পাওয়া গেল না। এবারে মওলানা শাম্‌স-এর অন্তর্ধানে

১. কতক লোক বলেছেন, কাউনিয়াতে কিছু লোক হযরত শাম্‌সকে হত্যা করেছে। মওলানা বলেন ঃ يَفْعَلُ اللّٰهُ مَايَشَاءُ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ অর্থাৎ আল্লাহ যা চান তাই করেন এবং তিনি তাঁর ইচ্ছা মাফিক ফয়সালা দেন। কিন্তু ফ্রুযানফার তাঁর অন্তর্ধানের পশ্চাতে সেই কারণটিকেই অগ্রাধিকার দিয়ে বলেছেন যে, সুলতান ওয়ালাদই তাঁর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ও নিকটজন ছিলেন। এ ক্ষেত্রে তার বর্ণনাই সর্বাধিক বিশ্বাসযোগ্য। এজন্য শাম্‌স-এর হত্যা সম্পর্কিত বর্ণনা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এর থেকে এ প্রমাণও মেলে যে, যদি শাম্‌সকে হত্যাই করা হ'ত এবং মওলানা যদি তা জানতে পারতেন তাহলে তাঁর সন্ধানে তিনি এতটা চিন্তান্বিত হতেন না। (যিন্দেগানী–৮৩-৮৪ পৃ.–নদভী)।

মওলানা রূমীর অবস্থা আগের তুলনায় আরো বেশী পরিবর্তিত হয়ে যায়।

شیخ گشت از فراق او مجنون + بے سر وپاز عشق او چو ذو النون

শায়খ (মওলানা রূমী) তাঁর বিচ্ছেদে ব্যথায় পাগল হয়ে যান এবং তাঁর প্রেমে যু'ন-নূন মিসরীর মত দিশেহারা হয়ে পড়েন।

যে সমস্ত লোকের কারণে তাঁর জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল মওলানা তাদের সবাইকেই তাঁর (মওলানা রূমীর) নিজের সাহচর্য থেকে বের করে দেন। এবার তিনি গযল গাওয়া ও সামা মাহফিলেই সময় ব্যয় করতে শুরু করেন। এ ঘটনা ৬৪৫ হিজরীর।

হযরত শাম্‌স (র) গায়েব হয়ে যাবার পর মওলানা দু'দিন চতুর্দিকে তাঁর তালাশ করেন। কোনভাবেই যখন তাঁর সন্ধান পাওয়া গেল না– তখন তাঁর নিজের অবস্থার পরিবর্তন শুরু হয়। সামা'র তরীকা (পন্থা-পদ্ধতি) তো তিনি প্রথমেই এখতিয়ার করেছিলেন। এখন তাঁর অবস্থা হ'ল, সামা' ভিন্ন তিনি একটি মুহূর্তেও অতিবাহিত করতে পারেন না। মাদ্‌রাসায় তিনি টহল দিয়ে ফিরতেন এবং প্রকাশ্যে ও গোপনে শোরগোল করতেন, করতেন ফরিয়াদ। এ সময় তিনি হযরত শাম্‌স-এর বিচ্ছেদ যন্ত্রণায় অনেকগুলো মর্মস্পর্শী গযল রচনা করেন। তাঁর বেদনা-বিধূর গযলগুলোর অধিকাংশই এ সময়ের রচনা।

এসব অস্থিরমনা ও চিত্ত-চাঞ্চল্য সত্ত্বেও মওলানার মন থেকে এ চিন্তা ও চেতনা কিন্তু একেবারে মুছে যায়নি যে, রোমকদের গৃহযুদ্ধ, মিসরীয়দের তুর্কতাযী এবং তাতারীদের ধ্বংসকর অভিযানের কারণে গোটা দেশই যেখানে তছনছ হয়ে যাচ্ছে, সে ক্ষেত্রে এই অশুভ ক্ষণে না জানি হযরত শাম্‌স-এর কি হয়েছে।

হযরত শাম্‌সুদ্দীনের গায়েব হয়ে যাবার পর তাঁকে পাবার আকাঙ্খায় মওলানার অবস্থা হয়েছিল এরূপ যে, যদি কোন লোক মিছেমিছিও বলত যে, সে হযরত শাম্‌সকে অমুক জায়গায় দেখেছে অমনি মওলানা নিজের পরিহিত পোশাক খুলে তাকে দিয়ে দিতেন এবং শুকরিয়া আদায় করতেন।

সিরিয়া সফর ও সান্ত্বনা লাভ

এরূপ উৎসাহ-উদ্দীপনার মাঝে মওলানা একদিন সিরিয়া সফরের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েন। তাঁর সঙ্গী-সাথীরাও তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে। এভাবেই তিনি দামিশ্‌ক পৌঁছেন এবং সেখানকার মানুষের অন্তর-মানসে প্রেমের আগুন জ্বালিয়ে দেন। সকল লোকই বিস্ময়াপন্ন হ'ত, এরকম একজন 'আলিম ও ফাযেল ব্যক্তি

কেন এরূপ দেওয়ানাপ্রায় হচ্ছেন? শাম্‌স তাবরীয আসলে বস্তুটা কী যাঁর পেছনে এরূপ একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি মাথা কুটে মরছেন!

দামিশ্‌কে যখন শাম্‌স-এর কোন পাত্তা পাওয়া গেল না তখন মওলানা বললেন : আমি আর শাম্‌স দু'জন নই। তিনি যদি হন সূর্য তাহলে আমি তার আলোক-বিন্দু; আর তিনি যদি হন সমুদ্র তাহলে আমি তার (পানির) ফোঁটা। আলোক-বিন্দুর অস্তিত্ব তো সূর্য থেকেই আর পানির ফোঁটার যে আর্দ্রতা তার উৎসও তো সমুদ্রই। তাহলে আর পার্থক্যটা রইল কি? কয়েকদিন পর সিরিয়া (শাম) থেকে তিনি রূমের দিকে রওয়ানা হন।

অতঃপর কয়েক বছর তিনি কাউনিয়া অবস্থান করেন। এখানে তাঁর প্রেমাবেগ পুনরায় উথলে ওঠে। কিছু লোক সাথে করে তিনি আবার সিরিয়া পানে রওয়ানা হন। এরপর কাউনিয়া প্রত্যাবর্তন করেন। এবারে তিনি এই ধারণা নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেন, আমিই শাম্‌স তাবরীয। শাম্‌স তাবরীযীর অনুসন্ধান আর কিছুই ছিল না, বরং নিজেকেই খুঁজে ফিরছিলাম আমি। এবার তিনি এই ধারণা নিয়ে ফিরে আসেন যে, শাম্‌স-এর ভেতর যা কিছু ছিল, স্বয়ং আমার মধ্যেও তা বর্তমান।

এবার দামিশ্‌ক থেকে প্রত্যাবর্তনের পর মওলানা হযরত শাম্‌স-এর সঙ্গে মিলিত হবার ব্যাপারে একেবারে হতাশ হয়ে পড়েন। কিন্তু যে অবস্থা তিনি শাম্‌স-এর মাঝে প্রত্যক্ষ করতেন– তা তিনি নিজের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করতে থাকেন।

শায়খ সালাহুদ্দীন যরকূব

দামিশ্‌ক থেকে দ্বিতীয় দফা প্রত্যাবর্তনের পর মওলানা কিছুদিন চুপচাপ থাকেন। এরপর তিনি শায়খ সালাহুদ্দীনকে তাঁর গুপ্তভেদের সঙ্গী ও খলীফা বানান। ৬৪৭ হিজরীতে তিনি তাঁকে স্বীয় বিশিষ্ট সহচর নিযুক্ত করেন এবং হযরত শাম্‌সুদ্দীনের পরিবর্তে তাঁকেই স্বীয় সহযোগী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেন।[১]

شه صلاح الدین زبعد شمس دین + گشت اور اندریں درزش معین
حال وقالش از وجودش می فزود + سر هائے نادر ازوے می شنود

১. ফ্রুযানফার বলেন : مولانا ار دیدار شمس نومید گشت بتمامی دل وهمگی همت روئے در صلاح آور داد راشیخی وخلیفتی - وسر لشکری جنود اللّه" منصوب فرمود دیاران را باطاعت دے مامور ساخت . صـ ۹۳ (ندوی)

শাহ সালাহুদ্দীনই শাম্‌সুদ্দীন তাবরীযীর এ কাজে তাঁর সাহায্যকারী হন। তাঁর হাল-চাল, কাজ-কর্ম ও কথাবার্তায় তাঁর উন্নতি ঘটে; তাঁর থেকে অনেক বিস্ময়কর গুপ্ত কথা তিনি শোনেন।

শায়খ সালাহুদ্দীন কাউনিয়ার নিকটবর্তী একটি গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। গরীব পিতামাতার সন্তান ছিলেন। তিনি ছিলেন মৎস্যজীবী। অবশ্য সালাহুদ্দীন নিজে স্বর্ণকারের পেশা গ্রহণ করেন। প্রথম থেকেই তিনি আমানতদারী, সততা ও বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে মশহূর ছিলেন। সায়্যিদ বুরহানুদ্দীন যখন কাউনিয়ায় আসেন, তখন তিনি তাঁর মুরীদ হন এবং তাঁর দরবারে বিশিষ্ট আসন লাভ করেন। সায়্যিদ বুরহান উদ্দীনের ইনতিকালের পর তিনি মওলানার হাতে নতুন করে বায়'আত হন। মৃত্যুর দশ বছর পূর্বে তিনি মওলানার এরূপ নৈকট্য লাভ করেন যে, এই দশ বছর তিনি তাঁর বিশিষ্ট খলীফা হিসাবেই কাটান। ৬৫৭ হিজরীতে ১লা মুহাররাম তারিখে শায়খ ইনতিকাল করেন।

শায়খ যরকূবের সান্নিধ্যের কারণে পুনরায় গোলযোগ দেখা দেয়। এবার লোকের অভিযোগ ছিল যে, এর চেয়ে শাম্‌স তাবরীযীই বরং ছিলেন ভাল। তিনি আর যা-ই হোন, একজন 'আলিম তো নিশ্চয়ই ছিলেন। আর এ লোক হচ্ছে এখানকারই অধিবাসী। সবাই তাকে একজন সাধারণ লোক হিসাবে জানে। জীবনভর গহনার নকশা খোদাই করেছে, আর এখন মওলানার বন্ধু হয়ে বসেছে। আশ্চর্য লাগে যে, মওলানা নিজে এত বড় সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও এমন একজন লোককে ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনে কেন এতটা বাড়াবাড়ি করেন! শায়খ এসব শোনার পর বলেন ঃ লোকের মনঃকষ্টের কারণ যে, মওলানা কেন আমাকে সবার মাঝে বৈশিষ্ট্য দান করলেন। কিন্তু তারা আসল কথা বুঝতে পারছে না যে, মওলানা নিজেই নিজের 'আশিক। আমি তো একটা বাহানামাত্র।[১]

দশ বছর পর্যন্ত মওলানাকে সাহচর্য প্রদানের পর শায়খ হঠাৎ করেই অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং পহেলা মুহাররাম পরিপূর্ণ আত্মিক প্রশান্তির সাথে এই নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করেন।

---

১. বদী'উ'য-যামান ফ্রুযানফার "যিন্দেগানী মওলানা জালালুদ্দীন মুহাম্মাদ" নামক পুস্তকে লিখছেন : مولانا بکوری چشم منکران حسود، دیده بر صلاح الدین گماشت وهمان عشق و دل باختگی که باشمس داشت بادے بنیاد نهاد و از انجا که صلاح الدین مردے و رام و نرم و جذب و ارشادش بنوع دیگر بود شورش وانقلاب مولانا آرام تر گردید و از بے قراری بقرار باز آمد و برائے شکستن خمار هجران شمس از پیمانه و جود وطلب هائے سبك مى نو شید - صـ ۲ - ۱۵۲

চিল্পী হুসামুদ্দীন

শায়খ সালাহুদ্দীনের ইনতিকালের পর মওলানা চিল্পী[১] হুসামুদ্দীন ইবনে আখী তুর্ককে স্বীয় নায়েব ও খলীফা নিযুক্ত করেন। চিল্পী হুসামুদ্দীন ছিলেন মওলানার বিশিষ্ট মুরীদদের অন্যতম এবং মওলানার ইনতিকালের পর এগার বছর পর্যন্ত তিনি মওলানার খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মূলত তুর্ক ও দেশীয় হিসাবে আরামীয় ছিলেন। রূমের মশহূর ও প্রভাবশালী খান্দান "আখী"-র সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন তিনি।[২]

হযরত শাম্‌সুদ্দীন তাবরীযী ও শায়খ সালাহুদ্দীনেরও তিনি মুরীদ ছিলেন। তাঁদের থেকেও তিনি উপকৃত হয়েছিলেন।

হযরত হুসামুদ্দীন চিল্পী তাঁর সমস্ত গোলাম ও কর্মচারীকে প্রকাশ্যে বলে রেখেছিলেন, তারা যেন নিজেদের মর্জি মতই কাজ করে। আস্তে আস্তে তিনি তাঁর মালিকানাধীন সমস্ত সম্পত্তি মওলানার খিদমতে ব্যয় করে ফেলেন। শেষে তিনি গোলামদেরকেও আযাদ করে দেন। মওলানাকে তিনি এতটা সম্মান করতেন যে, কোনদিন তিনি মওলানার ওযূখানায় ওযূ করতেন না। তীব্র ঠাণ্ডা ও শীত, গুঁড়ি গুঁড়ি বরফ পড়ছে, এতদসত্ত্বেও তিনি ঘরে গিয়ে ওযূ করে আসতেন। অপর দিকে তাঁর সঙ্গে মওলানার আচরণও ছিল এমনি যে, বহিরাগত কোন দর্শক তা দেখার পর খোদ মওলানাকেই মুরীদ ভেবে বসত।[৩]

মছনবী প্রণয়ন

মছনবী শরীফ প্রণয়ন এ যুগের একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি। এতে হযরত হুসামুদ্দীনের ক্রমাগত তাকীদ ও চাপের একটি বিরাট ভূমিকা ছিল। যদি বলা হয় যে, মছনবী শরীফের অস্তিত্ব লাভ ঘটেছিল তাঁরই কারণে তাহলে সম্ভবত বেশী বলা হবে না।[৪]

১. তুর্কী ভাষায় চিল্‌পী— আরবী সীদী শব্দের সমার্থক।
২. ফ্রুযানফার তাঁর জন্ম তারিখ ৬২২ হিজরী বলে উল্লেখ করেছেন।
৩. মওলানা যা কিছু পেতেন—সবই চিল্‌পীর নিকট পাঠিয়ে দিতেন। যে মজলিসে চিল্‌পী থাকতেন না সে মজলিসে মওলানার স্বভাবে জোশ ও উত্তাপ সঞ্চারিত হ'ত না। তাই তিনি সেখানে আধ্যাত্মিকতার গুপ্ত-রহস্য ও মা'রিফত সম্পর্কে কোন আলোচনাই করতেন না। যাঁরা এ সত্য সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন তাঁরা মজলিসে হযরত চিল্‌পীকে হাযির রাখতে অধিক যত্নবান হতেন যাতে করে আধ্যাত্মিক ফয়েযের স্রোত প্রবাহিত হয়। (দ্র. যিন্দেগানী—পৃ. ১০৫) —নদভী।
৪. ফ্রুযানফার লিখেছেন যে, চিল্পী হুসামুদ্দীনের আহ্বান ও ফরমায়েশ অনুসারেই মছনবী রচিত হয়। তিনি আরও লিখেছেন যে, চিল্পী দেখতে পেতেন যে, মওলানার বন্ধু-বান্ধব ও সম্পর্কিত জনেরা শায়খ 'আত্তার ও সানা'ঈর রচিত গ্রন্থ ও কথামালা অধ্যয়নে মগ্ন থাকেন। মওলানার গীত গযলের যদিও ভাণ্ডার ছিল, কিন্তু তাসাওউফের হাকীকত ও সুলূক (আধ্যাত্মিক পথ)-এর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম (পরবর্তী পৃ. দ্র.)

সাথী নির্বাচনের কারণ

মওলানা কোন না কোন সাথী ব্যতিরেকে আরাম পেতেন না। শামসুদ্দীনের পর সালাহুদ্দীন এবং সালাহুদ্দীনের পর হুসামুদ্দীন তাঁর গুপ্ত-রহস্য সঙ্গী ও অন্তরঙ্গ সাথী ছিলেন, বরং এ সিলসিলা যদি আরো বাড়ানো যায় তাহলে পরিষ্কার দেখা যাবে যে, সায়্যিদ বাহাউদ্দীন তিরমিযীও এ দলে শামিল যদিও তিনি ভিন্ন অবস্থান থেকে এ দলে এসেছিলেন। সায়্যিদ বাহাউদ্দীন তিরমিযীর ইনতিকাল এবং হযরত শামস-এর আগমন মধ্যবর্তী পাঁচ বছর মওলানা এমনভাবে অতিবাহিত করতেন যাতে মনে হ'ত, এ সময় তিনি একটা কিছুর ঘাটতি অনুভব করছেন। এর থেকে যে ফলাফল বেরিয়ে আসে তা হ'ল এই যে, মওলানার ভেতর যে কামালিয়াত প্রচ্ছন্ন ছিল সে সবের প্রকাশের জন্য কোন না কোন আন্দোলক ও উৎসাহদাতার প্রয়োজন ছিল। তাঁর রচিত "দীওয়ান" ও "মছনবী" এসব প্রচ্ছন্ন আন্দোলনেরই সাক্ষী। কেবল হুসামুদ্দীনের অন্যমনস্কতার কারণে মছনবী শরীফের রচনা দু'বছর বন্ধ থাকে।

মওলানা কোন লোককে তাঁর কাশ্ফ ও কারামতের কারণে সাহচর্যের জন্য নির্বাচিত করেন নি। এ ক্ষেত্রে তাঁর অভিমত ছিল, মুহব্বতের কারণে সহজাতিত্ব। মওলানা নিজে তাঁর পুত্র সুলতান ওয়ালাদের এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, "সম্পর্কের দিক দিয়ে এক জাতিত্বের কারণেই তাঁকে আমি বিশিষ্ট বন্ধু হিসাবে জানি।" তিনি আরও বলেছেন : যে প্রেম ও ভালবাসা সৃষ্টি হয় সম্পর্কের কারণে

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর) বিষয়ের তুলনায় তার বেশির ভাগই ছিল মওলানার উত্তপ্ত প্রকৃতি ও প্রেমের উচ্ছ্বাসে ভরপুর। তিনি সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। এক রাত্রে মওলানাকে একাকী পেয়ে হাদীকা, সানা'ঈ কিংবা মানতি'কু'ত'-ত'ায়র-এর ঢঙে একটি কিতাব প্রণয়নে তাঁকে অনুপ্রাণিত করেন। এ কথ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাঁর পাগড়ীর ভেতর থেকে একটি কাগজ বের করেন। এতে ১৮টি কবিতা লিখিত ছিল। এর প্রথম চরণটি ছিল তাই যদ্দারা মছনবীর সূচনা হয়েছে।

بشنواز نے چوں حکایت می کند + وز جدائی ها شکایت می کند

"বাঁশীর বিরহ সুর লক্ষ্য করে শোন সে কিরূপ (হৃদয়গ্রাহী) সুর (বিরহ জ্বালা) ব্যক্ত করে"-- (এখানে বাঁশী অর্থ মানুষের রূহ)। শেষ চরণ ছিল ঃ پس سخن کوتاه باید والسلام "ব্যস! কথা সংক্ষিপ্ত করাই উচিত।-- ওয়াসসালাম।"এটাই ছিল মছনবী রচনার সূচনা। মওলানা তাঁর মুখ দিয়ে স্বতস্ফূর্তভাবে কবিতা আবৃত্তি করতেন আর মওলানা হুসামুদ্দীন তা লিখে যেতেন। লিখে নেবার পর হুসামুদ্দীন তা সজোরে মিষ্টি সুরে পাঠ করতেন। কখনো সারারাত এতে কাবার হয়ে যেত। মছনবী রচনার কাজ সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত চলত।

মছনবী ১ম খণ্ড সমাপ্ত হতেই হুসামুদ্দীনের স্ত্রী-বিয়োগ ঘটে এবং তাঁর ওপর এর গভীর প্রতিক্রিয়া পড়ে। শোকে তিনি পাগল-প্রায় হয়ে যান। তাঁর এই অপ্রকৃতিস্থ অব 'াদৃষ্টে মওলানাও হঠাৎ বিমূঢ় হয়ে যান। ফলে দু' বছর মছনবীর কাজ বন্ধ থাকে। এরপর পুনরায় হুসামুদ্দীনের তাগাদা প্রদান ও চাপ সৃষ্টির ফলে মছনবীর কাজ শুরু হয় এবং মওলানার ওফাত পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। ১৫ বছর এ কাজ চলেছিল (যিন্দেগানী মওলানা জালালুদ্দীন মুহাম্মদ -১১৬-১৮ পৃ.)-নদভী।

তার পরিণতিতে লজ্জিত হবার কিছু নেই। প্রকৃত ভালবাসা ও সম্পর্ক সৃষ্টির দ্বারা দুনিয়া ও আখিরাতে কোথাও লজ্জিত হতে হয় না। সেজন্যই কিয়ামতের ময়দানে হিসাব-নিকাশে আটকে পড়া লোকগুলো অভিলাষ জাহির করবে, يَالَيْتَنِىْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلاَنًا خَلِيْلًا "হায়! আমি যদি অমুককে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ না করতাম।"

মুত্তাকী প্রেমিকদের গুণাবলী হবে নিম্নরূপ ঃ

اَلاَخِلاَّءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلاَّ الْمُتَّقِيْنَ .

বন্ধুজনেরা পরস্পরের দুশমন হবে সেদিন; একমাত্র মুত্তাকীরাই হবে এর ব্যতিক্রম।

মওলানা নিজে বলেন :

موجب ایمان نه باشد معجزات + لیك جنسیت بود جذب صفات

মু'জিযা ঈমানের কারণ হয় না, বরং স্বজাতিত্বের মিল গুণাবলী আত্মস্থ করবার মাধ্যম হয় (অর্থাৎ পারস্পরিক সম্পর্ক একের গুণ অন্যের মাঝে সংক্রমিত করে)।

সিপাহসালার বলেন ঃ মওলানার ইনতিকালের চল্লিশ দিন পূর্ব থেকেই কাউনিয়ায় ভূমিকম্প হচ্ছিল। আফলাকীর বর্ণনা মুতাবিক মওলানা শয্যাগত থাকাকালে সাতদিন উপর্যুপরি ভূমিকম্প হয়। অত্যধিক ভূমিকম্পের কারণে লোকেরা হাঁপিয়ে ওঠে এবং মওলানার সাহায্যপ্রার্থী হয়। এতে মওলানা বলেন : যমীন ক্ষুধার্ত, সে এখন খাবার চায়। সত্বরই সে তা পাবে আর তোমাদের কষ্টেরও অবসান ঘটবে। সে সময় তিনি নিম্নোক্ত গযল গেয়েছিলেন :

بااین همه مهر و مهربانی + دل می دہدت که خشم رانی
دین جمله شیشه هائے جانرا + درهم شکنی به لن ترانی

তোমার সেই করুণা ও কৃপা সত্ত্বেও অন্তর-মন তোমাকে ক্রোধান্বিত হবার অনুমতি দিচ্ছে, আর অনুমতি দিচ্ছে 'লান তারানী' (তুমি আমাকে কখনো দেখতে পারবে না) বলে এই সব প্রাণের দর্পণ চূর্ণ করবার।

চিল্পী হুসামুদ্দীন বলেন ঃ একদিন শায়খ সদরুদ্দীন দরবেশ-শ্রেষ্ঠদের সমভিব্যাহারে রুগ্ন মওলানাকে দেখতে আসেন। মওলানার অবস্থাদৃষ্টে তাঁরা ব্যথিত হন এবং আল্লাহ্র দরবারে তাঁর রোগ মুক্তির জন্য দু'আ করেন। সেই সঙ্গে তাঁরা মওলানার পরিপূর্ণ সুস্থতা ফিরে পাবার ব্যাপারেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এতে মওলানা বলেন ঃ এখন আরোগ্য লাভ আপনার জন্যই বরকতময় হোক! প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মাঝে অন্তরায় হিসাবে চুলের ন্যায় সরু ও চিকন একটি

আবরণ রয়ে গেছে। আপনি কি চান না যে, সেটা উঠে যাক এবং নূর নূরের সাথে গিয়ে মিলিত হোক।

রোগাক্রান্ত অবস্থায় তিনি নিম্নোক্ত গযল শুরু করেন। হুসামুদ্দীন চিল্পী তা লিখছিলেন আর কাঁদছিলেন।

روسر بنه ببالین تنہا مرا رھا کن .... بادست اشارتم کرد که عزم سوئے ماکن

যাও, তুমি তাকিয়ায় গিয়ে মাথা রাখ! আমাকে একাকী ছেড়ে দাও; আমার মত বিপর্যস্ত, বিপন্ন এবং রাতে বিচরণকারী মুসাফিরকে ছেড়ে যাও।

আমি আছি আর আছে একরাশ চিন্তার উত্তাল তরঙ্গ; রাতদিন একাই থাকি। যদি চাও আস এবং বখশিশ কর অথবা চলে যাও এবং জুলুম কর।

আমার থেকে পালিয়ে যাও যাতে তুমিও বিপদে না পড়। শান্তির পথ ধর, বিপদের রাস্তা পরিত্যাগ কর।

আমি আছি আর সঙ্গে আছে চোখের পানি; পেরেশানির মধ্যে আটকে আছি। (এমতাবস্থায়) আমার অশ্রুমালার ওপর দিয়ে স্টীম রোলার চালাও।

বিনা কারণে আমাকে মারে এবং পাষাণের ন্যায় নির্মমভাবে টানাহেঁচড়া করে। এ কথা বলে না যে, প্রতিশোধ নেবার পথ বের কর।

মা'শূক (প্রেমাস্পদ)-দের সর্দারের ওপর বিশ্বস্ততা প্রদর্শন বাধ্যতামূলক নয়; ওহে হলুদ চেহারার প্রেমিক! তুমিই ধৈর্য ধর এবং বিশ্বস্ততা প্রদর্শন কর।

আমি এমন এক আঘাত পেয়েছি মৃত্যু ভিন্ন যার কোন চিকিৎসা নেই; অতএব, আমি কেমন করে বলি যে, এ ব্যথার চিকিৎসা কর।

গত রাতে আমি স্বপ্নে এক বৃদ্ধকে দেখলাম। সে আমাকে হাতের ইশারায় বলছে, আমার দিকে চলে আসার সংকল্প কর।

ঠিক মৃত্যুর কাছাকাছি সময়ে তিনি বলেন :

گرمومنی وشیرین هم مونست مرگت + در کافری و تلخی هم کافربست مردن

যদি তুমি মু'মিন হও, মিষ্ট হও, তাহলে তোমার মৃত্যুও মু'মিন; আর তুমি যদি কাফির হও, তিক্ত ও বিস্বাদ হও, তাহলে তোমার মৃত্যুও কাফির।

৬৭২ হিজরীর জুমাদা আল-উখরার পাঁচ তারিখে সূর্যাস্তের সময় হাকীকত ও মা'রিফত বর্ণনারত অবস্থায় তিনি ইনতিকাল করেন। ইনতিকালের সময় মওলানার বয়স ছিল ৬৮ বছর তিন মাস।

মওলানার জানাযা বাইরে আনতেই এক কিয়ামত-দৃশ্যের অবতারণা হয়। সকল ধর্মের ও সকল জাতিগোষ্ঠীর লোকই তাতে শরীক ছিল। সবাই কাঁদছিল। ইয়াহূদী ও খ্রিস্টান তাদের স্ব স্ব ধর্মগ্রন্থ (তওরাত ও ইনজীল) পাঠ করছিল।

মুসলমানেরা তাদেরকে বাধা দিচ্ছিল, কিন্তু তারা বিরত হচ্ছিল না। শেষাবধি গোলযোগের আশঙ্কা দেখা দেয়। যখন এ সংবাদ কাউনিয়ার শাসনকর্তা মু'ঈনুদ্দীন পরওয়ানার নিকট পৌঁছুল তখন তিনি খ্রিস্টান ধর্মযাজক ও পাদরীদের জিজ্ঞেস করেন : (মওলানার জানাযায় শরীক হবার সঙ্গে) তোমাদের কী সম্পর্ক? তারা বলল : আমরা পূর্ববর্তী নবীদের হাকীকত এঁরই বর্ণনার মাধ্যমে বুঝতে পেরেছি এবং কামিল দরবেশদের চলনভঙ্গী তাঁর চলনভঙ্গী থেকেই জেনেছি। যা হোক, ঐ সব লোক জানাযার অনুগমন করে। লোকের ভীড় এত বেশি হয়েছিল যে, মুর্দার খাটিয়া খুব ভোরে মাদরাসা থেকে রওয়ানা হয়েছিল এবং সন্ধ্যার সময় কবরস্থানে গিয়ে পৌঁছেছিল। রাতের বেলা তাসাওউফ ও ফকীরির এই সুমহান সূর্য লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যায়।

চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য

মওলানা শিবলী মরহুম "সওয়ানেহ'-ই-মওলানা রূম" নামক গ্রন্থে বলেন : মওলানা যতদিন পর্যন্ত তাসাওউফের বেষ্টনীর মাঝে আসেন নি ততদিন পর্যন্ত তাঁর জীবন ছিল জ্ঞানীসুলভ জাঁকজমকের এক আশ্চর্য প্রতিমূর্তি। তাঁর সওয়ারী যখন রাস্তায় বের হত তখন 'আলিম-'উলামা কিংবা ছাত্রই শুধু নয়, আমীর-উমারার একটি দলও তাঁর অনুসরণ করত। আমীর-উমারা ও সুলতানদের দরবারের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ছিল। কিন্তু সলূক (আধ্যাত্মিকতার পথ)-এ প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। পঠন-পাঠন (দরস ও তাদরীস), ফতওয়া প্রদান ও জনকল্যাণমূলক কাজের সাথে তাঁর কিছু যোগ ছিল বটে, তবে তা ছিল অতীত জীবনের প্রতীকস্বরূপ। অন্যথায় তিনি সব সময়ই আল্লাহ প্রেম ও তাঁর মা'রিফতের নেশায় ডুবে থাকতেন।

রিয়াযত ও মুজাহাদা

তাঁর রিয়াযত ও মুজাহাদা ছিল সীমাতিরিক্ত। সিপাহসালার তাঁর সাহচর্যে কাটিয়েছেন বছরের পর বছর। তিনি বলেন ঃ আমি কখনোই তাঁকে রাত্রিকালীন পোশাকে দেখিনি। বিছানা কিংবা তাকিয়া (বালিশ) একেবারেই থাকত না। ইচ্ছে করেই তিনি শয়ন করতেন না। ঘুম আসলে বসে বসেই একটু ঝিমিয়ে নিতেন। একটি গযলে তিনি বলেন : چه آساید بهر پهلو که خپد + کسے کز خار دار داد نهالین

এমন লোক কি করে আরাম করতে পারে– তা সে যে পাশ ফিরেই শয়ন করুক না কেন–যার বিছানা কাঁটাভরা।

সামা' মাহফিলে তাঁর মুরীদদের যখন ঘুম পেত তখন তিনি তাদের খাতিরে দেওয়ালের সঙ্গে হেলান দিয়ে জানুর ওপর মাথা রাখতেন যাতে তাঁর দেখাদেখি অন্যেরা নির্দ্বিধায় কিছুটা শুয়ে নেয়। তারা ঘুমিয়ে পড়তেই তিনি উঠে যেতেন এবং যিকর-আযকার ও তাসবীহ্-তাহলীলে মত্ত হয়ে পড়তেন। একটি গযলে এরই প্রতি তিনি ইঙ্গিত করেছেন :

همه خفتند و من دل شده را خواب نبرد
همه شب دیده من بر فلك استاره شمرد

خوابم از دیده چناں رفت که هرگز ناید
خواب من زهر فراق تو بنو شید و بمرد

সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু আমি হত হৃদয়ের ঘুম আসেনি। আমার আঁখিযুগল কেবল আসমানের তারকা গুণেই রাত কাটিয়েছে।

ঘুম আমার চোখ থেকে এমনভাবেই উধাও হয়েছে যে, আর কখনো ফিরে আসবে না। কেননা আমার চোখ তোমার বিচ্ছেদ বিষ পান করে মারা গেছে (আর মৃত তো পুনরায় ফিরে আসতে পারে না)।

অধিকাংশ সময় তিনি সিয়াম পালন করতেন এবং উপর্যুপরি কয়েক দিন পর্যন্ত কিছুই খেতেন না।

সালাতের অবস্থা

সালাতের ওয়াক্ত হতেই তিনি কিবলামুখী দাঁড়িয়ে যেতেন। এ সময় তাঁর চেহারার রং বদলে যেত। সালাতের মধ্যে তিনি নিজেকে হারিয়ে ফেলতেন। সিপাহসালার বলেন : নিজের চোখেই আমি বহুবার দেখেছি যে, এশার আওয়াল ওয়াক্তে তিনি নিয়ত বেঁধেছেন এবং দু' রাকআত পড়তেই সুবেহ (ভোর) হয়ে গেছে। মওলানা তাঁর একটি গযলে স্বীয় সালাতের অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন :

چو نماز شام هر کس نهد چراغ و خوانے
منم و خیال یارے غم و نوحه وفغانے

چو وضو ز اشك سازم بود آتشیں نمازم
در مسجدم بسوزد چو در رسد اذانے

عجبا نماز مستان توبگو درست هست آں
که نداند او زمانے نه شناند او مکانے

عجبا دو رکعت ست ایں عجبا چهارم است ایں
عجبا چه سوره خواندم، چونداشتم زمانے

در حق چگونه کوبم؟ که نه دست ماندونے دل

دل دوست چوں توبردی بده اے خدا امانے

بخدا خبر نه دارم چو نمازی گزارم

که تمام شد رکوعے که امام شد فلانے

সবাই সন্ধ্যায় সালাত আদায় করেই দস্তরখানা বিছায় এবং প্রদীপ জ্বালায়; কিন্তু আমি তখন অন্য এক বন্ধুর কল্পনায় থাকি, থাকি পেরেশান। তাঁরই বিরহ গাঁথা গাই এবং তাঁরই কাছে ফরিয়াদ জানাই।

চোখের পানিতে যখন ওযূ করি তখন আমার সালাতও আগুনে পরিণত হয়; মসজিদেই আমাকে পুড়িয়ে ফেলে যখন সেখানে আযানের আওয়াজ পৌঁছে।

আরে! পাগলদের সালাতই অদ্ভুত ধরনের। তোমরাই বল,এটা কি জায়েয? (এমতাবস্থায় যে,) না তারা (সালাতের) ওয়াক্তের খবর রাখে আর না রাখে স্থানের।

বিস্ময়ের ব্যাপার, তারা জানে না এ সালাত দু' রাক'আতের, না চার রাক'আতের? আরো বিস্ময় এই যে, সালাতের সময় জ্ঞান যখন আমার নেই তখন কি করে বলি, আমি সালাতে কোন্ সূরা পড়েছি।

আল্লাহ্র দরজার কিভাবে কড়া নাড়ি, যখন আমার হাতও নেই, হৃদয়ও নেই। হে খোদা! তুমি যখন হৃদয়, হাত সব কিছুই নিয়ে গেছ– তখন আমাকে (অন্তত) নিরাপত্তা দাও।

আল্লাহ্র কসম! আমি যখন সালাত আদায় করি তখন কোন কিছুরই খবর রাখি না। কোন রুকূ' পুরা হ'ল কিনা, কে ইমামতি করল তাও জানি না।

একবার শীতের দিনে মওলানা সালাতে দাঁড়িয়ে এত বেশি কাঁদেন যে, তাঁর সমস্ত চেহারা ও দাড়ি চোখের পানিতে ভেসে যায় এবং শীতের তীব্রতায় সে পানি জমে বরফে পরিণত হয়। অবশ্য তিনি সেভাবেই সালাতে মশগুল থাকেন।

যুহ্দ ও অল্পে তুষ্টি

মেযাজের দিক দিয়ে তিনি সর্বোচ্চ মাত্রায় যুহ্দ-এ অভ্যস্ত এবং অল্পে তুষ্ট ছিলেন। সকল সুলতান ও আমীর-উমারাই নগদ অর্থ-কড়িসহ সর্বপ্রকার উপহার-উপঢৌকন তাঁর কাছে পাঠাতেন। কিন্তু তিনি সে সবের কিছুই নিজের কাছে রাখতেন না। যা কিছু আসত এবং যেভাবে আসত তিনি তা সালাহুদ্দীন যরকূব অথবা চিল্পী হুসামুদ্দীনের নিকট পাঠিয়ে দিতেন। কখনো এমনও দেখা গেছে যে, ঘরে এক মুঠো খাবারও নেই, এমতাবস্থায় মওলানার সাহেবযাদা

সুলতান ওয়ালাদের পীড়াপীড়িতে ঐ সমস্ত জিনিস থেকে কিছুটা ঘরে রেখে দিতেন। যেদিন ঘরে খাবার কিছুই থাকত না–সেদিন মওলানা অত্যন্ত খুশি হয়ে বলতেন, "আজ আমাদের ঘরে দরবেশির গন্ধ অনুভূত হচ্ছে।" [১]

বদান্যতা ও কুরবানী

দানশীলতা ও বদান্যতার অবস্থা ছিল এই যে, সায়েল (প্রার্থী)-কে কিছু দিতে না পারলে দেহে আবা, কুর্তা যা-ই থাকুক না কেন, তাই খুলে দিয়ে দিতেন। পাছে খুলে দিতে দেরী হয় সেজন্য আবার মত কুর্তার সম্মুখ ভাগও সব সময় খোলা রাখতেন।

পরার্থপরতা ও অহংশূন্যতা

একবার মুরীদদের সঙ্গে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে সংকীর্ণ একটি গলিপথের ওপর একটি কুকুর শুয়েছিল। ফলে রাস্তা গিয়েছিল আটকে। মওলানা থেমে গেলেন এবং অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। বিপরীত দিক দিয়ে এক ব্যক্তি হেঁটে আসছিল। লোকটি কুকুরটাকে রাস্তা থেকে হটিয়ে দেয়। মওলানা এতে মনঃক্ষুণ্ন হন এবং বলেন : তুমি ওকে না-হক কষ্ট দিলে।

একবার দু'জন লোক রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে ঝগড়া করছিল এবং একে অপরকে গালি দিচ্ছিল। তাদের ভেতর একজন অপরজনকে বলছিল ঃ অভিশপ্ত! তুমি আমাকে একটা বললে বিনিময়ে আমি দশটা শুনিয়ে দেব। আকস্মিকভাবে মওলানা এদিক হয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। তিনি ঐ লোকটিকে ডেকে বললেন : ভাই! তোমার যা কিছু বলার তা ওকে নয়, বরং আমাকে বল। কেননা তুমি আমাকে হাযারটা বললেও আমি প্রত্যুত্তরে একটিও বলব না। এ কথা শুনে লোক দু'টি মওলানার পায়ে পড়ে ক্ষমা চেয়ে নেয় এবং নিজেদের মধ্যে সন্ধি করে।

হালাল উপার্জন

আওক 'াফ বিভাগ থেকে মাসিক ১৫ দীনার ভাতা নির্ধারিত ছিল। এর দ্বারাই মওলানা জীবিকা নির্বাহ কতেন। বিনা শ্রমে প্রাপ্ত অর্থে জীবিকা নির্বাহ করা তিনি অত্যন্ত অপছন্দ করতেন। সেজন্য তিনি এর বিনিময়ে ফতওয়া লিখতেন। মুরীদদেরকে তাকীদ দিয়ে রেখেছিলেন, "যখনই কেউ ফতওয়া নিয়ে আসে, তখন যে অবস্থায়ই থাকি না কেন, আমাকে অবশ্যই সংবাদ দেবে যাতে এর মাধ্যমে আমি হালাল উপার্জন করতে পারি।"

একবার কেউ বলেছিল, 'শায়খ সদরুদ্দীন মাসে হাযার রূপিয়া ভাতা পান, আর আপনি পান কেবল পনের দীনার মাসিক।'[১] মওলানা জওয়াবে বলেছিলেন : শায়খ-এর খরচের পরিমাণও খুব বেশি। আসলে আমি যে পনের দীনার পাই সেটাও তাঁরই পাওয়া উচিত।

দুনিয়াদারদের সংশ্রব বর্জন

মওলানা প্রকৃতিগতভাবেই আমীর-উমারা, সুলতান ও শাসকদের ঘৃণা করতেন এবং তাদের সংস্রব এড়িয়ে চলতেন। কেবল সদাচরণের খাতিরেই তিনি তাঁদের সঙ্গে কখনো কখনো মিলিত হতেন। একবার এক আমীর মওলানার নিকট এই মর্মে সংবাদ পাঠান, "অত্যধিক কাজের চাপে ফুরসৎ পাই না। তাই হযরতের দরবারে হাযির হবার মওকা জোটে খুবই কম। মেহেরবানী করে আমাকে ক্ষমা করবেন।" মওলানা তাঁকে বলে পাঠান :

"ক্ষমা প্রার্থনার প্রয়োজন নেই। আসার চেয়ে না আসলেই বরং আমি বেশি কৃতজ্ঞ থাকি।"[১]

মছনবী ঃ তার জ্ঞানগত ও সংস্কারমূলক অবস্থান ও পয়গাম

মছনবী

মওলানার অবস্থা থেকে বোঝা যায়, তিনি স্বভাবতই উৎসাহী ও আবেগপ্রবণ ছিলেন। 'ইশ্‌ক তথা প্রেম তাঁর প্রকৃতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছিল। জাহির 'ইল্‌ম ও বুদ্ধিবৃত্তির অনুক্ষণ ধ্যান তাঁর ও প্রেমের এই আগুনকে দাবিয়ে রেখেছিল। শাম্‌স তাবরীযের অগ্নিবৎ ধ্যান তাঁর এ প্রেমের এই আগুনকে দাবিয়ে রেখেছিল। শাম্‌স তাবরীযের অগ্নিবৎ সাহচর্য তাঁর প্রকৃতিকে উস্কে দিয়েছিল এবং প্রশিক্ষণ ও পরিবেশ তাঁর ওপর যে আবরণ ফেলেছিল– অত্যন্ত আকস্মিকভাবেই তা বিলীন হয়ে যায়। ফলে তিনি আপাদমস্তক জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরিতে পরিণত হন।

شعلها آخر زهر مویم دمید + ازرگ اندیشه ام آتش چکید

আমার লোমকূপের গোড়া থেকে শেষাবধি অগ্নি-শিখা নির্গত হচ্ছে; আমার চিন্তার শিরা-উপশিরা থেকে আগুন ঝরে পড়ছে।[২]

এই মকামে পৌঁছার পর 'আরিফের প্রতিটি লোমকূপ থেকে আওয়াজ ধ্বনিত হয় :

---

১. সওয়ানেহ্ মওলানা রূম–সংক্ষেপিত ও ঈষৎ পরিবর্তিত।
২. ইকবাল দর মছনবী– আসরারে খূদী।

در جہاں یارب ندیم من کجاست + نخل سینایم کلیم من کجاست

হে প্রভু-প্রতিপালক ! দুনিয়াতে আমার সাথী (বন্ধু) কোথায়? আমি সিনাই পর্বতের খোরমা বৃক্ষ; আমার কলীম (হযরত মূসা) কোথায়?

আর এটাই একমাত্র কারণ যে, অন্তরঙ্গ বন্ধু ও রহস্য-সঙ্গী ব্যতিরেকে তাঁর পক্ষে জীবন ধারণ করা ছিল অসম্ভব। শাম্‌স তাবরীযের পর যতদিন পর্যন্ত না তিনি সালাহুদ্দীন যরকূব এবং সালাহুদ্দীন যরকূবের পর যতদিন পর্যন্ত হুসামুদ্দীন চিল্‌পীকে পেয়েছেন তাঁর অশান্ত ও অস্থির চিত্ত শান্ত হয়নি। شمع راتنہا طپیدن سہل نیست "মোমের পক্ষে একাকী ছটফট করা সহজ নয়।"

এই জ্বলন্ত অগ্নিই তাঁকে ক্রমান্বয়ে সামা'র দিকে টেনে নিয়ে যেত এবং তিনি এ থেকে শক্তি ও খোরাক সংগ্রহ করতেন। অনন্তর তিনি বলেন :

پس غذایے عاشقاں آمد سماع + که از وباشد خیال اجتماع
قوتے گیرد خیالات ضمیر + بلکه صورت گردد از بانگ صفیر
آتش عشق از نواها گرد تیز + آنچنانکه آتش آں جوز ریز

'আশিকের খাদ্যই হচ্ছে সামা'র মাহফিল; কেননা এর দ্বারাই একাগ্রতা ও মানসিক প্রশান্তি আসে।

অন্তরের কল্পনা একটা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ শক্তি লাভ করে, বরং বাঁশীর আওয়াজে তার একটা ব্যবস্থা কিংবা সুরাহা হয়ে যায়।[১]

প্রেমের আগুন শব্দ দ্বারা আরো বেগবান হয়েছে, যেরূপ এই অগ্নিকুণ্ডে কয়লা নিক্ষেপকারীর আগুনের অবস্থা।[২]

এই তাপ ও জ্বালাই তাঁকে আরো উস্কে দিয়েছে এবং চুপচাপ থাকাকে তাঁর পক্ষে অসম্ভব করে তুলেছে। তাঁর ভাষায় :

جوش نطق از دل نشاں دو ستیست + بستگی نطق ازبے الفتی است
دل که دلبر دید کے ماند ترش + بلبل گل دیده کے ماند خمش

হৃদয় থেকে উৎসারিত শব্দের বন্যা উছলে পড়া মুহব্বতের আলামত; আর শব্দ আটকে যাওয়া সম্পর্কহীনতা ও প্রেমশূন্যতার কারণ।

যে হৃদয় প্রেমাস্পদকে দেখতে পেয়েছে সে কি করে নিষ্প্রাণ ও স্বাদহীন থাকতে পারে; আর যে বুলবুল ফুল দেখেছে সে কি করে না গেয়ে থাকতে পারে।[৩]

---

১. মছনবী, ৩১৯ পৃ.; নওল কিশোর, ৯ম প্রকাশ।
২. ঐ।
৩. মছনবী, ৫৫১ পৃ.।

এই বাদ্যযন্ত্র থেকে যে গীত নির্গত হ'ল তার সংকলনই হ'ল মছনবী। এ তাঁর ধ্যান-ধারণা ও অবস্থা, ঘটনা ও প্রতিক্রিয়া,পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার দর্পণ। এটা গায়বের ব্যথা ও জ্বালা,জোশ ও মত্ততা এবং ঈমান ও ইয়াকীন দ্বারা পূর্ণ। মছনবীর বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা ও নজীরবিহীন প্রভাব সৃষ্টির এটাই আসল কারণ।

ہے رگ ساز میں رواصاحب ساز کا لہو.

বাদ্যযন্ত্রের প্রতিটি শিরা-উপশিরায় এর নির্মাতার রক্ত প্রবাহিত।[১]

বুদ্ধিবৃত্তি ও জাহির পরস্তীর সমালোচনা

মওলানার শিক্ষা ও এর বিকাশ ঘটেছিল সর্বাংশেই আশ'আরীদের জ্ঞানগত পরিবেশ ও পরিমণ্ডলে। তিনি নিজেও একজন সফল শিক্ষক ও যুক্তিবাগীশ 'আলিম ছিলেন। আল্লাহ্র অনুগ্রহ যখন তাঁকে মা'রিফত (পরিচিতি) ও অবহিতির স্তর পর্যন্ত পৌঁছাল এবং বাণী থেকে অবস্থা, খবর থেকে নজর, শব্দ থেকে অর্থ এবং পরিভাষা ও সংজ্ঞার শাব্দিক ইন্দ্রজাল থেকে হয়ে যখন তিনি মূল সত্যে গিয়ে উপনীত হলেন, তখনই তিনি দর্শন ও 'ইলমে কালামের দুর্বলতা ও যুক্তি-প্রমাণ ও আনুমানিক সিদ্ধান্তের ভ্রান্তি পরিমাপ করতে সক্ষম হলেন। দার্শনিক, মুতাকাল্লিম ও যুক্তি-বাগীশদের অসহায়ত্ব ও মূল সত্য সম্পর্কে অজ্ঞতার হাকীকত তাঁর সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। যেহেতু এ সবের প্রতিটি অলি-গলি সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন সেজন্য তিনি যা বলতেন তা তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতেই হ'ত এবং এর বাস্তবতাও কেউ অস্বীকার করতে পারত না।

এ যুগে দর্শন ও বুদ্ধিবৃত্তির উৎস হিসাবে সর্বাধিক জোর দেওয়া হ'ত বাহ্য ইন্দ্রিয়ের উপর। বাহ্য-ইন্দ্রিয়কেই জ্ঞান লাভ ও নিশ্চিত বিশ্বাস উৎপাদনের সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য মাধ্যম বলে মনে করা হ'ত। আর যে সব বস্তু এর আওতায় আসত না অর্থাৎ বুদ্ধির অগম্য ও ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়বস্তুকে অস্বীকার করবার প্রবণতা বেড়ে চলেছিল। মু'তাযিলাগণ এই 'ইন্দ্রিয়ানুভূতি পূজা'র সবচেয়ে বড় প্রবক্তা ছিল। এই ইন্দ্রিয়ানুভূতি পূজা ঈমান বি'ল-গায়ব তথা অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপনকে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল এবং ইসলামী শরীয়ত ও আল্লাহ্ কর্তৃক অবতীর্ণ ওয়াহীর পেশকৃত হাকীকতের প্রতি এক ধরনের অনাস্থার ভাব সৃষ্টি করে দিয়েছিল। মওলানা এই পঞ্চেন্দ্রিয় পূজা এবং এর তুখোড় প্রবক্তাদের সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন :

چشم حس راهست مذهب اعتزال + دیده عقل است سنی در وصال

---

১. ইকবাল, বালে জিবরীল।

سخره حس اند اهل اعتزال + خویش راسنی نمایند ازضلال

هرکه در حس ماندا ومعتزلی است + گرچه گوید سنیم از خامی است

هرکه بیرون شد زحسن سنی ویست + اهل بینش اهل عقل خویش بیست

জ্ঞান-বুদ্ধির চক্ষু সুন্নত ওয়া'ল-জামা'আতের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

মু'তাযিলীগণ ইন্দ্রিয়পূজার খেলনামাত্র; বিভ্রান্তি ও গোমরাহীর কারণে তারা নিজেদের সুন্নী হিসেবে দেখিয়ে থাকে।

যে কেউই ইন্দ্রিয়-পূজায় অতিবাহিত করল, সে মু'তাযিলী অর্থাৎ সত্যানুসারীদের দলবহির্ভূত; যদি সে সুন্নী হবার দাবি করে, তবে এ তার দুর্বলতা।

যে ইন্দ্রিয় পূজা থেকে বেরিয়ে এল সে সুন্নী ; জ্ঞানী ব্যক্তিরা কেবল তাদের বুদ্ধির ওপরই দাঁড়িয়ে থাকে।[১]

তিনি স্থানে স্থানে এটা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, ঐসব বাহ্যেন্দ্রিয় ছাড়াও মানুষকে কিছু প্রচ্ছন্ন ইন্দ্রিয় দান করা হয়েছে। আর এই প্রচ্ছন্ন ইন্দ্রিয় বাহ্যেন্দ্রিয়ের তুলনায় অনেক বেশী বিস্তৃত ও গভীর। মওলানা বলেন :

پنج حسیے هست جز ایں بنج حس + آں چوزر سرخ وایں حسها چومس

اندران بازار کا هل محشر اند + حس مس راچوں حس زرکے خرند

حس ابداں قوت ظلمت می خورد + حس جان از آفتابے می چرد

ঐ পাঁচটি ইন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক) ছাড়াও আরও পাঁচটি ইন্দ্রিয় রয়েছে, যেগুলো স্বর্ণের ন্যায় লাল আর এই বাহ্যেন্দ্রিয় তামার মতই (মূল্যহীন)।

জনসমাবেশে পরিপূর্ণ এই বাজারে তামার ন্যায় মূল্যহীন ইন্দ্রিয়কে স্বর্ণের ন্যায় মূল্যবান ইন্দ্রিয়ের বিনিময়ে ক্রয় করবে?

শরীরের ইন্দ্রিয়াভূতির খোরাক হ'ল অন্ধকার; আর হৃদয়ের মাঝে যে অনুভূতি বিরাজমান তার খোরাক সূর্য-কিরণ।[২]

তাঁর মতে কোন বস্তু অস্বীকার কিংবা প্রত্যাখ্যানের জন্য এতটুকু প্রমাণ যথেষ্ট নয় যে, তা দেখা যায় না কিংবা তা ইন্দ্রিয় অনুভূতি অথবা উপলব্ধিতে ধরা পড়ে না। তাঁর মতে বাতেন (প্রচ্ছন্ন বস্তু কিংবা বিষয়) জাহির (বাহ্যিক কিংবা দৃশ্যমান বস্তু বা বিষয়)-এর পেছনে লুক্কায়িত এবং ঠিক সেইভাবে যেভাবে ঔষধের

---

১ মছনবী-১০১ পৃ.।

২ মছনবী-১০১ পৃ.।

অন্তরালে উপকারিতা ও কল্যাণ লুকিয়ে থাকে। যারা এই অদেখা বা প্রচ্ছন্ন বস্তু অস্বীকার করে তাদের সম্পর্কে তিনি বলেন :

حجت منکر همی آمد که من + غیر ازیں ظاهر نمی بینم وطن

هیچ نندیشد که هر جا ظاهراست + آں زحکمت هائے پنهاں فجرست

فائده هر ظاهرے خود باطنیت + همچو نفع اندر دواها مضمریست

(অদৃশ্য বস্তুর) অস্বীকারকারীদের যুক্তি হ'ল, "আমি এই দৃশ্যমান বস্তুজগত ছাড়া আর কোন জগতই দেখছি না।"

তারা এটা চিন্তা করে দেখে না যে, প্রতিটি দৃশ্যমান বস্তু একটি প্রচ্ছন্ন মৌলিক সত্যের হিকমত থেকেই প্রকাশ পেয়েছে।

প্রতিটি দৃশ্যমান বস্তুর কল্যাণ ও উপকারিতা তো একটি প্রচ্ছন্ন বিষয়; যেমন ঔষধ দৃশ্যমান বস্তু, কিন্তু তার অন্তর্বর্তী উপকারিতা প্রচ্ছন্ন।[১]

তাঁর বক্তব্য এই যে, অস্বীকারকারীরা নিজেদের এই বাহ্যদর্শিতা ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীজনিত অভ্যাসের কারণে ঐসব বাতেনী হাকীকতের দর্শন থেকে বঞ্চিত এবং আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হতে মাহরূম।

چونکه ظاهر هاگر فتند احمقاں + آں دقائق شد ازیشاں بس نهاں

لاجرم محجوب گشتند از غرض + که دقیقه فوت شد در مفترض

বেওকুফেরা যখন কেবল প্রকাশ্য ও দৃশ্যমান বস্তুকে গ্রহণ করল তখন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়বস্তুর হাকীকত তাদের দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেল।

এজন্যেই অসহায় এসব লোক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'ল; একটি কাল্পনিক ও কৃত্রিম বস্তুর জন্য তাদের হাকীকত তথা মূল সত্যই হারিয়ে গেল।[২]

পঞ্চেন্দ্রিয় থেকে অগ্রসর হয়ে তিনি যুক্তি ও জ্ঞান-বুদ্ধির ওপর সমালোচনার ছুরি চালিয়েছেন এই বলে যে, 'আলম-ই-গায়ব বা অদৃশ্য জগতের হাকীকত ও আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালামের 'ইল্‌ম ও মা'রিফতের ব্যাপারে যুক্তি ও জ্ঞান-বুদ্ধি সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। তার নিকট অনুমানের কোন ভিত্তি নেই, এ জগতের কোন অভিজ্ঞতাও তার নেই। যে সমুদ্রের লবণাক্ত পানির অধিবাসী সে সুপেয় মিষ্টি পানির স্বাদ কি করে বুঝবে?

اے که اندر چشمه شور است جات

توچه دانی شط وجیحون وفرات

১. ঐ, ৩৬৮ পৃ.।
২. ঐ, ৪২২ পৃ.।

ওহে! লবণাক্ত ঝর্ণার মাঝে তোমার অধিবাস, জীহুন ও ফোরাতের মত সুপেয় নদীর পানির স্বাদ তুমি কী করে বুঝবে?[১]

তিনি সেই যুক্তি ও জ্ঞান-বুদ্ধিকে যা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সূচনাপর্বের অধীন, আংশিক জ্ঞান নামে স্মরণ করে থাকেন। তাঁর মতে জল্পনা-কল্পনা ও সংশয় তার পরিণাম এবং অন্ধকার জগত তার স্বদেশভূমি। এই আংশিক জ্ঞানের চেয়ে পাগলামিও ভাল।

عقل جزوی آفتش وهم ست وظن ... دست در دیوانگی باید زدن

আংশিক জ্ঞানের বিপদ হ'ল অনুমান ও ধারণা ; কেননা অন্ধকারের মাঝেই তার অধিবাস।[২]

আংশিক বুদ্ধি বুদ্ধিকেই দুর্নামের ভাগী করেছে ; দুনিয়ার মতলব মানুষকে ব্যর্থতার শিকারে পরিণত করেছে।[৩]

এই জ্ঞান ও বুদ্ধি থেকে অমনোযোগী হওয়াই ভাল ; এর চেয়ে বরং পাগলামি আরও ভাল-অর্থাৎ এরূপ জ্ঞান-বুদ্ধি অপেক্ষা অজ্ঞানতার মাঝে বাস করাও ভাল।[৪]

তিনি বলেন ঃ আমি স্বয়ং এই দূরদর্শী জ্ঞান-বুদ্ধির অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, অতঃপর আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি।

آز مودم عقل دور اندیش را
بعد ازیں دیوانه سازم خویش را

এই দূরদর্শী বিদ্যা-বুদ্ধিকে আমি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছি এবং এই অভিজ্ঞতা লাভের পরই আমি নিজেকে পাগল বানিয়েছি।[৫]

অতঃপর মওলানা সোজা, সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় বলেন, যদি 'আকল (জ্ঞান ও যুক্তি-বুদ্ধি) দীনের হাকীকত ও মা'রিফত বুঝবার জন্য যথেষ্ট হত তাহলে তার্কিক, দার্শনিক, পণ্ডিত ও মুতাকাল্লিমগণই সবচেয়ে বেশী আল্লাহ্ওয়ালা ('আরিফ) এবং ধর্মের সূক্ষ্ম রহস্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতেন।

اندریں بحث از خرده بیں بدے
فخر رازی راز دار دین بدے

---

১. মছনবী, ৯৬ পৃ.।
২. ঐ, ২২৪ পৃ.।
৩. ঐ, ৪০২ পৃ.।
৪. ঐ, ১৫২ পৃ.।
৫. ঐ, ১৫২ পৃ.।

এই তর্কালোচনায় যদি 'আকল দ্বারা কাজ হ'ত তাহলে ফখরুদ্দীন রাযীই ধর্মের গুপ্ত রহস্য সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী হতেন।[১]

তাঁর মতে ভাসা ভাসা বাহ্যিক জ্ঞান (দর্শন) 'ইলমে হাকীকীর পক্ষে অন্তরায় এবং আধ্যাত্মিক পথের পথিকের (সালিক) মানসিক অস্থিরতার জন্য দায়ী। অতএব, নিশ্চিত জ্ঞান (ইয়াকীন), স্থির বিশ্বাস ও আল্লাহ্র পরিচয় লাভ করতে হলে বাহ্যিক জ্ঞানকে বিকশিত করার পরিবর্তে হ্রাস, এমন কি এর থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে হবে। তিনি বলেন :

گرتو خواهی کت شقاوت کم شود ... حکمت دینی برد فوق فلك

যদি তুমি চাও যে, তোমাদের দুর্ভাগ্যের পাল্লা হাল্কা হোক, তাহলে তুমি চেষ্টা কর যাতে তোমার মধ্যে দর্শন-চিন্তা কম হয়।

বাহ্যিক বিজ্ঞান, প্রকৃতি ও কষ্ট-কল্পনা থেকে যা আসে তা আল্লাহ্র (রহমতের) ফয়েযশূন্য হয়।

পার্থিব ও জাগতিক জ্ঞান তোমার মাঝে নানারূপ জল্পনা-কল্পনা ও সন্দেহ-সংশয়ের সৃষ্টি করে আর দীনের জ্ঞান তোমাকে আসমানের ওপর আল্লাহ্র সান্নিধ্যে নিয়ে যায়।[২]

তাঁর ধারণায় যুক্তি-প্রমাণ যে কোন ঘটনার বিন্যাস এবং তা থেকে ফলাফল বের করবার এক কৃত্রিম পন্থা বটে এবং এ থেকে সীমাবদ্ধ ফল পাওয়াও যেতে পারে। তবে এর দ্বারা দীনের হাকীকত প্রমাণ করা এতই কঠিন যত কঠিন কাষ্ঠ নির্মিত পায়ের সাহায্য ইচ্ছে মাফিক যত্রযত্র চলাফেরা করা ও দূর দেশে ভ্রমণ করা। তাঁর এই উদাহরণ প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছে এবং তা লোকের মুখে মুখে ফিরছে যে ঃ

پائے استد لالیان چوبیں بود + پائے چوبیں سخت بے تمکین بود

যুক্তিবাদীদের পদযুগল কাষ্ঠনির্মিত; এগুলো শক্ত হয় বটে, তবে কোথাও ঠিক হয়ে বসে না।[৩]

তাঁর মতে 'ইলমে কালাম ও মুতাকাল্লিমসুলভ বাহাছ-মুবাহাছা ও যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও ঈমানের মিষ্টতা পাওয়া যায় না। কেননা মুতাকাল্লিম অন্ধ আনুগত্যের বশে কেবল তার পূর্বসুরিদের দলীল প্রমাণের উদ্ধৃতি দেন এবং তা চর্বিত চর্বণ করেন। ফলে তার আত্মা প্রকৃত জ্ঞান ও ইয়াকীনী অবস্থা থেকে বঞ্চিত থাকে।

---

১. মছনবী, ৪৮৯ পৃ.।
২. ঐ, ১৭১ পৃ.।
৩. ঐ, ৫৫ পৃ.।

آں مقلد صد دليل وصد بيان + بر زبان آردندارد هيچ جان
چونكه گوينده ندارد جان وفر + گفت اوراكے بود برگ وثمر

অন্যের অন্ধ আনুগত্যকারী তার আনুগত্যের সমর্থনে শত কিসিমের যুক্তি-প্রমাণ ও বিবৃতি পেশ করে, তবে তাতে প্রাণ (রূহ) থাকে না। যখন স্বয়ং কথকের মধ্যেই প্রাণ-স্পন্দন নেই, নেই কোন মাহাত্ম্য, তখন তার কথা কেমন করে পত্র-পুষ্পে পল্লবিত ও ফলবতী হবে।[১]

আংশিক জ্ঞানের পরিবর্তে যা পঞ্চেন্দ্রিয়লব্ধ–তিনি সেই ঈমানী জ্ঞানের পক্ষপাতী যা স্বয়ং জ্ঞান ও বুদ্ধিকেই পথ দেখায় ও তার আলোকবর্তিকাস্বরূপ কাজ করে। এ প্রকারের জ্ঞানকে জ্ঞান-বুদ্ধির জ্ঞান বলতে পারেন। এ জ্ঞান সে সমস্ত লোকের উত্তরাধিকার যারা ঈমানী নূর ও ইয়াকীনী সম্পদ দ্বারা ধন্য।

بند معقولات آمد فلسفى + شهسوار عقل عقل آمد صفى

দার্শনিক বোধগম্য বস্তুনিচয়ে মধ্যেই বন্দী; আর পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী ঈমানী নূরে আলোকিত।[২]

আংশিক জ্ঞানের কারণেই মানবতার ইতিহাস কালিমাময়; আর পরিপূর্ণ যে জ্ঞান তা দ্বারা পূর্ব দিগন্ত আলোক-উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

মওলানা রূমীর ভাষায় :

عقل دفترها كند يكسر سياه + عقل عقل آفاق دارد پر زماه
از سياهى وسپيدى فارغ است + نور ماهش بر دل وجان بازغ است

এই আংশিক জ্ঞান-বুদ্ধি দফতরের পর দফতর মসীলিপ্ত করে তোলে ; আর প্রকৃত জ্ঞান চন্দ্রালোকিত করে তোলে আসমানের প্রান্তদেশ।

এই জ্ঞান কৃষ্ণতা ও শুভ্রতা থেকে মুক্ত; এর চন্দ্র কিরণ উদিত হয় হৃদয়ের প্রাণে।[৩]

ঈমানী জ্ঞান শহররক্ষীর ন্যায়। আংশিক জ্ঞান ভয়, সন্ত্রাস ও জাগতিক সংশয়ের কারণে আর ঈমানী জ্ঞান তৃপ্তি, প্রশান্তি ও কামনা-বাসনার রক্ষক।

عقل ايمانى چوشحنه عادل است + پاسبان وحاكم شهر دل است
عقل درتن حاكم امان بود + كه زبيمش نفس در زندان بود

ঈমানী জ্ঞান ন্যায়পরায়ণ কোতোয়ালের ন্যায়, হৃদয়রূপী শহরের সে রক্ষক ও শাসক।

---

১. মছনবী, ৪৪৯ পৃ.।
২. ঐ, ২৪৬ পৃ.।
৩. ঐ, ২৪৬ পৃ.।

জ্ঞান দেহাভ্যন্তরে ঈমানের শাসক হয়ে থাকে, যার ভয়ে নফ্স কয়েদখানায় বন্দী থাকে।[১]

মাওলানার মতে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের ওপর যেরূপ জ্ঞানের অধিকার রয়েছে তেমনি জ্ঞানের ওপরও আত্মার প্রাধান্য ও প্রশাসনিক ক্ষমতা রয়েছে। রূহ (আত্মা) একটি মাত্র ইঙ্গিতে জ্ঞান ও বুদ্ধির ('আকল) শত শত গ্রন্থি উন্মোচন করতে পারে এবং চোখের পলকে তার যে কোন সমস্যার সমাধান করতে পারে।

حس اسیر عقل باشد اے فلان + عقل اسیر روح باشد هم بدان

دست بسته عقل راجان باز کرد + کارهائے بسته راهم سازکرد

লোক সকল! জেনে রেখ, বাহ্যিক অনুভূতি জ্ঞানের নিকট বন্দী আর জ্ঞান বন্দী রূহ্ (আত্ম)-এর নিকট।

জ্ঞানের বদ্ধ হাতকে জীবন খুলে দিয়েছে অর্থাৎ জীবন জ্ঞানের বন্দী জীবনের অবসান ঘটিয়েছে এবং যাবতীয় সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে।[২]

দার্শনিক নিম্নতম বোধগম্য বস্তুনিচয় ও প্রাথমিক তথ্যাদির মনযিল থেকে খুব বেশী দূর অগ্রসর হতে পারে না। তার জ্ঞান এখনও চৌকাঠের বাইরেই পা ফেলে নি।

فلسفی گوید زمعقولات دون + عقل از دهلیز می ناید برون

দার্শনিক খুবই নিম্ন মানের বোধগম্য বস্তুর কথা বলে; তার জ্ঞান এখনও দহলিজের বাইরে পা-ই রাখে নি।[৩]

দার্শনিক স্বয়ং তারই বুদ্ধি-জ্ঞান ও চিন্তার শিকার হয়েছে। সে এমন এক দুর্ভাগা মুসাফির যে তার পৃষ্ঠদেশ মনযিলের দিকে আর গতিমুখ প্রান্তর পানে। সেজন্য যে যত দ্রুত পদক্ষেপে অগ্রসর হয় সে ততই মনযিলে মকসুদ থেকে দূরে সরে যায়।

فلسفی خود را از اندیشه بکشت + کو بدو کورا سوئے گنج است پشت

کو بدو چنداں که افزوں می دود + از مراد دل جدا ترمی شود

"দার্শনিক দুনিয়ার যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে ওয়াকিফহাল, বিস্তৃত দৃষ্টির অধিকারী, শত রকমের জিনিস সম্পর্কে অবহিত।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, সে তার আত্মপরিচয়ের ক্ষেত্রেই অপরিচিতির বেড়াজালে আবদ্ধ, অথচ সবচেয়ে বড় জ্ঞানই হ'ল আত্মপরিচয় লাভ।"[৪]

১. মছনবী, ৩৪৭ পৃ.। ৪. ঐ, ৫৪৪ পৃ.।
২. ঐ, ২৩০ পৃ.।
৩. ঐ, ৮২ পৃ.।

রূমীর ভাষায় :

صد هزاران فضل دارد از علوم + جان خود رامی نداند ایں ظلوم
داندا وخاصیت هر جوهرے + در بیان جوهر خود چوں خرے
قیمت هر کاله می دانی که چیست + قیمت خود را ندانی زاحمقیست
جان جمله علمها این ست ایں + که بدانی من کیم در یوم دین

দার্শনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনের ক্ষেত্রে শতবিধ ফযীলত ও কামালিয়তের অধিকারী, কিন্তু এই জালেম তার নিজের সম্পর্কেই বে-খবর।

সে সব ধরনের মূল্যবান মণি-মুক্তার বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ সম্পর্কে অবহিত; কিন্তু নিজের সম্পদের বৈশিষ্ট্যের বর্ণনায় গাধার মত আহাম্মক।

তুমি সব ধরনের ধন-সম্পদ সম্পর্কেই জান কোন্‌টার কি মূল্য ; অথচ কী বিস্ময়কর মূর্খ যে, তুমি তোমার নিজের মূল্য জানা না?

সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল (রূহ) এটাই যে, তুমি নিজের সম্পর্কে জেনে নেবে যে, কাল কিয়ামতের দিন তোমার অবস্থান কোথায়।[১]

মওলানা রূমী তাঁর যুগের জ্ঞানী-গুণী ও মুতাকাল্লিমদের গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন ছেড়ে ঈমানী জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিকে মুখ ফেরাবার দা'ওয়াত জানান যা প্রকৃত 'ইল্‌ম (জ্ঞান) ও হিকমত (বিজ্ঞান ও দর্শন)।

چند چند از حکمت یونانیان + حکمت ایمانیاں راهم بخوان

গ্রীক দর্শন থেকে আর কত নেবে; ঈমানী বিজ্ঞান সম্পর্কেও একটু পড়াশোনা কর।[২]

মওলানা বলেন, তাযকিয়া-ই-নফ্‌স তথা আত্মিক পরিশুদ্ধির মাধ্যমে সঠিক ও যথার্থ আত্মপরিচয় লাভ ঘটে। হৃদয়-পাতা যত পরিচ্ছন্ন হবে, হিকমতে ঈমানীর চিত্রও ততটা আলোকোজ্জ্বল হবে। ঠিক সেই মুহূর্তে কোন প্রকার কিতাবাদি ও উস্তাদ ছাড়াই আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালামের 'ইল্‌ম ও মা'রিফত হাসিল হবে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনের উৎস খুলে যাবে।

তাঁর ভাষায় :

خویش راصافی کن زاوصاف خود + تابه بینی ذات پاك وصاف خود
بینی اندر دل علوم انبیاء + بے کتاب وبے معید وبے اوستا

উত্তম চরিত্র ও গুণাবলী দ্বারা স্বীয় অভ্যন্তর ভাগ সাফ-সুতরো কর যাতে করে তুমি তোমার পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন সত্তাকে দেখতে পাও।

১. মছনবী, ৪৪৯ পৃ.।
২. ঐ, ৮৬।

হৃদয়াভ্যন্তরেই তুমি আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালামের 'ইল্‌ম দেখতে পাবে; কোন প্রকার কিতাব অথবা মুখস্থকারী কিংবা উস্তাদের সাহায্য ব্যতিরেকে আপনা থেকেই তোমার ভেতর জ্ঞানের আলোক বিকিরণ শুরু হবে, তোমার অভ্যন্তরভাগ হবে অসামান্য আলোকোজ্জ্বল।[১]

অন্যত্র বলেন :

آعدینه دل چوں شود صافر وپاك + نقشها بینی برون ازآب وخاك

روزن دل گر کشادست وصفا + می رسد بے واسطه نور خدا

হৃদয়-দর্পণ যখন স্বচ্ছ, শুভ্র ও পবিত্র হবে তখন তাতে মৃত্তিকা ও পানি-বহির্ভূত অপর কিছুর চিত্র প্রতিভাত হবে।

হৃদয়-দুয়ার যদি উন্মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন থাকে তাহলে কোনরূপ বাধা-প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই তাতে খোদায়ী নূর গিয়ে পৌঁছুবে।

ইশ্‌ক-এর দা'ওয়াত

সপ্তম শতাব্দীতে 'ইলমে কালাম ও বুদ্ধিবৃত্তির যে শীতল বায়ু মুসলিম জাহানের পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছিল, তাতে হৃদয়ের অঙ্গার-ধানী উত্তাপবিহীন ঠাণ্ডা পাত্রে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। কোথাও এক-আধটু অগ্নিস্ফুলিঙ্গ থেকে থাকলেও তা ছাই-গাদায় চাপা পড়ে গিয়েছিল। মুসলিম বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিমর্ষচিত্ততা ছেয়ে গিয়েছিল এবং কথক ঘোষণা দিচ্ছিল :

بجھی عشق کی اگ اندھیر ہے + مسلمان نہی خاك کاڈھیر ہے

প্রেমের আগুন নিভে গেছে, চতুর্দিক অন্ধকার। কোথাও মুসলমান নেই, শুধু মাটির স্তূপ (দেখছি)।

এরূপ শীতল ও ঘুমন্ত পরিবেশে মওলানা প্রেমের ('ইশ্‌ক-এর) ডাক দিলেন এবং এত জোরে দিলেন যে, সে ডাকে মুসলিম জাহানের মরা দেহে বিদ্যুত প্রবাহের সৃষ্টি হ'ল।

মওলানা খোলাখুলিভাবে প্রেমের দা'ওয়াত জানান এবং মুহব্বতের অলৌকিকত্ব ও 'ইশ্‌ক-এর বিস্ময়কর চমৎকারিত্ব বর্ণনা করেন :

از محبت تلخها شیرین شود ..... وزمحبت شاه بنده می شود

প্রেমের কারণে তিক্ত ও বিস্বাদ বস্তুও সুখাদ্যে পরিণত হয়; আর প্রেমের দ্বারাই তামা স্বর্ণে পরিণত হয়।

প্রেম দ্বারা পাত্রের নীচে জমাট ময়লা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়; প্রেমের দ্বারা অনেক ব্যথার নিরাময় ঘটে।

প্রেম কারাগারকেও কুসুম কাননে পরিণত করে; আর প্রেমশূন্য কানন অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয়।

প্রেমের বদৌলতে পাথরও তেলের মত নরম ও মসৃণ হয়; আর প্রেমহীন মোমও লোহায় পরিণত হয়।

প্রেম রোগীকেও সুস্থতা দান করে; আর প্রেমের কারণে ক্রোধও করুণায় পরিণত হয়।

প্রেমে মৃতও জীবিত হয়ে ওঠে; আর প্রেম বাদশাহকেও গোলামে পরিণত করে।[১]

তিনি প্রেমের শক্তি ও অনুগ্রহ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন :

جسم خاك از عشق بر افلاك شد + كوه در رقص آمد وچلاك شد

عشق جان طور آمد عاشقا + طور مست وخر موسى صعقا

"মাটির দেহ প্রেমের বদৌলতে আসমানে আরোহণ করে (মি'রাজের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে); আর প্রেমের কারণে পর্বতও নেচে ওঠে, চেতনা পায় [উহুদ পর্বতের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে যখন এতে আঁ-হযরত (সা) আরোহণের পর আনন্দে তা দুলে উঠেছিল]।

ওহে 'আশিক! প্রেম তূর পর্বতের প্রাণে পরিণত হ'ল; কোহে তূর নূরে ইলাহীর তাজাল্লীতে মত্ত হ'ল আর মূসা 'আলায়হি'স-সালাম জ্ঞান হারিয়ে মূর্ছা গেলেন।[২]

তিনি বলেন : 'ইশ্‌ক (প্রেম) সম্মান ও মর্যাদার ক্ষেত্রে অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত এবং আপন সত্তা সম্বন্ধে অত্যন্ত সজাগ ও সচেতন। সে সপ্ত মহাদেশের রাজত্ব প্রাপ্তিকেও গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। প্রেমের স্বাদ যে একবার আস্বাদন করেছে সে আর কোন কিছুর দিকেই ফিরে তাকায় না :

دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو + عجب چیز ہے لذت آشنائی

(প্রেম) অন্তর-মনকে উভয় জগতের প্রতি উদাস ও বিমুখ করে তোলে ; প্রেমের স্বাদ এক আশ্চর্য বস্তু।[৩]

মওলানা রূমীর ভাষায় :

بادو عالم عشق را بیگانگی + اندر وهفتاد دو دیوانگی

১. মছনবী-১৩৪ পৃ.। ৩. বাল-ই জিবরীল, ইকবাল মরহুম।

২. মছনবী-৫ম পৃ.।

প্রেম উভয় জগত থেকে উদাসীন;এর ভেতর বাহাত্তরটি উন্মত্ততা লুক্কায়িত।[১]

سخت پنهاں است وپیدا حیرتش + جان سلطانان جاں در حسرتش

غیر هفتاد دو ملت کیش او + تخت شاهان تخته بندے پیش او

প্রেমের বিস্ময় অনেকটা প্রচ্ছন্ন আর অনেকখানি প্রকাশ্য ; এর হা-হুতাশের ভেতর প্রাণ-সম্রাটের প্রাণ রয়েছে।

সর্বোত্তম ধর্ম ব্যতিরেকেও প্রেমের স্বতন্ত্র এক ধর্ম রয়েছে; সম্রাটের সিংহাসনও তার নিকট সমতল চত্বরের মত অর্থাৎ প্রেমের নিকট রাজসিংহাসনেরও কানাকড়ি মূল্য নেই।[২]

কোন ব্যক্তি যখন দুঃসাহসী দারিদ্র্য ও ঈর্ষাতুর প্রেমের চর্চা ও আলোচনা করতে থাকে তখন তার মধ্যে জোশ ও উন্মত্ততার এক অদ্ভুত অবস্থার অভ্যুদয় ঘটে এবং সে আত্মহারা হয়ে বলতে থাকে :

ملك دنیا تن پرستان را حلال + ما غلام ملك عشق بے ذوال

দুনিয়ার হুকুমত দেহপূজারীদের জন্য বৈধ ; কিন্তু আমরা (প্রেমিকরা) তো এক চিরন্তন প্রেমের রাজ্যের গোলাম যার ক্ষয় নেই, নেই লয়।[৩]

মওলানা বলেন যে, 'ইশ্‌ক (প্রেম) এমন এক রোগ যার হাত থেকে রোগী কখনো আরোগ্য কামনা করে না, বরং সে চায় এ রোগ তার মধ্যে দিনে দিনে আরও বৃদ্ধি পাক।

جمله رنجور اں شفا جویندواین + رنج افزون جوید ودر دو چنین

خوبتر زین سم ندیدم شربتے + زین مرض خوشتر نباشد صحتے

রোগ-ব্যাধিগ্রস্ত সব লোকই রোগ নিরাময়ের পন্থা অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকে; (অথচ কি মজার ব্যাপার) প্রেম রোগে রোগাক্রান্ত ব্যক্তি চায় তার এ রোগ ও দুঃখ-বেদনা আরও বৃদ্ধি পাক।

এই বিষের চেয়ে উৎকৃষ্ট পানীয় আমি আর দেখিনি; আর এ রোগের চেয়ে অধিক আরামও আমি আর পাইনি।[৪]

কিন্তু এ এমন এক রোগ, যা কাউকে একবার ধরলে অন্য কোন রোগই তাকে আর ধরে না।

মওলানার ভাষায় :

آن کلامت می رهاند از کلام + وان سقامت می جهاند از سقام

১. মছনবী, ২৪৭ পৃ.।
২. ঐ, ২৪৭ পৃ.।
৩. ঐ, ৫৯১ পৃ.।
৪. ঐ, ৫৯৫ পৃ.।

তার কথা এমন, যা তোমাকে অন্য সব কথা থেকে রেহাই দেবে ; এ রোগ এমন যা তোমাকে অন্য সব রোগ থেকে মুক্তি দেবে।[১]

প্রেম রোগ এমন যার ওপর লক্ষ স্বাস্থ্য কুরবান; এমন রোগ যার ওপর হাযারো আরাম-আয়েশ উৎসর্গীকৃত।

پس مقام عشق جان صحت است + رنجهایش حسرت هرواحت است

'ইশ্‌ক-এর মকাম সুস্থতার প্রাণ, তার ব্যথা প্রতিটি আরামের উৎসস্থল।[২]

এই পবিত্র (ঐশী) প্রেম যদি গোনাহ্ হয় তাহলে শত 'ইবাদত আনুগত্যও তার মুকাবিলায় নিষ্প্রভ।

زین گنه بهتر نباشد طاعتے + سالها نسبت بدین دم ساعتے

প্রেমের একটি মুহূর্তে যে (আধ্যাত্মিক) উন্নতি লাভ ঘটে, শত শত বছরের কঠোর রিয়াযত ও মুজাহাদায় তা সম্ভব হয় না।[৩]

প্রেমের পথে যে রক্ত প্রবাহিত হয় তা যে কোন পানির চেয়ে কম পবিত্র নয়। প্রেমের রাস্তায় চলতে গিয়ে যে শহীদ হয়েছে আমাদের দেয়া ওযূ গোসলের তার কোন প্রয়োজন নেই।[৪]

মওলানার ভাষায় :

خون شهید ان را زآب اولی تراست + این خطا از صد صواب اولی تراست

শহীদের খুন পানির চেয়ে উত্তম; প্রেমের ভুল-ত্রুটি শত বিশুদ্ধতার চেয়ে উৎকৃষ্ট।[৫]

প্রজ্বলিত হৃদয় ও দগ্ধ অন্তরের 'আশিকের ওপর সাধারণ গণ-মানুষের জন্য প্রণীত আইন কার্যকরী হয় না। যে গ্রাম বিরান হয়ে গেছে তার আবার খাজনা কিসের?

মওলানার ভাষায় :

عاشقاں را هر نفس سوزید نیست + برده ویران را خراج وعشر نیست

'আশিক-এর প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসের ভেতর রয়েছে শত যিন্দেগী; বিরান গ্রামের ওপর খাজনা কিংবা ওশর নেই অর্থাৎ সর্বসাধারণের জন্য প্রণীত বিধি-বিধান প্রেমিকের বেলায় প্রযোজ্য নয়।[৬]

---

১. মছনবী। ৪. ঐ, ১৩৯ পৃ.
২. ঐ। ৫. ঐ।
৩. ঐ। ৬. ঐ, ৩৩৪।

'ইশ্‌ক আদম ('আ)-এর পরিত্যক্ত সম্পত্তি অর্থাৎ মীরাছ; আর চালাকি ও চাতুরি ইবলীসের পুঁজি।

রূমীর ভাষায় :

داند آں کو نیك بخت ومحرم است + زیر کی زا بلیس وعشق از آدم است

যে ব্যক্তি ভাগ্যবান ও রহস্যভেদী, সে জানে, চালাকি হ'ল ইবলীসের কাজ আর 'ইশ্‌ক (প্রেম) হ'ল আদমের পরিত্যক্ত সম্পত্তি।[১]

চালাক-চতুরের দক্ষিণ হস্ত হ'ল তার বাহুদ্বয়। এর ওপরই তার সকল নির্ভরতা। আর প্রেমিক তার বাহুর ওপর নির্ভর করে না, বরং কোন বৃহত্তম শক্তির আঁচলতলে সে আশ্রয় খোঁজে। সে নিজেকে বিলিয়ে দেয় কিংবা সমর্পণ করে কারো কাছে। চালাকি ও চাতুর্য সাঁতারুর সাঁতার-কৌশল আর 'ইশ্‌ক হ'ল নূহ্ ('আ)-এর কিশতী।

زیرکی سباحی آمد در بحار + کم زهد غرق اسبت او پایان کار

عشق چوں کشتی شود بهر خواص + کم بود آفت بود اغلب خلاص

চালাকি চাতুরি সমুদ্রে সন্তরণতুল্য; যাহিদ ('আশিক)-এর পরিণাম পানিতে ডুবে মৃত্যু নয়।

'ইশ্‌ক হ'ল আল্লাহ্‌র বিশিষ্ট বান্দার জন্য নৌকা; আর নৌকার বিপন্ন হবার আশংকা কম এবং উদ্ধার পাবার আশা বেশী।[২]

জ্ঞান-বুদ্ধির সতর্কতাকে প্রেমের হয়রানির মধ্যে কুরবানী দেওয়াই সমীচীন। কেননা এই সতর্কতা কেবল ধারণা ও অনুমানমাত্র। আর এই হয়রানির মাধ্যমে প্রেমাস্পদের মুশাহাদা ও পরিচিতি লাভ সম্ভব।

زیرکی بفروش وحیرانی بجز + زیرکی ظنیست ، حیرانی نظر

চালাকি ও চাতুর্য বিক্রি করে ফেল এবং (প্রেমের) হয়রানি খরিদ কর; চালাকি ও সাবধানতা অনুমান ছাড়া কিছু নয়, প্রেমের হয়রানি মুশাহাদার নামান্তর অর্থাৎ প্রেমের রাস্তায় চলতে চলতে ক্লান্ত হবার পর আল্লাহ্‌র রহমতের মুশাহাদা সম্ভব হয়।[৩]

মওলানা 'ইশ্‌ক-এর সবক দিতে গিয়ে বলেন ঃ 'মাহবুব' (প্রেমাস্পদ) হওয়া সবার পক্ষে সম্ভব না হলেও 'আশিক' (প্রেমিক) হওয়া কিন্তু সম্ভব। আল্লাহ যদি তোমাকে মাহবুব না বানিয়ে থাকেন তবে তুমি 'আশিক হয়ে জীবনের স্বাদ ও আনন্দ হাসিল কর।

---

১. মছনবী। ৩. ঐ, ৪৯ পৃ.।
২. ঐ, ৩৩৪ পৃ.।

توکه یوسف نیستی ، یعقوب باش + همچو او باگریه وآشوب باش

توکه شیرین نیستی، فرهاد باش + چوں نئ لیلی مجنوں گرد باش

তুমি যদি য়ুসুফ হতে না পার তাহলে কমপক্ষে ইয়া'কুব তো হও; তাঁর (ইয়া'কূবের) মত রোদন ও ফরিয়াদে লেগে থাকে।

তুমি যখন শিরীন নও, নিদেনপক্ষে ফরহাদ তো হও; তুমি যখন লায়লা নও, তখন বাহ্যিক বেশ-ভূষায় মজনু তো হও।[১]

তিনি আরও এক কদম এগিয়ে গিয়ে বলছেন : 'আশিক হবার মাঝে যে স্বাদ, মজা ও উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে তা মাহবুব হবার মাঝে কোথায়? যদি পৃথিবীর প্রেমাস্পদরা এই স্থায়ী ও চিরন্তন সম্পদের সন্ধান পেত তাহলে প্রেমাস্পদের কাতার ছেড়ে তারা 'আশিকদের কাতারে গিয়ে শামিল হ'ত।

ترك کن معشوقی وکن عاشقی + اے گمان برده که خوب وفائقی

মাশুক হবার চিন্তা ছাড়, 'আশিকের পথ ধর; ওহে ঐ ব্যক্তি যে নিজেকে খুব ভাল ও সর্ববিষয়ে যোগ্য মনে করে, আমি তাকেই একথা বলছি।[২]

'ইশক-এর মত জাগ্রত সম্পদ কোন মৃত ও অস্থায়ী প্রেমাস্পদের জন্য শোভা পায় না। 'ইশ্‌ক স্বয়ং জীবিত; তাই তা একজন জীবিত ও চিরন্তন প্রেমাস্পদের জন্যই শোভা পায়।

عشق بر مرده نباشد پائدار + عشق را برحئے جان افزائے دار

কোন মৃতের ওপর প্রেম স্থায়ী হয় না; যিনি জীবন দানকারী, যিনি চিরন্তন ও চিরঞ্জীব, তাঁর সঙ্গেই প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন কর।[৩]

عشق آں زنده گزین که باقیست + وزشراب جانفزایت ساقیست

عشق آں بگزین که جمله انبیاء + یافتند از عشق اوکا ردکیا

সেই জীবিত সত্তার প্রেম এখতিয়ার কর যিনি চিরন্তন এবং যিনি তোমার জন্য জীবন-বর্ধক পানীয় (সাকী) পরিবেশনকারী।

সেই সত্তার 'ইশ্‌ক এখতিয়ার কর যাঁর প্রেম অবলম্বন করেই সমস্ত নবী-রসূল সফলকাম হয়েছেন।[৪]

সৌন্দর্যের এই মহান দরবারে প্রেমের অকৃতকার্যতার অভিযোগ সমীচীন নয়; কেননা সেই আদিকাল থেকেই সৌন্দর্য প্রেমের পূজারী ও বন্ধুত্ব পিয়াসী।

تو مگو ما رابداں شه باز نیست + باکریماں کارها دشوار نیست

১. মছনবী।
২. ঐ, ৪৬৬ পৃ.।
৩. ঐ, ৪৬৮।
৪. ঐ, ১০।

তুমি একথা বলো না যে, সেই বাদশাহ্‌র দরবার পর্যন্ত পৌঁছুবার প্রবেশাধিকার আমার নেই; কেননা মহৎ প্রাণদের জন্য কোন কাজই কঠিন নয়।[১]

প্রেম বাহ্যত এক ধরনের রোগ, অন্তরের ভঙ্গুরতা ও দুর্বলতা থেকে যার জন্ম। এই রোগ বড় কালান্তক। কিন্তু মানুষ যদি একে বরদাশত করে নিতে পারে তাহলে এর পরিণতিতে আল্লাহ্‌র মা'রিফত-ই হাকীকী ও চিরন্তন জীবন লাভ ঘটে।

عاشقی پیداست از زارئی دل + نیست بیماری چوں بیماری دل

علت عاشق زعلتها جداست + عشق اصطر لاب اسرار خداست

হৃদয়ের কান্না থেকে প্রেমের প্রকাশ ঘটে; অন্তরের রোগের মত রোগ আর নেই।

প্রেমিকের রোগ সকল রোগ-ব্যাধি থেকে স্বতন্ত্র; আর 'ইশ্‌ক আল্লাহ্‌র গোপন রহস্য জানবার হাতিয়ার বিশেষ।[২]

প্রেমরোগ সকল রোগের ঔষধ, সকল প্রকার প্রবৃত্তিজাত ও চারিত্রিক ব্যাধির নিরাময়কারী। চিকিৎসক যে সব আধ্যাত্মিক (রূহানী) রোগের চিকিৎসা থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছে, যে সব রোগের ক্ষেত্রে কোন ব্যবস্থাপত্রই ফলদায়ক হয় না, একমাত্র 'ইশ্‌ক চোখের পলকে সে সব রোগ নিরাময় করতে পারে। শত বছরের রোগী যখন প্রেমের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক জটিল রোগ থেকে মুক্তি পায় তখন সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে আপন মনেই গেয়ে ওঠে :

شاد باش اے عشق خوش سودائے ما + اے طبیب جمله علتهائے ما

اے دوائے نخوت وناموس ما + اے تو افلاطون وجالینوس ما

খুশীতে থাক, হে 'ইশ্‌ক! হে আমাদের উত্তম পেশা, হে আমাদের সকল রোগের চিকিৎসক!

হে আমাদের গর্ব, অহমিকা ও অহংকারের ঔষধ! তুমি আমাদের জন্য প্লেটো ও জালীনুসতুল্য।[৩]

'ইশক (প্রেম) একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। যখন তা উত্থিত হয় তখন সব আবর্জনা পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। একমাত্র তার মাহবুব (প্রেমাস্পদ) ছাড়া সে আর কাউকে তোয়াজ করে না। এক্ষেত্রে সে বড় বেপরোয়া, বড় আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন।

عشق آں شعله است کوچوں بر فروخت

هرچه جز معشوق باقی جمله سوخت

تیغ لادر قتل غیر حق براند

১. মছনবী, ১০। ৩. ঐ, ৫ পৃ.।
২. ঐ, ৭ পৃ.।

در نگر زاں پس که بعد از لاچه ماند
ماند الا الله باقی جمله رفت
شاد باش اے عشق شرکت سوز رفت

প্রেম (ইশ্‌ক) এমন একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, যখন তা জ্বলে ওঠে তখন একমাত্র মা'শুক (প্রেমাস্পদ) ছাড়া আর সব কিছুকেই পুড়িয়ে দেয়।

লা-ইলাহা-র তলোয়ার গায়রুল্লাহ্- (আল্লাহ্‌বহির্ভূত শক্তির) হত্যায় নিয়োজিত হয়েছে; এরপর দেখ 'লা'-এর পর আর কি বাকি আছে?

একমাত্র 'ইল্লাল্লাহ'-ই-বাকি আছে আর সব কিছুই অন্তর্হিত হয়েছে।

খুশী হও, হে শির্‌ক (অংশীবাদ) খতমকারী 'ইশ্‌ক![১]

'ইশ্‌ক'ই-ইলাহী এক অন্তহীন সমুদ্র। এর কাহিনী শেষ হবার নয়। যুগের বিস্তৃতি এর মুকাবিলায় সংকীর্ণ, পৃথিবীর বয়স এর কাহিনী বর্ণনার জন্য অপর্যাপ্ত। এটা সেই অন্তহীন ও চিরন্তন সৌন্দর্যের কিস্‌সা, যার না আছে আদি আর না আছে অন্ত। অতএব, এ ব্যাপারে চুপ থাকাই ভাল এবং নিজের দুর্বলতা স্বীকার করে নেয়াই সমীচীন।

شرح عشق ارمن بگویم بردوام + صد قیامت بگزر دواں ناتمام
زانکه تاریخ قیامت راحد است + حد کجا آنجا که وصف ایزد است

আমি যদি প্রেমের ব্যাখ্যা দিতে যাই তাহলে শত কিয়ামত গুজরে যাবে কিন্তু আমার কাহিনী শেষ হবে না।

এটা এজন্য যে, কিয়ামতের তারিখের একটা সীমা আছে ; কিন্তু যেখানে আল্লাহ্ পাকের বর্ণনা রয়েছে সেখানে সীমা কোথায়?[২]

অন্তর-রাজ্য

কিন্তু এই 'ইশ্‌ক ও প্রেম, যার দা'ওয়াত মওলানা রূমী অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে দিয়েছিলেন, তা মনের সচেতনতা ও অন্তরের উষ্ণ উত্তাপ ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। প্রতিটি যুগের ন্যায় মওলানার যুগেও মানসিক আলস্য ও অজ্ঞতা বেড়ে চলেছিল এবং মস্তিষ্কের শ্রেষ্ঠত্বের প্রভাব অন্তরের ওপর গিয়ে পড়ছিল। মস্তিষ্ক উজ্জ্বল আর দিল নিস্তেজ ও ঠাণ্ডা হতে চলেছিল। মানুষের জীবনে পেটই কেন্দ্রীয় মর্যাদা পেতে চলেছিল, অর্থাৎ মানুষ নিজেকে আহারসর্বস্ব জীব ভিন্ন যখন আর কিছুই ভাবতে পারছিল না, ঠিক তখনই মওলানা দিলেন শ্রেষ্ঠত্ব ও

১. মছনবী-৪০৫ পৃ.।
২. ঐ, ৪৪২ পৃ.।

বিস্তৃতির প্রতি মনোযোগ দেন এবং এর বিস্ময়কর ক্ষমতা ও বিজয়সমূহ বর্ণনা করেন। তিনি বুঝিয়ে দেন যে, মানুষ তার এই মাটির দেহে বসন্তের এক চিরসবুজ বাগিচা লালন করছে, যার পার্শ্বদেশে বিরাজ করছে এমন এক বিস্ময়কর জগত যার ভেতর দেশের পর দেশ হারিয়ে যাবে। কিন্তু কারো দ্বারা সেখানে লুণ্ঠিত হবার আশংকা নেই।

این آباد است دل اے مردماں + حصن محکم موضع امن و امان
گلشن خرم بکام دوستاں + چشمہا و گلستاں در گلستان

লোক সকল! মানুষের দিল্ এমন আবাসভূমি যেখানে ভয় নেই, ভীতি নেই; এটি একটি নিরাপদ জায়গা ও মযবুত দুর্গ।

বন্ধুদের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য এটি একটি উত্তম বাগিচা; এখানে আছে পানির নহর আর আছে বাগানের পর বাগান।

তিনি বলেন যে, দুনিয়ার বাগান যত সুন্দর ও মনোহরই হোক না কেন, তার স্থায়িত্ব কয়েক দিনের মাত্র। কিন্তু অন্তররাজ্যের (প্রেমের) যে বাগান তা চির যৌবনা; সেখানে শীত-গ্রীষ্মহীন চিরবসন্ত বিরাজমান। দেহের বাগান আবাদ করতে লেগে যায় বছরের পর বছর এবং মুহূর্তেই তা বিরান হয়ে যায়। কিন্তু দিলের বাগান আবাদ করতে সময় লাগে না, অথচ তার সবুজ শ্যামল রূপ ও কমনীয়তা চিরস্থায়ী।[১]

گلشنے کز نقل روید یک دم است + گلشنے کز عقل روید خرم است
گلشنے کزتن دمد گردد تباہ + گلشنے کز دل دمد وافرحتاہ

কিতাবী জ্ঞান (পুঁথিগত বিদ্যা ও জ্ঞান) থেকে যে বাগানের উদ্ভব তার আয়ু মুহূর্ত মাত্র; যে বাগান 'আক্ল (জ্ঞান-বুদ্ধি) থেকে উদ্গত– তাই শ্রেষ্ঠ।

দেহ থেকে যে বাগান উদ্গত তা ধ্বংসশীল; আর অন্তর থেকে যে বাগান উদগত তা অত্যন্ত আনন্দের বস্তু।[২]

তিনি বলেন, দেহকে যৌবনবতী বানাবার চেষ্টা এক অর্থহীন উদ্যোগ এবং সিকান্দার (যু'ল-কারনায়ন) বাদশাহ্‌র "চশমা-ই-আবে হায়াত"[৩] তালাশের ন্যায় এক ব্যর্থ অনুসন্ধান। এর পরিবর্তে বরং 'ইশ্ক-এর আবে-হায়াত পান করে হৃদয় মনে সজীবতা আনয়নের প্রয়োজন যাতে করে সঠিক অর্থেই আত্মার আনন্দ লাভ ঘটে এবং জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে শক্তি-সামর্থ্য ও কমনীয়তা অনুভূত হয়।

---

১. মছনবী, ১৯৯ পৃ.।
২. ঐ, ৫৯৬ পৃ.।
৩. যে ঝর্নার পানি পান করলে চিরঞ্জীব হওয়া যায় বলে কথিত।–অনুবাদক।

دل بجز تا دائما باشی جوان + ازتجلی چهره ات چوں ارغوان

طالب دل شوکه تاباشی چومل + تاشوی شادان وخنداں همچو گل

হৃদয় খরিদ কর, যাতে করে সর্বদা তরুণ থাকতে পার এবং তোমার চেহারা থাকে তাজাল্লী-ই ইলাহীতে লালে লাল।

দিলের প্রার্থী হও, যাতে আঙ্গুরী শরাবের মত থাক (প্রেমমত্ত), যাতে থাক ফুলের মত প্রফুল্ল ও হাস্যমুখর।[১]

যে দিল্ কামনা-বাসনার বিচরণ ক্ষেত্র, যে দিল্ প্রেমের স্বাদ-আনন্দ ও নিশ্চিত বিশ্বাস (ইয়াকীন) থেকে বঞ্চিত, সে দিলে প্রেমের পুষ্পকলি কখনো ফোটে না; সে দিল্ দিল্ নয়, বরং একটি পাষাণ খণ্ড।

تنگ وتاریك است وچوں جان یهود + مینوا از ذوق سلطان ودود

نیے دراں دل تاب نور آفتاب + نے کشاد عرصه نے فتح باب

য়াহূদীর দিল্ সংকীর্ণ, কৃষ্ণকায় এবং প্রেমময় আল্লাহ্‌র আনন্দ-আকর্ষণ থেকে শূন্য।

এই দিলে সূর্যের রৌশনীর দীপ্তি নেই; এখান থেকে কোন প্রশস্ত চত্বরের রাস্তাও বেরিয়ে আসেনি, এর কোন দ্বারও উন্মুক্ত নয়।[২]

এ দিল্ আপন কাঠামো, আকৃতি-প্রকৃতি ও স্থূলত্বের দিক দিয়ে হৃদয়বানের জাগ্রত ও প্রশান্ত দিলের মতই। কিন্তু হাকীকতের দিক দিয়ে কেবল শব্দগত মিল ও শারীরিক সাদৃশ্য ছাড়া উভয়ের মাঝে কোন সম্বন্ধই নেই। স্বচ্ছ ও নির্মল ঝর্ণার প্রবাহিত পানিও পানি, আবার কোন আবর্জনাপূর্ণ বদ্ধ জলাশয় কিংবা কর্দমাক্ত ডোবার পানিও পানি। কিন্তু এই উভয় পানির গুণগত মানের ক্ষেত্রে বিস্তর ফারাক বিদ্যমান। প্রথমোল্লিখিত পানি স্বচ্ছ, সুন্দর ও নির্মল। এর দ্বারা পিপাসার নিবৃত্তি ঘটানো যায়, হাত-পাও পরিষ্কার করা যায়। কিন্তু শেষোল্লিখিত পানিতে মাটির ভাগ এত বেশি যে, এর দ্বারা পানির কাজ নেওয়া চলে না। এক দিল্ থেকে আরেক দিলের পার্থক্যও অনুরূপ। এক দিল্ সাধারণ মানুষের, যা বস্তু-পূজারী, লোভী, অনুভূতিশূন্য ও মৃত। আরেকটি দিল্ আম্বিয়া-ই-কিরাম ও আল্লাহর ওলীগণের যার বুলন্দীর সম্মুখে আসমানের বুলন্দীও খর্ব, যার বিস্তৃতির সামনে গোটা জগতের বিস্তৃতিও সংক্ষিপ্ত।

توهمی گوئی مرا دل نیز هست ...... آں دل ابدال یا پیغمبر است

তুমি বল, আমার কাছেও দিল্ আছে; কিন্তু দিল্ তো 'আরশ-ই-মু'আল্লাহ্‌র মত উন্নত হয়, তা কখনো নিম্নমুখী হয় না।

১. মছনবী–১৫৪ পৃ.। ২. ঐ, ১৭০ পৃ.।

কাদার ভেতরও পানি আছে, তবে সে পানি তোমার হাতে আসবার নয় অর্থাৎ সে পানি তোমার কোন কাজেই আসবে না।

কেননা তাতে পানির তুলনায় কাদার ভাগ বেশী; অতএব তুমি তোমার দিল্ সম্পর্কে এ কথা বলো না যে, এটাও দিল্।

যে দিল্ আসমানের চেয়েও উচ্চ ও সমুন্নত, সেই দিল্ই ওলী-আবদাল ও আম্বিয়া-ই-কিরামের দিল্।[১]

এরপর তিনি সান্ত্বনার সুরে বলছেন, দিল্ আর যাই হোক দিল্ই, আর আল্লাহ্র কাছে কোন দিল্ই মরদূদ (বিতাড়িত ও বহিষ্কৃত) নয়। কারণ তিনি প্রতিটি দিলেরই খরিদ্দার। উপরন্তু এই ক্রয়ের দ্বারা লাভবান হওয়ার কোন উদ্দেশ্যই তাঁর নেই।

کاله که هیچ خلقش ننگرید + ازخلافت آں کریم آں راخرید

هیچ قلبے پیش آو مردوۃ نیست + زانکه قصدش از خریدن سود نیست

যে বস্তুর দিকে কোন সৃষ্টিই চোখ তুলে চাইল না, মহানুভব ও সদাশয় সত্তা তাকেই স্বীয় খিলাফতের অনুপম মর্যাদা দিয়ে খরিদ করে নিলেন।

তাঁর দরবার থেকে কোন দিল্ই বিতাড়িত ও বহিষ্কৃত নয়; কেননা এই ক্রয়ের দ্বারা লাভবান হওয়াটা তাঁর উদ্দেশ্য নয়।[২]

অতঃপর মওলানা রূমী আবার বলেছেন : পেটের স্বর্ণ-নির্মিত তালা পরিত্যাগ করে দিলের স্বাধীন লোকালয়ে পরিভ্রমণ কর এবং আল্লাহ্র অপার কুদরতের বিস্ময়কর তামাশা অবলোকন কর। তোমার এবং তোমার স্রষ্টার মাঝে এই পেট ও পেট পূজা সবচেয়ে বড় আবরণ। তুমি এই আবরণ ভেদ করে বেরিয়ে পড় যাতে সেই মহান দরবার থেকে তোমার প্রতি সালাম বর্ষিত হয়।

معده را بگذار سوئے دل خرام + تاکه بے پرده زحق آید سلام

পেটকে তোমার লক্ষ্যে পরিণত কর না, তাকে পরিত্যাগ কর; দিলের দিকে যাত্রা শুরু কর যাতে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তোমার ওপর অবাধে সালাম বর্ষিত হয়।[৩]

মানবতার স্থান

অত্যাচারী স্বৈরশাসনের প্রভাব, নিরন্তর জুলুম এবং অব্যাহত যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে সাধারণ গণ-মানুষের ভেতর জীবন-বিমুখতা, ভবিষ্যত সম্পর্কে নৈরাশ্য ও

১. মছনবী, ২৩৯ পৃ.। ৩. ঐ, ৪৫০ পৃ.।
২. ঐ, ৫২১ পৃ.।

হীনমন্যতাবোধ এসে গিয়েছিল এবং মানুষ তার নিজের চোখেই ছোট হয়ে গিয়েছিল। অনারবীয় সূফী দর্শন, আত্মসত্তার অস্বীকৃতি ও আত্মহননের শিক্ষা এত জোরেশোরে শুরু হয়ে গিয়েছিল যে, আত্মসংযম ও আত্মপরিচয় লাভকে মানুষ নৈতিক অপরাধের পর্যায়ে ফেলে দিয়েছিল। মানবতা ও মনুষ্যত্বের মধ্যে নয়, বরং তা বর্জনের মধ্যেই তার সার্বিক উন্নতি নিহিত বলে সে ভাবতে শিখেছিল। সে সাধারণভাবে মানবতা ও মনুষ্যত্বের স্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে নিস্পৃহ এবং মানুষের শরাফত সম্পর্কে বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল। সে সময়কার কাব্য সাহিত্যেও মানবতার প্রতি অবজ্ঞার ভাব ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে গণ-মানুষের মাঝে সাধারণভাবে আস্থাহীনতা, হতাশা, বিমর্ষতা ও পরাজিত মনসিকতা বিরাজ করছিল। ফলে তারা কখনো-সখনো জীব-জন্তু ও জড় জগতের প্রতিও ঈর্ষা পোষণ করত। মানবতা ও মনুষ্যত্ব যে কত বড় মূল্যবান সম্পদ সে সম্পর্কে তারা অজ্ঞ এবং নিজেদের মহামর্যাদা ও উন্নতির সম্ভাবনা সম্পর্কে ছিল বেখবর। মওলানা নিজস্ব বিশিষ্ট ভঙ্গিতে এ দিকটিও তুলে ধরেন এবং মানুষের মর্যাদার গান এত উৎসাহ ও আবেগের সঙ্গে গাইতে শুরু করেন যে, মানুষের মধ্যে ঘুমন্ত 'খুদী' (অহংবোধ) জেগে ওঠে এবং তারা নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন হয়ে ওঠে। মওলানার এই রণসঙ্গীতের প্রভাব পড়ে গোটা ইসলামী সাহিত্যের ওপর। তাঁর কবিতা, কাব্য ও সূফী দর্শন একটি নতুন ভাবধারার জন্ম দেয়।

মওলানা মানুষের দৃষ্টি তার সেই সৃষ্টি-কৌশলের দিকে আকর্ষণ করেছেন যাকে কুরআন মজীদের স্থানে স্থানে احسن تقويم বা 'সর্বোত্তম গঠন' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

"احسن التقويم" در "والتين" بخوان
که گرامی گوهر اس اے دوست جان
"احسن التقويم" ازفکرت برون
"احسن التقيم" از عرشش فزون

তুমি সূরা "ওয়া-ত্তীন"-এ احسن قويم পাঠ কর; বন্ধু হে! এ প্রাণ একটি অতি মূল্যবান রত্ন।

احسن تقويم তথা সর্বোত্তম ও সুন্দরতম এই গঠন তোমার চিন্তা-ভাবনার বহু ঊর্ধ্বে; حسن تقويم -এর বুলন্দী 'আরশ-ই মু'আল্লারও ওপরে (অতএব, তুমি ছোট নও)।[১]

১. মছনবী, ৫১৫ পৃ.।

তিনি আরও বলেন, মানুষ ছাড়া আর কারও মস্তকে কি "কারামত"-এর তাজ পরানো হয়েছে? كرمنا এবং اعطينك। অর্থাৎ "আমি সম্মানিত করেছি" এবং "আমি তোমাকে দান করেছি"—মানুষ ছাড়া আর কাউকে কি এ সম্বোধন করা হয়েছে?[১]

هيچ كرمنا شنيد اين آسمان + كه شنيد ايں آدمی پرغمان

تاج كرمناست بر فرق سرت + طوق اعطينك آويز برت

এই আসমান কি كرمنا (আমি তোমাকে সম্মানিত করেছি)-এর আওয়াজ শুনেছে (একমাত্র মানুষ ছাড়া)? দুঃখ জর্জরিত এই মানুষই কেবল এই আওয়াজ শুনেছে (শুধু তাকেই এই সম্মান দেওয়া হয়েছে)।

কার্রামনা'র টুপি তোমার শিরোপরি স্থাপন করা হয়েছে; 'আ'তয়্যায়নাকা'-এর বেড়ি একমাত্র তোমার কাঁধেই ঝোলানো হয়েছে।[২]

তিনি বলেন, মানুষ তামাম সৃষ্টি জগতের সার-নির্যাস, সংমিশ্রণ ও সর্বগুণের আধার। ক্ষুদ্র মানুষের ভেতর এত বিরাট বৈচিত্র্যের সমাহার ঘটানো হয়েছে যে, এ যেন এক মহাসমুদ্রকে একটি কুঁজোয় বন্দী করা হয়েছে; একটি সংক্ষিপ্ত অস্তিত্বের মাঝে গোটা জগতটাই যেন লুকিয়ে আছে।

آفتابے دریکے ذرہ نہان ... درسه گزتن عالمے پنہان شده

নগণ্য এক কণিকার ভেতর বিশাল সূর্য লুকিয়ে রয়েছে; হঠাৎ করে একদিন এই কণিকাটি মুখ খুলবে।

সেই মহাসূর্য যখন তার আবাস থেকে বেরিয়ে পড়বে তখন প্রতিটি কণা আসমান-যমীনে রূপান্তরিত হবে।[৩]

ছোট এক জলাভূমির ভেতর জ্ঞানের এক মহাসমুদ্র লুকিয়ে রয়েছে; তিন হাতের এক দেহে লুকিয়ে রয়েছে একটি বিশ্ব।[৪]

মানুষই গোটা সৃষ্টি জগতের একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং মানুষই তামাম কায়েনাত তথা বিশ্ব-জগতের ঈর্ষার বস্তু। এর থেকেই জগতের রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণ ও জীবনের সম্ভ্রম রক্ষা হয়। এরই আনুগত্য সমস্ত অস্তিত্বশীল প্রাণী জগতের ওপর বাধ্যতামূলক।

هر شرابے بنده آں قد وخد ... جوهرے چون عجز دارد باعرض

সব ধরনের নেশা (পানীয়) এই মানবীয় অবয়ব এবং এই গণ্ডদেশের গোলাম; সব ধরনের মস্তান (আত্মভোলা) তোমার প্রতি ঈর্ষা পোষণ করে।

---

১. মছনবী, ৪৯৫ পৃ.। ৩. ঐ, ৫৯৪ পৃ.।
২. ঐ, ৪৭৫ পৃ.। ৪. ঐ, ৪৭৫ পৃ.।

তুমি গোলাপী রঙের কোন পানীয়ের মুখাপেক্ষী নও; তুমি প্রেমিকা নও, অতএব, তুমি সুগন্ধি গুঁড়ো মাখা ছেড়ে দাও।

মানুষ একটি রত্ন, আর আসমান তার প্রস্থতা (অবস্থা); সমস্ত কায়েনাত তথা প্রাণী-জগত শাখা ও ছায়ার মত, আর তুমি হচ্ছ কায়েনাতের লক্ষ্য।

তুমি পুস্তকের পাতায় জ্ঞানের অনুসন্ধান করে বেড়াও; আফসোস! তোমার সকল উৎসাহ-উদ্দীপনা ক্ষুধার অন্নের সাথেই সংশ্লিষ্ট।

তোমার খেদমত করা সকল জীব-জগতের ওপর ফরয। একটি রত্ন (সত্তা) কেমন করে (প্রস্থতার) অবস্থার মুকাবিলায় নিজেকে দুর্বল জ্ঞান করতে পারে।[১]

মানুষ ঐশী গুণাবলীর প্রকাশ এবং এমন এক দর্পণ যার ভেতর আল্লাহ্র তাজাল্লী ও নিদর্শনসমূহের ছায়াপাত হয়।

آدم اصطر لاب اوصاف علوست ... چوں ستاره چراغ در آب رواں

আদম ('আ) উন্নত ও মহত্ত্বর গুণাবলী পরিমাপক যন্ত্র; আদমের গুণাবলী আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহেরেই বহিঃপ্রকাশ।

আদম ('আ)-এর ভেতর যা কিছু দৃষ্টিগোচর হয়, সব সেই মহান সত্তারই প্রতিবিম্ব; যেমন নদীর পানিতে চাঁদের প্রতিবিম্ব দৃষ্টিগোচর হয়, এও ঠিক তেমনিই।

গোটা সৃষ্টি জগতকে স্বচ্ছ– সুমিষ্ট পানির মত মনে কর; এর ভেতর আল্লাহ যু'ল-জালালের গুণাবলীর ঝলমলানি দৃষ্টিগোচর হয়।

তাঁর জ্ঞান, তাঁর ইনসাফ ও তাঁর মেহেরবানী এমনভাবে পরিদৃষ্ট হয় যেমন পরিদৃষ্ট হয় প্রবাহিত পানির ভেতর আসমানের তারকারাজি।[২]

এত সব বলার পর তিনি অনুভব করেন, মানুষের সংজ্ঞা, পরিচয় ও তার সম্মান ও মূল্যের বর্ণনা এখনও অসম্পূর্ণ–আর সত্যি বলতে কি, কারো মধ্যে তা শোনবার ধৈর্যটুকু পর্যন্ত নেই।

মওলানার ভাষায় :

گر بگویم قیمت آں ممتنع + من بسوزم، هم بسوزد مستمع

আমি যদি এই মানুষের মূল্য বলে দিই যার মূল্য নির্ধারণ করা যার তার পক্ষে সম্ভব নয়, তাহলে আমি নিজেও জ্বলে যাব এবং শ্রোতাও জ্বলে যাবে।[৩]

১. মছনবী–৫৬২ পৃ.। ৩. ঐ, ৫১৫ পৃ.।
২. ঐ, ৫৬২ পৃ.।

এই সম্মান ও উন্নত মর্যাদার পর একমাত্র আল্লাহ্ ভিন্ন মানুষের খরিদ্দার আর কে হতে পারে এবং কেই বা তার মূল্য নির্ধারণ করতে পারে? আফসোস ঐসব মানুষের জন্য যারা নিজেদের মূল্য জানে না আর আফসোস তাদের জন্যও যারা যে কোন মূল্যে যে কোন হাতে বিক্রি হবার জন্য তৈরি থাকে। তিনি অত্যন্ত মর্মবেদনার সঙ্গে বলেন :

اے غلامت عقل و تدبیرات وهوش + تو چرائی خویش را ارزاں فروش

হে মানুষ! জ্ঞান, হুশ-বুদ্ধি ও কৌশল সব তোমারই গোলাম; অতএব, তুমি কেন নিজেকে সস্তায় বিকিয়ে দাও।[১]

অতঃপর তিনি বলেন, মানুষের ক্রয়-বিক্রয় তো সমাধা হয়ে গেছে। স্বয়ং আল্লাহ্ মানুষের খরিদ্দার এবং একমাত্র তিনিই মানুষের মর্যাদা বোঝেন।

مشتری ماس الله اشتری + ازغم هر مش ری هین تبر ترآ

مشتری جوکه جویان تواست + عالم آغاز وپایان تواست

আমাদের ক্রেতা একমাত্র আল্লাহ্; অতএব তুমি নিজেকে অন্যান্য সব ক্রেতার ধারণার ঊর্ধ্বে স্থাপন কর যাতে সেই মহান সত্তা ভিন্ন অপর কেউ তোমাকে খরিদ করার কল্পনাও না করতে পারে।

(যদি একান্তই তুমি নিজেকে বিকোতে চাও তবে) এমন খরিদ্দার তালাশ কর যিনি স্বয়ং নিজেই তোমাকে চান; যিনি তোমার আদি-অন্ত তথা তোমার সকল নাড়ি-নক্ষত্রের খবর জানেন (আর এমন খরিদ্দার একমাত্র আল্লাহ্ ভিন্ন আর কে হতে পারেন)।[২]

এতক্ষণ সে সব মানুষ সম্পর্কেই আলোচনা করা হ'ল যাঁরা মানবতারূপ সম্পদে ধন্য এবং যাঁরা মানবতার হাকীকত তথা এর অন্তর্নিহিত সত্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। এখানে সে সব মানুষের আলোচনা করা হয়নি[৩] যারা মানবতা-বোধশূন্য এবং যারা কেবল আকার-আকৃতিতেই মানুষ, যারা নিজের নফসের দাস এবং প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনার শিকার। এরা মানুষ নয়; মানুষের নিষ্প্রাণ খোলস ও প্রতিকৃতিমাত্র।

این نه مرد ا ند اینها صورت اند + مرده نان اندو کشته شهوت اند

যারা নফসের পূজারী তারা মানুষ নয়, মানুষের প্রতিকৃতি; এরা প্রবৃত্তির তাড়নার শিকার এবং রুটির জন্য প্রাণ বিসর্জনকারী।[৪]

---

১. মছনবী, ৪৭৫ পৃ.।
২. ঐ, ৪৫৯ পৃ.।
৩. ঐ।
৪. ঐ, ৪৫৯ পৃ.।

প্রকৃত মানুষের অভাব সর্বযুগে। মওলানার যুগেও এর ব্যতিক্রম ছিল না বরং সে যুগে সাধারণভাবে সেই সব লোকেরই প্রাধান্য ছিল যারা চতুষ্পদ জন্তু ও হিংস্র প্রাণীর স্বভাববিশিষ্ট। মওলানা ঐ ধরনের পশু স্বভাববিশিষ্ট মানুষের আচার-আচরণে বিষিয়ে উঠেছিলেন। তিনি প্রকৃত মানুষের খোঁজে ছিলেন। তিনি আপন সত্তারও অনুসন্ধান করছিলেন। এই আত্মানুসন্ধানের কাহিনী তিনি একটি চিত্তাকর্ষক পারস্পরিক কথোপকথনের ভেতর দিয়ে অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন :

دی شیخ باچراغ همی گشت گرد شهر
کزوام و دو ملولم وانسانم آرزوست
زیں همرهان سست عناصر ولم گرفت
شیر خدا و رستم و ستانم آرزوست
گفتم که یافت می نه شود جسته ایم ما
گف آں که یافت می نشود آنم آرزوست

গত রাতে এক বৃদ্ধকে দেখলাম, প্রদীপ হাতে শহরের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছে। সে বলছিল, আমি পৃথিবীর এই মায়াবী জাল ও মানব দঙ্গলের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে উঠেছি; আর তাই আমি আলো হাতে মানুষ খুঁজে ফিরছি।

এই ঢিলেঢালা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অধিকারী সঙ্গীদের ওপর আমি আস্থা হারিয়ে ফেলেছি; আমি একজন শেরে খোদা (আল্লাহ্‌র বাঘ) ও বীরবাহু রুস্তমের আশা করছি।

তাকে আমি বললাম, আমিও এ ধরনের লোক খুঁজেছি, কিন্তু তা পাবার নয়। সে বলল, যা পাওয়া যায় না– আমি তাই খুঁজে ফিরি।১

আমলের দা'ওয়াত

মওলানার তাসাওউফ ও তালক্বীন (শিক্ষা ও উপদেশ) বেকার জীবন যাপন ও সন্ন্যাসব্রত পালনের শিক্ষা দেয় না, বরং তা শিক্ষা দেয় কর্মের, সংগ্রাম সাধনার ও আয়-উপার্জনের এবং আহ্বান জানায় সামাজিক জীবন যাপনের প্রতি। সন্ন্যাসব্রত পালন ও সংসার ধর্ম ত্যাগকে তিনি ইসলামের মূল লক্ষ্য এবং রাসূল আকরাম (সা)-এর শিক্ষার পরিপন্থী কাজ বলে মনে করতেন। তাঁর মতে সামাজিক জীবন যাপন যদি আল্লাহ্‌র অভিপ্রেত না হ'ত তাহলে তিনি জুমু'আ, জামা'আত এবং সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধের তাকীদ দিতেন না। তিনি বলেন :

১. দীওয়ান।

مرغ گفتش خواجه در خلوت ما یست ... سن احمد صـ مهل محکوم باش

মোরগ তাঁকে বলল, সাহেব! নির্জনে দাঁড়িয়ে থেকো না; আহমদ মুজতবা (সা)-এর ধর্মে সন্ন্যাসব্রতের কোন স্থান নেই।

রসূলে খোদা (সা) সন্ন্যাসব্রতকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। অতএব, হে বোকা! যা রসূলের শিক্ষা ও জীবনাদর্শে নেই, যা বিদ'আত, তুমি তা কেন ইখতিয়ার করলে?

সালাতে জুমু'আ ও জামা'আত শর্ত এবং আমর বি'ল-মা'রূফ ওয়া নাহী 'আনি'ল-মুনকার তথা সৎ কাজে আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ ইসলামের নির্দেশ ও বিধান (অতএব, সন্ন্যাসব্রত পালন ও বেকার জীবন যাপনের শিক্ষা কোথায়?)।

আল্লাহ্র অনুগ্রহপ্রাপ্ত মানুষের দলে থাকো (জামা'আত থেকে আলাদা ও বিচ্ছিন্ন হয়ো না); আহমদ মুজতবা (সা)-এর সুন্নত পরিত্যাগ ক'র না এবং শরীয়তের বিধান মেনে চল।১

মওলানা রূমীর যুগে হাত-পা ছেড়ে নিষ্ক্রিয় ও নির্বিকার বসে থাকাকেই তাওয়াক্কুল মনে করা হ'ত। যে কোন রকমের সতর্কতা কিংবা সাবধানতা অবলম্বন এবং যে কোন ধরনের ব্যবস্থাপনাকে মনে করা হ'ত তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী। মওলানা তাওয়াক্কুল-এর শর'ঈ মর্মার্থ বর্ণনা করেন এবং শ্রম ও উপার্জনের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে এর প্রকৃষ্টতা ও শ্রেষ্ঠত্ব সর্বসমক্ষে তুলে ধরেন। اعقلها و توکل علی الله (উটটি বেঁধে রাখো এবং আল্লাহ্র ওপর তাওয়াক্কুল কর)—রসূলুল্লাহ্র এই বিখ্যাত হাদীছ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন :

گفت پیغمبر صـ باواز بلند ... در تو از جهدش بمانی ابلهی

ইসলামের মহান পয়গম্বর (সা) অতি উচ্চ কণ্ঠে বলেন, "আল্লাহ্র ওপর নির্ভর করার সঙ্গে নিজের উটটিও বেঁধে রেখ" (রশি খুলে দিয়ে আল্লাহ্র ওপর নির্ভর ক'র না যেন)।

'উপার্জনকারী শ্রমিক আল্লাহ্র দোস্ত'— এর গোপন রহস্য অনুধাবন কর; তাওয়াক্কুলের বাহানায় উপার্জনের ক্ষেত্রে কখনো আলসেমি ক'র না।

বাবা! তুমি যাও, আল্লাহ্র ওপর তাওয়াক্কুল কর; কিন্তু সেই সঙ্গে উপার্জনও কর, প্রতিটি কাজে পরিশ্রম কর এবং নিজের হাতে উপার্জন কর।

মেহনত কর, চেষ্টা কর যাতে মুক্তি পাও (দুঃখ ও দারিদ্র্যের হাত থেকে); যদি মেহনত থেকে দূরে সরে থাক তাহলে তুমি একটা আস্ত বেওকুফ।২

---

১. দীওয়ান—২৭ পৃ.।

মওলানা দুর্বল পশুর মুখ দিয়ে তাওয়াক্কুল ও নিষ্ক্রিয় জীবনের পক্ষে সে সব প্রমাণ পেশ করেছেন যা সাধারণত দুর্বল ও ভীরু লোকেরা করে থাকে। এসব প্রমাণ অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ও গুরুত্ববহ বলে মনে হয়। অতঃপর তিনি সে সবের বিস্তারিত জওয়াবও দিয়েছেন। সিংহের জওয়াব মওলানার নিজস্ব কল্পনারই অভিব্যক্তি।

সিংহের ভাষায় তিনি বলেন, মানুষকে যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, যোগ্যতা ও শক্তি দেওয়া হয়েছে তা দেওয়া হয়েছে নিরন্তর চেষ্টা ও সংগ্রাম-সাধনার জন্য। যদি কোন ব্যক্তি তার গোলামের হাতে কোদাল কিংবা শাবল তুলে দেয় তাহলে বুঝতে হবে, এর দ্বারা সে তার গোলামের কাছ থেকে মাটি খোড়া কিংবা পাথর ভাঙার কাজ নিতে চায়। এ কথা তার মুখ ফুটে বলবার কিছু মাত্র প্রয়োজন নেই। ঠিক তেমনি আমাদেরকে যখন হাত-পা ও কাজ করবার ক্ষমতা ও শক্তি দান করা হয়েছে তখন তার একমাত্র উদ্দেশ্য এটাই যে, আমরা আমাদের হাত-পা ও শারীরিক শক্তি দ্বারা কাজ-কর্ম করব এবং স্বীয় অভিপ্রায় ও এখতিয়ারকে বাস্তব রূপ দেব। এই প্রেক্ষিতে বলা যায়, দৌড়-ঝাঁপ, কাজ-কর্ম, আয়-উপার্জন, চেষ্টা-সাধনা সবই আল্লাহ্‌র মর্জি এবং আমাদের ফিতরতের ধর্ম। নিষ্ক্রিয় ও কর্মহীন জীবন যাপন আল্লাহ্‌র খেলাফ এবং তাঁর প্রদত্ত নে'মতের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপনেরই শামিল। বিশুদ্ধ তাওয়াক্কুল হ'ল, অবিরাম চেষ্টা-তদবীর করতে হবে এবং ফলাফলের জন্য একমাত্র আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা রাখতে হবে। কেননা সাফল্য একমাত্র আল্লাহ্‌র হাতে।

মওলানা বলেন :

گفت شیر آری دلے رب العباد ... کسب کن پس تکیہ بر جبار کن

সিংহ বলল, আরে! তুমি যা বলছ সে তো ঠিক (যে, আল্লাহ্ই সব কিছু করেন, মানুষের কোন কিছু করবার ক্ষমতা নেই, মানুষ তাঁর ইচ্ছার হাতের পুতুলমাত্র); কিন্তু সেই সঙ্গে তোমাকে তো এ কথাটাও ভেবে দেখতে হবে যে, বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা আমাদের পা দু'টোর সামনে একটা সিঁড়িও দিয়েছেন (অতএব, তুমি ধাপে ধাপে সিঁড়ি বেয়ে তাঁর সান্নিধ্যে উপনীত হও)।

ছাদ পানে যেতে চাইলে ধীরে ধীরে পা ফেলে এগুতে হবে; জাবরিয়া সম্প্রদায়ের মতবাদ (যে, মানুষের কোন ক্ষমতাই নেই; সে জড় বস্তুর মত অসহায় ও চলৎশক্তিহীন) অনুসরণ একটা ভ্রান্ত কল্পনা-বিলাসমাত্র।

প্রভু যখন তার নওকরের হাতে একটা বলদ তুলে দিলেন– তখন না বলতেই প্রভুর উদ্দেশ্য বোঝা হয়ে গেল।

১. মছনবী, ২৬ পৃ.।

যখন তুমি তাঁর উদ্দেশ্যকে নিজের জীবনের ওপর স্থান দেবে, তাঁর ইঙ্গিত পূর্ণ করতে নিজের জীবন বিলিয়ে দেবে, তাঁর ইশারা ও ইঙ্গিতের ওপর সুদৃঢ় থাকবে; (তখন) তিনি তোমার মস্তকে ন্যস্ত বোঝা সরিয়ে ফেলবেন এবং তোমার আকাঙক্ষা পূর্ণ করে দেবেন। তোমাকে যে শক্তি-সামর্থ্যরূপ নে'মত (অনুগ্রহ) দান করা হয়েছে তার শুকরিয়া হ'ল চেষ্টা ও মেহনত; জাবারিয়াদের ন্যায় দাবি করা (যে, মানুষ বড় অসহায়– তার করবার কোন ক্ষমতাই নেই) আল্লাহ্‌র নে'মতের অস্বীকৃতির নামান্তর।

নে'মতের শুকরিয়া আদায় কর, তাহলে তিনি তোমার নে'মত আরও বাড়িয়ে দেবেন; আর নে'মতের প্রতি কুফরী করলে সে নে'মত তিনি ছিনিয়ে নেবেন।

সাবধান, ওহে আস্থাহীন ও অবিশ্বাসী জাবারিয়াবাদি! ফলবান বৃক্ষের ছায়াতলেই বিশ্রাম নাও (কর্মের স্বীকৃতি দিতে ও গুরুত্ব স্বীকার করতে যারা নারাজ–তারাই জাবারিয়াবাদী)....

যাতে প্রবল বাতাস বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা ঝেড়ে বিশ্রামরত ব্যক্তিদের মস্তকের ওপর অনুগ্রহের দান (ফল) ঝরাতে পারে।

যদি তুমি ভরসা পাও তাহলে দুটো কাজ অন্তত কর; উপার্জন করতে থাক এবং সেই সাথে প্রবল পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র ওপর ভরসাও রাখ।[১]

অতঃপর সিংহের মুখ দিয়ে তিনি এ সত্যও তুলে ধরেছেন যে, চেষ্টা, তদবীর ও সংগ্রাম-সাধনা চালিয়ে যাওয়া এবং কর্মের জগতে ঝাঁপিয়ে পড়া আম্বিয়া-ই-কিরামেরই সুন্নত এবং আওলিয়া-ই 'ইজামের পন্থা।

شیر گفت آرے ولیکن هم بین ... منکر اندر نفی جهدش جهد کرد

সিংহ বলল, হ্যাঁ, সত্য বটে যা তুমি বলেছ; কিন্তু এটাও তো দেখতে হবে যে, আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালাম কত কঠোর মেহনতই না করেছেন!

আল্লাহ তা'আলা অবর্ণনীয় জুলুম ও অসহনীয় নির্যাতন সইবার পরই তাঁদের নিরলস পরিশ্রমকে সফল ও জয়যুক্ত করেছেন।

অতএব, জনাব! যতটা পার, আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালাম প্রদর্শিত ও আওলিয়া-ই-কিরাম অনুসৃত পথে মেহনত চালিয়ে যাও।

দুনিয়া কোন্ বস্তুর নাম? ব্যস! আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে গাফিল থাকা; এই পোষাক-পরিচ্ছদ, স্বর্ণ-রৌপ্য ও স্ত্রী-পুত্রের নাম দুনিয়া নয়।

---

১. দীওয়ান–২৭ পৃ.।

সম্পদ যদি "দীনের" খাতিরে উপার্জন কর তাহলে তা তোমার জন্য সৌভাগ্যের কারণ। কেননা রসূল (সা) বলেছেন ঃ সৎ ব্যক্তির জন্য সৎ পথে উপার্জিত সম্পদ নে'মতস্বরূপ।

মেহনতও সত্য, ঔষধও সত্য, ব্যথা-বেদনাও সত্য; মেহনত অস্বীকার করার অর্থ সত্যকেই অস্বীকার করা।[১]

তিনি কেবল তাঁর যুগের সাধারণ মানুষেরই সমালোচনা করেন নি কিংবা কেবল তাদেরই ভুল-ভ্রান্তিগুলোর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেন নি– যাদের সম্পর্ক ছিল জ্ঞানী-গুণী ও ধর্মীয় মহলের সঙ্গে, বরং তিনি সেই শ্রেণীর লোকেরও সমালোচনা করেছেন যাঁদের হাতে ছিল ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের রাজদণ্ড, যাঁরা ছিলেন সকল দণ্ডমুণ্ডের মালিক। তিনি খোলাখুলিভাবে এ সত্য তুলে ধরেছেন যে, অযোগ্য লোকদের হাতে আজ দেশের শাসনভার চলে গেছে এবং জনস্বার্থ এসব লোকের হাতের খেলনায় পরিণত হয়েছে। স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের যুগে এ ধরনের সমালোচনা অত্যন্ত বিপজ্জনক পরিণতি ডেকে আনতে পারত। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও মওলানার সত্যভাষী যবান নীরব থাকেনি– তিনি ছিলেন সোচ্চার কণ্ঠ। তিনি বলেন :

حکم چوں بر دست رنداں اوف تاد + لاجرم ذوالنون بزندان اوفتاد
چوں قلم در دست غدارے بود + لاجرم منصور بردارے بود
چوں سفیہاں رابود کار وکیا + لازم آمد یقتلون الانبیاء

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যখন ধর্মহীন অসৎ ব্যক্তিদের হাতে গিয়ে পড়ে, যু``ন্নুন মিসরীর ন্যায় সাধু ও সজ্জন ব্যক্তিও তখন কারাগারে ঢোকেন।

বিশ্বাসঘাতক গাদ্দারদের হাতে যখন কলম ওঠে, তখন তার পরিণতিতে মনসূর হাল্লাজকে শূলে চড়ানো হয়।

আর শাসন ক্ষমতা যখন ঘিলুবিহীন বেআক্কলের নিয়ন্ত্রণে চলে যায় তখন তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে আম্বিয়া-ই-কিরামকেও না-হক হত্যা করা হয়।[২]

দেশ শাসনের ভার যখন অপাত্রে ন্যস্ত হয়– তখন তার ফলাফল কি দাঁড়ায়? মওলানার ভাষায় শুনুন :

حکم چوں در دست گمراہے بود + جاہ پندارید ودر چاہے فتاد
احمقاں سرد رشد ستند وزبیم + عاقلاں سرہا کشیدہ در گلیم

রাষ্ট্র শাসনের অধিকার লাভ করে যখন গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট ব্যক্তি তখন সে

১. দীওয়ান–২৮ পৃ.।
২. ঐ, ১৩১ পৃ.।

এটাকে সম্মান ও পদমর্যাদা জ্ঞান করে, অথচ বাস্তব অবস্থা এই যে, এরই (শাসন ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভের) কারণে সে কূপে নিক্ষিপ্ত হয় (অর্থাৎ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বই তার অধিকারীকে ডুবিয়ে ছাড়ে)।

বেওকুফ ও আহমকেরা (সমাজ ও রাষ্ট্রের) নেতৃত্ব পেয়েছে আর ওদিকে বুদ্ধিমান লোকেরা (পরিণতির আশঙ্কায়) চাদরের তলায় মুখ লুকিয়েছে।[১]

'আকাইদ ও 'ইল্‌মে কালাম

মওলানা শুধু বুদ্ধিবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়ানুভূত জ্ঞানের সমালোচনা, 'ইলমে কালামের ভারসাম্যহীনতা, জাহির পরস্তী এবং শব্দ ও কথার মারপ্যাঁচের আসল রহস্যই উদ্‌ঘাটন করেন নি, কেবল ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতিলব্ধ জ্ঞান, রূহ বা আত্মার সাহায্যে কর্ম গ্রহণ এবং 'ইশ্‌ক তথা প্রেমের পথে মানুষকে আহ্বান জানানোকেই যথেষ্ট মনে করেন নি, বরং কালামশাস্ত্র সংক্রান্ত সমস্যা ও অসুবিধাদি তার নিজস্ব ভঙ্গীতে সমাধান করার এবং নিজস্ব বিশেষ রীতিতে বর্ণনা করার ও হৃদয়পটে তা গেঁথে দেবারও চেষ্টা করেছেন অর্থাৎ মওলানার আহ্‌বান ও তাঁর দর্শন কেবল নেতিবাচক ও সমালোচনামূলকই ছিল না, বরং তা ইতিবাচক ও শিক্ষামূলকও ছিল। যেসব সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে 'ইলমে কালামও ব্যর্থ হয়েছে, যে সব গ্রন্থি উন্মোচন করতে গিয়ে আরও অসংখ্য গ্রন্থির সৃষ্টি হয়েছে, মওলানা সে সব সমস্যার সমাধান এবং সেসব গ্রন্থি উন্মোচন এমনভাবে করেছেন যে, সেগুলোর অস্তিত্ব যে পূর্বেও কখনও ছিল, তেমনটি মনেই হ'ত না; এ ছিল যেন তাঁর চোখে দেখা বাস্তব সত্য এবং দৈনন্দিন জীবনের গৎবাঁধা ঘটনা। মওলানা তাঁর প্রতিপক্ষকে লা-জওয়াব করবার প্রয়াসী ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন আপন কথা প্রতিপক্ষের মন-মানসে গেঁথে দেবার প্রয়াসী। তিনি এমনভাবে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করতেন যাতে করে তাঁর প্রতিপক্ষ অনুভব করত যে, এ কথা তো তার নিজেরই অন্তরের কথা! মওলানার এ ধরনের বাক্যালাপের ফলশ্রুতি এই ছিল যে, তাঁর মছনবী দ্বারা ধর্মীয় মূলনীতি, 'আকাইদ ও 'ইলমে কালাম সংক্রান্ত বিষয়াদি এমনভাবে পরিষ্কার ও বোধগম্য হয়ে যায় যেমনটি হ'ত না 'ইলমে কালামের গোটা ভাণ্ডার গুলিয়ে খেলেও। এর দ্বারা এমন এক ধরনের স্বাদ ও মিষ্টি আমেজ সৃষ্টি হয় যা কেবল একজন গভীর আত্মপ্রত্যয়ী ও হৃদয়বান 'আশিকের কথাতেই সৃষ্টি হতে পারে।

মওলানা যদিও একজন আশ'আরী চিন্তাধারার অভিজ্ঞ উস্তাদ ও গভীর ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন 'আলিম ছিলেন, কিন্তু এ কথাও সত্য যে, তিনি তাঁর ব্যক্তিগত

১. দীওয়ান–৩৩৫ পৃ.।

অভিজ্ঞতা ও আল্লাহ্র রবূবিয়তের বদান্যতায় 'আকাইদ ও 'ইলমে কালামের একজন মুজতাহিদও ছিলেন– ছিলেন একটি নতুন কালামশাস্ত্রের স্রষ্টাও। তাঁর ধরন-ধারণ সাধারণ মুতাকাল্লিম ও 'আকাইদশাস্ত্রের 'আলিমদের থেকে ছিল একেবারেই আলাদা। তাঁর কথা ছিল কুরআন মজীদের মূল প্রেরণা এবং সাধারণ জ্ঞানের অত্যন্ত নিকটবর্তী।

আল্লাহ্র অস্তিত্ব

আল্লাহ্র অস্তিত্ব সম্পর্কিত সমস্যা 'ইলমে কালামসহ সব শাস্ত্রেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক সমস্যা। প্রাচীন কালাম শাস্ত্র আল্লাহ্র অস্তিত্বের সপক্ষে যেসব দলীল-প্রমাণ পেশ করেছে তা নিছক দর্শনসুলভ। এর দ্বারা মানুষের মনে তেমন কোন আস্থা কিংবা গভীর প্রত্যয় সৃষ্টি হয় না; এসব যুক্তি-প্রমাণে বড় জোর একজন মানুষ লা-জওয়াব হয়ে যেতে পারে। কুরআন মজীদের রীতি ও পদ্ধতি এই যে, সে এ ব্যাপারে মানুষের সুস্থ ফিতরতকে উস্কে দেয় এবং তার সুস্থ প্রকৃতির ওপর আস্থা রেখে তার ঘুমন্ত অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলে। সে পয়গম্বরের মুখ দিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত কণ্ঠে বলায় :

أَفِى اللّٰهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ

"সেই আল্লাহ সম্পর্কে কি কারও মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকতে পারে যিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা?" –(সূরা ইবরাহীম–১০ আয়াত)

এই স্বতঃস্ফূর্ত বর্ণনা ও বিস্ময় প্রকাশ দ্বারা মানুষের ফিতরত তথা প্রকৃতি চমকে ওঠে এবং সে তার যথার্থ কর্ম সম্পাদনে আত্মনিয়োগ করে। অতঃপর দেখা যায়, যমীন ও আসমানের সৃষ্টি থেকে এর স্রষ্টা, শিল্প ও সৃষ্টিজাত বস্তু থেকে এর শিল্পী এবং ক্রিয়া ও ফলাফল থেকে এর ক্রিয়াশীল ও ফলোৎপাদনকারী শক্তির দিকে হঠাৎ করেই পথ-নির্দেশনা ঘটে গেছে। সমগ্র কুরআন মজীদে এই যুক্তি ও প্রমাণ পদ্ধতিই গ্রহণ করা হয়েছে। ঘন ঘন মানুষকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহ অবলোকন কর এবং সৃষ্ট বস্তুরাজি (মখলুকাত) থেকে এর খালিক (স্রষ্টা) এবং শিল্পজাত দ্রব্যাদি থেকে এর শিল্পী পর্যন্ত গিয়ে উপনীত হও। কুরআনের মতে আল্লাহ্র পরিচয় লাভের এটাই নিশ্চিত, সংক্ষিপ্ত ও নিরাপদ পন্থা। কুরআন বলে :

سَنُرِيْهِمْ اٰيَاتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِى اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ط اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ شَهِيْدٌ .

আমি ওদের জন্য আমার নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করব বিশ্বজগতে এবং ওদের

নিজেদের মধ্যে; ফলে ওদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, ওটাই (অর্থাৎ আল-কুরআন) সত্য। এটাই কি যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের প্রতিপালক সর্ববিষয়ে অবহিত? – সূরা হামীম আস-সজদাঃ, ৫৩ আয়াত।

মওলানা তাঁর মছনবীতেও ঐ একই যুক্তি-প্রমাণ পদ্ধতি এখতিয়ার করেছেন। তিনি তাতে সৃষ্টিজগত থেকে সৃষ্টি জগতের স্রষ্টাকে খুঁজে বের করার পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, দুনিয়ার বুকে অনেক কিছুই ঘটতে আমরা দেখছি, অথচ এসবের কারক যিনি তাঁকে আমরা বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু যে সব কাজ হচ্ছে তাতেই প্রমাণিত হচ্ছে যে, পর্দার পেছনে কোন করনেওয়ালা নিশ্চয়ই আছেন। এখানে কর্ম প্রকাশ্য, কিন্তু কর্মী অন্তরালে।

دست پنہان و قلم بین خط گزار + اسپ در جولان و ناپیدا سوار

تیر پیدا بین ونا پیدا کمان + جانہا پیدا و پنہاں جان جان

হাত দৃষ্টির অগোচরে, কিন্তু কলমকে লিখতে দেখা যাচ্ছে; অশ্ব চক্রাকারে ঘুরছে, কিন্তু আরোহী দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না।

তীরের দিকে দৃষ্টিপাত কর, পরিষ্কার দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, কিন্তু কোথাও ধনুক দেখা যাচ্ছে না; প্রাণ প্রকাশমান, কিন্তু প্রাণের প্রাণ অপ্রকাশ্য।[১]

গতি তথা আন্দোলন স্বয়ং আন্দোলনকারীর অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে। যদি শনশন শব্দে বাতাস বয় তাহলে জেনে রেখ, এ বাতাসের প্রবাহকারী নিশ্চয়ই আছেন।

باد را دیدی که می جنبد بدان + باد جنبا نیست اینجا بادر ان

پس یقین در عقل ہر داننده ہست + این که با جنبـید جنبا ننده ہست

বাতাসের দিকে দেখ, যখন তা প্রবাহিত হয় তখন তার আলামত দেখা যায়, অথচ যিনি এই বাতাস প্রবাহিত করেন, তিনি থাকেন দৃষ্টির আড়ালে।

সজাগ মস্তিষ্কের অধিকারী যিনি, তিনি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করেন যে, এই প্রবহমান বাতাসের প্রবাহকারী নিশ্চয় কেউ আছেন।[২]

ফলোৎপাদনকারী শক্তি তোমার দৃষ্টিগোচর না হলেও ফল তো তুমি দেখতে পাচ্ছ। এর থেকেই তুমি বুঝতে চেষ্টা কর যে, ফল উৎপাদনকারী নিশ্চয়ই কেউ আছেন। দেহের ভেতর যে গতি ও শক্তি বিরাজ করছে, তা থেকেই বোঝা যায় যে, তোমার ভেতর জীবন্ত আত্মা (রূহ) রয়েছে। যদি রূহ দৃষ্টিগোচর না হয়, ক্ষতি কি! তোমার দেহের অঙ্গ সঞ্চালন তো প্রমাণ দিচ্ছে যে, তোমার মধ্যে রূহের অস্তিত্ব রয়েছে।

---

১. মছনবী, ৩০৫ পৃ.।
২. ঐ.।

کرتو اور امی نه بینی در نظر + فهم کن آن رابا ظهار آثر
تن بجان جنبد نمی بینی توجان + لیك از جنبیدن تن جان بدان

“যদিও সেই আসল সত্তা তোমার দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না, কিন্তু তার নিদর্শনাদির প্রকাশ থেকে তুমি তাকে চিনে নিতে পার।

আত্মার (প্রাণের) কারণেই শরীর নড়াচড়া করে, কিন্তু আত্মার দেখা পাওয়া যায় না। তবে শরীরের অঙ্গ সঞ্চালন থেকে তুমি আত্মার সন্ধান পেত পার।[১]

ফলোৎপাদকের জন্য ফল থেকে এবং শিল্পীর জন্য শিল্প-কর্ম থেকে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে? সূর্যের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য সূর্য-রশ্মির চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে?

خود نباشد آفتابے را دلیل + جزکه نور آفتاب مستطیل

সূর্যের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য তার বিচ্ছুরিত কিরণের চাইতে বড় প্রমাণ আর নেই।[২]

গোটা সৃষ্টিজগতই সগর্বে তার সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের ঘোষনা দিচ্ছে। সৃষ্টিজগতের প্রতিটি বস্তুই নিজস্ব চৌহদ্দির মধ্যে বৃত্তাবদ্ধ। গ্রহ-নক্ষত্রের চক্রাকারে পরিভ্রমণর একটা সুশৃঙ্খল নিয়ম-নীতি আছে, আছে চন্দ্র-সূর্যের জন্য একটা বিধিবদ্ধ মূলনীতি ও এক সুশৃঙ্খল কানূন। সঞ্চারণশীল মেঘমালাও বল্গাহীন নয় যে, যেদিকে চাইবে ছুটে চলবে। তার জন্যেও রয়েছে নির্ধারিত নিয়ম। এই সুশৃঙ্খল নিয়ম-বিধি ও বিন্যাস পরিষ্কার প্রমাণ দিচ্ছে যে, গোটা সৃষ্টি জগতের ওপর একজন মহাস্রষ্টা, মহাবিজ্ঞ নিয়ন্ত্রক আছেন। সৃষ্টি জগতের কিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে পারে না, তাঁর নিয়ম লঙ্ঘন করতে পারে না।

گر نمی بینی تو تدبیر قدر .... گوشمالش می دهد که گوش دار

যদি তুমি তকদীরে ইলাহীর সুশৃঙ্খল নিয়ম-নীতি দেখতে না পাও তাহলে সৃষ্টিজগতের মৌলিক উপাদানসমূহের ভেতর সক্রিয় ও গতিশীল শক্তি লক্ষ্য কর।

চন্দ্র-সূর্য একই যাতার দুটি পাতামাত্র যা একটি খুটাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে এবং পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করছে।

নক্ষত্ররাজিও তাদের গতিশীলতার কক্ষে বন্দী; এভাবে তারা ভালমন্দ ও সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্যের বোঝা বহন করে চলেছ।

---

১. মছনবী, ৩০৫ পৃ.।
২. ঐ.।

মেঘের ওপরও বিদ্যুতের কোড়া লাগানো হচ্ছে; (যেন কেউ বলছে) খবরদার! এভাবে চল, ওভাবে নয়।

(যেন আরও বলছে) অমুক উপত্যকায় মুষল ধারে বর্ষণ কর–এদিকে নয়; অবাধ্যতার ক্ষেত্রে তাকে কান মলে দিয়ে বলা হচ্ছে, শোন।[১]

মওলানা বলছেন, এই সৃষ্টিজগতকে এর মহাস্রষ্টা নিজের কল্যাণ কিংবা উপকারার্থে সৃষ্টি করেননি; বরং এসব তিনি মানুষের ফায়দা এবং তারই উন্নতির জন্য পয়দা করেছেন। এভাবে তিনি জগৎ সৃষ্টির যৌক্তিকতা, যাকে নিয়ে দার্শনিক ও মুতাকল্লিমীন পেরেশান, অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ভঙ্গীতে বর্ণনা করেছেন। এর ভেতরও তাঁর আনন্দময়তা ও প্রফুল্লচিত্ততার ছাপ সুস্পস্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে।

گفت پیغمبر صـ که حق فرمودست ... بلکه تا بر بندگاں جو دے کنم

পয়গম্বর 'আলায়হি'স-সালাতু ওয়া'স-সালাম বলেছেন ঃ আল্লাহু তা'আলা বলেন, 'গোটা বিশ্ব সৃষ্টির পেছনে আমার লক্ষ্য ইহ্‌সান (অনুগ্রহ) ছাড়া অন্য কিছু ছিল না।

'আমি এ জন্য সৃষ্টি করলাম যাতে তারা আমা থেকে উপকৃত হয়, যাতে তারা আমার (অনুগ্রহরূপী) মধু দ্বারা তাদের হাত পূর্ণ করে।

'সৃষ্টি থেকে আমি কল্যাণপ্রাপ্ত হই কিংবা কোন উপকার লাভ করি, এ জন্য আমি মখলূকাত সৃষ্টি করিনি; কিংবা আমার খোরপোশের ব্যবস্থা করবার জন্যও আমি এসব সৃষ্টি করিনি।[২]

'কোনরূপ ফায়দা লাভের উদ্দেশ্যে আমি মখলূকাত সৃষ্টি করিনি, বরং বান্দাহ্‌র ওপর আমার অনুগ্রহ প্রদর্শনের নিমিত্তে আমি এ সব সৃষ্টি করেছি।'

নবূওত এবং আম্বিয়া-ই-কিরাম ('আ)

আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালাম-এর পরিচয় তিনি দিয়েছেন স্বয়ং তাঁদের মুখ দিয়েই এবং বলেছেন ঃ তাঁরা আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত মানব সমাজের চিকিৎসক সম্প্রদায় এবং তাঁরা হৃদয়ঘটিত তথা আত্মিক রোগের ডাক্তার। একজন ডাক্তার রোগীর নাড়ী থেকে তার হৃদয় মূলে পৌঁছুবার চেষ্টা করেন। পক্ষান্তরে আম্বিয়া-ই কিরাম সরাসরি হৃদয়মূলে গিয়ে উপনীত হন। শারীরিক সুস্থতা রক্ষার জন্য একজন ডাক্তার জোর দেন, কিন্তু আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালাতু ওয়া'স- সালাম জোর দেন দিলের সুস্থতার ওপর, আমল-আখলাক তথা কর্ম ও চরিত্রের ওপর

১. মছনবী, ৫১৩ পৃ.; ২. ঐ ১৫৯ পৃ.।

এবং এর সংস্কার ও ভারসাম্য বজায় রাখার ওপর।

মছনবীর ভাষায় ঃ ما طبیبا نیم شاگردان حق ... ویں دلیل ما بود وحی جلیل

আমরা, আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালাম, দিলের চিকিৎসক এবং আল্লাহ্ জাল্লা জালালুহুর শাগরিদ; লোহিত সাগরও আমাদের দেখে ফুলে উঠেছে।

দেহের চিকিৎসকরা হচ্ছেন ভিন্ন লাইনের লোক; তাঁরা তো নাড়ী টিপে টিপে হৃদয়কে দেখেন (হৃদয়ের অবস্থা জানার চেষ্টা করেন)।

আর আমরা কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা কিংবা মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি হৃদয়কে দেখি; দূরদর্শিতার ক্ষেত্রে আমাদের স্থান অনেক ঊর্ধ্বে।

বস্তু জগতের চিকিৎসকরা ফলমূল ও খাদ্যাদির চিকিৎসক; তাদের দ্বারা পাশবিক আত্মা (প্রাণ) শক্তিশালী ও মযবুত হয়।

তারা কথা ও কর্মের চিকিৎসক; আর আমাদের ওপর সেই মহান সত্তার আলোক থেকে কথা নিক্ষিপ্ত হয় (অর্থাৎ নবীগণ আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন)।

(বলা হয়) তোমাদের জন্য এই কাজ উপকারী আর ঐ কাজ সত্যের আলোকোজ্জ্বল পথ থেকে তোমাদের বিচ্ছিন্নকারী।

এ ধরনের কথা তোমাদের সম্মুখে বাড়িয়ে দেবে আর ঐ ধরনের কথা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর।

এভাবে সব ভাল-মন্দ আমরা তোমাদের দেখিয়ে দিই এবং সে সবের সীমারেখাও নির্ধারণ করে দিই।

জাগতিক চিকিৎসকদের কাছে গন্ধ (সুগন্ধ অথবা দুর্গন্ধ) দলীল হিসাবে বিবেচিত হয় আর আমাদের (আম্বিয়া-ই-কিরামের) কাছে দলীল হ'ল, আল্লাহ্র ওয়াহী (প্রত্যাদেশ)।[১]

নবূওতের সপক্ষে দলীল-প্রমাণ পেশের ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি-প্রমাণ পেশের পরিবর্তে তিনি সাধারণত আনন্দ (ذوقى) ও প্রেমময় যুক্তির অবতারণা করেছেন। তিনি বলেন, পয়গম্বরদের প্রতিটি কমনীয় ভঙ্গী বলে দেয় যে, তিনি একজন নবী। তাঁদের আপাদমস্তক মু'জিযামণ্ডিত হয়ে থাকে। দর্শকের জন্য (তবে শর্ত এই যে, তাদেরকে হিংসা ও অহঙ্কার থেকে মুক্ত থাকতে হবে) তাঁরা নিজেরাই তাঁদের নবূওতের পক্ষে দলীল হয়ে থাকেন। এ কারণেই হযরত 'আব্দুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) বিশ্ব সৌন্দর্যের আধার নবীয়ে আখির–ই'য-যামানের নিষ্পাপ ও কমনীয়

১. মছনবী, ২৫০ পৃ.।

মুখশ্রী দর্শনে স্বতঃস্ফূর্ত কণ্ঠে বলে উঠেছিলেন : والله هذا ليس بوجه كذاب
আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি, এ কোন মিথ্যাবাদীর চেহারা হতে পারে না।

در دل هر کس که دانش را مزه است + روی آواز پیمبر معجزه است

যার দিলে জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির স্বাদ রয়েছে, তার জন্য পয়গম্বরীর আওয়াজের বাদ্য মু'জিযা বিশেষ (অর্থাৎ নবীর আওয়াজ কানে যেতেই সে নেচে ওঠে)।

তিনি (মওলানা রূমী)বলেন, পয়গম্বর এবং উম্মাহ্‌র সুস্থ বিবেক ও অন্তর-মানসের মধ্যে এমনই এক যোগসূত্র রয়েছে যে, পয়গম্বর যা কিছুই বলেন– উম্মাহ্‌র বিবেক তাতেই امنا و صدقنا (আমরা বিশ্বাস করলাম ও সত্য বলে মেনে নিলাম) বলে সায় দেয়। উম্মাহ্‌র বিবেক-বুদ্ধি ও অন্তর-মানস পয়গম্বরের প্রতিটি আওয়াজে হর্ষোৎফুল্ল হয়ে ওঠে– আর তা এ জন্য যে, সেই আওয়াজ এত চিত্তাকর্ষক, নিষ্কলুষ ও অসাধারণ হয় যে, এর ভেতর এবং অন্য আওয়াজ ও আহ্বানের ভেতর কোন সামঞ্জস্যই খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি বলেন :

چوں پیمبر از بروں بانگے زند + جان امت دردروں سجده کند
زانکه جنس بانگ او اندر جهاں + از کسے نشینده باشد گوش جان
آں غریب از ذوق آواز غریب + از زبان حق شنود انی قریب

পয়গম্বর যখন বাইরে থেকে আওয়াজ দেন তখন উম্মাহ্‌র প্রাণ ভেতরে সিজদায় পতিত হয়।

রূহ্‌ (আত্মা)-এর কান কখনো কারো থেকে এ ধরনের আওয়াজ আর ইতোপূর্বে শোনেনি, তাই

এই অসাধারণ উম্মাহ্‌ এই একক অশ্রুতপূর্ব আওয়াজে তন্ময় হয়ে আল্লাহ্‌র মুখে এই আওয়াজ শুনতে থাকে انى قريب –অর্থাৎ বান্দা, আমি তোমার নিকটেই অবস্থান করছি।[১]

তিনি বলেন, শ্রোতার পক্ষে পয়গম্বরের সত্যতার সপক্ষে সাক্ষ্য দেবার জন্য বাইরের কোন দলীল-প্রমাণের প্রয়োজন নেই। তাঁর কথিত উক্তি কেবল উক্তিই নয়, দাবিও বটে, প্রমাণও বটে। গোটা বিশ্বজগতের ব্যবস্থাপনা এর ওপরই প্রতিষ্ঠিত। পিপাসার্ত ব্যক্তিকে (যদি সে প্রকৃতই পিপাসার্ত হয়) যখন পানির জন্য ডাকা হয় তখন সে পানির জন্য প্রমাণ চায় না। শিশুকে মা যখন দুধ পান করাতে চায়, তখন সে প্রমাণের অপেক্ষায় হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকে না। আস্থা স্থাপন এবং কদম বাড়াবার জন্য মিষ্টি ডাক ও ভালবাসাই যথেষ্ট।

تشنه راچوں بگوئی تو شتاب ... تاکه بشیرت بگیرم من قرار

১. মছনবী—১৮০ পৃ.।

কোন পিপাসার্ত লোককে যখন তুমি তাড়াহুড়ো করে বল যে, পাত্রে পানি আছে, যাও! তাড়াতাড়ি পান করে এস;

পিপাসার্ত ব্যক্তি কি তখন বলে, কৈ, কোথায় পানি? তোমার কথা তো কেবল মুখের। অতএব ওহে প্রতারক! যাও, আমার কাছ থেকে সরে যাও (অর্থাৎ পিপাসার্ত ব্যক্তি পানির জন্য সন্ধানদাতার নিকট প্রমাণ দাবি করে না)।

দুগ্ধপোষ্য শিশুকে তার মা যখন সোহাগ ভরে ডেকে বলে, বাছা আমার! এস, আমি তোমার মা ডাকছি;

শিশু কি তখন বলে যে, মাতা! তুমি যে আমার সত্যিই মা– আগে তার প্রমাণ দাও যাতে করে তোমার দুধ পান করে পূর্ণ তৃপ্তি পেতে পারি?[১]

মওলানার মতে, মু'জিযা দ্বারা ঈমান লাভ ঘটে না অর্থাৎ মু'জিযা ঈমান লাভের মাধ্যম নয়। এটা জরুরী নয় যে, কেউ মু'জিযা দেখে ঈমান আনবেই। আর বাস্তবে ঘটেছেও তাই। মু'জিযা দেখে ঈমান এনেছে এমন লোকের নাম সীরাত গ্রন্থসমূহে খুব কমই পাওয়া যাবে। প্রখ্যাত সাহাবীদের তালিকায় তাঁদের নামই পাওয়া যায় যাঁরা স্বয়ং হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামকে দেখেই ঈমান এনেছিলেন, আর প্রকৃত ঈমান বলতে যা বোঝায় তা তো তাঁদেরই ছিল। মওলানা বলেন, মু'জিযা প্রদর্শন করা হয় প্রতিপক্ষকে পরাভূত করতে, লা-জওয়াব বানাতে। আর যারা পরাভূত হয় কিংবা হেরে যায়, যারা (তর্কে) নিরুত্তর হয়ে যায়– তারা কদাচিত মিত্র ও জীবন উৎসর্গকারী বন্ধুতে পরিণত হয়। আকৃষ্ট করবার এবং চিরতরে বন্দী করবার আসল বস্তু তো পারস্পরিক সম্বন্ধ ও সহজাতিত্ব। মওলানার ভাষায় :

موجب ایمان نباشد معجزات + بوئے جنسیت کند جذب صفات
معجزات از بہر قہر دشمن است + بوئے جنسیت دل بردن است
قہر گردد، دشمن اما دوست نے + دوست کہ گردد بہ بستہ گرد نے

মু'জিযা কখনো ঈমান লাভের কারণ হয় না; বরং রসূল ও উম্মাহ্‌র ভেতরকার সহজাতিত্ব ও শ্রেণীগত সম্পর্কের মিলই নবুওয়তের গুণাবলীকে আত্মস্থ করে।

মু'জিযা, সেতো দুশমনকে পরাভূত করবার জন্যে; বন্ধুর দিল্ হরণ করবার জন্য তা সম শ্রেণীর হওয়াই যথেষ্ট।

যুক্তি-প্রমাণের শাণিত অস্ত্রের সাহায্যে দুশমনকেই কেবল পরাভূত করা হয়, বন্ধুকে নয়; বন্ধুকে কে কবে গলায় দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে যেতে দেখেছে (বন্ধুকে তো কেবল হৃদয়ের আকর্ষণের জোরেই টানা যায়)![২]

---

১. মছনবী।
২. ঐ, ১৮০ পৃ.।

আম্বিয়া-ই কিরামের আলোচনায় তিনি বলেন, তাঁরা প্রেম ও সম্মানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত ও আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন (خود دار) হয়ে থাকেন। তাঁদের থেকে কিছু পেতে হলে শর্ত এই যে, আদব ও বিনয়ের সঙ্গে প্রার্থনা জানাতে হবে। তাঁরা শাহী মেযাজের অধিকারী হয়ে থাকেন। তাঁদের পদমর্যাদার অবস্থা এই যে, তাঁরা বলবেন, আর অন্যেরা শুনবে। এ ক্ষেত্রে কোনরূপ আপত্তি উত্থাপন কিংবা প্রতিবাদ জ্ঞাপন এবং বিবাদ-বিসম্বাদে লিপ্ত হওয়া বঞ্চনার পথ প্রশস্ত করারই নামান্তর।

মওলানার ভাষায় :

گر هزار ان طالب اندو يك ملول ... از رسالت شان، چگونه بر خورى

সত্যের হাজারো প্রার্থী হোক এবং একজন অনাগ্রহী, সেখানে রসূলের পয়গাম পৌছাতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হবেই।[১]

এই দিলের পয়গাম্বররা, যাঁরা রহস্যের কথা বলেন, ঠিক সেরূপ মনোযোগী শ্রোতা চান যেমনটি ইসরাফীল শিঙ্গা নিয়ে অপেক্ষারত আছেন।

এঁরা রাজা– বাদশাহ্‌র মতই আত্মমর্যাদা ও আত্মগৌরবের অধিকারী; তাঁরা দুনিয়ার মানুষের (শুধুমাত্র) আনুগত্য প্রত্যাশা করেন।

যতদিন পর্যন্ত তুমি তাঁদের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান ও আদব না দেখাবে, ততদিন কি করে তাঁদের রিসালত থেকে উপকৃত হবে?[২]

هر ادب شان کے همی آید پسند + کامد نديشان زا ايوان بلند

যে সে লোকের আদব কি করে এই সব রসূলের পছন্দ হবে? তাঁরা তো এক মহাসচিবালয় (দফতরে ইলাহী) থেকে এসেছেন (তাঁরা তো কোন মা'মুলী লোকের দূত নন)।[৩]

পরকাল

মওলানার মতে, মৃত্যু প্রকৃত জীবনারম্ভের ভূমিকা এবং মানুষের উন্নতির সোপান। ধ্বংস ব্যতিরেকে লোকালয় গড়ে ওঠা সম্ভব নয়; মাটি খনন করলেই কেবল মহামূল্য খনিজ সম্পদ লাভ করা যায়। নির্মিত ঘরবাড়ি যখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হচ্ছে– তখন জেনে রাখ, পুনর্বার এগুলো আবাদ করবার উপায়-উপকরণ তৈরি হচ্ছে।

১. মছনবী।
২. ঐ, ২৭১ পৃ.।
৩. ঐ।

شاہ جان جسم را ویراں کند + بعد ویرانش آبادان کند

کرد ویران خانہ بہر گنج و زر + وزهماں گنجش کند معمور تر

প্রকৃত বাদশাহ্ই দেহের প্রাণকে ধ্বংস করেন; অতঃপর তা পুনরায় আবাদ (সজীব) করেন।

স্বর্ণ-রৌপ্য ও মূল্যবান খনিজ সম্পদ বের করবার জন্যই তিনি ঘরকে ধ্বংস করেছেন। অতঃপর এই সম্পদ দ্বারাই তিনি পূর্বের চাইতে অধিক সুন্দর করে সৃষ্টি করবেন।[১]

মাটির দেহের এই পরাজয় এক বিরাট নির্মাণ কাজেরই আলামত। ফুলের কলি ফুটলেই ধরে নিতে হবে যে, ফলও শিগগির আসছে।

چوں شگوفہ ریخت میوہ سر کند + چونکہ تن بشکست جان سر بر کند

যখন ফলের আবরণ খসিয়ে দেওয়া হয় তখন ফল মাথা বের করবেই; যখন মাটির দেহের পরাজয় ঘটে (অর্থাৎ দেহধারী মানুষের যখন মৃত্যু হয়) তখনই প্রাণের স্পন্দন জাগে।[২]

তিনি অসীম ক্ষমাশীল দাতা, প্রকৃত দানশীল। তিনি জীবনের ন্যায় মহামূল্যবান সম্পদ দান করে কি করে তা চিরতরে ছিনিয়ে নিতে পারেন! অতএব তোমাকে বুঝতে হবে, তিনি এই ক্ষীণ ও দুর্বল প্রাণ নিয়ে এক অনন্ত জীবন দান করতে চান। তিনি একে মাটির আধার থেকে বের করে সেই নে'মতই দান করতে চান যা মানুষের কল্পনারও অতীত।

ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر – الحديث

(জান্নাতের নে'মতরাজি এমন) যা কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শোনেনি এবং কোন মানুষের কল্পনায়ও আসেনি। –আল হাদীছ;

آں کسے را کش کہ چنیں شاہے کشد + سوے تخت و بہترین جاہے کشد

نیم جان بستاند وصد جان دهد + انچہ درد همت نیا یدآں دهد

যাকে এমন এক মহান বাদশাহ মেরে ফেলেন (জেনে রেখ), তাকে শাহী তখ্তে উপবেশন এবং সর্বোত্তম মর্যাদায় ভূষিত করবার জন্যই নিজের কাছে টেনে নেন (অর্থাৎ এই মৃত্যু উৎকৃষ্ট জীবনের সিঁড়ি মাত্র)।

সেই হাকীকী বাদশাহ অর্ধেক প্রাণ নেন এবং শত প্রাণ দান করেন এবং এমন নে'মত দান করেন যা তোমার কল্পনারও অতীত।[৩]

১. মছনবী, ১২শ পৃ.।
২. ঐ, ৭৪ পৃ.।
৩. ঐ, ১০ পৃ.।

উন্নতির সর্বোচ্চ সোপানে আরোহণের জন্য ধ্বংস ও বিলুপ্তি অপরিহার্য। শ্লেটের পূর্বেকার লিখন বা অংকন না ধুয়ে, না মুছে কেউ কি তাতে নতুন লেখা লিখতে পারে? মাটি খুড়ে গর্ত করে সে গর্তের মাটি ভেতর থেকে সরানো ব্যতিরেকে কি পাতালের পানি বের করা যায়? লিখবার জন্য মানুষ সাদা কাগজ এবং বপন করবার জন্য ঘাস-জঙ্গলবিহীন আগাছামুক্ত পরিষ্কার জমিরই খোঁজ করে। لوح را اول بشوید بے وقوف ... تخم کارد موضعے که کشته نیست

আরে বেওকুফ! কেউ যখন লিখতে চায় তখন আগে ভাগে শ্লেটটা ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে নেয়; এরপরই না তার ওপর নতুন অক্ষর লিখতে শুরু করে।

ধোয়া-মোছার সময় শ্লেটের ঘাবড়ানো উচিত নয়; বরং তার মনে করা দরকার যে, তাকে আর একটি নতুন দফতরে রূপায়িত করা হচ্ছে।

যখন তোমাদের ঘরের নতুন ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয় তখন আগেকার ভিত্তিকে তুলে দেওয়া হয়।

যমীনের বুক চিরে যদি সুপেয় পানি বের করতে হয় তাহলে প্রথমে ওপরকার কাদা উঠিয়ে ফেলতে হয়।[১]

কোন জরুরী কথা লিখতে গেলে এমন কাগজ তালাশ করা হয় যার ওপর কিছু লেখা হয়নি এবং যা সাদা শুভ্র; অনুরূপভাবে কোন জমিতে বীজ বপন করতে চাইলে আগাছামুক্ত জমিতেই তা করা হয়।

অস্তিত্বহীনতা ও শূন্যতাই অস্তিত্বের অধিকার জন্মায় এবং স্রষ্টার রহমতের দরিয়ায় উত্তাল তরঙ্গের সৃষ্টি করে। দানশীল দানের জন্য অনুগ্রহপ্রার্থী নিঃস্ব ফকীরকেই বাছাই করে।

هستی اندر نیستی بتواں نمود + مالداران بر فقیر آرند جود

অস্তিত্ববিহীনতা থেকেই অস্তিত্বের প্রকাশ ঘটতে পারে; ধনবান লোকেরা নিঃস্ব-দরিদ্রের প্রতিই বদান্যতা প্রদর্শন করে।

তুমি স্বয়ং নিজের অবস্থার প্রতিই গভীরভাবে লক্ষ্য কর। তুমি বরাবরই ক্রমোন্নতির সোপানগুলো ধাপে ধাপে অতিক্রম করে এসেছ এবং ভাঙাগড়ার এই কার্যক্রম বরাবরের মতই অব্যাহত রয়েছে। তোমরা অস্তিত্বের একটি জামা (খোলস) খুলেছ এবং অপরটি পরিধান করেছ; একটি 'ফানা' (ধ্বংস) থেকে তোমরা 'বাকা' (স্থায়িত্ব) লাভ করেছ। যদি তোমরা প্রথম অবস্থায় থাকতে তাহলে

১. মছনবী–১০ পৃ.।

এই উন্নতি ও পরিপূর্ণতা কোথা থেকে লাভ করতে? তোমরা কাদা-পানির ভেতর বন্দী থাকতে; এখন তোমরা উন্নতির চূড়ান্ত ও শেষ সোপানে পৌঁছতে ঘাবড়াচ্ছ কেন? তোমাদের উড়ন্ত রূহ অস্থায়ী উপাদান সম্ভূত এই বন্দীশালা থেকে বের হতে ভয় পাচ্ছেই বা কেন?

تو ازاں روزے که در هست آمدی ... هر بقا چفیده آے بے نوا

> যেদিন তুমি অস্তিত্বের মধ্যে এলে সেদিন নিশ্চয়ই আগুন, মাটি অথবা বাতাস ছিলে।
>
> যদি তুমি এই অবস্থায়ই থাকতে তাহলে তোমার আজকের এ উন্নতি ও পরিপূর্ণতা লাভের সুযোগ কি করে আসত?
>
> পরিবর্তিত অস্তিত্ব থেকে সেই প্রথম অস্তিত্ব চলে গেল; অতঃপর সে স্থলে নতুন অস্তিত্বের ভিত্তি স্থাপন করা হ'ল।
>
> হে যুবক! সমগ্র অস্তিত্বের আবির্ভাব সে তো শূন্যতা থেকেই ('ফানা' থেকেই 'বাক'া'র আবির্ভাব); অতএব তুমি এই 'ফানা' (মৃত্যু) থেকে কেন মুখ ফেরাতে চাও?
>
> ওহে মিসকীন! এই সব ধ্বংস (যা তোমার দেহে ক্রমান্বয়ে প্রতিফলিত হয়েছে) তোমার জন্য কবে ক্ষতিকর হ'ল যে, এই ধংস (মৃত্যু) থেকে বেঁচে থাকার জন্য তুমি এত বেশি মনোযোগী হয়েছ?[১]

মৃত্যু আসলে মৃত্যু নয়, জীবনের সূচনা মাত্র। মৃত্যুর দিন মু'মিনের জন্য শোকের সন্ধ্যা নয়; বরং 'ঈদের সুবহে সাদিক।

آز مودم مرگ من در زندگی است + چون رهم زین زندگی پابند گیست

> আমি বহু পরীক্ষা করে দেখেছি, জীবনের মাঝেই আমার মৃত্যু; এই জীবন থেকে যখন অবসর মিলবে তখনই আমি চিরস্থায়িত্ব লাভ করব।[২]

'আরিফের মৃত্যুকে সাধারণের মৃত্যুর সঙ্গে তুলনা করা ঠিক নয়। কেননা 'আরিফ এই নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে আদৌ দুঃখিত কিংবা চিন্তিত হন না; বরং মৃত্যু তাঁর জন্য এক সুসংবাদ এবং মৃত্যুর দমকা বাতাস তাঁর অনুকূলে এক বসন্ত সমীরণ। 'আদ জাতির ওপর যে ধ্বংসাত্মক বায়ু প্রবাহ চালনা করা হয়েছিল তা হযরত হূদ ('আ) ও তাঁর সঙ্গীদের জন্য ছিল আরামদায়ক প্রভাত মলয়।

---

১. মছনবী, ৪১০ পৃ.।
২. ঐ, ২৭৬ পৃ.।

هود گرد مؤمناں خطے کشید + نرم می شد باد کا نجا می رسید

হূদ ('আ) ঈমানদারদের চারপাশে একটি সীমারেখা টেনে দিয়েছিলেন; 'আদ সম্প্রদায়ের উপর প্রবাহিত গযবী হাওয়ার গতি উক্ত সীমারেখায় পৌঁছে শ্লথ হয়ে গিয়েছিল।

همچنیں باد اجل باعار فاں + نرم و خوش همچو نسیم بوستان

ঠিক তেমনি মৃত্যুর হাওয়া 'আরিফ (আল্লাহ প্রেমিক, পূণ্যবান ব্যক্তি)দের জন্য কুসুম কাননের প্রভাত সমীরণের ন্যায় কোমল ও আরামদায়ক হয়ে থাকে।[১]

জবর ও এখতিয়ার (বাধ্যতামূলক ও ইচ্ছামূলক)

জবর ও এখতিয়ার-সংক্রান্ত বাহাছ (আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক) কালাম শাস্ত্রের কঠিনতম বাহাছসমূহের অন্যতম। একদল এখতিয়ার (অর্থাৎ মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আছে, আর এই স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি মানুষকে দেওয়া হয়েছে বলেই সে ভাল কাজের জন্য পুরস্কৃত এবং মন্দ কাজের জন্য তিরস্কৃত ও শাস্তিযোগ্য হয়)-কে অস্বীকার এবং জবর (অর্থাৎ মানুষ স্রষ্টার হাতের অসহায় পুতুল মাত্র, তার নিজস্ব সত্তা কিংবা ইচ্ছাশক্তি বলতে কিছু নেই)-কে সমর্থন করে। মুসলমানদের 'আকীদা ও ফেরকার ইতিহাসে এরাই জাবারিয়া ফেরকা নামে মশহূর। মওলানা রূমী বলেন, মানুষ যদি কেবল অসহায় হ'ত এবং স্বাধীন সত্তা ও ইচ্ছাশক্তি বলে কিছুই যদি তার না থাকত– তাহলে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে শর'ঈ বিধানের ক্ষেত্রে আদেশ-নিষেধের ব্যাপারে সে সম্বোধিত হ'ত না এবং শরীয়তের নানা হুকুম-আহকামের প্রতি তার মনোনিবেশেরও প্রয়োজন পড়ত না। কেউ কি কখনো কোন পাথর খণ্ডকে আদেশ-নির্দেশ দেয়?

جبریش گوید که امر و نہی راست + اختیارے نیست دین جمله خطا است

جمله قرآں امر ونہی است و وعید + امر کردن سنگ مر مر راکه دید

জাবারিয়া মতবাদ বলে, শর'ঈ আদেশ-নিষেধ যথার্থ, কিন্তু বান্দার এ ব্যাপারে কোন এখতিয়ার নেই। তাদের এ কথা ভ্রান্ত।

সমগ্র কুরআন মজীদ আদেশ-নিষেধ এবং ভাল কাজের কঠোর তিরস্কার ও সতর্ক বাণীতে পূর্ণ; (মানুষ যদি প্রস্তুরবৎ নিশ্চল ও চলৎশক্তিহীন অসহায়

১. মছনবী, ২৫ পৃ.।

মাত্র হয় তবে) কে কবে মর্মর পাথরকে কোন কিছু করার নির্দেশ দিতে দেখেছে।[১]

মওলানা বলেন, এখতিয়ার-এর 'আকীদা মানুষের প্রকৃতিতে অনুপ্রবিষ্ট এবং মানুষ তার দৈনন্দিন এই 'আকীদার প্রতি ইক'রার তথা স্বীকৃতি এবং জাবারিয় 'আকীদার প্রতি ইনকার তথা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে থাকে। কারো মাথার ওপর যদি ছাদের কড়ি কাঠ গিয়ে পড়ে তবে সে ছাদের ওপর রাগ দেখায় না, প্লাবন এসে ঘরের আসবাব ও তৈজসপত্র ভাসিয়ে নিয়ে গেলে এ জন্য কেউ কোনদিন প্লাবনের ওপর ক্রোধান্বিত হয় না; কারো পাগড়ী যদি বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে যায় তাহলে বাতাসের সঙ্গে সে বিবাদে লিপ্ত হয় না। সবাই জানে যে, এ সমস্ত জিনিস মজবুর ও বেকসুর। এ থেকে বোঝা যায় যে, একমাত্র মানুষই সাহিব-ই এখতিয়ার তথা স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির মালিক।

گرز سقف خانه چوبے بشکند ... تانه گوئے جبریانه اعتذار

যদি ঘরের ছাদ থেকে কোন কড়ি-কাঠ তোমার মাথায় খসে পড়ে এবং তোমাকে আহত করে তাহলে কি–

ঐ কড়িকাঠের ওপর তোমার কখনো রাগ হয়? তার সঙ্গে কি কেউ কখনো হিংসা কিংবা শত্রুতায় লিপ্ত হয়?

এই বলে যে, কেন ঐ কড়িকাঠটি আমাকে আঘাত করল এবং কেন আমার হাত ভাঙল কিংবা মাথা ফাটাল অথবা আমাকে চাপা দিল?

কিন্তু যে কেউই তোমার দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করতে চায়, তার ওপর তোমার হাজারো ক্রোধ ঝরে পড়ে।

কিন্তু যদি প্লাবন এসে তোমার মালমাত্তা ভাসিয়ে নিয়ে যায় তাহলে প্লাবনের ওপর কি তোমার ক্রোধ প্রকাশ কর?

অথবা হাওয়া যদি তোমার মাথার পাগড়ী উড়িয়ে নিয়ে যায় তাহলে কি তুমি হাওয়ার সাথে শত্রুতায় নেমে পড়?

তোমার ভেতরের ক্রোধই তোমার এখতিয়ার-এর প্রমাণ দেয় যাতে তুমি মজবুর কিংবা মা'যূর (অসহায় অথবা অক্ষম) হবার দাবি না কর।[২]

তিনি আরও এক কদম অগ্রসর হয়ে বলেন, জীব-জন্তু পর্যন্ত জবর ও কদর (ভাগ্য)-এর মসলা সম্পর্কে প্রকৃতিগতভাবেই ওয়াকিফহাল। তারাও বোঝে যে

---

১. মছনবী, ৪৬১-৬২। ২. মছনবী–৪৬৩ পৃ.।

বিবিধ যন্ত্রপাতি ও জড়-বস্তুর কোন দোষ নেই। একটা কুকুরকে যদি পাথর মারা হয় তাহলে সে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য পাথরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে না; বরং যে পাথর মেরেছে তারই পিছু ধাওয়া করে। উষ্ট্রচালক লাঠি দিয়ে উটকে মারে, এ জন্য উট সেই লাঠির ওপর রাগান্বিত হয় না; সে উষ্ট্রচালক থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চায়। পশু অবধি যখন এই সত্য সম্পর্কে অবহিত তখন মানুষের পক্ষে জাবারিয়াপন্থী হওয়া লজ্জাজনক বৈকি।

همچنیں گر بر سگے سنگے زنی ... روبه تاریکی کند که روز نیست

যদি তুমি কোন কুকুরের প্রতি পাথর নিক্ষেপ কর, তাহলে পাথর ছেড়ে সে তোমার ওপর ক্ষেপে যাবে এবং তোমাকেই তাড়া করবে।

যদি কোন উষ্ট্রচালক উটকে মারে তাহলে উট তার আঘাতকারীর প্রতিই মনোযোগী হয়।

উটের রাগ সেই কাষ্ঠখণ্ডটির ওপর নয় যা দিয়ে তাকে আঘাত করা হয়েছে (কেননা কাষ্ঠখণ্ডটির নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি নেই); অতএব উটের মত একটি পশুও বুঝতে পেরেছে যে, কে মালিক মুখতার আর কে মজবুর ও অসহায়!

পশু বুদ্ধিও যখন 'এখতিয়ার' সম্পর্কিত বক্তব্য বুঝতে পেরেছে, তখন ওহে মানব বুদ্ধি! শরম কর, তুমি আর এমন কথা বল না।

এ কথাতো একেবারেই পরিষ্কার। এতদসত্ত্বেও প্রভাতে সাহরী গ্রহণকারী পানাহারের বাহানায় সুবেহ সাদিকের আলোয় চারদিকে ফর্সা হয়ে গেছে দেখতে পেয়েও নিজের চোখ বন্ধ করে ফেলে।

এ সময় তার পরিপূর্ণ মনোযোগ তো নিবদ্ধ থাকে রুটির দিকে; (তাই) সে আঁধারের দিকে মুখ করে বলে, এখনও দিনের আলো ফুটে ওঠেনি।[১]

কারণ ও কার্যকারণ

কারণ ও কার্যকারণ সম্পর্কে মুসলিম ফের্কাগুলোর মধ্যে চরম মতবিরোধ বিদ্যমান। পণ্ডিতমণ্ডলীর মতে, গোটা সৃষ্টিজগতে কারণ ও কার্যকারণের সিলসিলা কায়েম রয়েছে। আদি কারণ কখনো কারণ থেকে পেছনে অবস্থান করতে পারে না। মু'তাযিলারাও এ মতের দ্বারা অনেকখানি প্রভাবিত। তাদের প্রবণতাও এদিকে যে, যে জিনিসের যে বৈশিষ্ট্য, স্বভাব ও পরিচয় স্বীকার করে নেওয়া

১. মছনবী– ৪৬৩ পৃ.।

হয়েছে তার ভেতর পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের সম্ভাবনা খুবই কম। এর ফলেই তারা খুবই অনীহা প্রকাশ করেন অস্বাভাবিক ও অত্যাশ্চর্য ঘটনার অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে আর কোন জিনিসের বেলায় তার স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থী কিছু ঘটতে দেখলে। অর্থাৎ কারণ ছাড়া কোন ঘটনা কিংবা দুর্ঘটনা ঘটাকে তারা অসম্ভব বলে মনে করেন। আশ'আরীপন্থিগণ এর ঠিক বিপরীত মত পোষণ করেন। তাঁদের মতে, কোন বস্তুই কোন বস্তুর কারণ নয়। কোন বস্তুর মধ্যে বিশেষ কোন স্বভাব বৈশিষ্ট্য ও কার্যকারিতা নেই। এ ধরনের ভারসাম্যহীন ও চরমপন্থী মতামতের ফলেই যে কোন লোকের যে কোন ধরনের কথা বলার এবং কার্যকারণকে সমূলে অস্বীকার করার একটা বাহানা মিলে গেছে। এর ফলেই মুসলিম বিশ্বাস জগতে এক ধরনের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি ও শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে।

মওলানার মত এই দুই চরমপন্থী মতামতের মাঝামাঝি। তিনি স্বীকার করেন যে, কার্যকারণ কিংবা হেতুর একটি হাকীকত আছে এবং হেতু কিংবা কারণ ও আদি কারণগুলোর মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা রয়েছে যা অস্বীকার করা অসম্ভব ও অযৌক্তিক। আল্লাহ্র সাধারণ রীতি এটাই যে, আদি কারণসমূহ কার্যকারণের অধীন হবে এবং বস্তু থেকে তার বৈশিষ্ট্যসমূহ বেরিয়ে আসবে। অবশ্য অত্যাশ্চর্য ও অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটাও সম্ভব এবং কখনো কখনো এ ধরনের (অত্যদ্ভুত) ঘটনা ঘটেও। তিনি বলেন :

بیشتر احوال بر سنت رود + گاه قدرت خارق سنت شود

سنت و عادت نهاده بامزه + باز کرده خرق عادت معجزه

بے سبب گر عز بما موصول نیست + قدرت از عزل سبب معزول نیست

অধিকাংশ অবস্থা স্বাভাবিক আইনানুযায়ী চলে; কখনো-সখনো কুদরত (আল্লাহ্র মহিমময় শক্তি) সে নিয়মের মধ্যে ব্যতিক্রম ঘটান (ফলে সেগুলো অতি অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক মনে হয়)।

তিনি আইন-কানুন এবং স্বাভাবিকতা নির্ধারণ করেছেন; অতঃপর ব্যতিক্রমী ও অত্যাশ্চর্য ঘটনাগুলোকে মু'জিযা আখ্যা দিয়েছেন।

যদি বিনা কারণে আমরা সম্মান লাভ করি (অর্থাৎ কারণের সঙ্গে আদি কারণসমুহের সম্পর্ক রয়েছে) তাহলে আল্লাহ্র মহিমময় শক্তি (কুদরত) কার্যকারণকে আদিকারণ থেকে পৃথক করতে পারেন।[১]

১. মছনবী ৪২৭ পৃ.।

সাধারণ মানুষ এসব কার্যকারণই দেখে থাকে এবং অন্য কিছু যে তাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, সে জন্য তাদেরকে মা'যূর গণ্য করা চলে।

حاصل آنکه در سبب پیچیده + لیک معذوری همیں را دیده

সংক্ষিপ্ত-সার এই যে, তোমরা কার্যকারণের জটিলতার মাঝে নিক্ষিপ্ত হয়েছ; আর একেই তোমরা 'জবর' ও অসহায়ত্ব মনে করছ।[১]

তিনি বলেন, কার্যকারণকে অমূলক ভাবা সমীচীন নয়; কারণ বা হেতুরও একটি হাকীকত আছে। কিন্তু যিনি মুসাব্বিবু'ল-আসবাব বা সমস্ত কারণের আদি কারণ তথা মহাস্রষ্টা– তাঁর হাকীকত এর চেয়েও ঊর্ধ্বে। তিনি মুসাব্বিবু'ল-আসবাব, রাব্বু'ল-আসবাব (কারণসমূহের প্রভু-প্রতিপালক) এবং তিনি ক'াদির-ই মত'লক' (একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী)। এমন যেন না হয় যে, কারণের পেছনে ছুটতে ছুটতে শেষাবধি তোমরা একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিপতিকেই একেবারে ক্ষমতাহীন ও নিষ্ক্রিয় ভাবতে শুরু কর।

اے گرفتار سبب بروں مپر + لیك عزل آں مسبب ظن مبر

هرچه خواهد آں مسبب آورد + قدرت مطلق سببها بردرد

ওহে, কারণ ও হেতুর জটিলতার মাঝে বন্দী! সীমার বাইরে উড্ডয়ন ক'র না; সমস্ত কারণের আদি কারণ তথা সৃষ্টিকর্তার দূরে সরে থাকার কথা চিন্তা ক'র না (কখনো আদি কারণসমূহের সম্পর্ক সরাসরি কর্তার সঙ্গে হয়ে যায়)।

সমস্ত কারণের যিনি আদি কারণ অর্থাৎ মহাস্রষ্টা যাকে চান তাকেই অস্তিত্ব দান করেন; তাঁর অপার কুদরত কখনো-সখনো কার্যকারণের পর্দাও ছিন্ন করে দেয়।[২]

এও বুঝতে হবে যে, কারণ কিংবা হেতু কেবল তাই নয় যা আমাদের জ্ঞান ও পর্যবেক্ষণের আওতায় রয়েছে; বরং সে সব প্রকাশ্য হেতুর ঊর্ধ্বে আরও কিছু হেতু রয়েছে যা আমাদের দৃষ্টি বহির্ভূত। প্রকৃত বা মূল কারণ প্রকাশ্য কারণ ও হেতুকে কখনো গতিশীল ও কার্যকর করে দেয়, আবার কখনো বা বেকার ও নিষ্ক্রিয় করে রাখে। সর্বোত্তম ও আসল হেতু হ'ল ঐশী ইচ্ছা, তাঁর অভিপ্রায় এবং আদেশ।

سنگ بر آهن زنی آتش جهد ... باز گاهے بے پرد عاطل کند

---

১. মছনবী ৪২৭ পৃ.।
২. মছনবী, ৪২, পৃ.।

তোমরা পাথর দিয়ে যখন লোহার ওপর আঘাত কর তখন আগুনের ফুলকী ছুটে বের হয়। এটা কারণ, কিন্তু আসল কারণ হ'ল হুক্‌মে খোদাওয়ান্দী তথা ঐশী হুকুম; তাঁরই হুকুমে আমরা বাইরে কদম ফেলি।

পাথর এবং লোহা হ'ল কারণ; কিন্তু ওহে সৎ লোক! তুমি একটু ওপরের দিকে তাকাও।

এই কারণ বা হেতুকে সেই মৌলিক বা প্রকৃত কারণই সচল করেছেন; বিনা কারণে কারণও কারণে পরিণত হয়নি।

এই প্রকাশ্য হেতুকে সেই হ'কীকত বা প্রকৃত কারণই কার্যকর ও কর্মক্ষম করে। আবার কখনো কখনো এটাকে বেকার ও নিষ্ক্রিয় করে দেয়।[১]

আমরা প্রকাশ্য হেতু বা কারণকে বুঝি এবং আম্বিয়া-ই-কিরাম প্রকৃত ও আদি কারণকে বোঝেন।

وان سبب ها کانبیاء را راهبر است + آن سببها زین سببها برتراست

این سبب را محرم آمد عقل ما + وان سببها راست محرم انبیاء

আসবাবে হাকীকী বা প্রকৃত ও যথার্থ কারণ যা কিনা আম্বিয়া-ই-কিরামের পথ-প্রদর্শক; তা এই প্রকাশ্য হেতু থেকে ঊর্ধ্বতর বস্তু।

এ সব হেতু সম্পর্কে ওয়াকি'ফহাল আমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধি; আর সেই হেতুর রহস্য সম্পর্কে ওয়াকি'ফহাল আম্বিয়া-ই-কিরাম।[২]

আসবাবে হাকীকী আসবাবে জাহিরীর হেতু এবং তার ওপর বিজয়ী।

هست بر اسباب اسباب دگر + در سبب منگر دران افگن نظر

হেতুর ওপর আরও হেতু আছে, আছে কারণের ওপর অন্য কারণ; শুধু হেতুর দিকে তাকাইও না; তাঁকেও দেখ।[৩]

এই আসবাবে জাহিরী আসবাবে হাকীকীর সামনে খবই নগণ্য ও দুর্বল; গোটা ব্যাপারটাই হাকীকী আসবাবের সঙ্গেই জড়িত ও সম্পর্কিত।

این سبب همچو مریض است وعلیل + این سبب همچو چراغ است وفتیل

شب چراغت را فتیلے تو بتاب + پاك دان زینها چراغ آفتاب

১. মছনবী, ৪২, পৃ.।
২. মছনবী–২৫ পৃ.।
৩. ঐ, ২৪৬ পৃ.।

এই প্রকাশ্য ও বাহ্যিক কারণ ব্যাধির ন্যায়; এটা যেন প্রদীপ ও বাতি।

রাত্রি বেলা তুমি তোমার প্রদীপ ও বাতির সলতে (ধরাবার চেষ্টায়) ঘোরাতে থাক; কিন্তু সূর্যের প্রদীপ এসব থেকে পাক-পবিত্র ও বেপরোয়া।[১]

আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালামের আবির্ভাবকালে যেহেতু সমগ্র দুনিয়াই জাহিরী আসবাব তথা বাহ্যিক ও প্রকাশ্য হেতুর মাঝে ঘুরপাক খায় এবং আসবাব-পরস্তী তথা হেতু পূজা যেহেতু চরম উচ্চ মার্গে অবস্থান করে, হেতু বা কারণের যিনি স্রষ্টা তিনি এবং তাঁর অপার কুদরত যেহেতু একেবারেই দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যায়, হারিয়ে যায় মস্তিষ্ক থেকে, গোটা জগৎ সেখানে শিরক এবং প্রকাশ্য ও দর্শনীয় বিষয়ের পূজার মধ্যে বন্দী থাকে, তাই আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালাম হেতু বা কারণের ওপর আঘাত হেনে থাকেন এবং কারণ বা হেতুর পরিবর্তে আদি কারণ ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র দিকেই সকলের মনোযোগ নিবদ্ধ করেন। আল্লাহ্ তা'আলাও তাঁদের হাত দিয়ে সিলসিলায় আসবাবের একেবারে বিপরীত ঘটনাও ঘটান এবং মু'জিযা প্রদর্শন করে আসবাব বা হেতুর গুরুত্বহীনতা ও কমযোরী প্রকাশ করে দেন।

انبیاء در قطع اسباب آمدند ... عز در ویش و هلاك و بولهب

আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালাম কারণ বা হেতু থেকে লোকদের দৃষ্টি লুপ্ত করে দিয়েছেন; তাঁরা হেতুর আসমানের ওপর মু'জিযার আঘাত হেনেছেন।

প্রকাশ্য ও বাহ্যিক হেতু ছাড়াই তাঁরা স্থল ও সমুদ্র অতিক্রম করেছেন; কৃষিকর্ম না করেই পরিষ্কার খাদ্য-শস্য পেয়েছেন।

তাঁদের প্রচেষ্টা ও সাধনায় বালিও আটায় পরিণত হয়েছে; রেশমী সূতা পশমী সূতা দ্বারা সজ্জিত হয়েছে।

সমগ্র কুরআনু'ল-করীম হেতু থেকে পরাঙ্মুখ থাকারই দরস দেয়; দরবেশের সম্মান লাভ এবং আবূ লাহাবের ধ্বংসপ্রাপ্তি তারই ইঙ্গিত বহন করে।[২]

কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার সাধারণ রীতি এবং প্রচলিত নিয়মাদর্শ হ'ল হেতু থেকে আদি কারণসমূহের উদ্ভব ও অস্তিত্ব প্রাপ্তি। এ থেকেই আপন বান্দাদেরকে তিনি শ্রমের তা'লীম দিয়ে থাকেন।

---

১. মছনবী, ১৪১ পৃ.।
২. মছনবী-২৪৬ পৃ.।
১. মছনবী, ৪২ পৃ.।

لیك اغلب بر سبب را ند نفاذ + تا بداند طالبے جستن مراد

কিন্তু অধিকাংশ বিষয় হেতুর ওপর চলে যাতে করে প্রার্থী তার অভিষ্ট সিদ্ধির জন্য অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হবার শিক্ষা লাভ করে। [১]

এভাবেই মওলানা কালাম-সংক্রান্ত ঐসব সমস্যা এবং ধর্মীয় মূলনীতি ও 'আকীদাসমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন যেগুলোকে মুতাকাল্লিমীন ও আশ'আরী-পন্থী দার্শনিকগণ দর্শনের ঐন্দ্রজালিক হেঁয়ালি সৃষ্টির মাধ্যমে অত্যন্ত শুষ্ক ও বিতর্কিত বিষয়ে পরিণত করেছিলেন। মওলানা সে সব বিষয়ের হাকীকত 'ইলমে কালাম ও দর্শনের সংকীর্ণ গলি-ঘুপচি থেকে বের করে সাধারণ বিবেক-বুদ্ধির প্রশস্ত অঙ্গনে নিয়ে আসেন এবং চিত্তাকর্ষক উদাহরণ, সহজবোধ্য দৃষ্টান্ত এবং কার্যকর ও প্রভাবমণ্ডিত বর্ণনাভঙ্গী দ্বারা সেগুলোকে দৈনন্দিন জীবনের সত্যে ও জীবন-কাহিনীতে পরিণত করেন।

মছনবীর প্রভাব

মছনবী তামাম মুসলিম বিশ্বের চিন্তাধারা ও সাহিত্যের ওপর গভীর ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। ইসলামী সাহিত্যের বিশালায়তন ভাণ্ডারে এমন পুস্তকের সংখ্যা খুব কমই আছে যা মুসলিম বিশ্বের বিস্তৃত পরিধিকে দীর্ঘকাল ধরে এমন গভীরভাবে প্রভাবিত করে রাখতে পারে। ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে অব্যাহতভাবে মুসলিম বিশ্বের বুদ্ধিবৃত্তিক, জ্ঞানগত ও সাহিত্য জগত এর সঙ্গীত ও গীতবাদ্যে মূর্ছিত হয়ে আছে। এর সরস সহজ বাণীসমূহ মুসলিম বিশ্বের দিল্ ও দিমাগ তথা মন ও মস্তিষ্ককে নতুন আলোক ও নবতর উত্তাপ প্রদান করছে। এর মাধ্যমে প্রতিটি যুগেই কবিকুল নিত্যনতুন বিষয়, নবতর ভাষা এবং নয়া আঙ্গিক লাভ করেছেন এবং তাদের চিন্তাশক্তি ও সাহিত্যিক প্রতিভা বিকশিত হচ্ছে। জ্ঞানী পণ্ডিত ও কালামশাস্ত্রবিদগণ স্ব-স্ব যুগের জিজ্ঞাসা ও সন্দেহ নিরসনের জন্য এ থেকে নতুন নতুন দলীল-প্রমাণ, চিত্তাকর্ষক উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত, মনোমুগ্ধকর কাহিনী ও প্রশ্নোত্তরের নিত্য-নতুন রাস্তা পেয়েছেন। তাঁরা এর সাশ্রয়ে স্বীয় যুগের অস্থির প্রকৃতি প্রতিভাবান যুবকদের অশান্ত চিত্ত পরিতৃপ্ত করেছেন। তরীকত ও মা'রিফতপন্থিগণ এ থেকে সূফীসুলভ বিষয়াদি, সূক্ষ্ম ও গূঢ় জ্ঞানরাজি এবং সবচেয়ে বড় কথা, মুহব্বতের পয়গাম ও চিত্তজ্বালা এবং প্রেমোন্মত্ততার উপকরণ লাভ করেছেন। এর উদ্দীপনাময়ী কথাবার্তা দ্বারা তাঁরা তাঁদের নির্জন ও নিঃসঙ্গ

---

১. মছনবী, ৪২ পৃ.।

মুহূর্তগুলো ও জনাকীর্ণ মাহফিলসমূহকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে স্পন্দিত ও উত্তপ্ত রেখেছেন। এ জন্য প্রতিটি যুগের 'আশিক ও মা'রিফতপন্থিগণ একে তাঁদের মাহফিলের শামা'দান ও দিলের মুখপাত্র বানিয়ে রেখেছেন।

মছনবীর বিষয়বস্তুগুলো সবরকম সমালোচনার ঊর্ধ্বে এবং সকল প্রকার ভুল-ভ্রান্তি থেকে মুক্ত– এ রকম ভাবার কোন কারণ নেই। বহু বদ 'আকীদাবিশিষ্ট সূফী ও প্রবৃত্তি-পূজারী এর থেকে কখনো কখনো অবৈধ ফায়দা লুটেছেন। ওয়াহ'দাতু'ল-ওয়াজূদ মতবাদীরা আজও এ থেকে তাঁদের মতের সমর্থনে ও অনুকূলে সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করে থাকেন। মছনবী আর যাই হোক একজন মানুষের রচনা তো; আর তিনি মা'সূম কিংবা নিষ্পাপও ছিলেন না। এর বিষয়বস্তুতে তাঁর মানসিক বিপত্তি এবং বাইরের প্রভাবের একটা ভূমিকা ছিল। এতসব সত্ত্বেও এটা অস্বীকার করা যায় না যে, মছনবী সে যুগের এক উল্লেখযোগ্য জ্ঞান-কীর্তি, ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য এবং এর অবিনশ্বর জীবনের উজ্জ্বলতর প্রমাণ। তিনি মুসলিম বিশ্বের চিন্তার স্থবিরতা, জ্ঞানগত ও সাহিত্যিক জড়তা এবং অন্ধ আনুগত্যমূলক ও অনুকরণসর্বস্ব সাহিত্য ও 'ইলমে কালামের ওপর কার্যকর আঘাত হানেন এবং ইসলামের চিন্তা ও দর্শনের কাফেলাকে, যা সপ্তম শতাব্দীতে হাত-পা ছড়িয়ে আরামপ্রিয় হয়ে উঠেছিল ও বসে বসে ঝিমুচ্ছিল, পুনর্বার সক্রিয় ও গতিশীল করে তোলেন।

মছনবীর একটি গুরুত্বপূর্ণ খিদমত এই যে, খৃস্টীয় বিংশ শতাব্দীতে যখন মুসলিম বিশ্বের ওপর দ্বিতীয় বারের মত বস্তুবাদ ও অনুভূতিবাদের (حسيت) হামলা চলে এবং য়ূরোপের নব্য দর্শন ও বিজ্ঞান মানুষের মনে নানা ধরনের সন্দেহ ও সংশয়ের বীজ বপন করে, ফলে মানুষের ঈমান ও গায়বী বিশ্বাসে এক সাধারণ অনাস্থা ও অবিশ্বাসের ভাব সৃষ্টি হতে থাকে এবং সেই সঙ্গে এ প্রবণতাও বৃদ্ধি পেতে থাকে যে, এমন প্রতিটি বস্তু যা মানুষের পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার আওতায় আসে না এবং মানুষের বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিকট ধরা পড়ে না– তার অস্তিত্বই নেই, যখন 'আকাইদের প্রাচীন পুঁথি-পুস্তক ও প্রাচীন যুক্তিধারাও 'ইলমে কালামের মুকাবিলায় নামতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করে তখন মছনবী এই বর্ধিত সয়লাবের (যা য়ূরোপের বস্তুগত ও রাজনৈতিক বিজয়ের চেয়ে কম বিপজ্জনক ছিল না) সফল ও সার্থক মুকাবিলা করে এবং মানুষের মন-মানসে পুনরায় ধর্মীয় ও গায়বী সত্যের প্রতি সম্মান ও মর্যাদাবোধ জাগ্রত করে এবং আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালামের জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব, অদৃশ্য জগতের বিশালতা ও বিস্তৃতি এবং হৃদয় ও আত্মা, ঈমান ও

আত্যন্তিক প্রেমের (وجدان) গুরুত্বের পরিপূর্ণ ছবি এঁকে দেয়। দর্শন ও বস্তুবাদের শতবিধ আঘাতে আহত যেসব যুবক ও বুদ্ধিজীবী ইলহাদ (ধর্মদ্রোহিতা, নাস্তিকতা) ও কুফরের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল অথবা ঈমান ও ইসলামের সীমান্ত যারা পাড়ি দিয়ে ওপারে চলে গিয়েছিল, মছনবী তাদের পুনরায় ঈমান ও ইয়াকীনী সম্পদে ধন্য করে। ভারত উপমহাদেশের জ্ঞানী-গুণী ও মনীষীদের একটি বিরাট সংখ্যা পরিষ্কার স্বীকৃতি দিচ্ছেন যে, তাঁরা মছনবীর বদৌলতে পুনর্বার ইসলামের ন্যায় মহামূল্য সম্পদ লাভে সক্ষম হয়েছেন এবং তাঁরা এর ফয়েয-এর মাধ্যমেই মুসলমান ও স'াহি'ব-এ-য়াক'ীন হতে পেরেছেন। বিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম দার্শনিক ও চিন্তানায়ক ডঃ স্যার মুহাম্মদ ইকবাল (র) শায়খ রূমীর ফয়েয ও ইরশাদ লাভে ধন্য হবার এবং নিজেকে তাঁর ছাত্র হবার গৌরব লাভের স্বীকৃতি নানাভাবে দিয়েছেন এবং এ বিষয়ে প্রকাশ্য স্বীকারোক্তি দিয়েছেন যে, মছনবী তাঁকে এক নতুন ও নবতর প্রেরণা দান করেছে। এক জায়গায় তিনি বলেন :

پیر رومی مرشد روشن ضمیر ... باز شورے در نہاد من فتاد

পীর মওলানা জালালুদ্দীন রূমী আলোকোজ্জ্বল দিলের অধিকারী মুরশিদ, 'ইশ্‌ক ও প্রেমোন্মত্ত কাফেলার অধিনায়ক;

মনযিল তাঁর চন্দ্র-সূর্যের চেয়েও উর্ধ্বে; নক্ষত্ররাজি দিয়ে তিনি তাঁর তাঁবুর রশি বানিয়ে থাকেন।

কুরআনের নূর তাঁর বক্ষে (গচ্ছিত); জাম-ই-জামশীদ (পারস্য-রাজ জামশীদের পান পাত্র। কথিত আছে যে, এতে সারা বিশ্ব প্রতিফলিত হ'ত)-ও তাঁর আয়নার সামনে লজ্জিত।

সেই পবিত্র বংশোদ্ভূত, রূহে'র ওপর অনুগ্রহ বর্ষণকারীর বাঁশরী দ্বারা আমার প্রকৃতির মাঝে এক অপূর্ব সুরের সৃষ্টি হয়েছে।[১]

অন্যত্র তিনি বলেন :

رومی آں عشق ومحبت را دلیل + تشنه کا مان را کلامش سلسبیل

রূমী 'ইশ্‌ক' ও মুহব্বতের পথ-প্রদর্শক; তৃষ্ণার্ত ঠোঁটের নিকট তাঁর বাণী জান্নাতী নহর সালসাবীলের ন্যায়।[২]

---

১. মছনবী, پس چه جاید کراے اقوام مشرق পৃষ্ঠা ১।
২. জাবিদনামা, ২৪ পৃ.।

এই সঙ্গে তিনি এও অভিযোগ করেন এবং এই মর্মেও ক্ষোভ প্রকাশ করেন যে, এক শ্রেণীর মানুষ তাদের দৃষ্টিকে এর শব্দ ও বাহ্যিক অর্থের ভেতর সীমাবদ্ধ করে রেখেছে এবং একে জীবনের কোমলতা ও হৃদয়ের উষ্ণতায় পরিণত করবার পরিবর্তে নর্তন-কুর্দনের ওসীলা বানিয়েছে।

شرح او کردند اورا کس ندید + معنی او چوں غزال از ما رمید

رقص تن از حرف او آموختند + چشم را از رقص جاں بر دوختند

লোকেরা তাঁর বাণীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছে, কিন্তু তাঁকে কেউ দেখেনি; তাঁর সে সব হাকীকত ও অর্থ আমাদের দৃষ্টি থেকে দ্রুতগামী হরিণের ন্যায় অদৃশ্য হয়ে গেছে।

লোকেরা এর অক্ষর থেকে নর্তন-কুর্দন শিখেছে; প্রাণের নৃত্য দ্বারা চক্ষুগুলোকে সেলাই করে দিয়েছে।[১]

কিন্তু এ ক্ষতি আমাদের, মছনবীর নয়। মছনবী এই বিপ্লবী যুগেও আমাদের পথের সাথী তথা চলার পথের বন্ধু হতে পারে। এই বস্তুপূজার যুগে সর্বাপেক্ষা দুষ্প্রাপ্য বস্তু হ'ল হৃদয়ের জ্বালা এবং পবিত্র প্রেম ও ভালবাসা।

دل سوز سے خالی ہے نگہ پاک نہیں ہے

پھر اس میں عجب کیاکہ تو بیباک نہیں ہے

وہ آنکھ کہ ہے سرمہ افرنگ سے روشن

پر کار و سخن ساز ہے نمناک نہیں ہے

এই জাগ্রত সম্পদ মছনবী থেকে লাভ করা যেতে পারে। বর্তমান যুগের যুবকদের ওসীয়ত (অন্তিম উপদেশ দান) করতে গিয়ে তিনি বলেন :

پیر رومی را رفیق راہ ساز + تا خدا بخشد ترا سوز وگداز

زانکہ رومی مغز را داند زپوست + پائے او محکم فتد در کوئے دوست

---

১. জাবিদনামা, , ২২৪।

মুর্শিদ রূমী (র)-কে তোমার পথের সঙ্গী বানাও; তাহলে আল্লাহ্ তোমাকে হৃদয়ের উত্তাপ ও সজীবতা প্রদান করবেন।

যেহেতু মওলানা রূমী (র) মগজকে খোসা থেকে আলাদা করতে জানেন; (তিনি একজন 'আরিফ) সেহেতু তাঁর পদক্ষেপ বন্ধুর রাহে সুদৃঢ় প্রমাণিত হয়।[১]

---

২. বাল-ই জিবরীল।